সোমব্রত সরকার

কুণ্ডলিনী ও শব সাধনার আখ্যান



কুণ্ডলিনী শব সাধকের আখ্যান

সোমব্রত সরকার

দীপ প্রকাশন
২০৯এ বিধান সরণি, কলকাতা-৭০০০০৬

দীপ

KUNDALINI SHOB SADHAKER AKHAYAN

by Somabrata Sarkar

ISBN 978-93-94432-16-1

Phone 033-2241-2538 ♦ 98310 52249

website www.deepprakashan.com

email deepprakashan@gmail.com

প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ২০২২

প্রচ্ছদ সৌম্যদীপ প্রধান

প্রকাশক শংকর মণ্ডল

২০৯এ, বিধান সরণি, কলকাতা ৭০০ ০০৬

মুদ্রক কল্পনা অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৭০০ ০১৫

উৎসর্গ

ত্যাগীনাথ অঘোরী

ভূমিকা

দেহের মধ্যে ঘুমিয়ে থাকা শববৎ কুণ্ডলিনী হল অত্যাশ্চর্য শক্তির স্বরূপ। শ্মশান-মশানে, সাধুসঙ্গে কুণ্ডলিনী চক্রের নানান উপলব্ধি ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথকতা শুনতে শুনতে নিজের ভেতর কখন যে কলরব জমে ওঠে!

তা দিয়ে লেখা চলে তান্ত্রিক বিদ্যা- অবিদ্যা- অপবিদ্যার শিহরন জাগানো আখ্যান। সাধু-বোরেগীর দেহচর্চা, গোপন মুদ্রার শৈলী-ভঙ্গিমা, শব সাধনা। শ্মশান সাধক-সাধিকাদের কাছ থেকে পাওয়া মায়াধারী যোগিনী-ডাকিনী-মধুমতী বিদ্যার কাহিনি।

সেইসব সরেজমিনে ঘোরাঘুরির অভিজ্ঞতা লব্ধ বিষয়গুলো উঠে এসেছে নতুন এই বইটিতে। পাঠকের ভাল লাগলে তবেই শ্রম সার্থক।

সোমব্রত সরকার

সূচিপত্র

শব সাধনা

চাক্ষুষী বিদ্যা ও সম্মোহন

গঙ্গার তীর্থপথে

স্থিতভঙ্গি নিয়ে যদি একবার দাঁড়াতে পারো, দেখবে তোমার বিশ্বাস তোমার কাছে রয়েছে। বিশ্বাস হল স্থির শরীরের চাঞ্চল্যরহিত দশা। কোনও অস্থিরতা তখন নেই। ধ্যান - আসনে বসার সময় যে শান্ত শ্বাস পড়ে অধ্যাত্মভূমিতে তা বিশ্বাসের জমিকে দৃঢ় করে। দৃঢ়তা ধরে রাখাই সাধনা। যত আসনে বসতে পারবে অবিচলিত মন নিয়ে তত মনে একটা শক্তির ভাব টের পাবে। বিশ্বাসের নিরন্তর স্রোত বইতে থাকবে গঙ্গার জলপ্রবাহের মতো। গঙ্গা হল দিব্যরূপা। মোক্ষদা। আমার গুরুদেব বলতেন গঙ্গাস্নানে পরম পুণ্যের কথা। তখন আমার অস্থির, অবিশ্বাসী মন। জিজ্ঞেস করলাম, গঙ্গাস্নানের পরম পুণ্যের হাওয়া কী লাগে আজকের এই জলদূষণের কালাকালে? মৃদু হাসলেন গুরুদেব। বললেন, লাগে রে, লাগে। গঙ্গার জল অতীন্দ্রিয় সত্তা তৈরি করে। গঙ্গা কোনও বাইরের নদী নয়। গঙ্গার প্রবাহ তোর দেহের ভিতরও বইছে। মহাচৈতন্যময় দেহের ভিতর রয়েছে ইড়া নামের গঙ্গারূপা নাড়ি। সেই নাড়িকে সতেজ, সাবলীল করে নিতে পারলেই গঙ্গার মোক্ষদাভাব ধরা পড়ে নিজের ভিতর। দিব্যরূপও উন্মোচিত হয় চোখের সামনে। গঙ্গা হল অন্নদা। শস্যশ্যামলা ভূমিকে উর্বরা করে যেমন স্থূলগঙ্গা অন্ন জোগায়, তেমনই অন্তঃসলিলা গঙ্গারূপা ইড়া নাড়ির স্রোতপ্রবাহ দেহের চিৎশক্তিকে খুলে ফেলে দেহজমিকে ফসলের উপযোগী করে তোলে। উর্বর দেহের ঋষিরা, যোগিরা, মহাত্মারা গঙ্গার ধারে ধারে সাধন কুঠিয়ায় থাকতেন, প্রত্যহ সাধনে বসতে আসনশুদ্ধি করতেন। আসনশুদ্ধির পর জলশুদ্ধি। পুজো - অর্চনা, তর্পণ - হোমে জলশুদ্ধি করতে হয় সাত নদীকে স্মরণ করে। জলশুদ্ধির মন্ত্রে প্রথম নদী হিসেবে গঙ্গার নামখানি আসে, গঙ্গে

চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতী। নর্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেস্মিন সন্নিধিং কুরু।। দেহের গঙ্গা ও প্রাকৃতিক গঙ্গা দুটোরই উদঘাটিত সত্তা আছে। সাধনা করতে করতে দুই গঙ্গার সত্তার সাড়া মিলতে থাকবে। গুরুদেবের কথা ধরে আমি তখন গঙ্গামাহাত্ম্যের দিকেই এগোতাম। ভাবতাম বিষুর পা থেকে নেমে আসা গঙ্গাকে তো ভগীরথ মর্ত্যে নামিয়ে এনেছিলেন! শিব মস্তক - জটায় তাঁকে ধারণ করে হয়েছিলেন গঙ্গাধর। পাপপুণ্যের প্রচারিত জনরব টেনে এনে মহর্ষি ব্যাসদেব নিষ্পাপীদের উদ্দেশ্য করে বলছেন, সহস্র সূর্যের পরম জ্যোতির মতন গঙ্গাকে সংসারে থেকে একমাত্র তাঁরাই দেখতে পারেন যাঁরা নিষ্পাপ, বিধূতপাপাঃ যে মর্ত্যাঃ পরংজ্যোতিস্বরূপিণীং। সহস্রসূর্যপ্রতিমাং গঙ্গা পশ্যন্তি তে ভূবি।। এসব পুরাণ আর মহাকাব্যের কথা। আচার্য শঙ্কর গঙ্গাস্তোত্র রচনা করতে গিয়ে গঙ্গাকে যেমন পতিতপাবনী মা চিন্ময়ী বলছেন তেমনই বলছেন কাশীক্ষেত্ররূপী শরীরে জ্ঞানগঙ্গা বয়ে চলেছে। গুরুদেব আমাদের ত্রিকূটী কুম্ভক নামক একপ্রকার গুপ্তযোগ শিখিয়ে বলেছিলেন, এই কুম্ভক রপ্ত করতে পারলে গঙ্গার জলের নীচে অনেক সময় ধরে ধ্যানে বসা যায়। উচ্চকোটির মহাত্মারা মহাচৈতন্যময় সূক্ষ্মদেহ নিয়ে আজও ত্রিকূটী কুম্ভক করে গঙ্গার মধ্যেই আছেন। তাঁদের দেহের উপর দিয়ে গঙ্গা বয়ে চলেছে। সেইসব সূক্ষ্মদেহী মহাত্মাদের সত্ত্বগুণের ছোঁয়া যেমন গঙ্গার জলে আছে তেমনই নানান সব ভেষজ লতার গুণাগুণ, রত্নশিলা ও স্ফটিকের স্পর্শযোগও জলপ্রবাহের ভিতর বহমান। এই স্রোতধারাতে নামলে তারও অনিবার্য শক্তি সাধকেরা অনুভব করতে পারেন। কেননা একমাত্র সাধনা করলেই অতীন্দ্রিয় সত্তা উদঘাটিত হতে পারে। এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। পরম বিশ্বাস নিয়ে এজন্যই আজও মৃত্যু পথযাত্রীর মুখে গঙ্গাজল দেওয়া হয়। গঙ্গা, গোবিন্দ, গায়ত্রী, গীতাকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চান আধ্যাত্মিক মানুষেরা। এমনধারা ভাবনার ভিতর দিয়ে যখন সত্ত্বগুণ বাড়তে

থাকে শরীরের তখন আপনআপনি মন স্থির হয়ে যায়। স্থিরদশার ভিতর শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া কমতে কমতে একসময় বিগত হয়ে যায়। শ্বাস যখন বিগত হয়ে যায় তখনই বিশ্বাস যোগভূমিতে ছড়িয়ে গিয়ে শরীরে আধ্যাত্মিক প্রবাহ বইতে থাকে। কথাগুলো বলে সাধনানন্দ গিরি মহারাজ শেষমেষ বললেন, জগতে সমস্ত কিছু চঞ্চল, একমাত্র স্থির শ্রীভগবান। শ্বাসে লক্ষ্য রেখে একসময় তুমি যখন আকাশস্থ মহাপ্রাণের সঙ্গে নিজের প্রাণশক্তিকে মিশিয়ে নিতে পারবে— আকাশ থেকে বায়ুর বেগ টেনে এনে নিজের ভিতর প্রবেশ করাতে পারবে তখনই তৈরি হয়ে উঠবে প্রশ্বাস আর ভিতরকার শ্বাসকে যখন বাইরের আকাশে ফেলতে পারবে তখন বেরিয়ে আসবে তোমার নিশ্বাস। এই কার্যক্রম চলতে চলতেই একসময় বিশ্বাস অর্থাৎ শ্বাসহীন স্থিরতার দশা স্থায়ী ও লম্বা হতে থাকবে। একেই বলে অশরীর, অশরীরং শরীরেষু অনবস্থেষু অবস্থিতম এই উপনিষদ বাক্যে ভগবানকে অশরীর বলা হচ্ছে। অর্থাৎ তাঁর কোনওরকম কোনও ভোগ নেই। শরীর ভোগায়তন। সে যখন আহার, নিদ্রা, বিশ্রাম থেকে দূরে সরে অধ্যাত্মবাদের রাজ্য বা ভগবান দর্শনের চক্ষুতে রূপান্তরিত হয় তখন অশরীর হয়ে ওঠে। বিশ্বাসের ভূমি পাকাপোক্ত হয়ে যায়।

আমি ধরতে পারি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকেই বিশ্বাস হিসেবে চিহ্নিত করছেন সাধনানন্দ গিরি। যেটা একমাত্র সাধনা করেই পাওয়া চলে। এখানে বিশ্বাস হল গিয়ে সমগ্র সত্তার উপলব্ধি। অন্তঃকর্ণে দিব্যশব্দ শুনতে পেলেই সমগ্র সত্তার মধ্যে উপলব্ধি চলে এসেছে এটাই বুঝতে হবে। অধ্যাত্মবাদ একেই বলছে, নাদ প্রকট হওয়া। নাদসিদ্ধ সাধকদের সাধনস্থলীর মাটিতে, গাছপালায়, জল, আকাশে সাধনায় প্রকটিত নাদ জাগ্রত হয়ে থাকে তিনি অপ্রকট হলে পরেও। এজন্যই এসব স্থলে গিয়ে সাধনভজন করতে পারলে সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর উপলব্ধি ফুটে উঠতে পারে। মহানাদসিদ্ধদের নানান

দুর্গম সাধনস্থলীতে তাই সাধুসন্তদের আনাগোনা লেগেই থাকে। আমি ভাবতে থাকি পুরাণপুরুষদের সাধনস্থলীগুলোর কথা। সেখানে যোগি - মহাত্মা থেকে শুরু করে ভ্রমণপিপাসু অধ্যাত্মবাদীদের চলাফেরা। তাঁরা সব ভগবানের লীলাচিন্তা করেন, জপ করেন। জপ করতে করতেই মন্ত্রলয়ের অবস্থা আসে। গুরু, মন্ত্র, ইষ্ট— এই তিনকে এক ধারণা রেখে জপ করতে হয়। সাধনায় মস্ত বড় কাজ হল এক দেখা অভ্যাস করা। দেবতা একটি— একমেবাদ্বিতীয়ম জিভ দিয়ে যখন দেবতার নাম আমরা উচ্চারণ করে থাকি তখন শব্দ বৈখরীতে ধ্বনিত হয়। বেদে রয়েছে শব্দ থেকে জগৎ সৃষ্টি হওয়ার কথা। খ্রিস্টানদের বাইবেল ও মুসলমানদের কোরানেও শব্দ থেকে যে জগতের সৃষ্টি হয়েছে এই মতকেই স্বীকার করা রয়েছে। শব্দকে সাধকেরা দেখেন ব্রহ্ম হিসেবে। শব্দব্রহ্মের চার অবস্থা রয়েছে আমাদের শরীরেও। মূলাধার চক্রে রয়েছে পরা, মণিপুর চক্রে পশ্যন্তী, অনাহত চক্রে মধ্যমা আর বিশুদ্ধ চক্রে বৈখরীর অবস্থান। লিঙ্গ, নাভি, হৃদয় ও মুখ— এই চার প্রত্যঙ্গে শব্দব্রহ্মের অবস্থান। মুখ দিয়ে যখন বীজমন্ত্র জপ করা হয় সেই বীজ ক্রমাগত উচ্চারণে হৃদয় বা অনাহত চক্রে এসে লাগে। মধ্যমার ধ্বনি এরপর স্বতঃই ঠেলে উঠতে থাকে। সাধকেরা মধ্যমাতে ডুব দেওয়ার কথা বলেন। বলেন, হৃদয়ে ডুবতে পারলে অনন্ত শব্দ শুনতে পাওয়া যাবে। গুরুপ্রদত্ত বীজের শব্দের সঙ্গে অনন্ত শব্দ বা শব্দব্রহ্ম আপনাআপনি মধ্যমাকে ঠেলে তুলে এরপর উপরে উঠতে থাকে। একেই বলে নাদব্রহ্ম। অলৌকিক ভাবে এই শব্দ ওঠে। বৈখরীর জপ তখন একেবারেই থেমে পড়ে। মধ্যমাকে অতিক্রম করে যখন নাদের আওয়াজ মণিপুর বা নাভিতে গিয়ে লাগে তখন সেটা পশ্যন্তী বাক সাধকেরা বলেন, পশ্যন্তী বাকে এলে পরে জ্যোতির আবির্ভাব ঘটে। সুষুম্না নাড়ির দ্বার খুলে যায়। মন্ত্রের লয় হয়ে যায়। তখন নাদময় শরীর স্থিত হওয়ার দিকে খালি এগোতে থাকে। সাধক

বলেন পরায় স্থিতি। মূলাধারে সগুণ সাক্ষাৎকার ঘটে। ইষ্টের দর্শন পাওয়া যায়।

জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয়— এই চার অবস্থা আমাদের শরীরের মধ্যেই রয়েছে। তুরীয় অবস্থা হয় ব্রহ্মলক্ষ্যে। সাধকেরা বলে থাকেন, সাধন-আসনে বসলে সমাহিত চিত্ত যখন হয় তখন হৃদয়ে গুরুপ্রদত্ত বীজমন্ত্র বা নাম উঠতে থাকে। এই শব্দ কানকে ঢেকে ফেলে শ্রোত্রবৃত্তি অর্থাৎ বাইরের আওয়াজকে পুরোপুরি বন্ধ করে দেয়। যখন বাইরের সঙ্গে শরীরের যোগাযোগ বন্ধ হয়ে গেল তখন অধ্যাত্ম ইন্দ্রিয় জেগে ওঠে। নাদান্তর্গত জ্যোতিতে যখন মন আটকে থাকে তখন মন বলে কোনও বস্তু থাকে না, মন লয় হয়। বীজমন্ত্রের সশব্দ অক্ষর ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে পড়ে নিঃশব্দ পরমব্রহ্মকে খালি এগিয়ে এগিয়ে দেয়। এভাবে নাদানুসন্ধানের উপাসনা করতে হয়। নাদ থেকে যখন ওঙ্কারের ধ্বনি আসে তারও একটি ত্রিমাত্রাত্মক আওয়াজ ওঠে— অ, উ, ম। একে অব্যক্ত স্বয়ং প্রকাশ বলে থাকেন সাধকেরা। পরব্রহ্মবোধের দরজা হল নাদ। ওঙ্কার বা প্রণবধ্বনির পথে যে সাধনা তাও ওই সৃষ্টির রূপকেই খুলে ধরে। এ জগতের সবকিছুই ওঙ্কার। ওঙ্কারই বিশ্বের মূল উপাদান। ওঙ্কারের বুকে ওঙ্কারই ভাসছে জগৎরূপেই। ওঙ্কারের খেলা চলছে জগতরূপে, আবার ওঙ্কারের প্রলয় হচ্ছে যখন শরীরের ভিতর, লীন হয়ে যাচ্ছে সমস্ত আওয়াজ। সাধকেরা বলেন ওঙ্কারের ত্রিমাত্রাত্মক ধ্বনির প্রথম পাদ অ হল পৃথিবী বা আমাদের স্থূলশরীর। পুজোপাঠ, হবন সবই হল অকার পাদের উপাসনা। আমাদের যাবতীয় ইষ্টকার্য, শাস্ত্রীয় অনুশাসন এগুলো সব অকার পাদের সাধনা। শাস্ত্রাদির চর্চা, জপতপ এগুলো সব উকার পাদের সাধনা। উ-কার পাদ হল ঊর্ধ্বলোক। নাদান্তর্গত জ্যোতি শরীরের মধ্যে স্থির না হলে উকার পাদে যাওয়া চলে না। উকার পাদেই মন লয় হয়। শান্ত, অজর, অমৃত, অভয়, সর্বোত্তম ঊর্ধ্বমুখ

হল উকার পাদ। গোটা ওঙ্কার যখন শরীরময় ধ্বনি তুলতে সক্ষম তখন বুঝতে হবে যে, অনাহত নাদ খুলে গেছে। এটাই মায়িক প্রকাশের জায়গা, মকার পাদ। সগুণ মন্ত্রে উপাসনা করে সগুণ সাক্ষাৎকার বা ইষ্টদর্শনের মকার পাদের পরই সগুণ মন্ত্র শরীরের ভিতর বিলীন হলেই ওঙ্কার বা নাদের পুরোপুরি আবির্ভাব ঘটে। নাদ দিয়ে শুরু হয় নির্গুণ ব্রহ্মের সাধনা। এটাই তুরীয় দশা সাধকের। নাদের আওয়াজ কেউ আগে পান কেউ আবার আগে জ্যোতি দেখে ফ্যালেন। নাদ, জ্যোতি অতিক্রম না করতে পারলে সাধনা শুরু হয় না। পুজো আর উপাসনার ভিতর খালি আটকে থাকতে হয়। সাধনপথ যেমনই হোক না কেন— শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, সৌর, গাণপত্য, হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান— সকলেই গিয়ে শেষমেষ মিলিত হন নাদের পথে। নাদবিন্দু বা বিন্দুনাদের পথে তাই আধ্যাত্মিক জীবনের সূচনা করতে হয়। ভ্রুমধ্যে চোখ বুজে ধ্যান রেখে নাদ শুনতে ও জপ করতে হয়। ভ্রুমধ্যে সবসময় সাধকের আশ্রয় রাখতে হয়। ভ্রুমধ্যে যে ধ্যান একে সাধকেরা বলেন মৃত্যুঞ্জয়ী ক্রিয়া। নাদজ্যোতি যখন শরীরের মধ্যে খেলা করতে থাকে তখন যদি জ্যোতির প্রতি ধ্যান থাকে, নাদ সরে যায়। সেজন্যই সাধকেরা বলেন জ্যোতির দিকে মন যেন কোনওভাবে চলে না যায়, মনকে নিতে হবে ভ্রূদ্বয়ে, ওখানে নাদের আওয়াজকে প্রতিস্থাপন করতে পারলেই সূক্ষ্মনাদ পাওয়া যাবে তখন। সূক্ষ্মনাদ এলেই সাধক কোটিসূর্য সমপ্রভ কোটিচন্দ্র সুশীতলম পরমবিন্দুতে একীভূত হয়ে যাবেন। একেই বলা হচ্ছে নির্বাণ। মন্ত্রজপ করতে করতে আপনাআপনি এর প্রকাশ ঘটে। মন্ত্রযোগে ধ্যেয় মূর্তি আসে। শরীরে যখন মন্ত্রের লয় হয় তখন আসন, মুদ্রাযোগ, প্রাণায়াম শুরু হয়। ধ্যেয় জ্যোতির পথে এগোতে থাকেন সাধক। জ্যোতি যখন ধ্যেয় বিন্দুতে গিয়ে দাঁড়ায় তখন মহালয় ঘটে শরীরের। একেই বলে লয়যোগ। মন্ত্রযোগে শরীরে ওঠে মহাভাব, হঠযোগে আসে মহাবোধ আর লয়যোগে

ব্রহ্মগ্রন্থির সাধনপথে কুণ্ডলিনী গিয়ে হৃদয় চক্রে দাঁড়িয়ে যায়। হৃদয়েই সাধকেরা লীলাচিন্তা করেন, স্থূলমূর্তির ধ্যান করেন। ধ্যান করতে করতে বিষ্ণুগ্রন্থি ভেদ হলে কুণ্ডলিনী দ্বিদল চক্রের নীচে গিয়ে দাঁড়ায়। দ্বিদলেই রুদ্রগ্রন্থি ভেদ হলে কুণ্ডলিনী আকাশাত্মিকা হন। তখন সাধকেরা ধ্যানের ভিতর শত শত বর্ণের চিদাণু দেখতে পান। যা সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর হয়ে সূক্ষ্মতমে গিয়ে বিশ্বরূপের চিদকে প্রকাশ করতে থাকে। কুণ্ডলিনী শক্তি যখন নিম্নাভিমুখী হয়ে কুণ্ডলীরূপ ধারণ করে তখন মূলাধার চক্র ব্রহ্মদ্বার রোধ করে ঘুমিয়ে পড়ে। পুরোপুরি জাগরণের আগে কুণ্ডলিনী হৃদয় চক্রে দীপশিখার মতন জ্বলতে থাকে। বিন্দুস্পন্দ হয়ে কুণ্ডলিনী জাগে হৃদয়ে। মূলাধারে কুণ্ডলিনী হলেন পরা প্রকৃতি। শরীরের স্বাভাবিক দশা আমাদের নিম্নমুখী। যখন হৃদয় চক্র সক্রিয় হয়ে কুণ্ডলিনী রুদ্রগ্রন্থি ভেদ করে ফ্যালে তখনই আকাশরূপ ধারণ করে ঊর্ধ্বমুখ হয়। কুণ্ডলিনীর ঊর্ধ্বমুখীন দশাতেই ভ্রূমধ্যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম চিদসকল নাদধ্বনির আকর্ষণে অব্যক্ত নাদে গিয়ে দাঁড়ালে ভ্রূমধ্যে শরীরের যাবতীয় চাওয়া-পাওয়া নিশ্চল অবস্থানে চলে যায়। এটাই হল লয়যোগের শেষ ধাপ। মনবায়ু বিলীন হলেই পরম জ্যোতিতে মন লয় হয়, মনবায়ু বিলীয়ন্তে তত্রৈব পরমাত্মনি। জ্যোতির নানান রং ওঠে হৃদয় চক্র থেকে। প্রথমে আসে লাল জ্যোতি। তমঃগুণের আলো। জ্যোতি নীল হলে রজঃগুণের দশাপ্রাপ্তি ঘটে শরীরে আর যখন একেবারেই ধবধবে সাদা তখন সত্ত্বগুণের জ্যোতি। যখন পূর্ণজ্ঞান আসে তখন চোখ বন্ধ করলেও জ্যোতি, খোলা থাকলেও জ্যোতি। জ্যোতি আর সরে না কোনওভাবেই। নাদ শুনতে শুনতে অলৌকিক নানান শব্দ এল, স্পর্শ-রূপ-গন্ধ সবই এল, বাইরের যাবতীয় আকাঙ্ক্ষা দূর হয়ে একসময় ইষ্টদর্শনের আকাঙ্ক্ষা জাগল তারপর যখন পশ্যন্তীতে দর্শন ঘটতে লাগল তার পর হতে পরায় স্ব-স্বরূপকে অনুধাবন করা সহজ হল। সহজ দশা এলে পরে ধ্যান-আসন ছাড়া

খোলা চোখেও জ্যোতি দেখে থাকেন সাধকেরা। যা পূর্ণজ্ঞানের বা পূর্ণব্রহ্মের অবস্থা। হঠাৎ উপলব্ধির কোনও ব্যাপার নয়। দীর্ঘকালের আধ্যাত্মিক অনুশীলনে সিদ্ধদশা আসে। তখন কখনোই আর মনশ্চাঞ্চল্যের নাগালই পায় না শরীর।

শরীর দেবময় হয়ে ওঠে। দেবপম হলে শরীরসত্তায় দিব্যসত্তা জেগে ওঠে। দিব্যসত্তার ভিতরই পুরাণপুরুষদের ক্রিয়াবান সাধনস্থলীর অভিব্যক্তি টের পাওয়া যায়। নাদময় শরীর হলেই মহানাদসিদ্ধ সাধকদের অপ্রকট কালের দিব্যশব্দ খালি টের পাওয়া চলে। এজন্যই সাধকেরাই কেবল মহাত্মা-পুরাণপুরুষ, ঋষি-আচার্যদের সাধনস্থলীর প্রতি অনুরক্ত হন। সেখানে এসে সাধনভজন করতে করতে সাঁই সাঁই শব্দ, বাঁশির আওয়াজ, ঝিঁ ঝিঁ, মেঘনাদ — কত রকম শব্দ শুনতে পান। সাধারণত নবনাদের আওয়াজ পান সাধকেরা মহাত্মাদের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা সাধনস্থলীর ভিতর। উপনিষদে মেঘনাদকে বলা হয়েছে শেষনাদ। শিবপুরাণ আবার ওঙ্কারনাদকে বলেছে শেষনাদ। পতঞ্জলি ঋষিও মেঘনাদকে বলেছেন শেষনাদ। সাধনায় প্রকটিত নাদ জাগ্রত থাকে সিদ্ধভূমির সাধন গুহায়। এজন্যই দুর্গম সব সাধনগুহা, পূর্ণতীর্থভূমিতে গিয়ে জপধ্যান করতে চান পরবর্তী সময়ের সাধকেরা। সকলেরই নজর থাকে সেখানে জাগ্রত প্রকটিত নাদের প্রতি। তাঁরা এসে পুরাণপুরুষদের সাধনস্থলীতে সময় অতিবাহিত করেন, দিনের পর দিন থাকেন, সাধনভজন করতে থাকেন। কেননা এসব জায়গাতেই সাধনালব্ধ প্রকট নাদ জাগ্রত আছে সিদ্ধসাধকদের দেহ চলে যাওয়ার পরও। দিব্যশব্দ, দিব্যনাদের লয় হয়নি, দেহের লয় হয়ে গেলেও। সিদ্ধভূমির আকাশে-বাতাসে- মাটিতে-গাছপালায়-জলপ্রবাহের পরিসীমাতে নাদ আবদ্ধ হয়ে থাকে। সেই নাদ জেগে ওঠে নতুন তপস্বীদের তপস্ক্রিয়ায়। সিদ্ধ তপস্থলীগুলো জীবন্ত হয়ে ওঠে যেন আমারই চোখের সামনে। নানান

পৌরাণিকীর ভিতর ঢুকে পড়ে তখন সত্ত্বগুণী মন! এরকম করে ভাবতে পারাটা তো আমাকে শিখিয়েছিলেন সাধনানন্দ গিরি। যাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল সাগরসঙ্গমে, কপিল মুনির আশ্রমে।

সত্যযুগে সকল স্থানই ছিল তীর্থভূমি, ত্রেতাযুগে পুষ্কর ছিল শ্রেষ্ঠ, দ্বাপরে কুরুক্ষেত্রের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করা হয়েছে আর কলিযুগে শ্রেষ্ঠ তীর্থ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে গঙ্গাকেই। মহাভারতের বনপর্বে মহামতি ব্যাস সেই উক্তিই করেছেন, সর্বং কৃতযুগে পুণ্যং ত্রেতায়ং পুষ্করং স্মৃতম দ্বাপরে তু কুরুক্ষেত্রং গঙ্গা কলিযুগে স্মৃতা।। বনপর্বেই দেবর্ষি নারদ গঙ্গাসাগর তীর্থের প্রশস্তি সংকীর্তন করছেন। তিনি বলছেন যুধিষ্ঠিরকে, দশটি অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল একবার মাত্র গঙ্গাসাগরে এসে স্নান করলেই মেলে। দেবর্ষির মুখে গঙ্গাস্নানের এহেন প্রশংসা শুনে মহারাজ যুধিষ্ঠির এলেন গঙ্গাসাগরে স্নান করতে। যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে লোমশ মুনি, অর্জুন, ভীম, নকুল, সহদেবও আছেন। তাঁদের সঙ্গে রয়েছেন ধৌম্য পুরোহিত। সাগরসঙ্গমে পুরোহিতের তত্ত্বাবধানে পঞ্চপাণ্ডব স্নান সারলেন। দ্রৌপদীও সঙ্গে আছেন। গঙ্গানন্দন ভীষ্ম পর্যন্ত গঙ্গাসাগর তীর্থে এসেছিলেন মহর্ষি পুলস্ত্যের উপদেশ পেয়ে। প্রচলিত এক প্রবাদ রয়েছে, বাংলা হল পাণ্ডববর্জিত দেশ। মহাভারতের বনপর্ব পড়তে বসলে তেমনটা মনে হয় না। তখন লোকপ্রবাদ ভ্রান্ত বলেই মনে হয়। ভীষ্ম এসেছেন গঙ্গাস্নানে। পুলস্ত্য ঋষির তত্ত্বাবধানে তিনি ডুব দিলেন পবিত্র জলে। ঋষি বললেন, কুরুপিতামহ, জলে ডুবে স্নান করার আগে বলুন একবার, গঙ্গে গঙ্গে। গঙ্গার নামকীর্তন করলে সমস্ত পাপ খণ্ডিত হয়ে যায়। গঙ্গা দর্শন করলেই পরম মঙ্গল লাভ হয় জীবনে আর স্নান করলে এবং গঙ্গার জল পান করলে উপরের সাত কুল এবং নীচের সাতকুল পর্যন্ত পবিত্র হয়ে যায়। শত পাপ করেও যদি কেউ অনুতপ্ত হয়ে ভক্তি সহকারে গঙ্গাস্নান করে গঙ্গার জল কাঠকে পুড়িয়ে ফেলা আগুনের মতো তার সমস্ত

পাপকে বিনাশ করে ফ্যালে। দশহারা তিথিতে যদি গঙ্গাস্নান করা হয় তবে দশবিধ পাপ খণ্ডিত হয়। কোটি ব্রহ্মহত্যার পাপও গঙ্গাস্নানে কেটে যায়। গঙ্গার জলে জ্ঞানতঃ অবস্থাতে যদি কেউ মারা যান তার সদ্যোমুক্তি ঘটে, এমনকী অজ্ঞানত মৃত্যু হলেও ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি ঘটে। মৃত্যুর সময়ে গঙ্গাপ্রাপ্তির আশাতে আগেকার ধর্মপ্রাণরা গঙ্গাযাত্রা করতেন। মহর্ষি পুলস্ত্য বলছেন পিতামহ ভীষ্মকে, যেখানে গঙ্গা আছেন, সেটাই দেশ, গঙ্গার তীরবর্তী সমস্ত জায়গাই তপোবন আর সিদ্ধতীর্থ, যত্র গঙ্গা মহারাজ স দেশস্তত্তপোবনম সিদ্ধক্ষেত্রঞ্চ তজজ্ঞেয়ং গঙ্গাতীরসমাশ্রিতম। গঙ্গাকে পূর্ণতীর্থ মেনেই পুরাণাদি শাস্ত্রের শত শত মাহাত্ম্যসূচক শ্লোক লিখে গেছেন স্তব, বন্দনা আর ধ্যানের আচার্য ঋষিরা। মহাভারতেই বলা রয়েছে, গঙ্গা সব জায়গাতেই পাবনী কিন্তু হরিদ্বার, প্রয়াগ ও গঙ্গাসাগরসঙ্গমে তিনি অধিক পুণ্যময়ী, সর্বত্র পাবনী গঙ্গা ত্রিষু স্থানেষু দুর্লভা। গঙ্গাদ্বারে প্রয়াগে চ গঙ্গাসাগর সঙ্গমে।। পুণ্যের আশাতেই সেই পৌরাণিক যুগ থেকে অদ্যাবধি গঙ্গাস্নানে মানুষের আগ্রহ একটুও তো কমেনি। বারাণসীতে মোক্ষ রয়েছে গঙ্গার জলে ও স্থলে আর গঙ্গাসাগরের জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে সবখানেই রয়েছে মোক্ষ। এই বক্তব্য স্কন্দপুরাণের, গঙ্গায়ং চ জলে মোক্ষ বারাণস্যাং জলে স্থলে। জলে স্থলে অন্তরীক্ষে গঙ্গাসাগরসঙ্গমে।। স্কন্দপুরাণই বলছে, মানুষ তীর্থ সেবা, সব ধরনের দান, সকল দেবতাদের পুজো, সর্ববিধ তপস্যা ও যজ্ঞ, সমস্ত পুণ্যাশ্রমের পুণ্য যতই পেয়ে থাকুক না কেন, এই সকল কাজের মিলিত যে ফল তা একমাত্র এক গঙ্গাসাগরে স্নান করেই পাওয়া যায়। শুধু পৌরাণিক সাহিত্য তো নয় প্রাচীনতম বৈদিক গ্রন্থাদির ভিতরও গঙ্গার প্রশস্তি রয়েছে। ঋকবেদের এক মন্ত্রে যমুনা, সরস্বতী, শতদ্রু, পরুষ্ণি, অসক্লী, মরুৎবৃধা, বিতস্তা, সুষোমা ও আর্জীকীয়া নদীর সঙ্গে গঙ্গার নামেরও উল্লেখ আছে। বলা হয়েছে হে গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, শতদ্রু, পরুষ্ণি, আমার এ স্তবগুলো

তোমরা ভাগ করে নাও। হে অসিক্নীসঙ্গতা, মরুৎবৃধে, হে বিতস্তা ও সুষোমাসঙ্গতা, আর্জীকীয়ে, তোমরা শ্রবণ করো, ইমং মে গঙ্গা যমুনে সরস্বতী শতদ্রু... (১০। ৭৫। ৫)। আরেক ঋকে জাহ্নবীর নামও রয়েছে। আচার্য সায়ণ ওই শ্লোকের অর্থরূপে বলছেন, জহ্নুকুলজা অর্থাৎ জহ্নুকুলসমুৎপন্না— সেখান হতে উঠে আসা জাহ্নবী বা গঙ্গা (৩। ৫৮। ৬)।

গো শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ করলে হয় পৃথিবী। দ্বিতীয়ার এক বচনে গাম। গাং অর্থাৎ পৃথিবীতে যিনি আগমন করেছেন বা এসেছেন, স্ত্রীলিঙ্গে আপ প্রত্যয় নিষ্পন্ন হয়ে তিনিই হলেন গঙ্গা। বিভিন্ন পুরাণে গঙ্গার উৎপত্তি ও অবতরণ নিয়ে পরস্পর বিরোধী তথ্য পাওয়া যায়। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে বলা হয়েছে লক্ষ্মী, সরস্বতী ও গঙ্গা তিনজনই বিষুর স্ত্রী। তিনজনই পরস্পর অভিশপ্ত হয়ে নদী হিসেবে পৃথিবীতে অবতীর্ণা হয়েছেন। দেবতাদের কাছে অপ্রাকৃত কলহলীলার ফলাফল মানব সভ্যতাতে এসে দাঁড়ালো আশীর্বাদস্বরূপ। দেশভূমি হল শস্যশালী। নদীদের ধারে গড়ে উঠল বাণিজ্য - শিল্পে সমৃদ্ধ অনেক ধনাঢ্য নগরী আর দেবতার পুণ্যতীর্থ। রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, হরিবংশ সবখানেই রয়েছে গঙ্গার অবতরণ নিয়ে নানান সব কুসুমিত পল্লবিত গল্পকথা। পদ্মপুরাণে গঙ্গা অপরূপা, সৌন্দর্যময়ী। শ্বেতশুভ্র তাঁর বর্ণ। গলাতে মুক্তোর হার। সমস্ত দেহই অলংকারে ঢাকা। এক হাতে তাঁর জ্ঞানের প্রতীক কলস অন্য হাতে শ্বেত পদ্ম। মকরের উপর তিনি বসে। কল্কিপুরাণে গঙ্গার স্তব করছেন ঋষিরা। বলছেন, সুরতরঙ্গিণী গঙ্গা সকলকে ভবসাগর পার করান। তাঁর জলে সব পাপ দূর হয়। হরির পাদপদ্ম থেকে তিনি আবির্ভূতা। মহেশ্বরের মাথার মুকুট। ব্রহ্মা, বিষু, মহেশ্বর তাঁর বন্দনা করেন। দেব - দানব - মানব সকলেই তাঁর স্তব করেন। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, গঙ্গা, রুদ্ররূপী লবণসাগর তোমার পতি, তুমি লক্ষ্মী, ভারতবর্ষের মানুষের কাছে দেবী। সকলেই তোমার স্তব করে।

যে তোমার পুজো করে, তার অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। তোমার থেকে শতযোজন দূরে থেকেও কেউ যদি তোমার নাম করে তবে সে পাপমুক্ত হয়ে বিষুলোকে যায়। গীতার ভিতর শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, জলচর জীবের মধ্যে আমি মকর এবং স্রোতস্বিনীর মধ্যে আমি গঙ্গা, ঝষাণাং মকরশ্চাস্মি স্রোতসামস্মি জাহ্নবী। মকরবাহিনী গঙ্গা লোকবিশ্বাসে সাক্ষাৎ ব্রহ্মের দ্রবীভূতা মূর্তি। ভাগীরথী গঙ্গা পূতসলিলা, পতিতোদ্ধারিণী— ভারতবর্ষের যুগ-যুগান্তরের ধর্মীয়-সামাজিক -অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক ভাবধারার মূর্ত রূপ। গঙ্গার তটভূতিতেই নানান পুণ্যতীর্থ ও আধ্যাত্মিক কথিকা নিষ্পন্ন হয়েছে। রাজা পরীক্ষিত নিজের সাত দিনের পরমায়ু জানতে পেরে ভাবলেন বিষুপাদোদ্ভূতা পতিতপাবনী গঙ্গা ছাড়া আমার মতো পাপীকে আর কে আশ্রয় দেবে? আমি মৃগয়া করতে এসে খুব ক্লান্ত হয়ে শমীক মুনির আশ্রমে ধ্যানস্থ মুনির কাছে জল খেতে চেয়ে সাড়া না পেয়ে ব্রহ্মমগ্ন মুনির গলাতে মরা সাপ জড়িয়ে এসে নরাধমের কাজই তো করেছি। প্রচ্ছন্ন ব্রহ্মতেজ সম্পন্ন ব্রাহ্মণের সঙ্গে আমার সেই সময়কার আচরণ ছিল অত্যন্ত উদ্যত। এ এক ধরনের মূর্খতা পাপাচারণও তো বটে। মুনির ছেলে ধ্যানমগ্ন, ঈশ্বরের চিন্তাতে রত সাধক পিতার সঙ্গে রাজার এহেন আচরণ অপমানকর মনে করে তখন শাপ দিলেন, সাত দিনের মধ্যেই রাজন, তোমার সাপের কামড়েই প্রাণ যাবে। ব্রহ্মজ্ঞানী শমীকের ধ্যান ভঙ্গ হলে ছেলের এই অভিশম্পাতের কথা শুনতে পেয়ে বললেন, হায় হায় শৃঙ্গী, এ তুমি করেছ কী! মহারাজ তো প্রজাপালক ধর্মের রক্ষক, ভক্তচূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণের পরম প্রিয়। তুমি মহারাজকে অভিশাপ দিয়ে অত্যন্ত অন্যায় করেছ। যাই হোক, ব্রহ্মশাপ তো আর ফেরানো যায় না, কী আর করা! শমীক মুনির কাছে সাত দিনের পরমায়ুর বার্তা পেয়ে রাজা রাজ্য, রাজসুখ ছেড়ে চলে এলেন গঙ্গার আশ্রয়ে। ভাবলেন, কাল-পিপাসার জন্য তিনি ব্রাহ্মণের অপমান করেছেন। সুতরাং যে কয়দিন তিনি

আর বাঁচবেন, জল খাবেন না। ছেলে জন্মেজয়ের হাতে রাজ্য ছেড়ে দিয়ে তিনি গঙ্গার তীরে গিয়ে প্রায়োপবেশন — মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা করতে থাকলেন। তখন তাঁর মনে উঠতে থাকল সারাক্ষণের জন্য শ্রীগোবিন্দের চরণচিন্তা। রাজা রয়েছেন গঙ্গার তীরে ভোগসুখ ত্যাগ করে। দেশে মহা হইচই পড়ে গেল। যাঁরা শুনলেন তাঁরাই মহারাজকে সাধুবাদ দিতে থাকলেন। চারদিক থেকে মুনি ঋষিরা এসে পরীক্ষিতের কাছে উপস্থিত হলেন। কামকামী, সংসারকামী, অসৎ লোকজনদের তীর্থস্থানে যে মলিনতা জন্মায়, তীর্থের সেই মলিনতা দূর করবার জন্য যেসব মহাপুরুষেররা তীর্থস্থানে গিয়ে তীর্থের মাহাত্ম্য বৃদ্ধি করে থাকেন, সেই মহানুভব মুনি ঋষিরা সশিষ্য পরীক্ষিতের কাছে এসে উপস্থিত হলেন। গঙ্গার চারদিকে তখন ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি, মহর্ষিদের উপস্থিতি। উপস্থিত রয়েছেন ঋষি অত্রি, বশিষ্ঠ, চ্যবন, ভৃগু, অঙ্গিরা, পরাশর, বিশ্বামিত্র, পরশুরাম, নারদ। চারদিকে ঋষি মুনিদের দেখে রাজা ভাবলেন, মুনি-বালকের দয়াতে আমার আজ এত সৌভাগ্য! যখন রাজা ছিলাম তখন তো মুনি ঋষিদের পদধূলি পাওয়ার সৌভাগ্য হত না। জমায়েতের ভিতর হঠাৎ এসে উপস্থিত ব্রহ্মজ্ঞানী শুকদেব। তিনি বললেন, আর তো সময় নেই মহারাজ। এই বেলা ভবনদী পারের কড়ি জোগাড় করতেই হবে। মৃত্যু আসছে দেখে দেহ গেহ ছেড়ে কেমন করে কোথায় যাব— এই ভয়ে দিশেহারা না হয়ে দেহাদিতে অনাসক্ত থাকাটাই বুদ্ধিমানের। অনাসক্তি দিয়েই সংসারের সব মোহ কাটানো যায়। মোহের আকর যে ঘর, তা ছেড়ে পুণ্যতীর্থে গিয়ে ভগবানে মনঃসংযোগ করতে হয়। এ সবই তো তুমি করেছ। সর্বস্ব ছেড়ে গঙ্গার তীরে এসে মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা করতে করতে শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হয়েছ। তোমার আর ভাবনা কি? তুমি পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের একান্ত ভক্ত। তাই এখন তোমায় শ্রীকৃষ্ণ লীলা-বর্ণন প্রধান শ্রীমদ্ভাগবত - কথা বলব, যা আমি

আমার পিতা ব্যাসদেবের কাছে শুনেছিলাম। ভাগবত- কথা শুনে, ভগবানের নাম কীর্তন করে, তাঁর লীলা স্মরণ করে তুমি রাজন, ভগবানে নিবিষ্ট-চিত্ত হতে পারবে। তাতেই তুমি কর্তব্য-অকর্তব্যর কার্যাকার্য শেষ করতে পারবে। শুকদেব গঙ্গার তীরে বসে বসে সাতদিন ধরে অষ্টাঙ্গ যোগ, জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি, বর্ণাশ্রম ধর্ম, দেবতা ও রাজাদের কীর্তি-কাহিনি, ভক্তদের অপূর্ব জীবন, বিভিন্ন অবতারদের কথা, বিশেষ করে শ্রীকৃষ্ণের পরম মনোহর অপার্থিব লীলার কথা বলতে লাগলেন। গঙ্গা এভাবে সাক্ষী হয়ে রইলেন ক্ষণস্থায়ী মানব জীবনকে শান্তি ও আনন্দে ব্যবহার করতে শেখার এবং মৃত্যভয় থেকে মুক্ত হয়ে চিরশান্তি লাভ করা ভাগবতের অমল কথিকার। আধ্যাত্মিক সাধনা ও সিদ্ধির প্রতীক হয়ে উঠলেন দেবীরূপা গঙ্গাস্নানে, স্পর্শে, দর্শনে— পাপক্ষয় ও মুক্তিলাভের আশায়। অদ্যাবধি ভারতীয় আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির ভিতর এই বোধ প্রবলরূপেই জায়মান।

শাস্ত্রে তীর্থ ও দেবতার মহিমাগুলো যখন বর্ণিত হয়েছে বর্ণনাকালে আচার্য ঋষিরা ফলশ্রুতি হিসেবে এমন সব বক্তব্য পেশ করেছেন সেগুলো অনেক সময় অতিশয়োক্তি বলেই মনে হলেও তার ভিতর সত্যের কণা কিন্তু লেগেই আছে। পূর্বজন্মার্জিত— পূর্বজন্মের পাপনষ্টের কথা তীর্থ ও দেবতার মহিমা বর্ণনাকালে প্রায়শই বলা হয়েছে বিভিন্ন শাস্ত্রেই। এর আসল মানে পূর্বজন্মের কর্মাদির ময়লামাটি সব ধুয়ে যাবে তীর্থস্নানে, তীর্থের দেবতাদির পুজোয় তা কিন্তু একেবারেই নয়। আধ্যত্মবাদ কর্মমলের কথা বলছে। কাজের ময়লা। অর্থাৎ কাজ বা কর্ম থেকে ফলাফল লাভের বাসনা নষ্ট হয়ে যদি কর্মটি কেবল মোক্ষ হয় তবে মনে একটা শুদ্ধসত্ত্বান্বিত অবস্থা আসতে বাধ্য। কর্মমল— কাজ থেকে কেবলমাত্র ফল লাভ করার বাসনা যখন গেল তখন মায়িকমলের পর্দাতে নাড়া পড়ল। মায়া সরলে আণবমলের আবরণ। আণবমল হল শারীরসত্তায় সাড়া থাকার শেষ ময়লামাটি। ওগুলো পরিষ্কার

হতে পারে সাধনা ও তপস্ক্রিয়ায়। তবেই শরীরবোধ সরে ব্রহ্মবোধ, আত্মাবোধ আসতে থাকবে। তীর্থস্নান, তীর্থ - পরিমণ্ডল থেকে এটা অনেকটা পরিষ্কার হতে পারে কেননা তীর্থাদিতে বহু বহু সন্তদের তপস্যাদির প্রভাবে একটা বিশুদ্ধ আবহাওয়া থাকেই। সেজন্যই তীর্থস্নান, তীর্থকৃত্য, অমুক নদীতে স্নান, অমুক দেবতার পুজোর সঙ্গে শাস্ত্রকারেরা পূর্বজন্মার্জিত পাপ, সপ্তজন্মার্জিত পাপ, স্বর্গলাভ ইত্যাদির মতন শরীর-মন পবিত্র ও জাগ্রত করার কিছু ভালো ভালো কথা মুনি ঋষির মুখ থেকে বলিয়ে নেওয়ার জন্যই পাপপুণ্যের কথাগুলো জুড়ে দিয়েছেন। কেননা মানুষ কিছুটা পাপপুণ্যের ধারণা এলেই একমাত্র খানিকটা দুর্বলচিত্ত হয়। এজন্যই তীর্থজলে ডুব লাগায়। শাস্ত্রে বর্ণিত মহাপুণ্যা গঙ্গাতে স্নান সেরে পবিত্র হতে চায়। মানুষের পাপ গঙ্গাতে গিয়ে পড়ে। গঙ্গা বলেও উঠেন, হে নারায়ণ, আপনাকে উদ্দেশ্য করে একসময় আমি তো উগ্র তপস্যা করেছি বলেই আপনি আজ আমাকে দর্শন দিলেন। খুশি হয়ে বর দিতে চাইছেন এবার। ভগীরথের তপস্যার প্রভাবে এবং আপনার আর গঙ্গাধরের কথাতে আমি তো মর্ত্যলোকে অবতীর্ণা হয়েছি। সকলেই আমাকে আপনার পাদোদ্ভূতা জেনে আমার জলে ব্রহ্মঘাতী, পিতৃমাতৃত্যাগী, মিথ্যাচারী, বিশ্বাসঘাতক, গুরুনিন্দুক, কত রকমের পাপকাজ করে রোজ স্নান করে পাপমুক্ত হতে চাইছে। আমি তাদের পাপের ক্ষারে রোজ পুড়ে চলেছি। যাতে তাদের পাপের জ্বালা ও স্পর্শ থেকে আমিও বাঁচতে পারি তার কিছু উপায় বলুন এবার। ভগবান বিষ্ণু বললেন, তুমি রোজ নর্মদার জলে গিয়ে কিছু সময়ের জন্য নেমে পড়বে। আমি আর মহেশ্বর সেখানে সব সময়ই থাকি। লোকজনের পাপতাপের জ্বালা লাগা তোমার জল নর্মদার এই জায়গাটায় এসে পড়লেই দেহের নিজের দহনাদিও ধরে আসবে। নর্মদাভূমিতে এই তীর্থই গঙ্গাবাহ তীর্থ হিসেবে প্রসিদ্ধ। এখানে এসে যোগিরা ধ্যানে বসে মা গঙ্গার সেই নর্মদার জলে

অবগাহন দেখতে পান। লোকনাথ ব্রহ্মচারী এখানে এসে ধ্যানদৃষ্টিতে দেখতে পেয়েছিলেন রেবাখণ্ডমে বর্ণিত সেই অপরূপ দিব্য সৌন্দর্য। তিনি দেখলেন মা গঙ্গা কৃষ্ণা গাভীর রূপ নিয়ে নর্মদার জলে স্নান করে শ্বেতবর্ণ ধারণ করে মহারণ্যের ভিতর অন্তর্হিতা হয়ে গেলেন। এই দিব্যতা তো আর সাধারণের চোখে ধরা পড়বে না। শাস্ত্রীয় মুনিকথা এভাবেও আধ্যাত্মিক মণ্ডলে সার্থক হয়ে যায়। সবটাই শাস্ত্রের অতিশয়োক্তি তো নয়। কেননা শাস্ত্রীয় বাক্য পরিস্ফূট হয়েছে মুনি ঋষিদের তপস্ক্রিয়ার উপলব্ধিজাত ফলাফল থেকে। সেখানে সত্য অনুভূতিও অনেক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। কেবলমাত্র অতিশয়োক্তি নয়।

তীর্থ মাহাত্ম্য, স্থান মাহাত্ম্যের পাশাপাশি সাধনায় ক্ষণ, কাল, তিথিরও যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। মহাত্মারা বলেন, ক্ষণ, কাল ও স্থান মাহাত্ম্যের গুণে সিদ্ধি ত্বরান্বিত হয়— তাড়াতাড়ি চলে আসে। সাধনায় ক্ষণের ভেতর সন্ধিক্ষণ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সন্ধিকালে জপতপ করতে হয়। রোজ দিন ও রাতের সন্ধিক্ষণগুলো বেছে বেছে জপতপ করতে পারলে মন্ত্রচৈতন্য থেকে তপোসিদ্ধি চলে আসে শীঘ্র শীঘ্রই। সাধু মহাজনেরা বলেন, ক্ষণ, কাল, স্থানের প্রভাবে সাধক জীবনে মণিকাঞ্চন যোগ ঘটতে বাধ্য। রাত চলে যাচ্ছে, ভোরের আলো ফুটে উঠছে— এই এক সন্ধিকাল। দুপুর ফুরিয়ে আসছে— সূর্য ডুবে যাচ্ছে, সন্ধ্যা হচ্ছে— এটি আরেকটা সন্ধিক্ষণ। দুপুর আবার ক্ষণ। আর তিথিক্ষণেরও প্রবল গুরুত্ব আছে সাধনার। অষ্টমী তিথি শেষ হচ্ছে নবমী তিথি আসছে — এও এক অতি গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণ। দুর্গাপুজোতে সন্ধিকালেই সন্ধিপুজো হয়। মাঝরাত যখন ফুরিয়ে যাচ্ছে তার আগেই পড়ছে মহারাত্রি, অমাবস্যার মহানিশা মাতৃসাধনার প্রশস্ত মহাক্ষণ। ক্ষণ, কাল, তিথিতে সিদ্ধক্ষেত্রে কিংবা কোনও মহাত্মার তপস্যাস্থলীতে বসে একমনে গুরুপ্রদত্ত বীজমন্ত্র জপ করতে পারলে সিদ্ধযোগি মহাত্মার সূক্ষ্ম

শরীরের অস্তিত্ব অনুভব করা যায়। তাঁর সাধনলব্ধ নাদ, জ্যোতি, মন্ত্রচৈতন্য, তপোসিদ্ধির গুণকণা সাধক দেহে এসে লাগে। এজন্যই প্রসিদ্ধ মহাত্মাদের তপস্যাস্থলীতে, মুনি ঋষিদের উপলব্ধ জীবন সত্য লাভ করার কাহিনি কিংবদন্তির জায়গাগুলোতে পর্যন্ত একটা শুদ্ধ হাওয়া বইতে থাকে। প্রচলিত এক গল্পে আছে, চূড়ামণিযোগ পড়েছে। কাতারে কাতারে মানুষজন গঙ্গাস্নান করছে তখন পাপমুক্ত হবে বলে। দুর্গার মনে এই দৃশ্য দেখে প্রশ্ন এসেছে, এত এত লোক স্নান করছে চূড়ামণিযোগে সবাই কী সত্যি সত্যিই পাপমুক্ত হতে পারবে মহাদেব? শিব তখন উত্তর করলেন, সবাই কেন হবে? পাপমুক্ত হবে একমাত্র তারাই যাদের মন থেকে কলুষ গেছে। কলুষ মন নিয়ে, মনে ঘৃণা-হিংসা-ঈর্ষা নিয়ে, অন্যের খারাপ চিন্তা করে, কারও ক্ষতি করে গঙ্গাতে ডুব দিলে কী আর পাপ যাবে দুর্গা? শিব একথা বলে বললেন, দাঁড়াও প্রত্যক্ষ একটা প্রমাণও দিয়ে দিই তোমায়। তুমি বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর রূপ নিয়ে বসো গিয়ে ওই গঙ্গার ঘাটে। আমি শববত হয়ে শুয়ে পড়ি তোমার কোলে। চূড়ামণিযোগে গঙ্গার ঘাটে এসে মা দুর্গা বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী সেজে কোলের ওপর নিজের মৃত স্বামীকে রেখে বিলাপ করতে থাকলেন, হায়, হায়! তোমরা দয়া করে কেউ আমার স্বামীর মৃতদেহ সৎকারে সাহায্য করো। আমি বুড়ি মানুষ। আমি একা শ্মশান পর্যন্ত স্বামীর দেহ বয়ে নিয়ে যেতে পারব না। সকলে তখন স্নান করে পুণ্যলাভ করবে বলে গঙ্গার ঘাটে গিজগিজ করছে। অনেকে ভাবল মৃতদেহ সৎকার করাটাও একটা পুণ্যকাজ। আজকের তিথিযোগে এমন কাজ করে গঙ্গায় স্নান সারলে তাড়াতাড়ি পাপমুক্ত হতে পারব। বাড়তি লাভ হবে পুণ্যসঞ্চয়। এগিয়ে গেল সকলেই বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর করুণ ডাকে সাড়া দিয়ে। ব্রাহ্মণী বললেন, সবাই আমার স্বামীর মৃতদেহ স্পর্শ করতে তো পারবে না, তাহলে সর্বনাশ হবে সকলের। একমাত্র যে নিজেকে নিষ্পাপ মনে করেন সে দেহ ছুঁতে পারবে। এমন কথা

শুনে সবাই সরে পড়ল। দুর্গা দেখলেন গিজগিজে ভিড়ে এমন কেউ নেই যিনি কুকর্ম, পাপ থেকে মুক্ত। এই এত এত পাপীতাপী কখনও কী গঙ্গাস্নানে মুক্ত হতে পারে নাকি! দেবাদিদেব তো ঠিকই বলেছেন। এরা কেউ তো উপযোগী নয়। এমন সময় এক যুবক এসে বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীকে বলল, মা আমি নিষ্পাপ নই। তবে সর্বনাশের ভয়ও আমার নেই। জীবন থাকলে কিছু দুরাচার, ব্যভিচার আসতেই পারে ঘটনার ঘনঘটায়। তবে আজ যে চূড়ামণিযোগ। গঙ্গাতে স্নান করলে মুহূর্তে আমি নিষ্পাপ হয়ে যাব। এ যে শাস্ত্রবাক্য— ঋষিমুখে ধ্বনিত। এ কী কখনো মিথ্যা হতে পারে মা? দাঁড়াও আমি একটা ডুব দিয়ে আসি। যুবক মনে শাস্ত্রবাক্যের প্রতি তীব্র বিশ্বাস নিয়ে গঙ্গাতে ডুব দিতে গেলেন। এই ফাঁকে ঘাট থেকে দুর্গা শিব অন্তর্হিত হলেন। শিব বললেন, দেখলে দুর্গা, যুবকটির কেবল দৃঢ় নিষ্ঠা আর অগাধ বিশ্বাস আছে মনে শাস্ত্রাদির প্রতি। এর একমাত্র সর্বপাপহারিণী গঙ্গার ঋষি বর্ণিত মহিমাগুলো মনে গাঁথা আছে। বাকিদের বিশ্বাস, নিষ্ঠা, তপস্যা, সাধনা কিছু নেই— কেবলমাত্র পাপমুক্তির বাসনা আছে। এরা কখনো চূড়ামণিযোগে গঙ্গাস্নানের প্রাপ্ত ফল পেতে পারে না। একমাত্র যুবক লোকটি এর অধিকারী। কেননা বাকিদের গঙ্গার সর্বপাপহারিণী মহিমার প্রতি ধ্রুব নিষ্ঠা নেই, তেষাং সিদ্ধি র্ন বিদ্যতে আস্তিক্যাৎ ভবতে ধ্রুবম।

তারা তারা মহানাদের ধ্বনি

কিশোরীবেলাতে গুরুর হাত ধরে শ্মশানে এসেছিলেন তিনি। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগেকার তারাপীঠ মহাশ্মশান। পৃথুলা টুকটুকে ফর্সাপানা গেরুয়াধারী মাঈয়ের কথাতে সে শ্মশান যেন জীবন্ত হয়ে পড়ছে এখন। এমনধারা সন্ন্যাসিনীর কথার তোড়। নিমগ্না। ভিতর থেকে উঠে আসছে কথাগুলি। আমি বসে আছি জে ব্লক, দক্ষিণাপুরী, নিউ দিল্লির মাতৃকা আশ্রমে। সন্ন্যাসিনী মাঈ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন পয়ত্রিশ বছর আগে। তিনি বলছিলেন পঞ্চাশ বছর আগেকার মহাশ্মশানের কথা।

কিশোরী চলেছেন তখন গুরুর হাতখানি শক্ত করে ধরে। তারা মায়ের রথঘরের সামনে প্রথমে দাঁড়ালেন তিনি। গুরু বললেন, পশ্চিমপানে একবার তাকিয়ে দ্যাখ বেটি। মাঈ দেখলেন ইট বাঁধানো এক সিঁড়ি নেমে গেছে অনেকখানি নীচে। গুরু বললেন, ওই হল গিয়ে মহাশ্মশানে যাওয়ার পথ। ডান দিকে নেমে যে ছোট ফাঁকা কুঁড়েটা পড়বে ওখানে থাকতেন এক সময় জানগুরু বাবা। কিশোরীবেলাকার মাঈ জানেন না কে ইনি! এটুকু জানেন গুরুদেব যখন নাম উচ্চারণ করছেন বাবার, নিশ্চয় তিনি কোনও সিদ্ধ মহাত্মা হবেন। গুরুদেব বললেন, জানগুরু বাবা বামদেব বাবার প্রশিষ্য। ওঁর গুরু ছিলেন খ্যাপাবাবার সঙ্গ করা মানুষ করুণাসিন্ধু ভট্টাচার্য।

মহাশ্মশানে নেমে এসেছেন তখন কিশোরী মাঈ। জানগুরু বাবার কুঁড়ের ধারে মস্ত এক নিমের গাছ। গাছতলায় চোখ যেতে কিশোরীবেলাকার মাঈ দেখলেন ওখানে রয়েছে এক ইট বেরোনো সমাধিবেদি। গুরুদেব বেদির ধারে গিয়ে নতমস্তক হলেন প্রথমে। কিশোরী শিষ্যাকে বললেন, আভূমি প্রণত হও বেটি।

কিশোরী মাঈ মহাশ্মশানের মাটিতে লুটিয়ে পড়ে যখন সমাধিবেদিতে আভূমি প্রণত তখন গুরুদেব বললেন, বেটি এ বড় পবিত্র বেদি। বামদেব বাবার আচার্যগুরু মোক্ষদানন্দ বাবার সমাধি।

প্রণাম সেরে গুরুর পাশে পাশেই তখন হাঁটছিলেন মাঈ। ১৯৬৬ সালের তারাপীঠ মহাশ্মশান। খুব শান্ত, নির্জন এক দিব্যপ্রভাব যেন বয়ে যেত সেই সময়। গভীর রাতে টের পাওয়া যেত শ্মশান বিভূতি। উচ্চকোটির সূক্ষ্মদেহের মহাত্মারা গভীর রাতে আসতেন। গুরুদেব বলতেন আমায়, অষ্টতারা বিচরণ করেন মহাশ্মশানে অমাবস্যার রাতে।

দিল্লির মাতৃকা আশ্রমে বসে অপার্থিব এলাকার কথাগুলি বলে চলছিলেন সন্ন্যাসী মাঈ। ভাবমগ্না। মায়ের আজ্ঞা চক্র দিয়ে যেন এক জ্যোতি ঠিকরে বেরিয়ে আসছে সে সময় দু-ভুরু জোড়ার মাঝখান দিয়ে। ওঁর বলার ভঙ্গিটি আমার গায়ে কাঁটা তুলছে। খাড়া হয়ে উঠছে লোম। অদ্ভুত এক শিহরন।

মাঈ বলছেন, রাতের শ্মশানে তখন বিষধর সাপেরা চলে বেড়ায়। ভরা বর্ষায় দ্বারকা ছাপিয়ে মহাশ্মশানে জল ঢুকে পড়ে। বাণের সময় জলের তোড়ে ভেসে এসে বিষধর সাপগুলা সব বড় বড় মহানিমের ডালে ঝুলতে থাকে। রাতে চিতাসাধনে বসতে গেলে নিশ্চুপ শ্মশান জেগে ওঠে শকুনের ডানা ঝাপটানির আওয়াজ লেগে। ছানা শকুন কাঁদে কোঁকিয়ে। আমার না - জমা জপের ভেতর সুতীক্ষ্ন আওয়াজ লাগে। গুরুদেব সমাধিস্থ। রাত বাড়ে, গভীর হয় আরও। কিশোরী মন কেঁপে কেঁপে ওঠে মহাশ্মশানে অপ্রাকৃত দিব্যদৃশ্যে। তার ভেতর কুকুরের সুতীব্র চিৎকার। আমি কেঁপে কেঁপে উঠে গুরুদেবের সমাধিদশার ভেতর নিজের দৃষ্টিকে স্থির করতে চেষ্টা করি। নিভন্ত চিতার ধারে শেয়াল এসে দাঁড়ায়। কুকুরে-শেয়ালে বিবাদ লাগে। গরীব মানুষের কাঠে দাহ করার সামর্থ্য থাকে না। তারা সব মহাশ্মশানে পুঁতে দিয়ে চলে যায় দেহ। মাংসখেকো কুকুরগুলা খুঁড়ে বের

করে মানুষের দেহ। দিনের শ্মশানেও জনকোলাহল নেই। অশ্বথ, অশোক, বিল্ব, হরতকী, আমলকী, নিম, শ্বেতশিমূল ঘেরা গাছ-গাছালির ঝোঁপ দিয়ে সূর্যের আলো পড়ে না শ্মশানে। সাধনোচিত পবিত্র বৃক্ষ সব। আমি গুঁড়িগুলা জড়িয়ে জড়িয়ে ধরি। কিশোরীবেলাকার ছেলেমানুষি। হাতের বেড়ে ধরা যায় না। সেসব গাছালি আজ আর নাই রে বাবা। গভীর গহন পবিত্রভূমি তখন মহাশ্মশান।

কিশোরী মাঈ শ্মশানে ঢোকার পথের ডানদিকে ফিরে তাকালেন। ওখানে ছোট্ট একটা মন্দির। মূল রাস্তা থেকে শ্মশান অনেকখানি নীচে। দশ - দশটা ধাপ ভেঙে মহাশ্মশানে নামতে হয়। সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে দ্বারকাতে ভেসে আসা মড়ার ভেলার দিকে চোখ পড়ে। চোখ তুলে কিশোরী মাঈ ছোট্ট মন্দিরের ভিতর দৃষ্টি নিবন্ধ করেন গুরুদেবের কথামতো। গুরুদেব বলেন, তারা মায়ের পাদপদ্মে ভক্তির আকুতি দিয়ে কাঁদ তো বেটিয়া। কিশোরী মাঈয়ের ভাব আসে হঠাৎ গুরুর কথার ছোঁয়ায়। পাদপদ্মের ধারে বসে চোখ কেমন যেন এক বিহ্বল দশায় চলে যায়। গড়াতে থাকে অশ্রুধারা। ভিজে যায় তারা মায়ের পাদপদ্ম।

কিশোরী মাঈ দাঁড়িয়ে বামদেব বাবার সমাধির গায়ে। গুরুদেব স্তোত্রপাঠে মগ্ন। ওঁর গলার আওয়াজে গমগম করে ওঠে বেলা দশটার শ্মশানভূমি। জান বাবার কুঁড়ে ফাঁকা। পাশাপাশি আরও গোটা কতক কুঁড়ে থেকে ভেসে আসছে সাধক তান্ত্রিকদের শাস্ত্রপাঠের নানান আওয়াজ। গুরুদেব স্তব করতে থাকেন বামদেব বাবার,

বহু বাঞ্ছিত পাবন পদযুগং রিপুশাতন ভৈরব শূল করং
জন বন্দিত নন্দিত পূতকুলং প্রণমামি শিবং শিবরূপধরম

কিশোরী মাঈ গিয়ে দাঁড়ান তারা মায়ের ব্রহ্মশিলাবেদির গায়ে। ওখানে জপে নিমগ্ন দু-একজন জটাজূটধারী তান্ত্রিক। এক ভৈরবী এসে ফুল দিয়ে

গেলেন ব্রহ্মশিলার ওপর। কিশোরী মাঈয়ের দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন, বাবার সমাধির পাশের চালাটিতে এস তো বেটিয়া, তোমার গুরুদেব জপে বসে গেলে পর।

চলে গেলেন ভৈরবী। মায়ের পাদপদ্মের ধার দিয়ে দিয়ে মহাশ্মশানে সাধন করা কত কত মহাত্মাদের ছোট্ট ছোট্ট সমাধি। গুরুদেব জপে বসলেন। কিশোরী মাঈ গুটি গুটি পায়ে এসে হাজির হলেন ভৈরবীর কুঠিয়ায়।

দক্ষিণাপুরীর মাতৃকা আশ্রমে বসে সত্তর পেরোনো গেরুয়াধারী সন্ন্যাসিনী বলে চলেছেন পুরোনো মহাশ্মশানের কথা। আমি নিমগ্ন, শান্ত, বুঁদ মায়ের কথার সম্মোহনে। কিছু আগে তিনি আমাকে উপহার দিয়েছেন ওঁর লেখা দু-দুটো সাধনগ্রন্থ। ''কুলাচার'' ও ''কুণ্ডলিনী''। আমি এসে গ্রন্থ দু-খানির হদিশ করাতে তিনি বলেছিলেন, কীভাবে জানলে তুমি বাবা, গ্রন্থ দু-খানির কথা! এগুলো সব পঁচিশ বছর আগেকার লেখা। সাধন অভিজ্ঞতার কথামালা। কী করবে? তুমি কী সাধন করো? তোমার গুরু আছেন নিশ্চয়। না হলে এইসব গ্রন্থের হদিশ পেতে কলকাতা থেকে এতদূর ছুটে এলে তুমি!

২০১১ সাল। দিল্লি এসে আমি উঠেছি হরিমন্দির গলি, পাহাড়গঞ্জ। এখানে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের নিউ দিল্লি শাখা। আমাকে শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাটের মহান্ত মহারাজ খুব স্নেহ করেন। পাটে একদিন কথা হল দিল্লি যাওয়ার। ভজনোন্মুখ মহারাজ বললেন, থাকবেন কই? বললাম, গিয়ে কিছু একটা ব্যবস্থা করে নেব। মহারাজ বললেন, আমাদের মঠে গিয়া থাকেন। ওখানে থাকেন সুমন মহারাজ। আপনের বয়সি। শিক্ষিত মানুষ। আপনের ভালো লাগবে।

সব ব্যবস্থা করে দিলেন মহারাজ। আমার তখন যাওয়াটা ছিল দিল্লি ঘোরার উদ্দেশ্য নিয়ে নয়। আমি চলেছি ভারত সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রকের ফেলোশিপটা যাতে পাই গবেষণা করব বলে সেই উদ্দেশ্যে এক

ইন্টারভিউ দিতে মন্ত্রকের জনপদ রোডের দপ্তরে। মহারাজ বললেন, মঠে থাকেন গিয়া। ওখান থেকে চলে যান বৃন্দাবন। দূরত্ব বেশি তো নয়। কালিয়াদহ, গোকুল মহাবনে আমাদের দু-দুটো মঠ। দু-জায়গার মহারাজেরা শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত। আপনের গবেষণার সুবিধা হবে।

ভালোভাবে আশাব্যঞ্জক ইন্টারভিউ হয়ে গেল। হরিমন্দির গলি থেকে দক্ষিণাপুরী তেমন দূরের পথও নয়। আমি জানতাম এখানকার মাতৃকা আশ্রমে যে মাধবী মাঈ আছেন তিনি একসময় কঠোর সাধনা করেছিলেন তারাপীঠ মহাশ্মশানে। বারো বছর বয়সে গুরুর হাত ধরে শ্মশানে এসেছিলেন তিনি। মহাশ্মশানে করেছিলেন চিতাসাধনের মতন ভয়ংকর সাধন।

মাঈ বললেন, সেদিনটা ছিল কোজাগরী পূর্ণিমা। মা বাড়িতে লক্ষীপুজো করবেন আর আমি বেরিয়ে এলাম। আমার আগে তেরোটি ছেলে সন্তান ছিল মায়ের। আমি প্রথম মেয়ে। বাবা এক সময় পাগল হয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন। আর ফিরলেন না। চোখের সামনে এগারো জন দাদা মারা গেল। মৃত্যু কী ওই বয়সে বুঝে গেলাম! মায়ের গুরু বসিরহাটের সিদ্ধ সাধক মণি গোঁসাই। তিনি ছিলেন বামদেব বাবার সাক্ষাৎ শিষ্য। তিনিই সেই আবহাওয়ার ভিতর বাড়ি থেকে বের করে আনলেন। তারপর মহাশ্মশানে প্রবেশ গুরুদেবের হাত ধরে।

গুরুদেব বামদেব বাবার ধ্যানমুদ্রাতে কিছু সময় বিভোর হওয়ার পর জপে মগ্ন হয়ে রইলেন। কিশোরী মাঈয়ের পেটে তখন প্রচণ্ড খিদে। মাঈ চলে এলেন ভৈরবীর কুঠিয়ায়।

জিজ্ঞেসা করলাম, ভৈরবী মাঈয়ের নাম মনে আছে আপনার? মাধবী মাঈ বললেন, তিনি ছিলেন কিরণ ভৈরবী। তাঁর আগে ওই কুঠিয়ায় থাকতেন যোগমায়া ভৈরবী।

নামটা শুনে ধাক্কা খেলাম। একই নামের এক সিদ্ধা মাঈয়ের সঙ্গে আমার অনেক দিনের সখ্য। তিনি বলেছিলেন আমাকে, মাধবী মাঈ মণি গোঁসাইয়ের শিষ্যা। ভাবোন্মাদ তারাসাধক বলে তাঁকেও অনেকে তারাখ্যাপা বলতেন। আর ভৈরবী মাঈয়ের মা ছিলেন চুয়াপুরের শ্মশান সাধক তারাখ্যাপার শিষ্যা। তিনি বামদেব বাবা দেহ রাখার পর বেশ কিছুদিন ছিলেন মহাশ্মশানে। বামদেব বাবাকে তিনি ডাকতেন বুড়োজি মহারাজ বলে। ১৯১১ সালে বামদেব বাবা তখন চুয়াত্তর বছরের প্রবৃদ্ধ সাধক। ওঁর শিষ্য তারাখ্যাপা কলকাতায়। এর পরের বছর দেহ রাখেন বামদেব বাবা। বাবার সব সময়ের সঙ্গী নগেন পাণ্ডাকে চিঠি লিখছেন তারাখ্যাপা। তখন তিনি পরিব্রাজক সাধু। গুরুর উদ্দেশ্যে চিঠি লিখছেন সেবক নগেন পাণ্ডার কাছে।

শ্রীমান নগেন,

আমি এক্ষণে কলিকাতায় আছি। পরমদেব বুড়োজী মহারাজকে বলিও, আজিও আমার নবোদয়ের উদয়পুরে দ্বিমোহিনীতে স্নান হয় নাই। সাপে ছোবল দিয়ে বিষহীন অবস্থায় মুখ লুকাতে চায়। এখন বেদের নিরুপায়, দশনে অশনাঘাত দ্বারা তাড়াতাড়ি উত্তরমুখে ধাবিত হইল। তার পরে উদয়পুর ছাড়িয়া সপ্তঘড়িতে প্রবেশ করিব। মণ্ডলদের ঘরে প্রবেশ করে পরিণামে পশ্চাতে ফেলিয়া বিশাল মাঠ সম্মুখে উপস্থিত। এই তো রামপুর যাইবার পথ। পথের দক্ষিণ পাশে ডোবার ভেতর কত রক্ত - কুমুদ ফুটিয়া আছে। কেহ বা সদ্য, কেহ বা স্ফুটনোন্মুখ, কেহ বা ফুটে গেছে। ফোটাফুল পথ ভুলাইবার চেষ্টায় ছিল। ভাগ্যে ভবানী - মন্ত্র মনে পড়ায় স্নানঘাটার আমবাগান অভিমুখে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ালাম। তখনও আমি বাগান পাই নাই। আবার দেখি, আশেপাশে ডোবার ভিতর শ্বেতফুল ফুটিয়া আছে। এইবার কুল বাঁচান হল দায়। কিন্তু রাঢ়দেশে মুড়ির আধিক্য থাকায় রাস্তায় দেখিতে

পাইলাম কেহ বা পাইট্যাক মুড়ি ঢেলে রেখে গেছে। হায় রে হায়— চিড়ে মুড়ির সংযোগ! তাই আবার ভাব পাইলাম, যথা ভাবের মানুষ ভাবে ফেরে। তখন হাঁপাতে হাঁপাতে আমবাগানে প্রবেশ করেছি। দেখিতে পাইলাম আশ্রয়দাতা দলের কালু সম্মুখে উপস্থিত! তিনি সোহাগ দিলেন, অভয় দিলেন! এইবার স্নানঘাটার পুল। এই পুলেই তো জাতফুল। এখন ভাবতেছি কী করিব! কালুর আশ্রয়ে সাহস ছিল। তাই মিঞা নয়, তাই মছলমান— হিন্দু নয় লো খৃষ্টান। নজর মে পয়ছান লেংগে। পদু আকবর হিন্দুস্থান। পুল পারের যোগাড়ে আছি। হাওড়া সাওড়া মুগলি হুগলি সাড়া মাড়া কাশী খাশী, অবশেষে প্রয়াগে প্রয়োগী হব। এই তো আজকার কথা। যখন স্নানঘাটার মাঠে দিক ভুলে পড়েছিলাম, তখন ঊর্ধ্বমুখে বলেছিলাম— মাঠে পড়ে ডাকি তোরে কোথা লো ঐ কমলমণি। শ্বেত ফুলে ভুলাতে চায়, সরিয়ে দে লো পা দু'খানি। আঃ মরি মরি, ওলার সরবৎ আর কি! এইবার বুঝি বা সকালবেলার বাল্যভোগে চিড়েমুড়ি না গুড়মুড়ি না আদামুড়ি— কার সংযোগে হবে কেমনে বলিব। আগ্রার মুড়িতে গুড়ের সংযোগটাই যে দেশে দেখিতে পাওয়া যায়। তবে সে দেশের গুড় তরল ও গন্ধভরা। এদেশের চিড়েমুড়ির সংযোগ মন্দ নয়। আমি লবণবর্জিত আদামুড়ির চেষ্টায় আছি। একটু ঝাল বটে, তা সাপুড়ের কাজ করিবে।

তারানাথ

তারাখ্যাপার লেখা সাধন সংকেতের হেঁয়ালি চিঠিগুলো আমি পড়তে পেরেছিলাম যোগমায়া ভৈরবীর দৌলতে। তারাখ্যাপার সাক্ষাৎ শিষ্য ছিলেন ডাক্তার অভয়পদ চট্টোপাধ্যায়। অভয়পদ নিতান্ত শিশুকালে বামদেব বাবার দর্শন পেয়েছিলেন ওঁর বাবা মায়ের দৌলতে। ১৮৯৭ সালে তিনি জন্মান। তাঁর জন্মের পনেরো বছর পর ১৯১২ সালে তারাপীঠ মহাশ্মশানের সাধন

কুঠিয়ায় দেহ রাখেন বামদেব বাবা। পরে তিনি বাবার কৃপাধন্য মন্ত্রশিষ্য তারানাথ ব্রহ্মচারীজির শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

তারানাথ বিপ্লবী ছিলেন। ব্রিটিশ শাসকদের রুদ্ররোষে পড়ে তিনি একসময় কলকাতা ছেড়ে নেপাল চলে যান। তখন অভয়পদ চট্টোপাধ্যায় খ্যাপাজির আশ্রয়ে চলে এসেছিলেন। গুরুর নির্দেশে তিনি গেলেন এবার নেপাল। ওখানকার কর্নেল ভূপাল সামসের জঙ্গ বাহাদুরের গৃহচিকিৎসক নিযুক্ত হলেন গুরুর সুপারিশে। গুরুদেব বহরমপুরের কাছে উমাবনমআশ্রম প্রতিষ্ঠা করলে অভয়পদের যাতায়াত ওখানে শুরু হয়। তিনি গুরুর একখানি জীবনীগ্রন্থ লিখেছিলেন। ১৯৮০ সালে চলে যান ডাক্তার অভয়পদ চট্টোপাধ্যায়। গুরুদেব দেহ রাখেন ১৯৪৫ সালে। গুরুর দেহ রাখার পঁচিশ বছর পর অভয়পদ চট্টোপাধ্যায় ছেপে বের করেন তারাখ্যাপার জীবনী। উমাবনমআশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন তারানাথ ব্রহ্মচারী ১৯৩৫ সালে।

অভয়পদ চট্টোপাধ্যায় লিখছেন, খ্যাপাবাবাকে আমি একদিন প্রশ্ন করেছিলাম, বহুস্থান দেখাশুনা করার পর বহরমপুর বেছে নিলেন কেন? উত্তরে তিনি বলেছিলেন, এই ভূমির নাম ব্রহ্মপুরম এই ব্রহ্মপুরেই বাংলার শেষ শক্তির লীলা— পলাশীর মাঠ। এই চুয়াপুর একসময় শ্মশান ছিল। এখানে সিপাহী বিদ্রোহের সূচনা হয়। নিকটে পঞ্চানন শিবের মন্দির ও বর্মার রাজকুমার প্রিন্স থিবোর সমাধি। ইহা গৌড়ের এলাকা। গঙ্গার অপর পারে পাঁচ মাইল দূরে কিরীটি পীঠ— একান্ন পীঠের অন্যতম। এখানে দেবীর কিরীট (মুকুট) পড়েছিল। ইহাই ভারতের মুকুট— সেনবংশ শূরবংশ গঙ্গাগিরিবংশ পালবংশ মুসলমান ইংরাজ সবাই একে একে এই মুকুটের অধিকারী হয়েছিলেন, কিন্তু এদের পতনও হয়েছে। ইংরাজের পতন ঘটাবার জন্য গুরুর আদেশে আমার বাংলায় আসা। বাঙ্গালীজাতির আত্ম-বিস্মরণ ঘুচাইবার জন্যই আমার সাধনা। বাঙ্গালীজাতির আচারহীনতা ধর্মহীনতা

উপলব্ধি করে এই মাটি স্পর্শ করে বলেছিলেন, আচারহীন পশুর দেশে এনেছ কুলকামিনী। এদেশে নাইকো আচার, জানে না সদাচার, শেষে কি আছাড় খেয়ে ভাঙ্গবো পা দু'খানি।। যেখানে এখন কদম গাছটি বাঁধান আছে ঐখানে একটা উঁচু মাটির ঢিপি ছিল। একদিন ঐখানে বসে থাকতে থাকতে বললেন, উমা-মহেশ্বরের পূজার আয়োজন করতে হবে। পরক্ষণেই এই আশ্রমের নামকরণ করলেন উমাবনম।

তারাখ্যাপার শিষ্যা ছিলেন সুশীলা ভৈরবী। গুরুর মতন আশ্চর্য যোগশক্তির অধিকারিণী তিনি। তাঁর মেয়ে যোগমায়া ভৈরবী আমাকে বলেছিলেন, মা উমাবনমআশ্রম পেরিয়ে ভরা গঙ্গার জলের ওপর হেঁটে ওপারে কিরীটি পীঠে রাতের বেলায় সাধনা করতে যেতেন। আমি তখন যুবতীবেলার কিছু আগের বয়সের।

ডাক্তার অভয়পদ চট্টোপাধ্যায়ের লেখা ওঁর গুরুর জীবন সংক্রান্ত গ্রন্থখানি ভৈরবী মা আমাকে ওঁর ঝোলা খুলে পড়তে দিয়েছিলাম একসময়। পরে ফেরাতে গেলে বলেছিলেন, তোর কাছে রেখে দে। এটা অভয়পদবাবুই দিয়েছিলেন।

যোগমায়া ভৈরবীর ঝুলিটা ছিল প্রবল আকর্ষণের। ওঁর ঝুলি থেকে একবার বের করলেন ''নীলতন্ত্রের'' পুরনো একখানি পুঁথি। বললেন, রেখে দে বাবা, তোর কাজে দেবে। ভৈরবী একসময় দিয়েছিলেন ''তারারহস্য বর্তিকা'' আর ''শক্তিসঙ্গমতন্ত্রের'' একখানি প্রাচীন পুঁথি। এসব ঘেঁটে আমি দেখলাম বেশ বিধৃত অধ্যায় আছে এখানে বৌদ্ধতন্ত্রের তারা দেবীকে নিয়ে। বশিষ্ঠদেবের চিনদেশ গমন, লোকেশ্বর বুদ্ধের সুতা ও তাঁর অপর নাম প্রজ্ঞাপারমিতার পূজাবিধি পুথি - পাতরার ভেতর দেখলুম উল্লেখিত। রয়েছে তারা দেবীর রূপ নীল সরস্বতী, একজটা, কামতারা, তারিণী, উগ্রতারার নামে নামে রচিত অর্চনার নানান সব কথকতা। বইগুলো কাজের হল। আমি

বুঝলাম বশিষ্ঠের মহাচিনটা হল আদতে তিব্বত সহ পাহাড়ি কিছু অঞ্চল। মানস সরোবরও তিব্বত বা মহাচিনের অংশ। অখণ্ড ভারতের ধর্মীয় মানচিত্র।

ভৈরবীর দেওয়া অভয়পদ চট্টোপাধ্যায়ের লেখা ''সিদ্ধসাধক তারাখ্যাপা'' পড়তে গিয়ে আশ্চর্য শিহরন হল আমার ভেতরে। এ তো শুধু জীবনী পড়া নয়। অভয়পদ চট্টোপাধ্যায় ওঁর গুরুর বিভিন্ন সাধন - হেঁয়ালির চিঠিগুলো প্রকাশ করে দিয়েছিলেন। যদিও হেঁয়ালি পড়ে গুপ্তপথ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়ে ওঠাটা প্রচণ্ড কঠিন। তার জন্যে রপ্তকারীর দরকার গুরু।

চিঠি পড়তে গিয়ে চোখ আটকালো আরও এক গুরুত্বপূর্ণ হেঁয়ালিতে। তারানাথ তখন উমাবনমআশ্রমে। ওখান থেকে তিনি চিঠি লিখছেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে। গুরুর চিঠি শিষ্য যোগেন্দ্রপদ ভট্টাচার্য দিয়েছিলেন প্রতিবেশী শশাঙ্কশেখর সান্যালের হাতে। তিনি সুভাষচন্দ্র বসুর কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন তারাখ্যাপার চিঠি।

''সাপ্তাহিক যুগবাণী'' পত্রিকার ১৯৬৩ সালের ২৩ নভেম্বর সংখ্যায় ''সুভাষ প্রসঙ্গে'' শ্রীশশাঙ্কশেখর সান্যাল লিখছেন, ৩০শে নভেম্বর ১৯৩৯ তারিখে বেলডাঙ্গায় প্রাতে কর্মী বৈঠক, সম্মেলন ইত্যাদি সেরে আমরা ১০।। ১১টাতে বহরমপুর এসেছি। আমাদের বাড়ীতে আমার বাবা মা ও পরিবারের অন্যান্য সকলের ও উপস্থিত বন্ধুদের চায়ের পর্ব সেরে স্থানীয় কৃষ্ণনাথ কলেজের আয়োজন ও অনুষ্ঠান আসরে যাবেন, এমন সময় আমার প্রতিবেশী জনৈক ব্যবসায়ী শ্রীযোগেন্দ্রপদ ভট্টাচার্য্য একখানি গালা দিয়ে বন্ধ করা খামে চিঠি আমার হাতে দিয়ে বল্লেন, ক্ষ্যাপাবাবা দিয়েছেন। আমি সুভাষের হাতে দিয়ে বল্লাম শ্রীমৎ তারাক্ষ্যাপা আপনাকে এই পত্র পাঠিয়েছেন। চিঠিখানা হাতে করে অন্ততঃ অর্ধ মিনিট তাঁর বিশেষ ভাবান্তর। চমকে বললেন, তারাখ্যাপা বেঁচে আছেন, কোথায় থাকেন, আমি দেখা করব। আমি বল্লাম,

উনি শহরের প্রান্তরেই নিজ আশ্রমে থাকেন এবং বৈকালে লালবাগে যাওয়ার পূর্বে যাতে দেখা হয় তার চেষ্টা করব। চিঠিটা খুলে লাল পেন্সিলের লেখা বিষয়বস্তুর উপর বার বার চোখ বুলিয়ে আমার হাতে দিয়ে বল্লেন— দেখুন তো শশাঙ্কবাবু এ সব বুঝেন, উদ্ধার করতে পারেন? ছকবককাটা সংস্কৃত ধ্বনি শব্দ সম্বলিত ভাষণ দুই পাতাতে লেখা।

তারাখ্যাপা লিখছেন,

উমাবনমবহরমপুর, (বেঙ্গল)
১৪ই মার্চ

সুভাষ বসু,
৫। ৬ বৎসর পূর্বে একদিন ভিয়েনার কথা মনে কর। পদ চুম্বন নয়। ইন্দ্রকে গোত্রভিৎ বলে, আর বলদেবকে যমুনাভিৎ বলে। তুমি কিছু ভেদ করেছ? অষ্টবজ্র মিলন কাল এসে গেছে। কোথায় কার উদ্দেশ্যে যাইতেছ?...

শশাঙ্কশেখর লিখছেন, কলেজের অনুষ্ঠানের এক ফাঁকে আমি উমাবনমথেকে ঘুরে আসি এবং আমাদের বাড়িতে মধ্যাহ্ন - ভোজনের সময় তাঁকে জানাই যে ক্ষ্যাপাবাবা কলিকাতাতে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে আমাকে নিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলোচনা করবেন। আমরা পরোক্ষ জানতাম ক্ষ্যাপাবাবা কৈশোর যৌবনে বৃটিশের রেজেষ্টারীতে সন্ত্রাসবাদী ছিলেন এবং সন্দ্বীপে অন্তরীণ ছিলেন এবং আরো বেশী জানতাম যে তিনি তারাপীঠের সিদ্ধযোগী বামাক্ষ্যাপার একমাত্র মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। কিন্তু সেইদিন প্রথম বুঝলাম যে সুভাষ ও ক্ষ্যাপা একই পথের পথিক।

অভয়পদ চট্টোপাধ্যায় ওঁর গ্রন্থের ভেতর "পাদটীকা" অংশে গুরুর হেঁয়ালি পত্রের সংযোজন করে দিয়ে তন্ত্রের গুপ্তকৌশলী প্রয়োগকে আরও উসকে তোলেন। পরবর্তী সময়ে হেঁয়ালি উদ্ধারে যোগমায়া ভৈরবী আমাকে অনেকখানি সহায়তা করেন। আর তিনিই মাধবী মাঈয়ের কথা বলেন। বলেন, দিল্লি গেলে মাতৃকা আশ্রম যেও। ওখানে থাকেন এক সিদ্ধা। যিনি তারাপীঠ মহাশ্মশানে নীলতন্ত্রের সাধন করেছিলেন স্বীয় গুরুর নির্দেশে বালিকা বয়সে।

মাধবী মাঈয়ের মুখে পঞ্চাশ বছর আগেকার তারাপীঠ মহাশ্মশানে যোগমায়া মায়ের কুঠিয়া শুনে প্রথমে চমকে গেছিলাম! পরে বুঝলাম ইনি পৃথক মাঈ। তাঁকে মাধবী মাঈও দেখেননি। দেখেছেন ওঁর কুঠিয়ায় সাধনরত কিরণ ভৈরবী মাঈকে। তিনি কিশোরী মাঈকে ওই কুঠিয়ায় যেতে বলে গেলেন।

কিশোরী মাঈ এলেন এবার কুঠিয়ায়। ভৈরবী একখানি আসন পেতে কলাপাতা বিছিয়ে তার ওপর ঢেলে দিলেন মুড়ি আর গোটা কয়েক পাকাকলা ছুঁলে দিয়ে বললেন, নে বেটিয়া খা।

মাঈ খাচ্ছেন তখন। সকাল থেকে চা ছাড়া কিছু আর জোটেনি। তিনি খাচ্ছেন অমৃতসম মায়ের প্রসাদ। পাশের কুঠিয়া থেকে তখন নিমগ্ন ভাববেশী কোনও এক সাধকের স্তব ভেসে আসছে মা তারার,

দক্ষগৃহে যোৎপন্না সতী নাম্নেতি কীর্তিতা।
কৈবল্যদায়িনী যস্মাৎ তস্মাদেকজটা স্মৃতা।।
তারকত্বাৎ সদা তারা লীলয়া বাকপ্রদা যতঃ।
নীলসরস্বতী প্রোক্তা উগ্রত্বাদুগ্রতারিণী।।
উগ্রাপত্তারিণী যস্মাদুগ্রতারা প্রকীর্তিকা।।

দক্ষরাজার ঘরে জন্মেছিলেন সতী। তিনি হলেন কৈবল্যদায়িনী, অর্থাৎ তিনি আদ্যাশক্তি, পরমা শক্তি বা ঈশ্বরী। মনের থেকে ধর্ম-অধর্মের সমস্ত সংস্কারগুলো যখন উঠতে শুরু করল তখন মন মুক্তির পথের দিকে এগোলো। একে বলা হচ্ছে, কৈবল্য বা কেবলের ভাব।

দেহকে আশ্রয় করে আমাদের যাবতীয় অহংবুদ্ধি আত্মাটাকে ঢেকে রেখে দিয়েছে। আত্মার প্রকাশ নেই বলে শক্তিরও কোনও ক্রিয়া নেই। যখন দেহে আনন্দস্বরূপ, চৈতন্যস্বরূপ, সৎস্বরূপ আত্মার উপলব্ধি আসছে তখন দেহ থেকে লিঙ্গের চিহ্ন মুছে যাচ্ছে। তখন নারী পুরুষ নয়— স্থূল সূক্ষ্ম দেহ নয় তখন তুমি হয়ে উঠছ, কেবলঃ ভব। তুমি সেই হয়ে উঠছ।

লিঙ্গ মানে তোমার সমস্ত চিহ্নাদি। মন, বুদ্ধি, অহংকার এগুলো যেমন লিঙ্গ তেমন আমি সন্ন্যাসী, আমি সাধক, আমি ধনী, আমি শিক্ষিত এগুলোও চিহ্ন। এর ঊর্ধে উঠতে হবে। অদ্বৈত বেদান্তের বক্তব্য এটা।

''নারদপঞ্চরাত্রে'' রয়েছে, সতী কৈবল্যদায়িনী। তাঁর নাম একজটা। তিনি সমস্ত রকম ভূতবর্গকে তারণ করছেন সেজন্য তিনি তারা। ভূতবর্গ মানে জীবন্মুক্তি। শরীরের সাধারণ দশা পেরিয়ে যাওয়া। পেরিয়ে গেলে আসবে জ্ঞান। বেদান্তের বক্তব্য হল এখানে তত্ত্বমসি— তুমিই তিনি।

ব্রহ্ম আর তুমি আলাদা কিছু নও। তেমন মহাবিদ্যার সাধনধারা আলাদা ভাবলে কোনওদিন চলবে না। এজন্য কালী ও তারা দুই মহাবিদ্যাকে বলা হচ্ছে আদ্যা— দু-জনই এক, অভিন্ন। পার্থক্য কিছু নেই। এই বোধজ্ঞান যখন জাগবে শরীরে তখন সেটা বাক

তারা দেবী বাকশক্তি প্রদান করে অবলীলায় নীল সরস্বতী হয়ে উঠছেন। তিনি যখন উগ্রমূর্তি ধারণ করছেন তখন উগ্রতারিণী।

উগ্র হল বিষম আপদবিপদ। এগুলো থেকে পরিত্রাণ দিচ্ছেন বলে তিনি উগ্রতারা। ''নারদপঞ্চরাত্রে'' তারাবিদ্যা সম্পর্কে এই বক্তব্যখানা রয়েছে।

''শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে'' কালী আর তারাকে স্বভাবত অভিন্না বলা হচ্ছে। কেউ আলাদা নন। কালী হলেন শিব, তারা হলেন শক্তি। এই হল গিয়ে ''শক্তিসঙ্গমতন্ত্রের'' স্পষ্ট মতামত। আলাদা নয় কিছু।

''তারারহস্যে'' স্পষ্ট করা রয়েছে একজটা তারার রূপখানি। আদ্যাকল্পে বা আদিভূতা দেবী মুক্তকেশী। দেবীর চুল ছাড়া কেন? চুল শক্তির প্রতীক। দেহ যখন নবযৌবনের তখন মাথাতে কেশগুচ্ছ বা চুলের আধিক্য কত বেশি, যখন মধ্যযৌবন দিয়ে বার্ধক্যের দিকে চলে যাচ্ছি, চুল কমে আসছে। শক্তির ক্ষয় হচ্ছে। মাকে দীর্ঘ ঘন আলুলায়িতাকেশী হিসেবে দেখিয়ে প্রচণ্ড শক্তির রূপকে আঁকা হয়েছে। আদ্যাকল্পে সেজন্য দেবী মুক্তকেশী আর স্বয়ং রুদ্র, তাঁর সেই ক্রোধের উন্মাদনাই জটা। ষোলো শতকের মানুষ ঢাকা রমনার সাধক ব্রহ্মানন্দ গিরির লেখা ''তারারহস্যের'' বক্তব্য তো এটা— আদ্যাকল্পে মুক্তকেশী রুদ্রস্তত্র জটা স্বয়ম

ষোলো শতকের আরেক সাধক কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ তাঁর প্রসিদ্ধ সংকলিত পুথি ''তন্ত্রসারে'' বক্তব্য দিয়েছেন, তারামন্ত্রাদিতে চৈতন্য দরকার। চৈতন্য হলে মুক্তি— যেষাং বিজ্ঞানমাত্রেণ জীবন্মুক্তস্ত সাধকঃ।

আঠারো শতকে তারার ব্যাপ্তি ভালরকম ভাবে যে হয়েছে বাঙালি সমাজে, তার উল্লেখ্য উদাহরণ হল ভারতচন্দ্রের লেখা ''অন্নদামঙ্গলের'' ধ্যানমান্যতার তারাপ্রশস্তি,

তারারূপ ধরি সতী হইলা সমুখ।।
নীলবর্ণা লোলজিহ্বা করালবদনা।
সর্পবান্ধা ঊর্ধ একজটা বিভূষণা।।
অর্ধচন্দ্র পাঁচখানি শোভিত কপাল।
ত্রিনয়ন লম্বোদর পরা বাঘছাল।।
নীলপদ্ম খড়গকাতি সমুণ্ড খর্পর।

চারি হাতে শোভে আরোহণ শিবোপর।।

বৌদ্ধ দেবীদের ভেতর তারার কদর সবচেয়ে বেশি। মহাযানী বৌদ্ধদের ভেতর তারা দেবীর অন্তর্ভুক্তি খ্রিস্টীয় ছয় শতকের আগের ঘটনা নয়। সাত শতক থেকে তান্ত্রিক বৌদ্ধমতের দেবীদের দেখা মিলতে শুরু করে। বৌদ্ধ দেবীদের দু'ধরনের অন্তর্ভুক্তি আছে। কিছু দেবীদের মান্যতা রয়েছে তান্ত্রিক বৌদ্ধ সমাজে বোধিসত্ত্বের সমকক্ষ হিসেবে। এঁরা বৌদ্ধ সাজুয্য নিয়ে স্বভাবত উগ্রা দেবী নন, সবাই সৌম্যরূপের। আরেক ধরনের দেবীদের অন্তর্ভুক্তি রয়েছে ধর্মপালদের সমকক্ষ হিসেবে। এঁরা উগ্রারূপের দেবী।

তান্ত্রিক বৌদ্ধরা বলেন, তারা দেবী ধ্যানী বুদ্ধের শক্তি। ধ্যানী বুদ্ধমূর্তিগুলোর গায়ের রং পাঁচ ধরনের হয় বলে তারামূর্তিরও রংগত রূপের ভেতর অন্তর্ভুক্তি হয়েছে। সিত, শ্যাম, পীত, লোহিত এবং নীল— সাদা, কালো, হলুদ, রক্তিমা, নীল পাঁচ ধরনের ধ্যানী বৌদ্ধমূর্তির সাজুয্যে বৌদ্ধ তান্ত্রিকেরা তারা দেবীর পুজো করে থাকেন।

সিততারা ত্রিনয়না হন। তিনি বোধিজ্ঞানের চিহ্ন বহন করেন। অবলোকিতেশ্বরের শক্তি হিসেবে দেখা হয়ে থাকে সিততারাকে। সিততারার আরেক তান্ত্রিক রূপভেদ হল গিয়ে জাঙ্গুলীতারার চতুর্ভুজা মূর্তি।

দু-হাত দিয়ে জাঙ্গুলীতারা বীণা বাজিয়ে চলেছেন। বাকি দুটো হাতের একটি অভয়মুদ্রার, অপরটিতে দেবী ধরে আছেন সাদা সাপ।

জাঙ্গুলীতারার সঙ্গে বাংলাদেশের লৌকিক দেবী মনসার ভাবগত সাজুয্য আছে। দেবীর গায়ের রং হয় দু-ধরনের— কালো আর হলুদ।

শ্যামাতারাকে তিব্বতিরা আদ্যাতারাও বলেন। ইনিও অবলোকিতেশ্বরের শক্তি। পদ্মের ওপর বসে থাকেন দেবী। বোধিসত্ত্বের মতন ওঁর পোশাকআশাক। গায়ে গয়না, মাথায় পাঁচটি পাতার মুকুট।

পীততারা চতুর্ভুজা। ইনি উগ্ররূপের। বৌদ্ধরা এনাকে ভৃকুটীতারাও বলেন। তারামূর্তি যখন ষড়ভূজ হন তখন তিনি নীলতারার গাত্রাবয়ব ধারণ করেন। বজ্রতারার মূর্তিও পীততারার রূপাবয়ব। খদিরবনীতারাও পীত বর্ণের।

বাংলাতে পাওয়া সমস্ত তারামূর্তির ভেতর শেষ তিন ধরনের তারার আধিক্য। নীলতারা একজটা বা উগ্রতারার রূপাবয়ব। দেবীর দুটো রূপ। একরূপ ভয়ংকর মূর্তির। অপর রূপে দ্বিভুজা দেবী শ্যামাতারার সাজুয্যে ভূষিতা। এক হাতে তাঁর খড়গ আরেক হাতে নরকপাল ধরে আছেন দেবী।

বিহার ভাগলপুরের মহিষী গ্রামের উগ্রতারার পীঠটির প্রাচীন হিসেবে প্রসিদ্ধি রয়েছে। এক শ্রেণির তান্ত্রিকদের ধারণা, বশিষ্ঠ তারা দেবীর সাধনা এখানে বসে করেছিলেন। পীঠে তারা, একজটা, নীল সরস্বতী মূর্তি আছে। তারা দেবীর মাথার ধারে অক্ষোভ্য গুরুর মূর্তিটি স্পষ্ট বলে দিচ্ছে যে প্রাচীন পীঠখানি বৌদ্ধ তন্ত্রের। পরে হিন্দু তান্ত্রিকেরা নিজেদের এক্তিয়ারভুক্ত করে নিয়ে একে দ্বিতীয়া মহাবিদ্যার পীঠে রূপান্তরিত করে রেখেছেন।

''শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে'' বলা রয়েছে, কালী, তারা, ছিন্নমস্তার সাধনায় রাত্রির এক যামে সিদ্ধিলাভ করা সম্ভব— কালী তারা ছিন্নমস্তা বীরসাধনমার্গতঃ। যামমাত্রেণ সিধ্যন্তি নাত্র কার্যা বিচারণাঃ।। ''শক্তিসঙ্গমতন্ত্রের'' পুথি কালী আর তারা দেবীর সম্বন্ধবোধটিতে শিবশক্তির অভেদতত্ত্বটি পরিয়েছে। বলা রয়েছে সেখানে, তারা দেবী হলেন শিব আর কালী হলেন শক্তি আবার কালী দেবীও শিবসমা তারা হলেন শক্তিরূপী— কলৌ তারা কলৌ কালী কলৌ তারা চ কালিকা। শিবশক্তিপ্রভেদেন দেহে শক্তিরূপস্থিতা। তারা শিবস্তথা কালী শক্তিরূপা প্রকীর্তিকা। কালী শিবস্তথা তারা শক্তিরূপা প্রকীর্তিকা।

মাতৃকা আশ্রমে সেদিন তারা দেবীর ধ্যানমুদ্রা নিয়ে অতীব সুন্দর এক কথা তুলেছিলেন মাধবী মাঈ। একটু বেশি পৃথুলা হওয়ার দরুন তখন তাঁর

চলতে ফিরতে খানিকটা অসুবিধা ছিল। তাঁর সেবক আনন্দময়জি বসেছিলেন পাশে।

মা বলছিলেন, তারাবিদ্যার চিন্তা তোমার দেহস্থ চিন্তা বাবা। ধ্যান কখনও বাইরের ব্যাপার নয়। ধ্যান হল ভিতরের। মহাবিদ্যার ধ্যান দিয়ে আমরা তান্ত্রিকেরা স্থূল ভূতশুদ্ধি করি। তারাপীঠের শঙ্কর বাবা ছিলেন আমার আপ্তকাম গুরু। গোঁসাই বাবার সঙ্গে বারো বছর বয়সে প্রথম মহাশ্মশানে যাই। ফিরে এলে চোদ্দো বছর বয়সে মা বিয়ে দিয়ে দেন। স্বামী-সংসার-সন্তান, চরম অর্থকষ্ট। ফের কয়েক বছর পর মহাশ্মশানে যাই। ওখানে তখন সাধনরত শঙ্কর খ্যাপা। তিনি আমাকে মহাবিদ্যার সাধনে নিয়ে আসলেন।

জিজ্ঞেস করলাম, কীভাবে এই সাধনক্রিয়া হয় তার কী কোনও ধারণা দিতে পারেন মাঈ?

মাঈ জানি না কেন প্রশ্ন শুনে আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার ভালো করে নজর দিয়ে দেখলেন। দেখার পর বললেন, তুমি কী বাবা যোগপথের?

বললাম, অধ্যাত্ম জিজ্ঞেসু।

মৃদু হাসলেন মাঈ। তাঁর ভরা গালের উৎফুল্লতা আমাকে খানিকটা স্বস্তি দিল। বুঝলাম মাঈয়ের বিশ্বস্ততা কিছুটা অর্জন করতে পেরেছি। তিনি হয়তো কিছু মহাবিদ্যার সাধন আভাস আমাকে দেবেন।

মাঈ বললেন, মূলাধারে যে রক্তপদ্মের চিন্তা তোমার গুরুজি শিখিয়েছেন ওখানে তারাবিদ্যার রক্তময়ী দেবী অধিষ্ঠিত। ভালো করে তারাবীজ ধরে এবার থেকে ও স্থানে মনোনিবেশ দিয়ে জপে বসো। শরীর কথা বলছে। স্বাধিষ্ঠানে যখন যাচ্ছ তখন গুরু নিশ্চয় শ্বেতপদ্মের ধ্যানপ্রণালী শিখিয়েছেন, ওখানে এখন থেকে শুভ্রতারার বীজ বলে জপে বসো। আর মণিপুর চক্রে যখন আসছ তখন যে নীলপদ্মের চিন্তাটা ওখানে আছেন নীলতারা। "কুণ্ডলিনী" বইখানি সময় করে পড়ো। এসব তোমার আয়ত্তে আছে। ধরে

নেবে। শঙ্কর বাবা বলতেন, রজোর গুণ লোহিত। রক্ততারার ধ্যানে তখন বসতাম মহাশ্মশানে। শ্বেতশিমুলের স্মারক যেখানে মহাশ্মশানে ওখানে রাতের বেলায় জপে বসেছি শুভ্রতারার। শরীরের সত্ত্বগুণগুলা সব শ্বেত। আর তমের গুণ নীলবর্ণা। যখন মহাপ্রলয় হল তখন দেবী তমের গুণে বিরাজিতা। তান্ত্রিকেরা যখন সাধন আরম্ভ দেন তখন শরীরে প্রলয়ের দশা। সেজন্য স্থূলভাব কীভাবে নাশ করতে হবে সেটা গুরু আগে দেখিয়ে দেবেন। ওখানে প্রলয়-পয়োধিজলে সমগ্র শরীর ব্রহ্মাণ্ড তলিয়ে গেল— এমন ভাব নিয়ে তারাচিন্তার ভিতর আসতে হয়। সেজন্য তিনি তারিণী। শ্বেতশুভ্রসম সত্ত্বগুণের প্রজ্জ্বলিত অগ্নি এক সময় তোমার অন্দরে এভাবে ঢুকে যাবে বাবা। ও নিয়ে অত চিন্তা কোরো না।

আমি "মহানীলতন্ত্রের" পাতা খুলি। দেখি ওখানে তারাবিদ্যার সাধনায় ত্রিপাদ সিদ্ধির কথাটি লেখা। মাঈ বলছিলেন, উগ্রতারা দেবী তারাপীঠে পূজিতা। মহাদেবকে উগ্রবিপদ থেকে রক্ষা করেন বলে দেবী উগ্রতারা। বিপদ তো শরীরে। কাম, লোভ, ক্রোধ কত বিপদ নিয়ে দ্যাখো ঘুরে বেড়াচ্ছে শরীর। ওখানে উগ্রতারার ধ্যানবিদ্যা দিতে পারলে শরীর যখন শান্ত, শিথিল, মহাদেব তখন শূন্যতারূপী শিবের ভিতর মায়ের ভাবচিন্তা আনতে হবে। মায়ের তিনটে বিশেষ রূপ— একজটা, নীল সরস্বতী আর উগ্রতারা। মায়ের প্রকৃতিটি উগ্রতারার। তান্ত্রিকেরা যখন বিশেষ কামনার পুজো করেন তখন একজটা নীল সরস্বতীর পুজো হয়। নীল সরস্বতী মা সাধকরূপী সন্তানকে মহাবিদ্যা দেওয়ার জন্য ও রূপে আসীনা। তিনি প্রথমে উগ্রা। শরীরের আপদ কাটিয়ে তোমাকে জ্ঞানবিদ্যা যখন শেষমেষ প্রদান করলেন তখন তিনি নীল সরস্বতী। উগ্র ও বিভৎস্য রূপ উগ্রতারা দেবীর। ও রূপ তাই দেখতে নেই। তারাপীঠের গর্ভগৃহে যে ব্রহ্মশিলারূপী মা তা ওই

উগ্রা রূপের। সেজন্য সাধক তান্ত্রিক ছাড়া গৃহীর ও রূপ না দেখা ভালো। এজন্য ও রূপে আভরণ দেওয়া আছে।

মা তারার মস্তকে রয়েছে শ্মশান থেকে উঠে আসার শেষচিহ্ন। মস্তকের ওপর মা পঞ্চমুদ্রার পাঁচটি মুণ্ড গেঁথে পরেছেন। মুণ্ড হল জ্ঞানাধার। যাবতীয় চিন্তা, কাজ মাথা থেকে বের হয়। তারা মায়ের মাথাতে থাকা নককপাল পঞ্চকের যে অস্থিমালার পঞ্চ মুণ্ড তা হল জ্ঞানবিদ্যা রূপের পাঁচটি বিষয়। শব্দের সাহায্য নিয়ে জ্ঞান আসে। স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধের থেকেও আমরা অনিত্য বিষয় জ্ঞান পঞ্চক লাভ করি। নিত্য জ্ঞান হল তারাবিদ্যার। সেজন্য তন্ত্রের সাধন আসনে পঞ্চমুণ্ডাসনের একটা বিধি আছে। অনিত্য জাগতিক বিষয চিন্তাকারী কেউ মুণ্ডাসনে বসে সাধনা করতে পারেন না। সাপের ফণামণ্ডল মস্তকে রেখে দিয়েছেন দেবী। ধ্যানে বলা রয়েছে, শীর্ষক্ষোভ্যমহাদেবকৃতনাগফণাভিশোভিতাং পার্শ্বদ্বয়ে লম্বমান নীলোৎপলমাল্যং পঞ্চমুদ্রাস্বরূপ শুভত্রিকোণাকাব কপালপঞ্চমমাং। মস্তকে অক্ষোভ্য— ক্ষোভশূন্য অক্ষোভ্যঋষি মহাদেবের দেওয়া অনন্ত নাগফণার শোভাটি রয়েছে তারাবিদ্যার রূপে। এটা শিবস্বরূপ দশা। কিন্তু শক্তি দেবীর মাথাতে নাগ অর্থাৎ এখানে দেবী প্রকৃতি স্বরূপিণী ব্রহ্মশক্তি। কুণ্ডলিনীশক্তি শিবসংযোগে আনতে হবে শেষমেষ তারাবিদ্যার সাধন দশায়। দেবীর রূপে তার প্রকাশ। দুই পাশে নীলকমলের মালা লম্বিত— লয় এখানে মুক্তি। কর্মপ্রবাহ থেকে সরে গিয়ে বিদ্যার ধ্যানে বসতে হবে নিভৃতে তবে তারাবিদ্যা লাভ করা যাবে। ও বই পড়েটড়ে হবে না। গুরুর কাছ থেকে শিখতে হবে তারাবিদ্যার প্রক্রিয়া। মায়ের মাথার পাঁচটি নরকপালের যে রূপ, পঞ্চতত্ত্বমূলক বিধি এগুলো সব বিষয়জ্ঞানের শক্তিবিদ্যা। অনিত্য বিদ্যা। এগুলো পঞ্চ তন্মাত্রা।

''মুণ্ডমালাতন্ত্রেও'' কালী-তারা অভেদচিন্তার ধ্যান আছে— যথাকালী তথাতারা এক দৈব হি ভিন্নতা। ধ্যানমন্ত্রে বলা হচ্ছে, ক্রিয়াশক্তিরূপিণী দশমহাবিদ্যার দ্বিতীয়া দেবীর অনেকগুলো নাম আছে। কেউ বলেন, নীল সরস্বতী, কেউ ডাকেন একজটা, কেউ ধ্বনি দ্যান তারা তারা।

মাধবী মাঈ বলেছিলেন, তারা তারা হল মহানাদের ধ্বনি। ধ্বনি দিয়ে মহাশ্মশানে শ্বেতশিমূল গাছতলায় শ্মশানচারীদের নাদব্রহ্মের সাধনাতে বসতে হয়। শঙ্কর বাবা শিখিয়েছিলেন। সতী দেবীর ঊর্ধ্বনয়নতারা পতিত হওয়ার কিংবদন্তি ওখানে আছে। ওটা আন্তর সাধনার ব্যাপার। ভেতরের তন্ত্র। শ্মশান দেহের মধ্যে সুষুম্না পথে। ওই পথে তান্ত্রিকদের ঊর্ধ্বগতি আসে। ওখানে উঠতে গেলে বায়ুর গতি বেঁকে বেঁকে গিয়ে জপের সময় নাদধ্বনি ভেঙে ভেঙে যায়।

বললাম, মাঈ এই সাধন ধারাটির কথা পড়েছি ব্রহ্মানন্দ গিরির লেখার ভিতর। ''তারারহস্যে'' তিনি আপনার বলা কথাগুলির স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন। উনি বলেছেন, তান্ত্রিকের কাজ ষটপদ্মের বৃত্তি ভাঙা। তবে তারানাদ উঠবে। তখন দেবীর ঊর্ধ্বনয়নতারা পতিত হওয়ার আসল মাহাত্ম্য তুমি বুঝতে পারবে। কিন্তু এ তো আমার পড়াবিদ্যা মাঈ।

মাতৃকা আশ্রম আলো করে হাসলেন মাধবী মাঈ। ওঁর প্রতিষ্ঠিত তারামূর্তির নীচে রয়েছে গুরু শঙ্কর খ্যাপার মূর্তি। আত্মানন্দজি বললেন, শঙ্কর বাবা দেহ রাখেন ১৯৮৭ সালে। মা আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন তিনি দেহ রাখার দু-বছর আগে। আমি যখন বাবাকে দেখি, তিনি মৌনী নিয়েছেন। বহুকাল কথাটথা বলেন না মানুষের উৎপাতে। মহাশ্মশানে বাবার শ্মশান বিভূতি প্রকাশ পেতে দলে দলে লোক আসত। বাবার পিছনে জোঁকের মতন সবাই এঁটে। হাজার সমস্যা মানুষের। এই করে দেও ওই করে দাও। শুধু দাও, বুঝলেন! মানুষের ব্যবহারে অতিষ্ঠ হয়ে নিলেন বাবা মৌনী।

মাঈ বললেন, তারাপীঠ তখনও শান্ত, নির্জন। আলো আসেনি। মাটির রাস্তা। সন্ধে হলে ঘন অন্ধকারে ঢেকে যায়। দু-একটা দোকান। আমরা শ্মশানে থাকতাম। বাইরের লোক আসে না। এরপর আমি চলে এলাম। চলে গেলাম কামাখ্যা। ওখানে গুরু পেলাম আবার সচ্ছিদানন্দ তীর্থনাথ বাবাকে। তিনি আমাকে শ্রীবিদ্যা ক্রম দিলেন। হঠাৎ সাক্ষাৎ হল গুফা বাবার সঙ্গে। যোগ শেখালেন তিনি। কৃষ্ণা চতুর্দশীর তিথি। দশ বছর পর গেলাম তারাপীঠ মহাশ্মশানে। ১৯৭৫ সাল। লোকজনের ভিড়। দোকানপাট অনেক। হোটেল হচ্ছে। কেমন অচেনা জায়গা আমার। শ্মশানে কত লোকের উৎপাত। মোদো - মাতাল, সাধু - গৃহী সব তখন একাকার। পুরোনো সাধকেরা এক এক করে দেহ রেখেছেন। গুরুদেব শঙ্কর বাবার কাছে যাওয়ার উপায় নেই। গিজগিজ করছে মানুষ। তাবিজ দাও, কবজ দেও। মামলা, সম্পত্তি চাকরি মানুষের কত কত সমস্যা! মহাশ্মশানে গুরুদেবের শ্মশান বিভূতি দেখেছিলাম আমি। আজ দেখলাম গুরুদেবের অসহায় মুখ। কথা বলছেন না। মৌনী নিয়েছেন। তবু মানুষ ছাড়ে না। আমাকে ইশারা করলেন মহাশ্মশানে বসতে। সে রাতে বসলাম। প্রবল বৃষ্টি। লোকজন সরে পড়ল। হঠাৎ দেখি গুরুদেব। ওঁর পেছন পেছন দু-জন বিদেহী বাবা। গুরুদেব বললেন, উনি কেশবানন্দ স্বামী। আজ তোর অঘোরবিদ্যা লাভ হবে। বাবা শুধু ছুঁয়ে দিলেন। পরে বুঝলাম শক্তিপাত। আরেক সিদ্ধাই গুরু দাঁড়িয়ে। কেশবানন্দ স্বামীজি বললেন, ইনি গণেশ নারায়ণজি। তিনি দৃষ্টিস্পর্শ দিয়ে আমার শরীর ধরিয়ে দিলেন। গুরুদেব শঙ্কর বাবা উন্মাদের মতন হাসছেন। বললেন, ভাগ। মহাশ্মশানে আর আসবি না। মানুষ ঘিরে ধরবে তোকে। আমার দেহ রাখার খবর পেলে সমাধিমাটি নিয়ে যাবি। ঘটনার তেরো বছর পর দেহ রাখেন গুরুদেব। আমি এখানে। আত্মানন্দ গুরুদেবের সমাধিমাটি নিয়ে এলে আসনবেদির ভিতর দিয়ে তার ওপর বাবার মূর্তিতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করি।

মাতৃকা আশ্রম থেকে ফিরে আসি হরিমন্দির গলি, পাহাড়গঞ্জ। রাতে বের করি দশমহাবিদ্যার খাতাখানা। লিখতে থাকি অষ্ট তারাবিদ্যার কথাগুলো। তারা, উগ্রা, মহোগ্রা, বজ্রা, কালী, সরস্বতী, কামেশ্বরী, ভদ্রকালী—অষ্টতারিণী তারাবিদ্যার পুথি ''মায়াতন্ত্র''। ''রুদ্রযামালের'' ভেতর রয়েছে তারা দেবীর কবচ। স্তব পাঠের মতো কবজ পাঠও তারা সাধনার অঙ্গ। মনে পড়ে যোগমায়া ভৈরবীর ডেরা। ভৈরব ঠাকুর কবজ পড়ছেন। কবচের ঋষি অক্ষোভ্য। অক্ষোভ্য হলেন ক্ষোভহীন আপ্তকামী। যিনি নিশ্চল অবস্থার ভিতর রয়েছেন। সহসা ফোন এল আত্মানন্দ ব্রহ্মচারীর, মাতৃকা আশ্রম থেকে বলছি। মাঈ আপনাকে কাল দুপুরে প্রদান নিতে বলেছেন। ভাবি, মঠঘরের দেওয়ালে থাকা শ্রীকৃষ্ণের ছবির মতো মাঈজি অক্ষোভ্য! হবেনই না বা কেন? পঞ্চাশ বছর ধরে তারাবিদ্যায় বুঁদ হয়ে আছেন তিনি।

চৈতন্যময়ীর শ্মশানে

মহাচৈতন্যের ভিতর

ছাতুর এক আশ্চর্য রুটি করেন যোগমায়া ভৈরবী। কড়াইতে ছাতু প্রথমে খানিকটা টেলে নিতে হয়। মা তখন থাকতেন মহুলটির শ্মশান লাগোয়া কুঠিতে। মানুষ পুড়তে থাকা চিতার আগুন যখন মিইয়ে আসত, তিনি ওর ওপর গিয়ে বসাতেন ছাতুর কড়াই। চিতাকাঠের নিভু আঁচে ছাতু লালচে হয়ে উঠলে তিনি টালা ছাতু নামিয়ে রাখতেন দাহকাজে ব্যবহৃত এক মালসায়।

ভৈরবী বলেন, শেষকৃত্য হল দেহটাকে হারিয়ে ফেলা। অন্তরে ওই ভাবটা দরকার। নিজেকে হারিয়ে ফেলতে হয় মহাচৈতন্যের ভিতর। ওটাই বাবা শ্মশানকালীর এলাকা। কিছুই নেই তোমার। একমাত্র সর্বব্যাপী চৈতন্যময়ীর সত্তা। এই ভাবনা যদি ধ্যানে তুমি ভাবতে পারো তবে তোমার চিন্ময় সত্তাটি শ্মশান হয়ে উঠতে পারে। শ্মশান মানে মৃত্যুর এলাকা শুধু নয় রে বাপ। শ্মশান হল আত্মবিলয়। সন্ধ্যায় শ্মশানের দেবীকে এই যে আমরা তান্ত্রিকেরা পুজো দিই, আরতি করি— ও কী জানিস?

বললাম, তুমিই বলো না মা।

ভৈরবী মৃদু হাসলেন। মালসায় রাখা টালা ছাতুর ভিতর কথা বলতে বলতেই চিতাআঁচে করা খানিকটা কুসুম কুসুম গরম জল থেকে এক আঁজলা ঢেলে ছাতু মাখতে থাকলেন। লেচি তৈরি করলেন তিনি। তারপর গোল পাকিয়ে আধপোড়া চিতাকাঠকে একটা চাকু দিয়ে সামান্য চেঁচে তুলে তিনি বেলুনি বানিয়ে তুললেন। চাকি করলেন দাহকাজে ব্যবহৃত আরেকটা

পরিত্যক্ত মালসার উলটোপিঠটাকে। কথা বলতে বলতে তিনি এবার ছাতুর রুটি বেলতে থাকলেন।

ভৈরবী বললেন, শ্মশান হল বাপ আত্মগত তোমার জায়গা। মনের যতরকমের অস্থিরতা তুমি যদি রোজ পোড়াতে পারো চৈতন্যময়ীর শ্মশানে, তলিয়ে যেতে পারবে একেবারেই নিজের ভিতরে। ওটাই তো মরণ বাপ। এ দেহ গেল কী রইল এ নিয়ে ভেবে কী লাভ রে! দেহ তো যাবে কালের নিয়ম ধরে। যতদিন আছে দেহ শ্মশানচিন্তা করো। ভাবো, নিজেকে আরও আঘাত করো মনে। যত তুমি আঘাত রাখবে মনখানায় তত ইচ্ছার স্পন্দন জাগবে। স্পন্দন তোমার মনে তখন নতুন প্রেরণা তৈরি করবে। প্রেরণা থেকে শক্তিময়ীর স্ফুরণ যদি জাগাতে পারো বাপ এভাবেই তোমার ওই মনখানায়, নতুন কর্মের স্পৃহাতে ভরে ভরে যাবে জীবন। স্থূলদেহ সরে গিয়ে তোমার ওই ইচ্ছারূপিণী মায়ের চেতনায় একটা সূক্ষ্মদেহ দেখা দেবে অজান্তেই। এভাবেই শ্মশানে শ্যামা জাগেন।

কথা বলতে বলতেই যোগমায়া ভৈরবী এবার কড়াই বসিয়ে ছাতুর রুটিগুলো সব সেঁকে নিলেন। তারপর ওই কড়াইতে দিয়ে দিলেন খানিকটা ভালো করে কুঁচানো ধনে পাতা। শ্মশান ধারের তেঁতুল গাছ থেকে কিছু পাকা তেঁতুল এনে ছাড়িয়ে তিনি টকবগ করে ফুটতে থাকা ধনে পাতার জলে দিয়ে দিলেন। এরপর দিলেন অনেকটা মরিচ কুঁচানি।

শ্মশানে দুটো চিতা। এক চিতাতে খালি মানুষ পোড়ে। অপর চিতা ভৈরবী ব্যবহার করেন প্রেতসাধনে। সেদিনটা ছিল প্রেতদীক্ষার।

দূর গাঁয়ের শ্মশান বলে মড়া এখানে আসে দুই - একদিন অন্তর অন্তর। যেদিন মড়া আসে সেদিনটাই খালি ভৈরবী মা শ্মশানকালীর রান্না ভোগ দেন। চিতার আগুন ছাড়া শ্মশানে রান্না করা যাবে না এ মায়ের গুরুর হুকুম।

যেদিন মড়া আসে না, মায়ের শুকনো ভোগ হয়। রান্না দানাশস্য সেদিন আর দেন না ভৈরবী।

ভৈরবী বলেন, প্রেতদীক্ষাতে দিব্যজ্ঞানলাভের সম্ভাবনা আসে। প্রেত কিন্তু কোনও অশরীরী কিছু নয় রে বাপ। প্রেত হল তোমার দেহসত্তার অন্তেষ্টির পর যে অবয়ব রইল তারই চিন্ময় অনুভূতি। ওই অনুভূতি এলেই চিৎজ্যোতি তুমি পাবে। তোমার দেহসত্তার জানবে তখন মৃত্যু হয়ে গেছে। শুদ্ধ এক প্রেতসত্তার সর্বব্যাপী চৈতন্য তখন তোমার। ওকে সর্বগত, সর্বব্যাপী করে নেও এবার। দেখবে সবখানেই শক্তিময়ীর ইশারা পাচ্ছ। ইশারা নিয়ে এবার কাজ করতে থাকো। অন্তরে তন্ময় ভাবটা খালি রাখো।

ধনে পাতার রসা আর ছাতুর রুটি দিয়ে এরপর মা শ্মশানকালীর ভোগ দিলেন। ভোগের পর শ্মশান ধারের জঙ্গল থেকে আনা কাঁচা শালপাতার ওপর তিনি ছাতুর রুটি সাজিয়ে ধনে পাতার টক রসা খানিকটা ছড়িয়ে দিয়ে খেতে দিলেন আমায়।

শ্মশানের চতুর্দিকে ছড়ানো শাল-মহুলের গাছের ঘেরা থেকে তখন গ্রামের আওয়াজ আসছে অস্পষ্ট। শ্মশানের জায়গায় জায়গায় শেয়ালকুল আর বৈঁচির জঙ্গল। ঝাড়খণ্ড আর পশ্চিমবঙ্গের সীমারাখায় অবস্থিত এই শ্মশান। সাঁওতাল বিদ্রোহ এদিকেই একসময় গর্জে উঠেছিল সিদো-কানোর নেতৃত্বে। এমন জায়গায় অমৃতময় মায়ের ভোগ এর আগে কোনওদিনই তো খাইনি!

ভোগ খেয়ে হাত ধুতে গেলাম চিলা নদীর জলে। গিয়ে দেখলাম ব্রহ্মানন্দ ভৈরব তখন স্নান সারছেন। স্নান সেরে শ্মশানচিতায় রোজ রাতে জপে বসেন তিনি।

অন্তর্মুখী শক্তিপ্রবাহ

কাশ্মীরতন্ত্রের আচার্য, উৎপলের শিবদৃষ্টি পুঁথিটি আমি দেখেছিলাম সোমানন্দ অবধূতের ডেরায়। আশ্চর্য সব কথা বলেন অবধূত। যখন আমি

পুঁথি খুলছিলাম, বললেন, শিবদৃষ্টিতে উৎপলদেব বাকনিয়ে অনেক কিছু বলে গেছেন। তন্ত্রের যে শব্দ চিকিৎসা তার উৎসভূমি হল শিবদৃষ্টি পুঁথি।

প্রদীপ অনেকক্ষণ জ্বলার পর শিখা যেমন উসকে তুললে আলো আরও ঘনীভূত হয়ে ওঠে তেমনই সাধুসন্তদের কাছে গেলে শাস্ত্রীয় আলোচনা যখন ঘনীভূত হয় আমি কথাকে উসকে উসকে তুলি। এটাই আমার কাজ। কথা বের করে নেওয়া।

অবধূত তখন বলছেন আমায় শব্দগুণমাকাশমের কথা— আকাশের গুণ বা কাজ হল গিয়ে শব্দ। অদ্বৈতবেদান্তের কথা বলছিলেন সোমানন্দ অবধূত।

বলতে লাগলেন, কাশীর সুমেরু মঠে গুরুদেব একদিন বললেন আমায়, আকাশ অনিত্য বলেই ধ্যান-ধারণার জন্য আসনে বসলে আমি আমার শিষ্যদের অনিত্য আকাশের চিন্তা রাখতে বলি। আকাশ যেমন ক্ষণে ক্ষণে পালটায় তেমনই মানুষের মন আকাশসম অনিত্য বলেই হঠাৎ করেই বদলে যেতে পারে আবহাওয়ার মতন। মনের মতো দ্রুত বেগে আবহাওয়ারও পরিবর্তন হয় না বুঝলে। আকাশ ও মনকে যখন অনিত্য পরিবর্তনশীল তুমি জানতে পারলে তখন নিত্য ও সত্যের সন্ধানী তোমাকে এবার হতেই হয়। সন্ধান তোমাকে তাই করতে হবে শব্দের ভিতর দিয়ে।

অবধূত বললেন, তখন আমার বিদ্যাশিক্ষার কাল। কাশীর সংস্কৃত কলেজে গিয়ে ভরতি হয়েছি। আমার গুরুদেব ছিলেন কাশীর বিদগ্ধ পণ্ডিত গোপীনাথ কবিরাজের ছাত্র। তিনি সরস্বতী ভবনে সংগৃহীত ১৫০০ পুথির তদারকি করছেন গোপীনাথ কবিরাজের নির্দেশ পেয়ে। সেখানেই তিনি শিবদৃষ্টির পুথিটি খুঁজে পান, বুঝলে। সেই পুথি পড়তে গিয়েই গুরুদেবের শব্দ চিকিৎসার বিষয়আশয়গুলো মাথাতে আসে। গুরুদেব অদ্বৈতবাদী হলেও তিনি ছিলেন আদতে শক্তিবিশিষ্ট অদ্বৈতবাদের প্রবল সমর্থক। আমাদেরকে বলতেন, শিবের সঙ্গে যেমন শক্তির অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে তেমনই শব্দের

সঙ্গে অর্থের নিত্যসম্বন্ধ আছে। শব্দ বলছ মানে, অর্থকেই প্রকাশ করছ। আমাদের প্রতিটি কথা ব্যঞ্জক, দ্যোতক ও প্রকাশক। কিছু না কিছু আমরা প্রকাশ করতেই চাই সবসময়ই। শব্দের চিকিৎসাতে ওই চাওয়াটাতে খালি প্রবল বিশ্বাস রাখতে হবে। তুমি যখন অভিপ্রায় নিয়ে শব্দ উচ্চারণ করছ তখন ওতে অর্থের প্রকাশ হচ্ছে। এটা হল গিয়ে শব্দবিদ্যার প্রকাশ ক্রিয়া। পুরোনো তান্ত্রিকেরা এই প্রকাশ ক্রিয়াগুলো জানতেন। যা দিয়ে তাঁরা শব্দ চিকিৎসার রাস্তাগুলো সব খুলে দিতে পেরেছিলেন।

ডেরায় তখন ঘিয়ের প্রদীপ জ্বলছে। মুণ্ডাসনের ওপর বসে আছেন সোমানন্দ অবধূত। লাল কাপড়, মাথায় জটা, ডান হাতের কবজিতে রুদ্রাক্ষের মালা, দু-হাত ভরতি পলায়, কপালে চওড়া সিঁদুরের টিপ পরা এক ভৈরবী কিছু আগে এসে উঠেছেন অবধূত ঠাকুরের ডেরায়। আমি ওঁর নাম জানি না। পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিনিবন্ধ হতেই আমাকে তিনি বললেন, এত মাথার যন্ত্রণা হয় কেন রে তোর?

বললাম, আমার মাইগ্রেন আছে। ব্যথা ওঠে মাঝে মাঝে। কিন্তু আপনি সেটা বুঝলেন কী করে?

মৃদু হাসলেন ভৈরবী। বললেন, তোর গলার আওয়াজে দৃঢ়চিত্ত স্থাপন করে বুঝলাম মাথাতে ব্যাথা উঠছে। এরপর ওষুধও খেতে হবে।

সত্যিই তখন আমার মাইগ্রেনের ব্যথা উঠেছে আর ওটা খানিকটা বাড়লেই ওষুধ খেতে হবে এটা আমার ডাক্তারের নির্দেশ।

ভৈরবী বললেন, সাধুসঙ্গে অনেকদিন তো আছিস। হৃদয়পদ্ম নিশ্চিত চিনিস। ওখানে ধ্যান করার প্রক্রিয়াটি শিখিয়ে দিচ্ছি তোকে। শব্দ দিয়ে জ্যোতির্ময় আকাশকল্পের ভাবনা করবি ওখানে ব্যথা উঠলে ধ্যানে বসে গিয়ে। হৃদয়দেশ হল ধ্যানের স্থান। ওখানে তান্ত্রিকী পদ্ম রয়েছে। তুই সবটা জানিস। তবু শুনে নে দেখি একবার।

আমি শিবদৃষ্টি ছেড়ে ভৈরবীর বলা শব্দের সঙ্গে অর্থের অবিনাভাব সম্বন্ধটি এবার বুঝতে সচেষ্ট হলাম অবধূতের সঙ্গে সারা দুপুর আলোচনার পর।

ভৈরবী বললেন, মানুষের হৃদয়দেশ খালি জায়গা। ওটাই আকাশ, মহাকাশ। ওতে রয়েছে পদ্ম। যত হৃদয়দেশে মন দিবি ততই পদ্মের পাপড়ি খুলতে থাকবে। হঠাৎ কোনও তীব্র দুঃখের অনুভূতি যখন ওঠে মানুষের হৃদয়দেশ থেকে তখনই সে কেঁদে ফ্যালে। আনন্দের অনুভূতিও ওই হৃদয়দেশ থেকে হয়। হৃদয়দেশে যদি যোগাভ্যাস করতে পারিস তবে ওখানে সত্ত্বগুণের আধিক্য ভাবনায় প্রজ্ঞার আলো গিয়ে লাগবে। তৎক্ষণাৎ চিত্তবৃত্তির নাশ হবে। স্থিরতা উৎপন্ন হবে। ব্যথারোগও একটি বৃত্তি। হৃদয়দেশে ধ্যান করতে হবে শব্দ দিয়ে। যে কোনও শব্দ দিয়ে ধ্যান করলে তো আর হবে না বাবা। শব্দব্রহ্ম। হৃদয়ে থাকা সাত্ত্বিক বৃত্তি কীভাবে কাজে লাগাতে হয় তা তোর গুরু নিশ্চয়ই শিখিয়েছিলেন। ওই শেখা বিদ্যায় এবার আমার দেওয়া শব্দব্রহ্মটির প্রয়োগ করতে থাক আসনে বসে।

ভৈরবী আমার কানে নিজের মুখ নিয়ে গিয়ে একখানি শব্দ দিলেন। বললেন শব্দটি নিয়ে হৃদয়পদ্মে এবার থেকে স্থাপন করে ধ্যান-ধারণা করতে বসবি ব্যথা উঠলে। উপশম হবে।

পরে যখন আচার্য আনন্দবর্দ্ধনের ধ্বনিতত্ত্ব পড়তে বসলাম সেদিনই আমি বুঝলাম ধ্বনির অন্তর্গূঢ় লাবণ্য কীভাবে মনে স্পন্দন তুলতে পারে! শব্দও এমনপানা যে স্পন্দন তুলে তাৎক্ষণিক কোনও অস্বস্তির নিবৃত্তি দিতে পারে তা তান্ত্রিক আচার্যরা ভালোভাবে জানেন। এজন্য এঁদের শব্দ চিকিৎসা অনেকটা ফলদায়ী।

সোমানন্দ অবধূত বলেন, মন যন্ত্রস্বরূপ। মনেতেই ইষ্টসিদ্ধি হয়। মন চঞ্চল ও ভ্রমণশীল। তার স্বরূপ আত্মা। সেটা যদি উপলব্ধি করতে না পারো আবার, তবে তন্ত্রের শব্দ চিকিৎসাটা কাজে আসবে না। অন্তর্মুখী

শক্তিপ্রবাহের ব্যবহার তোমাকে আগে শিখতেই হবে তন্ত্রের শব্দ চিকিৎসা করাতে হলে। অন্তর্মুখ মন দিয়েই শব্দসাধন হয়। শব্দের শক্তিতেই মন বাইরে ছড়িয়ে পড়ে আবার ভিতরে ঢুকে পড়ে। শব্দশক্তির আশ্রয় নেওয়াটাই হল গিয়ে দীক্ষা। শব্দ দিয়ে চৈতন্যপ্রবাহে আত্মস্মৃতি ফুটিয়ে তুলতে হবে। আত্মস্মৃতি মানে জাগতিক বর্ণমালাকে কিছু সময়ের জন্য দূরে সরিয়ে মহাজাগতিক পাঠে ডুবে থাকা। ডুবতে ডুবতেই শব্দ তখন ব্যঞ্জক, দ্যোতক আর প্রকাশক। বাকিটা আমাকে আর বলতে হবে না। অভ্যাস করতে থাকলে নিজেই টের পাবে।

যোনিমুদ্রার প্রয়োগ

সর্ষে গাছগুলো এখন ফুল আসার জায়গাতে পৌঁছে যাচ্ছে একটু একটু করে। শ্মশানজমির শেষ হাতায় তোয়াব আলির খেত। গঙ্গায় ভাঙন লেগেছে। যে কোনওদিন খেত তলিয়ে গিয়ে গিলে নেবে মা গঙ্গার বড় হাঁ।

ভয়ে আছে তোয়াব। শেষ বিকেলে এখন ডিঙি করে গঙ্গায় বেড়ালে ও নিয়ে বের হয় মশারির জাল। পাড়ের ধারে যেখানে ডিঙি ভিড়িয়ে তোয়াব খানিক জিরোয়, বিড়ি ধরায়, সেখানে জালের হাতা গুঁজে রাখে সে কাঠির আগায়। এ সময় ছোট ছোট পুঁটি জলের ওপর খলবল করতে করতে জালের ভেতর ঢুকে পড়ে। মরণ হাঁ তোয়াব যখন গুটিয়ে তোলে, রূপালি পুঁটিগুলো লাফাতে লাফাতে দু-চারটে ছিটকে গিয়ে ফের জলে পড়ে আর মা গঙ্গা গিলে নেন।

গঙ্গা আমাকে চিনিয়েছিলেন ছুক্কিনী মাঈ। রাজরাপ্পার ডেরাতে বসে সেবার তিনি মা গঙ্গার অবতরণ নিয়ে বলছিলেন। জহ্নুমুনির আশ্রম। মুনি যজ্ঞ করছিলেন। জোয়ার এসে সবকিছু ভাসিয়ে নিল। রেগে গেলেন মুনিঋষি। গঙ্গার সমস্ত জল গিলে নিয়ে শুকিয়ে তুললেন মাকে। মা গঙ্গার মুক্তির জন্য দেবতা সব নেমে এলেন মুনির আশ্রমে। বললেন এসে, হে মহাতেজা মহর্ষি,

গঙ্গা আপনার মেয়ের মতন। তাকে আপনি মুক্তি দিন। দেবতাদের অনুরোধ জহ্নুমুনির মন গলিয়ে ফেলল। তিনি তাঁর কান দিয়ে গঙ্গাকে স্রোতবতী করলেন, তাঁকে মুক্ত করে দিলেন। জহ্নুমুনির মেয়ে বলে গঙ্গার আরেক নাম জাহ্নবি।

মা গঙ্গা নিয়ে অজস্র পুরাণ ও শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যান বহুবার আমি মাঈয়ের মুখে শুনেছি। প্রতি সন্ধ্যায় শ্মশান ভৈরবের আরতির আগে মাঈ গঙ্গাস্নান করেন। রাজরাপ্পা ছেড়ে তিনি এখন উঠেছেন তোয়াব আলির ঘরের ধারে শ্মশান শিবের থানে। এখানে আছেন বছর তিন। গঙ্গার তীর অতি পবিত্র আর তান্ত্রিক ক্রিয়ায় ব্রহ্মময়ীর সাধনা গঙ্গার ধার ঘেঁষে করলে জলদি ফল মেলে। একথা মাঈ বলেন।

আমি মাঈয়ের কাছে এলে তোয়াবের ঘরে গিয়ে থাকি। তোয়াব আশ্চর্য এক মাধ্বী বানায় সর্ষে ফুলের মধু দিয়ে। খেতের ধারে মস্ত শ্যাওড়া গাছের ডালে বরাবর মৌমাছির চাক পড়ে তোয়াবের সর্ষে খেতে ফুল এলে। মৌমাছিরা একই গাছে বার তিন চাক ফ্যালে। এটাই নাকি নিয়ম, তোয়াব এসব বলে। আর আমি হাঁ হয়ে শুনি। মা গঙ্গার মতন আমারও এক বড় হাঁ। সব আমি গিলে নিতে পারি। পরে কাজে লাগে। বইয়ের পাতায় পাতায় উগ্রে দিতে পারি।

মাধ্বী হল মধু থেকে তৈরি মদ। সর্ষে মধুর মাধবী বানানো তোয়াব শিখেছে ছুক্কিনী মাঈয়ের কাছে। মাঈ বলেন, মধুর সুরা শ্রেষ্ঠ সুরা। দেবীঅর্চনায় মাধবী সুরা প্রশস্ত।

আমি মাধ্বী বানানো শিখি। চাকভাঙা মধুর ভিতর তোয়াব মিশিয়ে তোলে মাঈয়ের বলা ঔষুধী গাছের শেকড়। শ্মশান ভৈরবের পুজোর ফুল গাছের শেকড় তুলে তোয়াব আলি খানিকটা ঝলসে নেয় শ্মশানের নিভন্ত চিতায়। তারপর শেকড়কে খলে পিষে নেন মাঈ। তামাকের জল মিশিয়ে তা মধুর

ভিতর মিশিয়ে নিলে সর্ষে মাধ্বী তৈরি। এরপর মাধ্বীকে পরিণত করতে হয় কারণে। সেই কারণ তন্ত্র সাধনায় নিবেদন ও সেবন করার বিধি।

ফাল্গুনে হয় সর্ষে মাধ্বী। দোল পূর্ণিমার আগে চাক ভেঙে তুলে মাধবী বানায় তোয়াব। বেশ কিছুটা দিয়ে ও ক্ষুন্নিবৃত্তি সারে। বিক্রি করে আর বাকিটা ওর গুরুমা, মাঈকে দিয়ে দেয় দেবীঅর্চনার জন্য।

মাধ্বীর সঙ্গে ছোট পুঁটির চাখনা ভালো জমে। মাছগুলো ভেজে তোলে তোয়াব তারপর পঞ্চমকারে নিবেদনের পর চাখনা বানায় সে। কুচি করে মরিচ, ধনে পাতা আর খেতের টমেটো। নুন মাখায়। তৈরি হয়ে ওঠে মাধ্বী প্রসাদের চাখনা।

মাঈ বলেন, মাধ্বী খেলে মনঃসংযোগ বাড়ে, সাধনার সুবিধে হয়। আরাধ্য দেবীর একলক্ষ জপ এক আসনে করা চলে মাধবী প্রসাদ পেলে। কারণ ফুর্তি ও মজার জন্য পান করলে তা থেকে প্রাপ্তি আসে নেশা। আর পুজোর শোষিত কারণ খেলে দৃষ্টি ও মন বিচলিত হয় না। মাধ্বী যখন শিষ্যের মুখে দিয়ে দেন গুরু তখন তার কুণ্ডলিনীর মুখ যাতে উদ্বোধিত হয় সেদিকে দৃষ্টি থাকে ওঁর। তিনি মাধ্বী মন্ত্রপূত করে শোধন করে শিষ্যর মুখে তুলে দেন।

শ্মশান ভৈরবের থানে এখন হাওয়া দিচ্ছে। সাধু - ভৈরবরা প্রসাদ পাচ্ছেন। তৈয়ব চাখনার থালি সাজিয়ে তুলছে।

মাধ্বী হাতে দাঁড়িয়েছেন মাঈ। অতি যত্নে তিনি আমার মুখে ঢেলে দিচ্ছেন মাধ্বী প্রসাদ। এ মাধবী সুষুম্না পথে চালিত হবে একদিন...

যেদিন গুরু শিখিয়ে দেবেন শিষ্যকে যোনিমুদ্রার প্রয়োগ...

অগ্নির বল

পুরোনো মানুষ ব্রহ্মানন্দ বাবা। এখনও পোয়ায় হিসেব রাখেন। রোজ সকালে একপোয়া মুড়ি আর কাঁচা রসুন বরাদ্দ করেছেন তিনি ওঁর শিষ্যদের জন্য। কঠিন রোগে ভুগে উঠলে শরীর আপনেই রক্তাল্পতাতে দুর্বল করে।

নতুন ভৈরব তখন নানান শারীরিক দুর্বলতায় ভুগছেন। বাবা ওঁর ভৈরবীকে বললেন, রোজ সকালে একপোয়া করে মুড়ি আর কাঁচা রসুনের গোটা কয়েক কোয়া তুমি তার জন্য পাঠায়ে দেবে। এ পথ্য চলবে সাত-আট দিন। সেজন্য এক সপ্তাহ ধরে ব্রহ্মানন্দ বাবার ডেরায় সকালের জলখাবার ছিল মুড়ি ও রসুনের কোয়া। আমি ওর ভিতর গিয়ে উঠলে মুড়ির সঙ্গে কাঁচা রসুন সেই প্রথম খেলাম।

বাবা বলেন, রোগ হলে ওষুধ খেতে হবে এটা ঠিক কথা। কিন্তু ঋতু, কাল, দেশ, বয়স মেনে যদি রোগ অনুযায়ী পথ্য না পড়ে শরীরে, নীরোগ হওয়াটাও মুশকিল।

তান্ত্রিকেরা গাছ গাছড়ার মূল, পাতা, ছাল, আঠা প্রভৃতি দিয়ে যেমন তন্ত্রের চিকিৎসা সারেন তেমন আবার পথ্যকেও রোগের সঙ্গে যথেষ্ট গুরুত্ব দেন।

ব্রহ্মানন্দ বাবা বলেন, দুধ খুব ভালো জিনিস কিন্তু মাছ, ডিম খেয়ে যদি দুধ খাওয়া হয় তাহলে তার পুষ্টিগুণখানা নষ্ট করে দেওয়া হল। দুধ পেলে রোজ একটু খাওয়া ভালো। তবে রাতে দুধ খাওয়াটা ক্ষতিকর।

গরম দিনে দই পাতেন মাটির পাতিলে ভৈরবী। বাবা বলেন, শীতে দই আর ঘোল একেবারেই নিষিদ্ধ আহার।

গরম দিনে নতুন ভৈরবের খেতে ঢ্যাঁড়স ফলে। সে বাবার আশ্রম ঢ্যাঁড়স নিয়ে এলে মা রান্না করতে বসলে বললেন, তুমি আবার ও সব খেও না।

বললাম, ঢ্যাঁড়স উপকারী নয়? বাবা বললেন, যাদের বাত রোগ আছে তাদের ঢ্যাঁড়স খাওয়া একেবারে ঠিক নয়। কচি, পাকা যে ঢ্যাঁড়সই তুমি খাও না কেন শরীরে ব্যথা থাকলে তা আরও বাড়িয়ে তুলবে। সব শরীরে সব কিছু উপকারী এ তোকে কে বলল?

বাবা বললেন, ওল উপকারী খুব। যাদের অর্শ আছে, চুলকানি, পাঁচড়া, খোস এসব ওঠে শরীরে তাদের কোনওদিন ওল খাওয়া চলে না। শীতের মুলো উপকারী। তবে একেবারেই দেখে খেতে হবে। কচি মুলো একমাত্র শরীরে পথ্য হতে পারে। আমার গুরুদেব আয়ুর্বেদের উপদেশ দিতেন।

তিনি বলতেন, হিতাং মিতাং যথাকালং চ ভুঞ্জীত— পথ্য খেতে হলে হিতকর যা তা পরিমিত মাত্রায় খেতে হবে যথাকালে। না হলে ওই পথ্যই ক্ষতি করে দেবে শরীরের।

আয়ুর্বেদে স্পষ্ট উপদেশ আছে, যস্য দেশস্য যৎ জন্মণঃ, তজ্জং তস্য ভেষজং পথ্যং— যে দেশে যিনি জন্মান তাঁর আহার্য ও পথ্যাদিও সেই দেশে জন্মে থাকে।

ব্রহ্মানন্দ বাবা বলে চলেছেন, আমরা তান্ত্রিকেরা শ্মশান লাগোয়া নাবাল জমির দিকে থাকি সেজন্য গাছ, মূল, লতাকে জড়িয়ে বেঁচে থাকাটা পছন্দ করি। প্রাচীন আয়ুর্বেদে নির্ভর করি। অ্যালোপাথি চিকিৎসার প্রধান অন্তরায় হল ব্যয় বাহুল্য। সাধুগুরুরা সেজন্য ওসব থেকে বেশ দূরে। তাছাড়া ঔষধ ব্যবহারে শরীরে কুফল সৃষ্টি হয় কিছু। গাছ গাছড়ার চিকিৎসায় এই কুফলের সম্ভাবনা নাই। তান্ত্রিকেরা তাই এদিকে ঝুঁকে থাকেন।

ভৈরবী মা মুড়ি, রসুন কোয়া দিতে এসে অনুসন্ধিৎসু বলেই আমাকে বলতে বসলেন। বললেন, দু-বেলা ভাত খাবে। একবেলা রুটি খেতেও পারো। পুরোনো চালের ভাত শরীরের পক্ষে ভীষণ উপকারী। আমাদের কালে শালিধানের চাল পাওয়া যেত। কচি বেগুন, সজনে ডাঁটা, কচি উচ্ছে, বেতের ডোগা, কচি কচি পটল, নোটে গাছের ডগি এসব সবজি শরীরের পথ্য। কাঁচা মুগের ডাল খাবে। ভাজা মুগ শরীর গরম করে দেয়। গরম দিনে শুক্তো শরীরের উপকারী পথ্য। আর পাকা কয়েতবেল যখন পাবে, ওর শাঁস খাবে খাওয়ার পর। এতে হজম ক্ষমতা বেড়ে যায়। স্নান এখন সবাই ঘরে

করে। আমরা শ্মশানবাসী বলে ডুবে স্নান করার সুযোগটা পাই। শীতে তেল মেখে স্নান আর গরম দিনে গায়ে চন্দন মেখে স্নান খুবই দরকারি দেহের পথ্য। এতে নাড়ি সতেজ হবে। পাখির মাংস শরীরের খুব উপকারী পথ্য। আমার গুরুদেবের ওখানে তখন খরগোশের মাংসে ভোগ হত। গুরুমা চড়ুই পাখির মাংস, সারস, চাতক— এসব উড়ন্ত পাখির মাংসভোগ দিতেন। এসব মাংসাদি শরীরের পথ্য হিসেবেও উপকারী।

ব্রহ্মানন্দ বাবা বললেন, শরীরটা আমাদের তিনটা ধরনের। বায়ু প্রধান, পিত্ত প্রধান আর শ্লেষা প্রধান। এজন্য বায়ু, পিত্ত, কফ রোগে শরীর আক্রান্ত হয়ে যায় বেশি। আমার গুরুদেব খেতেন তিল তেলের রান্না। তিনি শিঙি, খলসে, মৌরলা, মাগুর তিল তেলে পাক দিতে বলতেন। কচি মোচা, পাকা চালতা, পাকা গাব, বৈঁচ ফল, বকুল ফুল তিনি আহার করতেন তিল তেলে ভাজি বানিয়ে। কাঁচা বেল শ্মশানচিতাতে পুড়িয়ে মাঝে মাঝে আহার করতেন।

দেহে দরকার অগ্নির বল। একথা গুরুদেব বলতেন বুঝলি। কাঁচা সিদ্ধি শরবত করে তিনি প্রসাদ দিতেন আমাদেরকে। জিরে ভাজা নিমের পাতা, শ্মশান ধারে হওয়া নানান কষা ফলের রস করতেন তিনি কবিরাজি খলে।

বলতেন, এসব খাবার দেহে অগ্নির বল বাড়ায়। পেটের দোষেও এর ব্যবহার চলে।

ব্রহ্মানন্দ বাবা বললেন, অগ্নি হল মণিপুর। শরীরের পুরোভাগ, পুর হল মণিপুর। শরীর ঠিক রাখাটাই তন্ত্রের প্রথম সাধনা।

শরীরের মেদঋতু

ঘি গরম করে খাওয়ার কথা বলেন ব্রহ্মানন্দ বাবা। গরম ঘি ভাত পাতে ফেলে ওর ভিতর দিতে হবে গোলমরিচের গুঁড়ো। এভাবে শীতকালে

সপ্তাহে তিন দিন খেলে শীতপিত্ত রোগটা আর হবে না। আর সর্দি লাগার ধাতটাও কমে যাবে।

পুরোনো মানুষ ব্রহ্মানন্দ বাবা। রোগের নামধাম বলেন পুরোনো ধাঁচাতেই। জিজ্ঞেস করি, বাবা শীতপিত্ত কী? দোক্তা নেওয়া কালচে দাঁতে হাসেন ব্রহ্মানন্দ বাবা। তারপর বলেন, হজমের সমস্যাদি থেকে শীতপিত্ত ধরে। যাদের এ সমস্যা আছে, টক-মিষ্টি-কষার রস, আর গুরুপাক চলে না। তেঁতো খেতে হবে রোজ। সজনে ডাঁটা গরম দিনে খাওয়া খুব ভালো। আর পেটের সমস্যাদি হলে বদহজম ঘটলে সামান্য গরম জল পান করা ভাল। শীতপিত্ত থাকলে জ্বালা করে খালি চোখমুখ। ঠান্ডা লাগাতে ইচ্ছে করে। আবার গরম দিনের তাপ পেলে শরীর থেকে ছোট ছোট গুঁটি বের হয়।

ব্রহ্মানন্দ বাবা বলতে লাগলেন, আমার গুরুমা ত্রিফলা, গুগ্গুল, পিপুল জলে মেড়ে বড়ি তৈরি করে রাখতেন। এই বড়ি রোজ সকালে খেলে পেটের সমস্যাদি ধরে আসে।

বাবা বললেন, পেট থেকেই সিংহভাগ রোগের উৎপত্তি। শীতপিত্তের উদয় ওই পেট থেকে। পুরোনো গুড় আদার রস দিয়ে খেলে পেট ভালো থাকে। শরীর ভালো রাখতে পুরোনো চালের ভাত ভালো। দুপুরের খাওয়া শেষে গরম দিনে খেতে হবে একটু টক দই আখের গুড় দিয়ে। কালো সর্ষে খাদ্য তালিকা থেকে একেবারেই বাদ। শরীরের ভীষণ উপকারী জিনিস রাই সর্ষে। মাছ, মাংস, ডিম, দুধ দ্রব্যগুণ হিসেবে একেবারেই বিপরীত শক্তির। এগুলো একত্র করে সুস্বাদু খাবার তৈরি করা যায় ঠিকই কিন্তু এর ফলাফল হল রক্তকে দূষিত করে দেওয়া। রক্ত দূষিত হতে থাকলেই দেহের বায়ু, পিত্ত, কফ সব গরম হতে থাকবে।

পথ্যের ভিতর উপকারী জিনিসগুলো কী কী বাবা? জিজ্ঞেস করলাম আমি।

তিনি বললেন, ভাত পাতে বসলে শরীরের শ্রেষ্ঠ পথ্য হল নিমপাতা, উচ্ছে সহ যে কোনও তিতা খাবার। তিতার পরই মিঠা।

ভৈরবী মা ভাত পাতে দিলেন তিলবাটা। গরম ভাতে তিল শরীরের জন্য খুব উপকার। কাঁচা মরিচ দিয়ে বাটা তিলে সামান্য কাঁচা সর্ষের তেল ছড়িয়ে খেতেও বেশ মজা। আমার তখন পেটের দিকে মেদ বেশ বাড়ছিল। ভৈরবী মায়ের নজর গেল এবার সেদিকে।

তিনি বললেন, পরিশ্রম, চিন্তা আর রাত জাগা থেকে মেদ বাড়ে। ছোটবেলাতে খেতাম আমরা শ্যামা চালের ভাত। ঠাকুরমা আমাদের ভাতের গরম মাড় খাওয়াটা অভ্যাস করিয়েছিলেন। ভাতের মাড়ে মেদ ঝরে। মেদ এলে শাকপাতা খেতে হবে বেশি। তিল তেলের রান্না খেলে মেদ নামে। ডালের ভিতর অড়হর। দেশগাঁয়ে আগে হত শ্যামা, উড়ি, কোদো, কাঙ্গুনি চাল। এসব চাষ উঠে গেছে। পুরোনো ধানের চাল ভাত করে খেলে মেদ ধরে। গরম দিনে ঘন ঘন স্নান একেবারে ভালো না। দুধ, ছানা, ঘি, পাকা মাছ আর মাংস মেদ এলে বন্ধ করে দিতে হবে। সেই সঙ্গে দিবানিদ্রা। দুপুরে ঘুমের অভ্যেস আর গা এলানো থাকলে শতগুণ বাড়বে মেদ।

ব্রহ্মানন্দ বাবা বললেন, ভুক্ত দ্রব্যের দ্বারা রস উৎপন্ন করে শরীর, যেটার আর পরিপাক হয় না। হজম না হওয়া দেহের রস তখন মধুর রস হয়ে যায় বাবা।

বললাম, মধুর রস কী?

দোক্তার ছোপ পড়া দাঁত খানিকটা বের করে তান্ত্রিক ব্রহ্মানন্দ বলতে থাকলেন এইবার, অপক্ক অন্নরসাদির যে স্নেহাংশ তা হল গিয়ে মধুর রস। এগুলো শরীরের মেদঋতুকে বাড়িয়ে তোলে। মেদ যত বাড়বে তত শরীরের রসে রক্তবহ স্রোতগুলি তাদের গতি কমিয়ে দেবে। ক্রমে ক্রমে সেই সব স্রোতগুলির প্রবাহ রুদ্ধ হতে থাকবে তখন শরীরের অন্যান্য ধাতুগুলি আর

পুষ্ট হবে না। মেদ বাড়তে থাকবে। মেদ থেকে অবসাদ, দেহশক্তির স্তব্ধতা, মৈথুনশক্তির অল্পতা এইগুলি এসে সব জোটে। আমাদের দেহে মেদটা জমে উদরে আর সূক্ষ্ম অস্থিতে। জমতে জমতে উদর ভারী হতে থাকে।

আমার মেদস্বী দশার নিয়ন্ত্রণে ভৈরবী মা পথ্যের দিকে জোর দিতে বললেন। নতুন চালের ভাত খাওয়া আমি একেবারে বন্ধ করে দিলাম। সেই সঙ্গে পশুপাখির মাংস মা বন্ধ করতে বললেন ছ-মাস। মুসুর ছেড়ে অড়হর, ছোলার ডাল খেতে লাগলাম। শাকসবজি বাড়িয়ে দিলাম। সর্ষের তেল বন্ধ করে ঘানি থেকে ভাঙিয়ে আনলাম তিলের তেল। সজনে, পটল, ডুমুর, মোচা, কচুর লতি— এসবের নিরামিষ রান্না খেতে লাগলাম আর ব্রহ্মানন্দ বাবার দেওয়া সবশেষ মোক্ষম দাওয়াইটা পালন করতে থাকলাম ছ-মাস। ধরে এল মেদ। শরীরে উঠল প্রচুর উদ্দীপনা ও প্রাণশক্তি।

বাবা বললেন, দশমী থেকে অমাবস্যা ও পূর্ণিমা পর্যন্ত মাসে দু-বার শরীরে রস বাড়ে। তান্ত্রিকেরা এ সময় শরীরের রস শুকায়। এ সময়টায় শরীরকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। শুক্লপক্ষ ও কৃষ্ণপক্ষের ছয় ছয় করে মোট বারো দিন। শরীরের রস কমলে স্থির হবে মন। যাবতীয় চাঞ্চল্যও ধরে আসবে। তিনি আমাকে দিলেন এবার ওঁর জিম্বায় থাকা গুরু পরম্পরাতে প্রাপ্ত তন্ত্রের একখানি প্রাচীন পুঁথি।

আমি দেখলাম হোরাতন্ত্রের ভেতর রয়েছে উদ্ভিদ বিদ্যার দীর্ঘ ১০৮টি অধ্যায়— আচারপদ্ধতি। ওর ভিতর পেলাম শব্দতন্ত্র। শব্দের ব্যাপক অর্থ জেনে যদি তার প্রকাশ করা যায় জোরে জোরে উচ্চারণ করে নাদব্রহ্মের দ্বারে তবে এরও এক কার্যকরী দিক আছে। বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, তৃণের যেমন কার্যকরী দিকটা হল খেয়ে, বেঁটে লাগিয়ে ব্যাধি থেকে উদ্ধার তেমনই শব্দতন্ত্র দিয়ে প্রত্যক্ষ ফল আসতে পারে— এও এক তান্ত্রিক চিকিৎসা পদ্ধতি। চরক সংহিতা, সুশ্রুত সংহিতা প্রাচীন আয়ুর্বেদের বিধান। এও আমি

জানতাম। নাড়াচাড়াও করেছি। কিন্তু ভৈরবী এবার দিলেন আরও এক মহার্ঘ পুথি বাগভট্ট সংহিতা। ওঁর কাছেই পেলাম জ্যোতিষ সংক্রান্ত আরও দুটি প্রাচীন শাস্ত্র — বৃহৎ সংহিতা ও বরাহমিহির সংহিতা।

রাতে রেড়ির তেলে জ্বলা প্রদীপের আলোয় খুলতে থাকলাম হোরাতন্ত্রের পাতা। দেখি লেখা ওতেই,

শ্রম চিন্তা ব্যবায়াধব ক্ষৌদ্র জাগরণ ক্রিয়ঃ

হন্ত্যবশ্যমতিস্থৌল্যং যব— শ্যামক-ভোজনঃ

অস্বপ্নং চ বাবায়ং চ ব্যয়ামং চিন্তননি চ

স্থৌল্যমিচ্ছনপরিত্যজ্যং ক্রমৈণাতি প্রবর্দ্দয়েৎ

প্রাতঃ মধযুতং বারি সেবিতং স্থৌল্যনাশনমউষ্ণমন্নস্য মণ্ডংবা পিবনকৃশতনুর্ভবেৎ

আমি বাংলা অনুবাদ করতে থাকলাম, পরিশ্রম, চিন্তা, মৈথুন, ঘোরাঘুরি, রোজ রোজ কিছু কিছু মধু খাওয়া (ব্রহ্মানন্দ বাবার বলা রসস্থ খাদ্য) আর রাত জাগা— এগুলো সব মেদ বাড়িয়ে তোলে। যবের পালো, শ্যামা চালের ভাত খেলে মেদ ঝরে। ভাতের গরম মাড় খাওয়ার অভ্যাস করলে মেদ কমে যায়।

কীভাবে যাবে গুপ্তচন্দ্রগ্রামে

'তোমার দেহ সচল, মন সচল। তুমি কিন্তু বাবা, ঘুমিয়েই আছো। নিজের ভিতরে চিন্ময় প্রকাশ না হলে জেগে থাকা আর ঘুমিয়ে থাকা দুটোই সমান কথা। বারো আনা মন রয়েছে জাগতিক দিকে। চার আনা মন নিয়ে কীভাবে যাবে গুপ্তচন্দ্রগ্রামে? জাগতিক জায়গায় যেতে শারীরিক উপস্থিতি লাগে। পারমার্থিক জায়গায় যেতে চাইছ, তা কী আর এতদিনকার ইন্দ্রিয় ভরা ঘুমন্ত শরীরটা দিয়ে সম্ভব? ইন্দ্রিয় না সরলে ওই সাধের শরীরখানার কুম্ভকর্ণ - ঘুম কাটবে না। সাধুসঙ্গে আসা-যাওয়া করো। তত্ত্বকথা শুনতে থাকো। শুনতে শুনতে একসময় দেখবা চিন্ময় প্রকাশ নিয়ে ভেতরের মানুষটা কথা কইছে। শরীরে ঘুমিয়ে থাকা কুলকুণ্ডলিনী জেগে গেছে। মন থেকে আত্মায় আসতে হবে যে, আত্মায় এলে আত্মতত্ত্ব জানতে পারবে। নিজের ভেতর মূলাধারে ঘুমিয়ে রয়েছে শক্তি। যেদিন আত্মতত্ত্বের সাক্ষাৎ পাবা, শক্তি নিয়ে আত্মজ্ঞানে দাঁড়ায়ে যাবা। এখন যা আছে, পুথিবিদ্যা। ঘুমিয়ে থাকা অচিৎ কুণ্ডলিনী নিয়ে ঘোরাফেরা করছ খালি। যখন অচিৎ গিয়ে চিৎশক্তি জাগবে, চিন্ময় প্রকাশখানা ফুটে উঠবে। তুমি তখন গুপ্তচন্দ্রগ্রামে পৌঁছেও যাবা। এখন রাস্তায় আছো গো। পায়ে ধুলো, মনে উপভোগ— বাসনার সঞ্চার, সঞ্চারিত বোধ মনের। অচিৎ জগতে রয়েছ যে। গুপ্তচন্দ্রগ্রামে যাওয়ার ঠিকানা তাই তো পাচ্ছ না।'

নাড়া খেয়েছিলাম বৈরাগিনীর বলা এইসব কবেবার কথায়। অথচ গুপ্তচন্দ্রগ্রামের রাস্তাটা আজও তো খুঁজে পাইনি। হাঁটা কিন্তু থামাইনি। হাঁটছি। হাঁটতে হাঁটতে বৈরাগিনীর বলা সেই চার আনা পারমার্থিক মন ছয় আনা যে হয়েছে এটা এখন বেশ ধরতে পারি। তবে চিন্ময় প্রকাশ হতে বেশ

দেরি। আমারও কোনও তাড়া নেই। এ রাস্তায় কচ্ছপের গতিতে চলতে হয়। তবেই জয়লাভ করা যায়। খরগোশের গতিতে পৌঁছলে মহাজনেরা বলবেন শেষে, 'অকাল কুষ্মাণ্ড'। কুষ্মাণ্ড হল গিয়ে কুমড়ো। সাধু-বোরেগীরা পথ্যাপথ্য মানেন - টানেন খুব। ঋতু, কাল, দেশ এবং বয়স অনুসারে খাবার-দাবার খান। আমার মনে পড়ে লালন ফকিরের দেশ কুষ্টিয়ার সাধু-ফকির লবান শাহের কথা। তিনি বলতেন, 'খাদ্য থেকে রসনা নয় খালি, খাদ্যের প্রকৃতিটা দরকার সাধকদের শরীরে। খাদ্য হল দেহের ওষুধ। সাধুরা কেবলমাত্র দেহকে সন্তুষ্ট রাখতেই খাবার খান। রুচির জন্য খাবার খান না। সাধুরা তাই সব সময় খেয়াল রাখেন খাবার যেন দেহকে বিরক্ত না করে। খাদ্য হল সাধুর সেবা। পরম ভক্তি নিয়ে সাধুরা সব সেবা গ্রহণ করেন আখড়ায়।'

সাধুদের আছে পথ্যজ্ঞান। পথ্য সম্বন্ধে গ্রহণ বর্জনের ক্ষেত্রে জানবার আছে। কারণ সাধারণ পথ্য বিপরীত কাজ করে। জানতে হবে খেতে বসে পাতের খাবার যেন সংযোগ বিরুদ্ধ না হয়, আবার কাল বিরুদ্ধও না হয়ে ওঠে। যেমন কুষ্মাণ্ড— কুমড়ো ভালো বটে, কিন্তু অকালে যেগুলো হয় সেগুলো খেলে অসুখ করে। সাধুগুরুরা বলেন, 'দুধ ভালো জিনিস, কিন্তু রাতে দুধ খাওয়া ভালো নয়। দইও শরীরের পক্ষে ভালো, কিন্তু শরৎ ও বসন্তকালে দই, ঘোল উপকার করে না। ওল উপকারী, কিন্তু অর্শ আছে যাদের— চুলকানির প্রবণতা তাদের ওল না খাওয়া ভালো। ঢ্যাঁড়স ভালো সবজি, কিন্তু শরীরে বাতজ বেদনা থাকলে ক্ষতি করবে।' সাধুরা এইসব বিবেচনা করে খাবার - দাবার গ্রহণ করেন। সাধুরা বলেন, 'হিতং মিতং যথাকালে চ ভুঞ্জীত।' অর্থাৎ, পথ্য খেতে হলে হিতকর দ্রব্য, পরিমিত মাত্রায় এবং যথাকালে খেতে হবে। চৈত্রে বুড়ো সিম, মাঘের বাতি মূলো, শেষ গরমের পাকা ঢ্যাঁড়স শরীরের ক্ষতি করে। সাধুগুরুদের কথা, 'জায়গা

অনুযায়ী খাদ্য গ্রহণ করতে হবে। যে সাধু যে দেশে জন্মগ্রহণ করেন তাঁর আহার্য ও পথ্য সেই দেশেই জন্ম হতে হবে। দেহ থাকে মাতৃগর্ভে, সে মায়ের অভ্যাসগত খাদ্য পানীয়ের রসযুক্ত হয়ে বাড়তে থাকে। এই হল গিয়ে দেহসাত্ম্যরসযোগ। যে অঞ্চলের মাটিতে দেহ জন্মায় সেখানকার যে খাদ্য ও পানীয় তা নিয়ে বর্ধিত হয়। সব খাদ্য পানীয় সমস্ত দেহের কখনো উপযোগী হতে পারে না।''

বাউল-বোরেগীদের আশ্রম কুটিরে এমন সব কথাবার্তা শুনে এসেছি খাদ্যাখাদ্য নিয়ে। একবার সেবাতে বসেছিলাম লবান শাহের শিষ্য ফকির নহির শাহের সঙ্গে। সেবা নিতে বসে তিনি বললেন আমায়, 'সাধুগুরু যখন সেবা নেন, সেবার সময় তিনি এর উৎপাদকের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেন।'' বললাম, 'এটা করা হয় কেন?' বললেন, 'বুঝলেন না? পৃথিবীর খাদ্যচক্রে আমরা সক্কলে তো একে অন্যের খাবার। এ কথাটা যখন ধরতে পারবেন তখন আর খাদ্যের জন্য রসনাই তৈরি হবে না আপনার মনে। খাদ্য হয়ে উঠবে সেবা। আমার গুরুর ইচ্ছে ছিল আখড়ার সেবাতে সমতা আনার। কুষ্টিয়ার ফকিরেরা মাছ খান। লালন সাঁইজি মাছ খেতেন। কিন্তু আমাদের সাধুসঙ্গে এখন বৈষ্ণবীয় ধারার সাধুরা আসেন, তাঁদের অনেকেই মাছ খান না বলে সেবা নেবার সময় একটা বিড়ম্বনা গড়ে ওঠে। সব দিক ভেবে তাই আমাদের সাধুসেবা থেকে লবান শাহ ফকির মাছ পদ উঠিয়ে দিয়েছিলেন। সাধনা হল উজানে চলার। সেথায় শরীরে হরেক খাদ্যদ্রব্য পুরে যদি শরীর বোঝা হয়ে পড়ে তাহলে জানবেন সাধুগুরুদের সব বৃথা গেল। ফকিরি হল গিয়ে দেহরসের কারবার। দেহরসকে কখনো নিম্নগামী করেন না ফকির। সেজন্যই উজানের সাধনায় লালন ঘরের সাধুরা সাধারণত মাছ খান। মাছ খেলে মাছের প্রকৃতি শরীরে ঢোকে।'

ধর্মকাজ সম্পূর্ণ অন্য জিনিস। এখানকার বিদ্যা অবিদ্যার গড়নগুলো বেশ আলাদা। বইতে পড়া জ্ঞান নিয়ে সাধুগুরুদের কাছে গিয়ে বেশি ফরফরালে গুরু মহাজনেরা বলেন, 'অকাল কুষ্মাণ্ড'। অর্থাৎ নিদ্রিত কুণ্ডলিনী নিয়ে আত্মতত্ত্ব, শক্তিতত্ত্ব ধরতে এসেছে। অকালে হওয়া কুমড়ো যেমন দেহের পক্ষে ভালো নয় তেমনই ঘুমন্ত দেহ নিয়ে জড় বিদ্যার বকবকানি দিলে শুদ্ধ জ্ঞান জাগে না। শুদ্ধ জ্ঞান না এলে বৈরাগিণীর বলা সেই চিন্ময় প্রকাশের দেখা পাওয়াটা শক্ত হয়ে পড়ে। বৈরাগিণী আমাকে সেই কবেই তো রাধাকৃষ্ণের রহস্যাবৃত উপাসনার পদ্ধতিগুলো বুঝিয়ে বলেছিলেন। বৈরাগিণীর সঙ্গে সেবার গিয়েছিলাম অজয়ের দক্ষিণ তট। অজয় নদ ও কুনুর নদীর সঙ্গমস্থল কুনুর গ্রামখানির পুরোনো নাম ছিল উজানি। গোঁসাই ঠাকুর বললেন, 'উজানি মহাপীঠ'। আমার মনে পড়ল মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গলে' তো এই নগরের কথা পড়েছিলাম বাংলা নিয়ে এম. এ পড়ার সময়, 'উজানি নগর অতি মনোহর বিক্রম কেশরী রাজা। করে শিবপূজা উজানির রাজা কৃপা কৈল দশভুজা।' এই গ্রাম নিয়েই তো গড়ে উঠেছিল কবিকঙ্কন মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল'।এই গ্রামেই ছিল শ্রীমন্ত সদাগরের বাড়ি। অজয়ের কাছেই ভ্রমরার দহ। দহ ধরে সমুদ্রগামী বাণিজ্যপোতগুলো তখন যেত। ধনপতি ও শ্রীমন্ত সদাগর ভ্রমরা দহ থেকেই বাণিজ্য যাত্রা শুরু করেন, 'প্রথমে ভ্রমরা জলে শ্রীমন্ত নৌকায় চলে, পূজিয়া মঙ্গল চণ্ডিকায়। এড়ায় ভ্রমরা পানি সম্মুখেতে উজানি নিজ গ্রাম এড়াইয়া যায়।' বৈরাগিণী বললেন আমায়, 'সতীর কুনুই পড়েছিল দহে। দহ বদলে হয় নদী। লোকমুখে কুনুই বদলে গেল দহ বদলাতে গিয়ে। হল কুনুর।' বৈরাগিনীকে বললাম, 'তন্ত্রচূড়ামণির ভেতর এই পীঠের উল্লেখ আছে। শিবচরিতের মধ্যেও উজানি হল গিয়ে মহাপীঠ।' গোঁসাই ঠাকুর বললেন, 'উজানিতে কফোনী মঙ্গলচণ্ডী দেবী, ভৈরব কপিলেশ্বর শুভ যাঁরে সেবি।' বললাম, 'এ যে পীঠমালার কথা।'

অজয়ে স্নান করলাম আমরা। হাঁটুজল। দেহ ডোবে না আমার। বৈরাগিণী বললেন, 'শুয়ে পড়ো। গোটা দেহ ডুবে যাক। শাস্ত্রে আছে গো অজয়ে স্নান সারলে অজেয় হওয়া যাবে।' গোঁসাই ঠাকুর বললেন, 'অজয়ের এ ধারেই স্নান করতেন লোচন দাস ঠাকুর। চলো, ভেজা শরীরে বৈষ্ণব আচার্যের সমাধি প্রণাম করব আমরা। তিনি ছিলেন অজেয়। অজেয় হল ইন্দ্রিয়াদির দমন গো, বাবা। সাধনা না করে স্নান সারলে অজেয় হওয়া যায় না।' আমরা এলাম লোচনের পাঠ। পাঠে ফুটে আছে হাসনুহানা। ফুল চড়ালাম 'চৈতন্যমঙ্গলের' কবি লোচনদাস কারিগরের সমাধিতে। মনে পড়ল আমার লোচনের পরিচয়, 'বৈদ্যকুলে জন্ম মোর কোগ্রাম নিবাস।' লোচনের নিবাসে বসে আছি আমরা। বৈরাগিণী ঝুলি খুলে বের করলেন শুকনো চিঁড়া আর গুড়। মালসায় ভরে গুড় চিঁড়া নিবেদন করলেন বৈষ্ণব আচার্যের স্মরণভোগে। অজয়ের জল তুলে মাখা হল চিঁড়া। গুড় জড়ানো মণ্ড তুলছি মুখে সেইসময় শুকনো খরখরে দুপুর ভরে উঠল বৈরাগিণীর সুমিষ্ট গলার গানে—

সংসারে পরমারাধ্য সেই সে একজনা
চিন্ময় সচ্ছিদানন্দ তারে কেউ চেনে কেউ চেনে না
পদ নাই গমনে দক্ষ
মুখ নাই বলে বাক্য
সে বিরুপাক্ষ, চক্ষু নাই সে করে লক্ষ
অলক্ষ্য তার নিশানা
বৈষ্ণবে কয় বিষুহরি
শৈবে কয় শিব জটাধারী
শাক্তে শঙ্করী
ও যে পুরুষ কি নারী চিনতে নারি

যুক্তি শাস্ত্রে মেলে না
তার ধাম জানি না নামটি গুরু
তিনি বাঞ্ছাকল্পতরু অতি সুচারু
তারে না ভজে যে অন্যে ভজে
নীলকণ্ঠ বলে অকূলে কূল মেলে না

আমি বললাম, 'কণ্ঠ মশাইয়ের গান! উজানিতেই তো ওঁর জন্ম। রামকৃষ্ণ কথামৃতের ভিতর পড়েছি, ঠাকুর কথা কইছেন কণ্ঠ মশাইয়ের সঙ্গে। আধ্যাত্মিক প্রসঙ্গ। একখানি গান ধরতে বললেন এইবার। কণ্ঠ মশাই গান ধরেছেন সবে। হরির গুণগান। রামকৃষ্ণ ঠাকুরের সমাধি হয়ে গেল!'

লোচনের পাটের গায়েই কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের বাড়ি। পরে ফের উজানি গেলে সে বাড়িতে থাকার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার কবির নাতি সুধেন্দু মল্লিকের ব্যবস্থাপনায়। তাঁর মুখেই শুনলাম কুনুর গ্রাম পরে কবির নামে বদলে যাওয়ার কথা। কুমুদ গ্রাম। এই গ্রামটিতে এক সময় ছিল বৌদ্ধদের তান্ত্রিক ধর্মমতের আধিক্য। মঙ্গলচণ্ডী মায়ের মন্দিরে রয়েছে এখনও সেই স্মারক। দেখলাম ওখানেই বজ্রাসনে উপবিষ্ট বুদ্ধের মূর্তি। কুনুরের দক্ষিণ পাড়ে মঙ্গলকোট। বিনয় ঘোষের লেখা পড়তে গিয়ে পেয়েছিলাম, ওড্ডিয়ান মঙ্গলকোষ্ঠের অনুকরণেই জায়গায় নাম মঙ্গলকোট হয়েছিল। দেবীর নাম এজন্যই মঙ্গলচণ্ডী। অজয়ের নদীগর্ভ থেকে সংরক্ষিত হয়েছিল মায়ের শাঁখা ও কয়েকটি মুদ্রা। ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও দীনেশ সেন সেসব পরীক্ষা করে রায় দেন, এগুলো সব পাঁচশো বছরের পুরোনো। এর থেকেই প্রমাণিত যে মায়ের প্রাচীন মন্দির এক সময় অজয়ের মধ্যেই ঢুকে যায়। সুধেন্দুদা বললেন, 'ঠাকুরদাদার তৎপরতারতে পরে মায়ের মন্দির ও লোচন দাসের পাট পুনঃনির্মিত হয়।'

কুমুদরঞ্জনের লেখার ভিতরও এই পীঠস্থান, লোচনের পাঠ ও শ্রীমন্ত সদাগরের কাহিনিমালা ভেসে ওঠে। পৌষ সংক্রান্তিতে লোচনের পাটে মেলা বসে। এ সময়টায় বোরেগীদের ভিড় হয় খুব। আখড়া বসে। কৃষ্ণকথায় মুখর হয়ে ওঠে কুনুর গ্রাম। আমি পড়তে থাকি সুধেন্দু মল্লিকের সৌজন্যে পাওয়া কুমুদরঞ্জন মল্লিকের দিনলিপি। তিনি লিখছেন, '১৯৫৬ সালের বন্যায় মাটির মন্দির পড়ে যায়। আমাদের বাড়িও পড়ে যায়। ১৬ই ডিসেম্বর শ্রীশ্রীলোচনদাস ঠাকুরের সমাধি নূতন ভবনে আনা হইল। সংকীর্তনের সহিত। সর্বং শুভায়ভবতু। ১৭ই ডিসেম্বর— অদ্যমে সফলং জন্ম অদ্য মে সফলা ক্রিয়া। নারায়ণ - প্রসীদতু। শ্রীগৌরাঙ্গের বেদী ও শ্রীশ্রীলোচনদাস ঠাকুরের সমাধি।' আমি ভাবি, দিনলিপিখানা যদি একবার দেখাতে পারতাম বৈরাগিণীকে! বৈরাগিণীর সুবাদেই সে যাত্রায় শ্যামরূপা মায়ের দর্শন হয়েছিল আমার। যেতে যেতেই তিনি আমাকে বলছিলেন শ্রীকৃষ্ণের তিন শক্তির কথা, 'মহাভাবস্বরূপা হলেন রাধারানি। প্রেমের সারসংক্ষেপ ধরতে হবে ওই রাধারানির মূর্তিরূপে। ওঁরই তত্ত্বরূপ হলাদিনী। সচ্ছিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণের প্রথম শক্তি হলাদিনী। এই শক্তিসম্বন্ধে না এলে বৈষ্ণবীয় সাধনা এগোবে না। সাধনা এগোলেই সত্তাধারণ হয়। সত্তা যখন ধরা পড়ে সাধকের তখন ওটাই সন্ধিনীশক্তি সচ্ছিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণের। আর তৃতীয় শক্তি সম্বিৎ। আত্মজাগরণ না ঘটলে সাধকের সম্বিৎ তো আসবে না। সম্বিৎ হল জ্ঞানশক্তি। রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি সম্বন্ধে যদি সম্বিৎ না থাকে সাধকেরও— মূর্তি শুধু সেবা করে পূজক হওয়া যাবে। সাধক নয়। শিবশক্তি আর রাধাকৃষ্ণের তত্ত্ব যদি ধরতে না পারেন কোনও সাধক, তিনি ভেদজ্ঞানী। শ্যাম আর শ্যামাকে এক করে নিতে পারাটাই সাধনা।'

আমরা এখন শ্যামরূপায়। চারধারে অজস্র ভাঙাচোরা মন্দির। গড় জঙ্গলের পথ পেরিয়ে এসে হাজির হলাম শ্যামারূপার মন্দিরে। গোঁসাই ঠাকুর বললেন

আমায়, 'গুরু ভবানী পাঠক দেবীচৌধুরানীকে এই মন্দিরে বসেই সাধনভজন শিখিয়েছিলেন।' আমি মনে মনে ভাবলাম, বঙ্কিমচন্দ্রের লেখার ভিতর থাকা সেই কাপালিকের কথা। তান্ত্রিকী বৌদ্ধ ধর্মের ছায়া। বঙ্কিম লিখেছেন নরবলির কথা। বৈরাগিণী বললেন, 'জয়দেব এলেন শ্যামরূপা। তিনি পরম বৈষ্ণব।' শ্যামরূপার কাপালিক পুরোহিতকে বললেন, 'নরবলি বন্ধ করো ঠাকুর।' কাপালিক বললেন, 'নরবলি বন্ধ হলে গোঁসাই ঠাকুর মায়ের পুজোর বিঘ্ন ঘটবে যে।' জয়দেব বললেন, 'চলো ঠাকুর, মা যদি জাগ্রতা হন তিনি নিজেই বলে দেবেন এবার তিনি কী চান না চান।' তান্ত্রিক কাপালিক আর বৈষ্ণব সাধক জয়দেব এসে দাঁড়ালেন শ্যামরূপা মায়ের সামনে। মা যে শ্রীকৃষ্ণ— শ্যাম। সচ্ছিদানন্দের সন্ধিনী সত্তার সঙ্গে বৈষ্ণব সাধকের যোগ ছিল। শ্রীকৃষ্ণের সাধনা করতে করতেই তাঁর সন্ধিনীশক্তির সত্তাধারণ হল সে সময়। তা যদি না হত তোমার-আমার সামনেও তো শ্যামরূপা মা প্রকট হতেন। মূর্তির সত্তাধারণ তখনই সম্ভব যখন সচ্ছিদানন্দের শক্তির সঙ্গে একাত্মতা আসে সাধকের।' আমি চমকে উঠি বৈরাগিণীর বলা এই কথায়। আমার মন সরে যায় তখন মূর্তিতত্ত্বের প্রবল গভীরতায়। বৈরাগিনী বলতেই থাকেন, 'শ্যামরূপা মায়ের কাছে এসে দাঁড়ালেন তান্ত্রিক আর বৈষ্ণব। বৈষ্ণব বললেন, 'ওহে কাপালিক, জেনো আমার শ্যাম কথা শোনেন। তাঁকে ডাকলে শ্যামার ভিতরই শ্যাম প্রকাশ হবেন। সচ্ছিদানন্দই যুগল হতে পারেন।' করজোড়ে জয়দেব মায়ের মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে আরাধ্যা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করতে থাকলেন এইবার। শ্রীকৃষ্ণের স্মরণ করতেই শ্যামা শ্যামে পরিবর্তিত হল। মা হয়ে গেলেন শ্যামরূপা। শ্যামা হয়েও শ্যামরূপে তিনি বৈষ্ণব ভক্ত জয়দেবকে দেখা দিলেন।'

বৈরাগিণীর কথা থেকে আমি বেরিয়ে গেছি। ভাবছি তখন একমাত্র মনেরই তো অসাধ্য সাধন করার ক্ষমতা থাকে। মনের শক্তি দিয়ে কী না

সম্ভব। মনেই মায়া। মনই আসলে সাধকের আরাধ্য ঈশ্বরের রূপকে দেখাতে পারেন। যে সাধক শিবের ধ্যান করেন অহরহ তিনি দিব্যানুভূতির ভিতর শিবকেই তো দেখতে পাবেন। একইভাবে সাধকদের কালী দর্শন, শ্রীকৃষ্ণ দর্শন। এমন দর্শনের কথা আজও তো মহাত্মাদের ক্ষেত্রে শোনা যায়। কেউ কালী পান, কেউ শিব। সাধকদের ওইসব দর্শন-স্পর্শন-শ্রবণে বৈরাগিণীর সহজ করে বলা ওই সচ্ছিদানন্দের ত্রিশক্তিরই আধার পেরোতে পারা একটা বোধ থাকে। দিব্যানুভূতির ভিতর থাকে ব্রহ্মবিদ্যা। তা সম্বিৎ চেতনা এনে দেয়। চেতনা এলেই মূর্তি দর্শন হয়। তবে মূর্তি দর্শন একটা সাধারণ স্তরের সাধনা। এর ওপরে উঠতে পারলেই চৈতন্যের শিখরে চলে যাওয়া যায়। একবার এক দেহসাধককে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'কী অবস্থায় আছেন এখন?' তিনি নির্বিকার উত্তর দিলেন আমায়, 'কোনও অবস্থাই তো নাই। বায়ুর ঘর, বায়ুর বাড়ি, বায়ু নিয়ে নাড়িচাড়ি। দিন কেটে যায় তো আমার।' শুনে আমি তো তখন চমক খেলাম। পরে ভাবলাম, বায়ুকেই তো সম্বর্গ বলছে উপনিষদ। আগুন যখন জ্বলছে তখন বায়ুকেই মিশে যাচ্ছে। সূর্য ডুব দিয়ে বায়ুর স্তরে গিয়ে ঢুকছে। চন্দ্রের অবস্থাটাও এক। বায়ু হচ্ছে মূল সঞ্চালনশক্তি। উপনিষদ তো এই কথা বলেছে, 'বায়ুর্বাব সম্বর্গো।'' সূর্যের তাপ বায়ুতে মিশছে, জল শুকিয়ে গিয়ে বায়ুতে মিশছে। বায়ুই সবকিছু আত্মস্বাৎ করছে তো, 'বায়ু র্হি এব এতামসর্বানসংবৃঙক্তে।' ভাবলাম দেহসাধক তো সঠিক পথেই আছেন। বায়ুকেই প্রতিষ্ঠা করেছেন দেহের মধ্যেই। বায়ু দিয়েই সম্বর্গ দর্শন করা যায়। আবার 'ছান্দোগ্যের' ভিতরই আছে প্রাণও সম্বর্গ। আমরা যখন ঘুমিয়ে পড়ি সব কথাবার্তা প্রাণে মিশে থাকে। চোখ প্রাণে গিয়ে আটকে থাকে। সমস্ত ইন্দ্রিয় তখন প্রাণে মিশে আছে। 'ছান্দোগ্য উপনিষদ' বলছে, সাধককে দুটো তত্ত্বই জানতে হয়। বায়ুতত্ত্ব আর প্রাণতত্ত্ব। এই দিয়ে দেবতা তথা মূর্তিকে ধরা যায়। বৈরাগিণী

তো এতক্ষণ ধরে ছান্দোগ্যের এই সহজ কথাটাই আমাকে বোঝালেন। তিনি এসব পড়েননি। কিন্তু গুরুমুখে দেবতার তত্ত্ব, মূর্তিতত্ত্ব সব শুনে শুনে সাধন করেই তো তাঁরও এই উপলব্ধি এসেছে। আমি মনে মনে শেষমেষ উচ্চারণ করলাম ছান্দোগ্যের শ্লোক, 'তৌ বা এতৌ দ্বৌ সম্বর্গৌ। বায়ুরেব দেবেষু প্রাণঃ প্রাণেষু।' বৈরাগিণী শুনতে পেলেন না। তিনি তো প্রজ্ঞার ডাক শুনেছেন। আমার মতো পড়াশোনা করা জ্ঞানের তাঁর দরকার নেই।

বৈরাগিণী বললেন, 'চৈতন্য চরিতামৃতটা শুধু তো আর চরিতগ্রন্থ নয়।' মোদীয় গুরুদেব বলতেন, 'বৈষ্ণবীয় বেদ। ওতে অনেক সাধনশিক্ষা লেখা আছে।' লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে সাধককে দু-ধরনের সাধনা করতেই তো হয়। বাহ্য আর অন্তর সাধনা। চৈতন্য চরিতামৃত বলছেন, 'বাহ্য অন্তর ইহাই দুইত সাধন।' বাহ্য সাধনা করতে হবে শরীরের ভেতরকার পদ্ম ও সরোবর দিয়ে।' আমি নিজেকে এক জায়গায় এনে তখন বসি শ্যামরূপার চাতালে। গোঁসাই ঠাকুর পদ্মের বর্ণনা দিতে থাকলেন আমার কৌতূহল নিরসনে। বললেন, 'সহস্রদল হয় মস্তক ভিতরে। অক্ষয় নামেতে তথা আছে সরোবরে।।' বৈরাগিণী বললেন, 'নামেতে কী আসে যায়। ছানার মিষ্টি যে নামেই ডাকো তারে খেলে পর ছানাই পেটে যাবে। শ্রীকৃষ্ণ মূল। তাঁর জন্য বাহ্য সাধনে শরীরের সমস্ত অংশটুকু জাগাতে হবে। সাধনায় শরীর মূলবস্তু। গোটা শরীরের ভিতরই সরোবর আছে। সবখানে পদ্ম ভরা। মূলবস্তু শ্রীকৃষ্ণকে জানতে গুরু-গোঁসাইরাই সবাই বলবেন, 'আগে তুমি শরীরবস্তু জানো।' শরীরবস্তু! ধাক্কা খাই বৈরাগিণীর সুচারু কথায়। কতটুকুই বা বিদ্যাশিক্ষা করছেন তিনি! বুঝি পারমার্থিক অর্জনের বিদ্যাবস্তু জাগ্রত কুণ্ডলিনী থেকেই আসে। বৈরাগিণী বলেন, 'মাথা হল জ্ঞানরাজ্য। মস্তিকেই সহস্রার। এই পদ্মের সহস্রদল। প্রতিটি পাপড়ি খুলতে পারলে এখানে অক্ষয় আনন্দ টলটল করবে। এই হল গিয়ে মহাজনের অক্ষয় সরোবর। নাভিতে

মণিপুর চক্র। উদর চক্র বৈষ্ণবের। উদর থেকে সাধনা শুরু। উদরে বাতাস ভরে ঊর্ধ্বমুখীন করতে হয়। এটাই শুরুয়াত। উদরে শ্রীকৃষ্ণের হলাদিনীশক্তি লুকিয়ে থাকে। এরই মান ভাঙাতে পারলে পদ্ম ফুটবে। পদ্ম হল জ্ঞান। শক্তিজ্ঞান, আত্মজ্ঞান পদ্মের নামান্তর। অবিদ্যা— পুঁথি পড়ার অহং মুছে উদরে পদ্মের বিকাশের দিকে লক্ষ্য করাটা সাধনা। এখানে রয়েছে মহাজনদের মান সরোবর। যখন পুঁথিপড়া জ্ঞান সরল, অশুদ্ধ জ্ঞান ভেদ হয়ে শুদ্ধ জ্ঞান জেগে গেল। এখানে একশো পদ্মের পাপড়ি। মহাজনেরা বলছেন এখানে ক্ষীরোদ সরোবর রয়েছে। তার ওপর পৃথু। পৃথুর আরও উপরে আরেক সরোবরের নাম করেননি মহাজনেরা। ওকে গুরু গোঁসাইরা বলেন ঘোর সরোবর।' গোঁসাই ঠাকুর বললেন এবার, 'অষ্টদল পদ্মের পরাৎপর বস্তু হয়। ঘোর অন্ধ সরোবরে ঊরুপদ্ম উপজয়।।'

বৈষ্ণবীয় দেহতত্ত্বের হেঁয়ালি ধরতে আমার অসুবিধা হল না এবার। মন গিয়ে দাঁড়াল এম.এ ক্লাসে পড়া চণ্ডীদাসের একখানি রাগাত্মিকা পদের ওপর। চণ্ডীদাস বলেছেন নাভিতে নীচে দশদল পদ্মের ভিতরই কুলকুণ্ডলিনীশক্তি ঘুমিয়ে থাকে আর নাভির ঠিক নীচে আটদলের পদ্ম। একে তিনি বলছেন প্রেম সরোবর। নাকের ফুটোতে দ্বিদল পদ্মের কথা বলছেন তিনি। ওটা তান্ত্রিকী আজ্ঞা। বৈষ্ণবীয় খঞ্জনাক্ষি চক্র। বৈষ্ণবীয় দেহসাধনায় সাতখানি পদ্ম সরোবর পার হওয়ার কথা শুনেছিলাম একবার সদানন্দ গোঁসাইয়ের আখড়ায়। তিনি বলেছিলেন মাথাতে 'অক্ষয় সরোবর', তার একটু নীচে অর্থাৎ তান্ত্রিকী আজ্ঞা চক্রের তলায় যেটা বিশুদ্ধ নামে অভিহিত তাঁকে বলেছেন 'কণ্ঠ সরোবর'। তান্ত্রিকেরা বিশুদ্ধ চক্রকে কণ্ঠ চক্রও বলেন। তার নীচে হৃদয়ে 'ক্ষীর সরোবর'। বৈরাগিণীর বলা সেই ক্ষীরোদ সরোবর। তার নীচে উদরে 'মান সরোবর'। সদানন্দ নাভিতে বলেছেন 'পৃথু সরোবরের' কথা। ঘোর সরোবর বললেন, 'নির্জন স্থান সাধনসঙ্গিনীর যোনি।' গোঁসাই

ঠাকুর অন্তর সাধনার প্রলেপ লাগিয়ে একেই তো বলেছেন, 'ঊরুপদ্ম'। সদানন্দ গোঁসাই থাকেন মাধবপুরের আখড়ায়। ঘোষপাড়া দোলমেলা থেকে ফেরার পথে সেবার গিয়েছিলাম ওঁর আখড়ায়। সান্ধ্য কথকতার আসরে তিনি বললেন, 'দেহের সরোবর হল ফাঁপর। ওর নাম কুণ্ড। কুণ্ড থেকেই কুণ্ডলিনী। কুণ্ডলিনী - কুণ্ডের ভেতরই কাম, প্রেম, সম্ভোগ, অমৃত সব থাকে। এসব পেরোতে পারলেই অকৈতব। এ হল অপ্রাকৃত দেহ। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা ধরতে এই দেহটাই লাগে গো।'

বৈরাগিণীর হেঁয়ালি ভরা কথা ধরে অনেক পরে বৈষ্ণব সহজিয়াদের পুঁথি-পাতরা পড়তে পড়তে আমি বুঝেছিলাম গুপ্তচন্দ্রগ্রাম আদতে ঊরুপদ্মের স্থানিক ভূগোল। এখানে গেলেই সদানন্দ গোঁসাইয়ের বলা সেই অকৈতব দেহ লাগে। মানে অপ্রাকৃত শরীর। প্রাকৃত শরীর বা কৈতবদেহে থাকে সম্ভোগ। অকৈতব নিত্যধাম—গুপ্তচন্দ্রগ্রাম—রাধাকৃষ্ণের লীলাস্থলী। দেহের মধ্যেই এই নিত্য বৃন্দাবন আছে। যেখানে গোচরীভূত ইন্দ্রিয়াদি আর নেই সাধকের। যেখানে বৈরাগিণীর বলা সেই সাধনার 'বাহ্য অন্তরও আর কাজ করে না সেভাবে। যেখানে ছয় দলের পদ্ম ফুটে থাকে অনুভূত সত্যে। পদ্মের মাঝখানে কৃষ্ণ আর শ্রীরাধিকা। আর ছয় দলে শুদ্ধ সত্তময় ও চিন্ময় রূপ প্রকাশিত হয়। বৈরাগিণী আমাকে কবেই তো সেই চিন্ময় প্রকাশের কথা বলেছিলেন। আমার অপার্থিব বিদ্যাশিক্ষা সেসময় সামান্য ছিল বলেই আমি তখন ধরতে পারিনি। এখন বুঝি চিন্ময় প্রকাশে আছে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দের ঊর্ধ্বে ওঠা সাধকদেহ এবং সেই দেহের ভিতরই জেগে থাকা প্রকৃতি। একেই বৈষ্ণব ঠাকুরেরা বলছেন, 'নিত্য বৃন্দাবন।' বৈষ্ণব সাধকের মহাভাবের কথা কৃষ্ণদাস কবিরাজ মশাই 'চৈতন্য চরিতামৃতের' ভেতর বলে গেছেন, 'মহাভাবরূপা রাধা ঠাকুরানী। সর্বগুণখনি কৃষ্ণকান্তা শিরোমনি।।' আখড়ার বৈষ্ণবরা মহাভাব ধারণ করতে বলছেন সাধন শরীরেই রাধা

ঠাকুরানীর মতোই। বৈরাগিণী বলেছিলেন শ্যামরূপায়, 'শরীরের সর্বোত্তম ভাবাবস্থার রূপটাই রাধারানি। এই ভাব নারী ও পুরুষ দুই শরীরেরই আসতে পারে। ভাব হল শক্তিতত্ত্ব।' সেদিন বুঝেছি ভাবাবস্থার ভিতর দিয়ে যেতে যেতেই গুপ্তচন্দ্রগ্রামের রাস্তাটা খুঁজে পাওয়া যাবে একমাত্র। এটাও একটা বৈষ্ণবীয় গুহ্য দেহসাধনার হেঁয়ালি। এই গ্রামে যাওয়া মানে শরীরের কেন্দ্রস্থলে চলে যাওয়া। নিত্য বৃন্দাবন বা নিত্য ব্রজধাম এভাবেই শরীরাভ্যন্তরস্থ সাধন উপলব্ধি হয়ে ওঠে। আখড়ায় ওঠাবসার অভিজ্ঞতা না থাকলে এর প্রকাশ চট করে ধরা যাবে না। শরীরে যখন চিন্ময় প্রকাশ আসে তখন পাঁচটি ইন্দ্রিয়ই বৈষ্ণবীয় রাগ বা রতির সাহায্য নিয়ে শ্রীকৃষ্ণের অনুশীলন করে।

ইন্দ্রিয়গোচর যে জগৎ আমাদের সেখানে সব বাহ্যরূপাদি ঢুকে থাকে। এজন্যই ধ্যান ও মনোনিবেশ। দুটোই মনকে একাগ্র করার বিষয়। বাহ্য বিষয় সরে গেলে পর এই অন্তর বিষয় আপনে ফুটে উঠবে। অন্তরে যাওয়ার রাস্তা মূলাধার। মূলাধারে আছে শব্দধারা। যখন আমরা মনকে একাগ্র করে নিতে ধ্যান করতে বসি তখনই যাবতীয় উৎপাত আসে। নানান চিন্তা, ইন্দ্রিয়ের কোলাহল এসে সব তখন জমা হয়। শব্দধারা উঠতে থাকে আর ধ্যান ভেঙে যায়। শব্দের খেলা একেবারে গিয়ে বন্ধ হবে সহস্রার চক্রে গিয়ে। ওখানে মনের ধারা শুরু। মনের ধারাতে গেলে রাধার অভিঘাত বোঝা যাবে। কিন্তু রাধার ধারার ভিতর আছে অপ্রাকৃত তত্ত্ব। প্রাকৃত তত্ত্ব হল গিয়ে কাম। একে দমন করতে না পারলে অপ্রাকৃত তত্ত্বের ভূমিতে যাওয়া চলে না। গুপ্তচন্দ্রগ্রামে যেতে কামের ধারাকে বদলাতে হবে। গোঁসাই ঠাকুর লোচনের পাটে এক অতীব সুন্দর কথকতা করলেন সেদিন এই নিয়ে। চিঁড়া প্রসাদ পেয়ে সবে বসেছি আমরা অজয়ের ধারে, বৈষ্ণব ঠাকুর বলতে বসলেন তখন সনাতন গোস্বামীর সাধন জীবনের কথা। বললেন, 'শরীরের

ধর্মখানাই তো উত্তেজনার। কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-হিংসা-খ্যাতি-যশের উত্তেজনাতে সবাইকার শরীর খালি ফুটছে। এতে চাঞ্চল্য বেড়ে যাচ্ছে। বিষয় কামনা থেকেই শরীরের বীর্যবস্তু চঞ্চল হয়ে পড়ে। স্ত্রীলোকের যেমন প্রতি মাসে রস সঞ্চয় হয়, রজঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় সে মতো পুরুষ শরীরেরও ওই একই অবস্থা ঘটে। যাকে বৈষ্ণব মহাজনেরা বলেন, 'শুক্রবৃদ্ধি'। 'কৃষ্ণ ও শুক্ল পক্ষের দশমী - একাদশী তিথিতে শরীরের এই অবস্থা ঘটে বলে বৈষ্ণবীয় ব্রত, একাদশী পালন, দেহক্ষয় রোধের একটা মস্ত তরিকা প্রণালী জানা যায়। ক্ষয় চলে অমাবস্যা পূর্ণিমা পর্যন্ত। দশমী তিথি থেকে শুক্ল ও কৃষ্ণ পক্ষ পর্যন্ত মাসে দুবার নির্দিষ্ট এই ক-দিন বৈষ্ণব মহাজনেরা অল্পাহারে থাকেন শরীরের রস শুকিয়ে ফেলার জন্য। এভাবে রস শুকোতে শুকোতে বাৎসরিক চেষ্টাতে অনেকখানি বীর্যবস্তু স্থির হয়ে পড়ে। কিন্তু কাম তো পুরোটাই যায় না শরীর থেকে। সাধন অনভ্যাসে ফের ঘুরে আসে বীর্যচাঞ্চল্য। প্রসিদ্ধ মহাজন সনাতন প্রভুর চৈতন্যদেবের কাছ থেকে দীক্ষাশিক্ষা নেওয়ার পরও ওই অবস্থার ভিতর পড়েছিলেন। বৃন্দাবনে তখন সাধনভজনে রত সনাতন প্রভু। শুক্রপাত বন্ধ হচ্ছে না দেখে তিনি গেলেন যমুনায় আত্মহত্যা করতে। গিয়ে দেখলেন এক স্ত্রীলোক জলে ভরা একটা কলসি নিয়ে সেখানে হাজির হয়েছেন। তিনি ভরা কলসির ভিতর একখানি পাত্র দিয়ে সমানে যমুনার পারে বসে বসে জল ঢেলেই চলেছেন। আর কলসি উপচে উদ্বৃত্ত জল পড়ে পড়ে যাচ্ছে। স্ত্রীলোকটি সমানে চিৎকার করে করে বলে চলেছেন, 'হায় হায়, জল পড়া তো বন্ধই হচ্ছে যা গো। কেন এমন হচ্ছে!' সনাতন প্রভু এত সাধনভজন করে, গুরুর সংসর্গে থেকে, সাধন গ্রন্থাদি লিখে, সর্বক্ষণ ভজনবৃত্তে ঘোরাফেরা করেও শরীরে শুক্রচাঞ্চল্যের কারণে বিষণ্ন মনে যমুনাতে ডুবে মরতে এসে এই দৃশ্য দেখে হেসে ফেললেন। তিনি স্ত্রীলোকটিকে গিয়ে বললেন, 'মা, তুমি উপর থেকে জল ঢালছ, সে জল

কলসিতে না ধরলে পড়ে তো যাবেই। এতে এত আক্ষেপের কী আছে?' স্ত্রীলোকটি তখন সনাতন প্রভুকে বললেন, 'তুমিও তো সাধু, প্রতিদিন রোজ উত্তেজক খাবার-দাবার খেয়ে শরীরকে খাদ্যবস্তুর রসে একেবারে পরিপূর্ণ করে রেখেছ আর এখন সেই রস শুক্রবৃদ্ধি করছে দেখে এসেছ মরতে? অধিক রস শরীরে প্রবেশ করলে তো তা পড়ে যাবেই! তুমি কী আমার থেকে নির্বোধ নও?' এই বলে স্ত্রীমূর্তি অন্তর্হিতা হলেন। গোস্বামী প্রভু ভজনকুঠীতে ফিরে এসে এর পর বীর্যাধিক্যের হদিশ পেয়ে শরীরের রস শুকোতে লাগলেন দশমী তিথি থেকে শুক্ল ও কৃষ্ণ পক্ষ পর্যন্ত। বলা হয়, 'স্বয়ং রাধারানি তাঁকে দর্শন দিয়ে শরীরশিক্ষা দিয়েছিলেন। সাধনায় তাই শরীরশিক্ষা প্রয়োজন।'

সদানন্দ গোঁসাই আরওই গূঢ় অভিধা দিয়েছিলেন আমায়, শরীরশিক্ষার। তিনি বলেছিলেন, 'বৃন্দাবন তো তিনখানা গো। শরীরে যেমন ত্রিদশা থাকে আমাদের— সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ তেমনই তিন দশাপ্রাপ্তির ভিতর ঢুকে থাকে বৈষ্ণবীয় শিক্ষার তিনখানা বৃন্দাবন। স্থূল বৃন্দাবন হল শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকার লীলা মাহাত্ম্যের জায়গাজমি। মানস বৃন্দাবন হল যখন সাধনদেহ সূক্ষ্ম দশাপ্রাপ্তির ভিতর ঢুকতে যাচ্ছে গুরু-গোঁসাইয়ের হাত ধরে। এরপরই নিত্য বৃন্দাবনে প্রবেশ করেন তিনি। নিত্য বৃন্দাবন হল সাধক থেকে সিদ্ধ হয়ে ওঠা দেহের স্বভাব। তিনি তখন দ্রষ্টাভাবে চলে এসেছেন যে। সবই দেখছেন গো। এই দেখার সঙ্গে স্থূলদেহটা আর যে জড়িয়ে নেই। তখন আছে কেবল আনন্দলিপ্ত একখানা প্রাণ। তাহাতেই স্থিতি। নিজের প্রকৃতি, মনের প্রকৃতি সব তখন এক। এমন দশাতে মোহ সংস্রব কেটে যায়। তখন মূর্তিতত্ত্ব নেই, দেহতত্ত্ব নেই। জগতের সমস্ত বস্তুর মধ্যে তখন স্বভাবের প্রকাশ। একেই বলে আত্মদর্শন। আত্মদর্শন না হলে নিত্য বৃন্দাবন বোঝা যায় না। মানস বৃন্দাবন আর স্থূল বৃন্দাবনেই কেবল রাধাকৃষ্ণের পরিক্রমাদি শেষ হয়ে যায়।'

বৈরাগিণী বললেন আমায়, 'যার যেমন ভাবনা তার তেমন লাভ। ভাবনা যদি তোমার দেহময় হয় খালি তাহলে ইন্দ্রিয়ের বাইরে যে জগৎ তার দেখা তো কোনওদিনই পাবা না। ভাবনা যদি যায় দেহ থেকে শরীরে, মনে, মনে আছে সাকার আবার মনেই নিরাকার। এ দুটো তত্ত্ব তোমাকে আগে ধরতে হবে। মনের সাকার হল আরাধ্যের রূপ। কুণ্ডলিনীর স্থিতির সঙ্গে রূপের সম্বন্ধ যে বাবা। তোমার কুণ্ডলিনীর অবস্থার উপর শ্রীভগবানের রূপারূপ নির্ভর করে খালি। রূপ থাকে দেহভাবনা পর্যন্ত। যখন দেহাত্মবোধ চলে গিয়ে শুদ্ধ মন আসে তখনই রাধারানির প্রকৃতি দর্শন হয়। প্রকৃতি থেকে সরতে পারলেই তখন সচ্ছিদানন্দ কৃষ্ণ বিগ্রহ। একসময় বিগ্রহ সরে তিনিই পরমাত্মা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েন।' গোঁসাই ঠাকুর বললেন, 'দেহের প্রকৃতিই হলাদিনীশক্তি বৈষ্ণবদের। তন্ত্রে তা আদ্যা। হলাদিনী রাধাত্বে উপনীত হন। কুণ্ডলিনীরূপা রাধাই শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য রস আস্বাদন করতে পারে। একেই বলে মাধুর্য ভজন। কথার মাধুর্য, দেহের মাধুর্য আর ভাবের মাধুর্য— ত্রিবিধ স্তর দিয়ে এগোতে হবে বাবা। তবেই গুপ্তচন্দ্রগ্রামে পৌঁছতে পারা যাবে। পিঙ্গলা হল চন্দ্র নাড়ি আর সুযুম্না হল গিয়ে বৈষ্ণবের রাধা নাড়ি। শরীরে সর্বাধিক খেলে দুই বায়ু। অপান আর প্রাণ বায়ু। শ্বাস নেওয়াটাই আমাদের প্রাণ বায়ুর কাজ। এতে কুণ্ডলিনী ঊর্ধ্বে উঠতে থাকে। আর শ্বাস ছাড়া হল গিয়ে অপান বায়ুর কাজ। এতে কুণ্ডলিনী নীচে নেমে যায়। মনখানা স্থূল জগতে কেবল ধাওয়া করে। শ্বাসের ধারার ভিতরই রাধা শব্দ আছে। ধারার উলটো রাধা। এভাবেই শ্বাস নেওয়া ও ছাড়ার যে স্বাভাবিক ক্রিয়া শরীরের তার মধ্যে আমাদের অজান্তেই রাধার ধারা বয়ে চলছে। ধা হচ্ছে অপান বায়ু — স্থূলতার বন্ধন আর রা হচ্ছে প্রাণ বায়ু— সূক্ষ্মতার প্রকাশ। রাধাতত্ত্ব ভেদ হলে পুরুষতত্ত্ব উঠে আসে। রাধা হল মহাপ্রকৃতি। শরীরের মহাপ্রকৃতি যখন দমশ্বাসে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে গিয়ে মিশছে তখনই স্থূলতার বন্ধন কেটে

সূক্ষ্মানুভূতির শরীরখানা জন্ম নিচ্ছে। এই হল শ্রীকৃষ্ণের জন্মবৃত্তান্ত দেহের ক্রিয়ায়। দেহকাজে শরীরের তিনটে নাড়ি গুরুত্বপূর্ণ। ইড়া, পিঙ্গলা আর সুষুম্না। সুষুম্না থাকে দেহের মধ্যধারায়। ইড়া-পিঙ্গলা জাগাই থাকে। এদের সমন্বয় দিয়ে সুষুম্নার শ্বাস জাগাতে হয়। দেহকাজে যখন নাড়ি জাগে তখন তো সব নাড়িগুলো আনন্দ পরায়ণ, নৃত্য করতে থাকে। দেহের মোট ৭২০০০ নাড়ির মধ্যে ১০০ নাড়ি সক্রিয়। এরা সব ইড়া-পিঙ্গলার খেলায় সুষুম্নার সক্রিয়তায় তখন নাচ করতে থাকে। শ্রীকৃষ্ণ শরীরে এই নাড়িরাই গোপী। দেহরূপী শ্রীকৃষ্ণ এইভাবে বিশ্বপ্রকৃতি গোপীদের আপ্যায়ন করে চলে। বৈষ্ণবীয় মতে পিঙ্গলা হল যমুনা। এই নাড়িকে চন্দ্র নাড়িও বলা হয়। গুপ্তচন্দ্রগ্রামে যাওয়ার পথে প্রধান দ্বারী পিঙ্গলারূপী চন্দ্র। পিঙ্গলা নাড়ির শ্বাস যখন দেহকাজে সক্রিয় হয় তখন সূক্ষ্ম পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ উজ্জীবিত হয়ে পড়ে। অন্য নাড়িগুলোর আভরণ উন্মোচিত করতে থাকে। দেহকাজে এই হল গিয়ে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক গোপীদের বস্ত্রহরণ। দেহ এভাবেই বৃন্দাবন হয়ে ওঠে। এটাই হল গিয়ে নিত্যানিত্যবোধ। এই বোধ নিজের ভিতর ফোটাতে পারলেই তুমি গুপ্তচন্দ্রগ্রামে চলে যাবে।'

আমার মনে পড়ল এবার সেই বৈষ্ণবী ঠাকুমার মুখ যাকে দেখেছিলাম শুরুর যৌবনে ঘোষপাড়া মেলায়। প্রথম গেছি আমি সেবার। বেশ রাতের দিকে বাউল আখড়াগুলো সব জমজমাট। এত মানুষের জমায়েতে তখন খুব অস্বস্তি হচ্ছিল। জিরোতে ফাঁকাতে এলাম। দেখলাম এক অতিবৃদ্ধা বৈষ্ণবী নিমগ্ন হয়ে বসে আছেন তাঁর ছোট্ট করে টাঙানো চাঁদোয়ার নীচে। গিয়ে বসলাম তাঁর একটু পাশে ঘাসজমির ওপর। তিনি টের পাননি। চোখ খোলা। ঘুমে যে ঢুলছেন না তা বেশ স্পষ্ট। সম্বিৎ ভাঙলে বললেন, 'ভাই এইখানটাতে বসো। একেবারে মাটিতে কেন? ঠাকুমার ছেঁড়া চাটাইটা আছে কী করতে? নাতি আমার মাটিতে বসবে তা কী হয়!' শতচ্ছিন্ন চাটাইটাতে

আমি বসলাম। বললেন, 'এখন আর ঘুম হয় না ভাই। তাই চেয়ে চেয়ে তাঁর অপেক্ষাতে থাকি। তবে তিনি সাত তাড়াতাড়ি না এলেই ভালো।' বললাম, 'না না। এত তাড়াতাড়ি মৃত্যু আপনাকে টানবে না। বলতে নেই, আপনার বয়স হলেও দেখে তো মনে হচ্ছে আপনি অসুস্থা নন।' বৈষ্ণবী ঠাকুমা বললেন, 'আমি তার কথা বলছি নে। বলছি ঘনশ্যামের কথা।' 'মানে!' — আমি একেবারে চমকে উঠলাম। বৈষ্ণবী বললেন, 'একটা কথা আছে ভাই, যতক্ষণ শ্বাস, তত সময়ই আশ। এই যে তিনি আসবেন। অপেক্ষা— এটাই তো জীবন। তিনি এলে, শ্যাম এলে তো আর আশা থাকবে না। আসাটুকুই শ্যাম রে ভাই। এইসব তুমি এখন বুঝবা না। তা ভাই তোমার সাথে কেউ নেই কেন? রাধা ছাড়া কৃষ্ণ কি মানায় ভাই? সেজন কোথায়?' বললাম, 'তার কোনও খোঁজ পাইনি ঠাকুমা।' বৃদ্ধা হাসলেন। বললেন, 'পাবা ভাই পাবা। তাড়া কিসের? প্রত্যেক কৃষ্ণের জন্য প্রত্যেক রাধা থাকে। গরু খোঁজা করে ফ্যালো। দেখবা পাবা একদিন। কৃষ্ণ ছাড়া সে থাকবে ক্যামনে শুনি?' 'ঠাকুমা, কৃষ্ণ কী?'— জিজ্ঞেস করলাম আমি। তিনি বললেন, 'কী আবার ভাই! কৃষ্ণ হল গিয়ে আসলে সুর। অপেক্ষার সুর। তাকেই শুনতে হয় ধরতে হয়, বুঝতে হয় দাদুভাই। বাঁশি কেন তাঁর হাতে?' বললাম, 'কেন ঠাকুমা?' ঠাকুমা মৃদু হাসলেন ফোকলা দাঁতে। বললেন, 'বাঁশিই তো সুর দাদু। বাঁশি বাজানো মানে আমাদের কামকে, ক্রোধকে, লোভকে, মোহকে, মাৎসর্যকে, মদমত্ততাকে বাজানো। এগুলিকে মন দিয়ে বাজাতে হবে দাদুভাই। তবেই না কৃষ্ণ বাজবে। বাঁশি বাজবে। বাঁশির সাতখান ফুটোর মানে হল ষড়রিপুকে মন দিয়ে বাজানো। আর বাজাতে পারলেই কৃষ্ণ মিলবে। তাকে বাজাবা ভাই। তাহলে মানুষের ঊর্ধে উঠবা। তোমার বাঁশিখান তোমাকেই তো বাজাতে হবে। তবেই না রাধা আসবে।' 'রাধা কী ঠাকুমা?' 'রাধা হল আগমন। অপেক্ষার শেষ। তার জন্যই তো কানাইয়ের পথ চেয়ে

বসে থাকা। এই তুমি যেমন আছো ভাই।' বললাম, 'ঠাকুমা আপনার আশ্রম কোথায়?' হাসলেন তিনি। বললেন, 'আশ্রম নেই ভাই। একখান বাড়ি আছে। পোড়া বাড়ি। তিনি চলে যাওয়ার পর বাড়িটা খালি বাজে। ষড়রিপু নিয়ে বাজে গো বাড়ি। বাড়ি ছেড়ে তাই ভাই পথে পথে ঘুরি। যাও যাও, খোঁজো তারে। আমি খুঁজি আমার ঘনশ্যামরে।' পার্শ্ববর্তী আখড়া থেকে তখন ভেসে আসছে বাউল গানের আওয়াজ। আমি শুনতে শুনতে এগোচ্ছি আর ঘুরে তাকিয়ে দেখছি, এ কী! বৈষ্ণবী ঠাকুমা বসে নেই যে সেখানে। তবে কোথায় গেলেন তিনি এই মধ্যরাতে? কৃষ্ণ খুঁজতে কি?

আমার খোঁজা তো এখনও শেষ হয়নি। সেখানেও বৈরাগিণীর আওয়াজ আসে, গোঁসাই ঠাকুর, সদানন্দ গোঁসাইয়ের কথকতা ভেসে আসে। বৈষ্ণবী ঠাকুমার এখন আর বেঁচে থাকার কথা নয়। তবু তাঁর ঘনশ্যামের কথা মনে পড়ে আর মনে পড়ে সেই রাতে নটবর দাস বাউলের গলাতে শোনা সেই কৃষ্ণকথার গান—

কোন কৃষ্ণ হয় জগৎপতি
মথুরার কৃষ্ণ নয় সে, সে-কৃষ্ণ হয় প্রকৃতি।
জীবদেহে শুক্ররূপে এ ব্রহ্মাণ্ড আছে ব্যেপে
কৃষ্ণ তারে কয় পুরুষ সেই হয় সেই রাধার গতি।
কৃষ্ণবস্তু নিগম ঘরে জীবদেহে বিরাজ করে
রসিকের করণ সে কৃষ্ণ ধারণ করণ গম্ভীর অতি।
আত্মতত্ত্ব জানে যে জন
কৃষ্ণ - সেতু চেনে সে জন।
লালন সাঁইর বাণী রসিক ধনী বলে দুদ্দুর প্রতি।

দেহচক্রে সাধুর বাজার

বাদল দাস বাবাজির সমাধির পাশে বসে ছিলেন বৈষ্ণবী। শান্ত নিশ্চুপ চোখের পাতা। মাঝ বয়সি। পরনে সাদা থান। গনুটিয়া আখড়ার পশ্চিম কোণে অনেকখানি ফাঁকা জমি। সেখানে রয়েছে বৈষ্ণব সাধকদের সমাধি। সবগুলো ঘুরে ঘুরে দেখে এসে বসলাম আখড়া লাগোয়া বাদল দাস বাবাজির সমাধিমঠে। মঠ থেকে বেরিয়ে গিয়েছে কয়েকখানা পদচিহ্ন। আমার নজর গিয়ে পড়ল সেখানে। আমি তাকিয়ে আছি। মাধুকরী থেকে ফেরা এক বাবাজি এলেন সমাধিমঠে প্রণাম করতে। প্রণাম সেরে আমাকে বললেন, 'কোথা থেকে আসা হচ্ছে?' আশ্চর্য শান্তি নিয়ে বসে আছেন বৈষ্ণবী। আমি বললাম, 'বীরচন্দ্রপুর থেকে আসছি।' বললেন, 'থাকা হয় কোথায়?' আমার উত্তর করার আগে বৈষ্ণবী বলে উঠলেন, 'থাকাথাকির কী আছে গো বাবা? তাঁর ডাক যে একবার শুনেছে, কী বা তার ঘরে থাকা কী তার পথে থাকা। এত বচ্ছর আখড়ায় আছো, সাধুসঙ্গ করছ, ঘরের কৌতূহল গেল না যে এখনও! ও রয়েছে ওর মতন। থাকতে দাও না গো বাবা, নিজের নিভৃতির মাঝে। অন্তরে থাকতে পারলে ঘর আর পথে পার্থক্য কিছু থাকে না গোঁসাই। যাও যাও, কৌতূহল ছেড়ে ভোগঘরের কাজে যাও।' বৈষ্ণবীর কথাতে সম্মোহিত হলাম। গোঁসাই বাবাজি চলে যাওয়ার পর তিনি বললেন, 'বীরচন্দ্রপুর হয়ে মহাপ্রভু এসেছিলেন গনুটিয়া আখড়ায়। এখানে ছিল এক প্রাচীন নিমের গাছ। তার তলে দু-দণ্ড বসেছিলেন তিনি সপার্ষদ। গাছতলাতে তখন ছিল গ্রামের দ্বিজকৃষ্ণ। ভাগবত প্রসঙ্গ ভালো লাগে তার। দিব্যকান্ত রূপ। নিমগ্ন ভাব দেখে মহাপ্রভু মুগ্ধ হলেন। তাকে কৃপা করলেন। কিছুদিনের ভিতরে স্বপ্নাদিষ্ট হল দ্বিজকৃষ্ণ। নিমগাছের তলাতে এসে ভোগ

লাগল মহাপ্রভুর নামে। দ্বিজকৃষ্ণের ভোগ গ্রহণ করেছিলেন তিনি সূক্ষ্মদেহী হয়ে। সেই থেকে এই জায়গাটার নাম হয়ে গেল ভোগপুর। আজ তুমি আখড়ায় ভোগের প্রসাদ পেয়ে তবে যেও।' আমি ঘাড় নাড়ি। বৈষ্ণবীর বলা কথার ভিতর ফের ঢুকে পড়ি। তিনি বলতে থাকেন, 'আখড়া হল বৈষ্ণব আচার্যদের ধর্মালোচনার জায়গা। এখানকার এক সংস্কৃতি আছে। প্রাচীন পুথি, মহাজনী পদ, আচার্যদের লেখা গ্রন্থাদি নিয়ে একসময় আখড়াগুলোতে আলোচনা বসত। পুরোনো বৈষ্ণবরা নিজেদের আবাসকেও আখড়াতে পরিণত করতেন রোজকার ধর্মকথার আসর বসাতে বসাতে। এখন সেসব আস্তে আস্তে উঠে যাচ্ছে। পুরোনো আচার্যরা চলে গেলেন সব একে একে। আখড়া এখন কেবল বিগ্রহ পুজো, আচার - অনুষ্ঠান, উৎসবাদি পালনের জায়গা হয়ে উঠছে। আখড়ার সংস্কৃতিচর্চা হারিয়ে যাচ্ছে। কপালে রসকলি, গলায় তুলসী কাঠের মালা, মুখে কৃষ্ণনাম তো আর বৈষ্ণবদের চিহ্ন নয়। বৈষ্ণবদের চিহ্ন হল জীবনলীলা। তুমি যদি মাধবেন্দ্রপুরী, অদ্বৈত আচার্য, চৈতন্যদেব, নিত্যানন্দ, সীতা দেবী, জাহ্নবা দেবীদের জীবনলীলার নানা ঘটনার সাক্ষীগুলোকে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে না পারো, বৈষ্ণবীয় আচরণের প্রাণবত্তা পাবে না। তাহলে আর বৈষ্ণব ধর্মটা বুঝবে কী করে? কেবলমাত্র নাম সংকীর্তন করা তো আর বৈষ্ণবের ধর্ম হতে পারে না।' বৈষ্ণবীর কথার গভীরতায় বিস্মিত হলাম এবার। গাঁয়ের এক সাধারণা নারী - সাধিকা এত সুচারু কথার জাল কীভাবে বিস্তার করতে পারেন? এঁরা তো সাধারণত ভক্তিভাবে মজে লোকবিশ্বাসে ভর করে চলতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন! তিনিও তো বলছিলেন গনুটিয়া আখড়ায় ঘটে যাওয়া কয়েকখানা লোকবিশ্বাসের কাহিনি। বলছিলেন আখড়ার ছাদে মধ্যরাতে মানুষ চলার শব্দ পেতেন বাদল দাস বাবাজি। তাঁর শিষ্য সীতারাম বাবাজি একদিন আখড়া ছেড়ে গেছিলেন ব্যক্তিগত কাজে। ফিরে আসতে আসতে সন্ধ্যারতির নির্দিষ্ট সময় পেরোতে

থাকে। মন্দির বন্ধ। তিনি এসে শুনলেন বন্ধ মন্দিরের ভিতর হতে ঘণ্টাধ্বনির আওয়াজ হচ্ছে। প্রবৃদ্ধ বাবাজির মুখে এই কথা শুনেছিলেন বৈষ্ণবী। আমাকে সীতারাম বাবাজির সমাধিতে প্রণাম করাতে নিয়ে গিয়ে তিনি সেসব বলছিলেন। বললেন, 'কৃষিপ্রধান গ্রাম গনুটিয়া। রাঢ়ের গরমে খেতের মাটি ফেটে যায়। তখন দীর্ঘ অনাবৃষ্টিতে আখড়ায় একবার হরিনাম যজ্ঞ হল তার পর-পরই বৃষ্টি নেমে এল। সেই থেকে আখড়ায় অষ্ট প্রহর হরিনাম যজ্ঞের আয়োজন।' বাদল বাবাজি সমাধিমঠের সামনে বেশ কয়েকটি পদযুগলের চাপ রয়েছে। লোকবিশ্বাস এগুলো সব মহাপ্রভুর পদচিহ্ন। গল্প-কাহিনিতে আস্থা আমার বরাবরের কম। কিন্তু শেষমেষ তলিয়ে দেখেছি প্রতিটি গল্প-কাহিনির পেছনে এক শাশ্বত সারবত্তা লুকিয়ে থাকে। যা আমাদেরকে জ্ঞানবুদ্ধির অগোচরে নিয়ে গিয়েও উজ্জ্বল এক চিৎশক্তির খেলা দিয়ে মাতিয়ে রাখে। নিজের সঙ্গে নিজের বোঝাপড়ার খেলা চলতে চলতে একেক সময় একেক মানুষের মধ্যে তুরীয় চৈতন্যখানা জেগে যায়। সেই চৈতন্যে বিশ্বাস রেখে সাধক তখন বলেন, 'নানারূপ নিত্যলীলা করেন গয়ুর রায়, কোনও কোনও ভাগ্যবান দেখিবারে পায়।'

বৈষ্ণবী বললেন, 'বীরচন্দ্রপুরের বঙ্কিম বিগ্রহ দর্শন করেছ তো?'. বললাম, 'হ্যাঁ মা।' তিনি বললেন, 'সাধকের সেবিত বিগ্রহে দেবতার টান থাকে সেজন্য বিগ্রহ দর্শন হলে মন যদি তোমার উচ্চ আধারের হয়, কাঁপতে থাকবে।' বললাম, 'কেন অমন হয়?' বৈষ্ণবী মা বললেন, ''সাধকেরা যখন ভগবানের চিন্তা করতে থাকেন, তখন তার একটা টান পড়ে, আকর্ষণ পড়ে। ক্রমাগত চিন্তা করতে করতে সেই টান দিব্যনেত্র খুলে দেয়। টানের ভিতর থাকে আবরণ। মন যখন ইষ্টস্থানে বসে তখন সাধকের আরাধ্য ইষ্টের ভজনসাধন জনিত যে সত্ত্বগুণের আবহাওয়া তা টেনে নিতে পারে আধ্যাত্মিক বাতাবরণে তৈরি হওয়া কোনও কোনও মন। সেই গুটিকয়েক মন সিদ্ধ

মহাজনদের সেবিত বিগ্রহাদি দর্শন করলে কেঁপে ওঠে। মনের ভিতর কী থাকে জানো?' বললাম, 'স্থূলমনে তো মা, থাকে কেবল ইন্দ্রিয়াদির সাড়া।' বৈষ্ণবী বললেন, 'মনে ইন্দ্রিয় যেমন থাকে গো ছেলে, তেমন মনে আছে বায়ুর বহতা। এই যে দুপুর আসবার বাতাস বইছে আখড়ায় এ তো মনেও বইছে গো। এখানকার বাতাস নিয়ে শ্বাস চলছে এখন তোমার-আমার। এ বাতাসের সত্ত্বগুণ, রজঃগুণ, তমঃগুণের সাড়া তোমার ভিতর লাগবে ছেলে। তবে সূক্ষ্ম সাড়া ধরার জন্য সূক্ষ্ম মনখানা লাগে। সব মনে কী আর বাবা, গোবিন্দের সাড়া মেলে? মনের ভেতর বায়ুর বহতা তরঙ্গ তোলে। এজন্য চিত্তবৃত্তিগুলো আমাদের নড়ে। অস্থির করে তোলে। আমরা স্থির থাকতে পারি না। মনের ভিতর আমাদের নানান অতৃপ্ত বাসনার গুণক্ষোভ। ক্ষোভের ভিতর দিয়ে ৪৯ বায়ু বয়। যখন একযোগে বইতে থাকে শরীরের ভিতর সমস্ত রকম বায়ু তখন মন আক্রান্ত হয়। মনে নাড়াচাড়া ওঠে। শয়তানের নাড়াচাড়া আর ভগবানের নাড়াচাড়া একখান থেকে ওঠে তো। যে কৌশল জানে সে বায়ুর বহতা ধারাতে গুরুপ্রদত্ত বীজমন্ত্র দিয়ে মনকে নাদাত্মক করে ফ্যালে। দীর্ঘদিন ও দীর্ঘকাল এভাবে হতে থাকলে আপনে তোমার মন্ত্রচৈতন্য হয়ে যাবে, বাবা। নিষ্ক্রিয়, শান্ত, অচল পরমাবস্থা তৈরি করতে হয় সাধকদের। তিনি যে সম্প্রদায়ের হন না কেন— শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব— পরমাবস্থা না হলে অলৌকিক লীলা কিছু ধরতে সক্ষম হবে না মন। সাধনা করতে সবার আগে একখানা মন চাই। মন শান্ত একাগ্র হতে হতে শুদ্ধ হয়ে যায়। শুদ্ধ সত্তার ভিতর আধ্যাত্মিক অনুভূতিগুলো ধরা পড়ে। না হলে পর ওগুলো অতিরঞ্জিত কাহিনিমালা বলে মনে হতে পারে।'

তখন আমার মনখানা নিয়ে যত ঝামেলা ছিল। আজও যে সে ঝামেলা কমেছে, তা বলতে পারি না। সাধুগুরুরা মন পড়তে পারেন। সেবার কাশী থেকে দত্তাত্রেয়পন্থী এক সাধু এসে উঠলেন তারাপীঠ অবধূত আশ্রমে। শিঙা

ও শঙ্খনাদ করে তিনি ধ্বনি দিলেন প্রথমে। হোম, আহার, বিশ্রামের পর তিনি মহাশ্মশান যেতে চাইলে আমিও পিছু নিলাম। সাধুর সঙ্গে চলেছি। তিনি বললেন, 'দত্তাত্রেয়কা বারে মেঁ আপক্যা জানতা হৈ?' বললাম, 'অত্রি ঋষি ও অনুসূয়ার ছেলে দত্তাত্রেয়। তাঁর বাবা বিষুর তপস্যা করেছিলাম। সন্তুষ্ট হয়ে বিষুদেব অত্রিকে বলেছিলেন, 'আমি পুত্ররূপে তোমাতে দত্ত হলাম।' নাম হল দত্তাত্রেয়। বিষুর প্রতাপে জন্ম ওঁর। ভাগবতে ভগবানের ষষ্ঠ অবতার বলা হচ্ছে তাঁকে। তিনি অলর্ক ও প্রহ্লাদাদিকে আত্মবিদ্যা দান করছেন। ভাগবতে এর উল্লেখ আছে। মার্কেণ্ডেয় পুরাণেও দত্তাত্রেয় বৃত্তান্ত পড়েছি। তাঁর নামে মন্ত্রযোগের একখানা সংহিতাও পড়েছি। দত্তাত্রেয় সংহিতা যোগিমহলে খুবই তো প্রসিদ্ধ।' সাধুর বাংলাতে যাতায়াত আছে। বাংলা বেশ ভালো বলতেও পারেন। বললেন, 'জ্ঞান রয়েছে তোমার। আসন, প্রাণায়াম কর। কিন্তু মন এখনও বেশ ওঠাপড়া করে। রোজ নিয়ম করে ঘণ্টা খানেক মাটির দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা অভ্যাস করো। এতে সত্ত্বগুণ বাড়বে। সত্ত্বগুণ বাড়তে থাকলে মন স্থির হয়ে আসবে। তুলসী পাত্তিয়া সত্ত্বগুণের প্রতীক। বৈষ্ণবরা তুলসীকে সত্ত্বগুণের মূর্তি মেনে সেবা করেন। তুলসী কাঠে, তুলসীর গন্ধে, তুলসী মূলের মাটিতে প্রচুর সত্ত্বগুণ নিশ্চলভাবে অবস্থান করে। তুলসী মালাতে আপাতত জপ করো আর রোজ তুলসী পাতা বেশ কয়েকখানা নিয়ম করে খাও। ভ্রূমধ্যে বীজমন্ত্রের ধ্যান করো। চোখ বুজে ধ্যান করতে করতে সেখানে যদি বীজের নাদ শুনতে পারো তাহলে মন স্থির হয়ে যাবে। একে বলে মৃত্যুঞ্জয়ী ক্রিয়া। রোজ অভ্যাস করে দ্যাখ।' অবধূত সাধু চলতে চলতে কিছু প্রয়োজনীয় দেহতরিকাও বলে দিলেন আমাকে। জানি না কেন তাঁর এই অযাচিত কৃপা হল। তিনি যেমন আমাকে দেখে এটা ধরতে পারলেন যে মন স্থির নিয়ে আমার কিছু সাধন সমস্যাদি আসছে আবার এটাও ধরতে পারলেন সাধারণ কিছু অসুখ বিসুখে আমি খালি ভুগে

চলেছি। তিনি বললেন, 'হরতকি ব্যবহার করতে শুরু করে দে। হরতকি গুঁড়ো করে ভাজা লবণ মিশিয়ে খাবি, শীতকালে ঠান্ডা লাগবে না। বাতজ বেদনা হলে হরতকি গুঁড়ো ঘিয়ের সঙ্গে মিশিয়ে খেতে হয়। চিনির সঙ্গে মিশিয়ে খেলে পিত্ত নাশ হবে আর গুড় দিয়ে সপ্তাহে দু-একদিন খেলে শরীরে যে কোনও রোগ কম ধরবে। শাস্ত্রে রয়েছে, মা যেমন ছেলের ওপর কখনো রাগ করেন না, সবসময় তার ভালো চান তেমন হরতকি ফল কখনও ক্ষতিকারণ হয় না। রাজাকে তাঁর গুরু উপদেশ করছেন, 'হরীতকীং ভুঙ্ক্ষর রাজনমাতেব হিতকারিণী। কদাচিৎ কুপ্যত্যে মাতা নোদরস্থা হরীতকী।' তুলসী পাতা আর হরতকি সেবনের অভ্যাস রাখ আর শ্বাসে-প্রশ্বাসে বীজ এনে জপ করতে থাক। সেইসঙ্গে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে ডান পায়ের বুড়ো আঙুল চিন্তা করতে থাক খালি, দ্যাখ কেমন মনস্থির হয়।' সত্যি সত্যি সাধুর বলা প্রণালী মাস তিনেক অভ্যাস করতে আমার মারাত্মক ফল এসেছিল। এটা আমি বুঝে গেছিলাম, শরীরের ভিতরকার বায়ু স্থির না করতে পারলে কিছু স্থির হয় না। অবধূত সাধু আরও এক আশ্চর্য জিনিস আমাকে শিখিয়েছিলেন সেদিন। মহাশ্মশানে বসে প্রসাদি গাঁজা হাতে ধরিয়ে দিয়ে তিনি বললেন, 'বেটা, রাতমেঁ ইধারই ঠারেগা।' সাধুর সঙ্গে থেকে গেলাম গোটা রাত মহাশ্মশানে। অমাবস্যা তিথি। তান্ত্রিকেরা বিভিন্ন জায়গায় হোম ক্রিয়াদি করছেন। কিছু ভক্ত সমাগম আছে। মধ্য রাতে ভিড় একটু পাতলা হতে অবধূত সাধু জপে বসার আগে আমাকে কিছু তরিকা শেখালেন। বললেন, 'দু-চোখকে নিষ্পলক করতে চেষ্টা করো। যতক্ষণ চোখ দিয়ে জল না গোড়ায়, একটা অতি সূক্ষ্ম লক্ষ্য রাখো। এভাবে এখন বসে থাকো। একে বলে ত্রাটক কর্ম। রোজ করতে থাকো। কাশী এলে আরও কিছু তরিকা দেখিয়ে দেব।'

নীলাচল পাহাড়ের কামেশ্বর মন্দিরের দক্ষিণ দিকে রয়েছে গুপ্ত ছিন্নমস্তার মন্দির। এখানে দেখা হয়েছিল জটাধারী মাঈয়ের সঙ্গে। সঙ্গে ছিলেন ওঁর ভৈরব। মাঈয়ের মাথায় মস্ত জটা, গলায় রুদ্রাক্ষ, পরনে গেরুয়া বসন। ভৈরবের হাতে কমণ্ডুলু। তিনি এক গগনভেদী চিৎকার দিলেন, 'বম! বম! বম! বম! বম!' এভাবে তিনি গুপ্ত ছিন্নমস্তায় আসা ভক্তদের মনোযোগ কেড়ে নিলেন। মাঈয়ের হাতে ধরা ত্রিশূল অথচ গেরুয়াধারী দেখে আমার খানিকটা খটকা লাগল। আমি তখন এ পথের নবিশ। জানি তান্ত্রিকের জন্য বরাদ্দ কেবল লাল কাপড়। তিনি আমার মন কেড়েছিলেন ভিড়ের ভিতর একখানা অযাচিত বাক্য বলে। তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে আমি তখন ভৈরব ঠাকুরের শিবতাণ্ডব স্তোত্রপাঠ শুনছি। তিনি ওই মন্ত্রধ্বনির ভিতর আমার কাছে মুখ এনে বললেন মাত্র একখানা বাক্য, 'আদ্যক্রিয়া চিত্তস্থিরতা।' আমি যেন চমকে উঠলাম। কী করে টের পেলেন মাঈ আমার অস্থির দশার কথা! তাঁকে একা পেলাম ভুবনেশ্বরীতে। নীলাচল পাহাড়ের সর্বোচ্চ শৃঙ্গে এই মন্দির। এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অতি মনোরম। তিনি যেন মনে হল আমার অপেক্ষাতে ছিলেন। পাশে দাঁড়ানো মাত্র বললেন, 'মণিপুরে মনঃসংযোগ করতে থাকো। সকল মন্ত্রের প্রাণস্বরূপ দেহের মণিপুর। মন্ত্র উচ্চারণ করতে হবে মণিপুর দিয়ে। তা না হলে মন্ত্র হয়ে যাবে নিষ্ফলা। দ্যাখো না হাজার হাজার মন্ত্রে ক্রিয়া করেন তান্ত্রিকেরা। ফলদায়ক কিছু দেখতে পারো তুমি? মণিপুর জাগানো সাধকের মন্ত্র উচ্চারণ কখনো নিষ্ফলা হবে না। তুমি কী পরীক্ষা করতে চাও?' আমি অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি মাঈয়ের দিকে। ভুবনেশ্বরীর সিঁড়ি দিয়ে উঠছিলেন এক তান্ত্রিক পুরোহিত। হাতে পুজোর আয়োজন। মাঈ বললেন, 'এই দ্যাখো সংযোগ, উচ্চারণ করছি মন্ত্র। এর অনুরণন গিয়ে লাগবে মায়ের পূজাদ্রব্যে। সমস্ত গিয়ে পড়তে এইবার ভুবনেশ্বরীর পায়ে।' মাঈ চোখ বুজে শান্ত সুরেলা কণ্ঠে বলতে

থাকলেন, 'ওঁ হ্রীং! ওঁ হ্রীং! ক্ষৌ! ক্ষৌ!' তৎক্ষণাৎ তান্ত্রিকের হাতের থালি গিয়ে পড়ে গেল একেবারে ভুবনেশ্বরী মায়ের সম্মুখে। নির্বিকার মাঈ এই নিয়ে কোনও প্রসঙ্গ আর উচ্চারণ করলেন না। শুধু বললেন, 'এরকম তো কত হয়। এগুলো কোনও সিদ্ধাই নয়। এগুলো হল স্বীয় সত্তাকে খালি নাভিকুণ্ডের সমসূত্রপাতে মেরুদণ্ডের মধ্যে থাকা গুপ্তস্থান মণিপুরে নিয়ে মন লাগানোর ফলাফল। নাভিকুণ্ড শব্দব্রহ্মের মূল যন্ত্র। দূরের মন্দিরে যখন ঘণ্টার শব্দ হত সেই শব্দকে আমার গুরুজি টেনে আনতে পারতেন নিজ আসনের কাছে। ঢং করে এক প্রবল শব্দ উত্থিত হতে আমরা শুনতাম। ওঁর কুঠিয়াতে কোনও ঘণ্টা ছিল না। কিন্তু ঘণ্টাটা আসনের গা ঘেঁষে বাজছে। বুঝতে পারছি অথচ দেখতে পাচ্ছি না ঘণ্টা আর তার বাজককে। গুরুদেব বলতেন, 'শব্দসূত্র'। ধ্বনি, শব্দরশ্মি নাভিপথ দিয়ে যদি বের করা যায় তবে তা দূরের যে কোনও কিছুকে আকর্ষণ করে ইচ্ছাক্রিয়া ঘটাতে পারে। আবার নাভিকুণ্ড দিয়ে দূরশ্রবণকেও কাছে টেনে নেওয়া যায়। নাভিকে এ কারণে দশমদ্বার বলেন সাধকেরা।' বললাম, 'শঙ্করাচার্যের জীবনীগ্রন্থে পড়েছিলাম তিনি নাভিদ্বার দিয়ে নিজের আত্মাকে বের করে নিয়ে মৃত রাজার শরীরে প্রবেশ করেছিলেন।' মাঈ বললেন, 'অনেক জানো দেখছি। এখন তোমার শরীরের উর্দ্ধঅঙ্গ আর উর্দ্ধপথকে খালি জানার চেষ্টা করে যাও। এখানে প্রাণবায়ুর ক্রিয়াদি দিতে থাকো। যত প্রাণের ক্রিয়া পড়তে থাকবে উর্দ্ধমুখে তত শ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে প্রাণবায়ুর ক্ষয় হতে থাকবে। এক সময় নিম্নশ্বাস—নিশ্বাসও প্রাণবায়ুকে আকর্ষণ করতে থাকবে। শেষে নাভিস্থলে গিয়ে নিম্নমুখী শক্তিক্রিয়াদি বন্ধ করে দেবে। প্রাণ অপানের আকর্ষণ বিকর্ষণ যত চলতে থাকবে তোমার শরীরে তত তাড়াতাড়ি নাভিকুণ্ডের পদ্মস্থ ডাঁটি জীবনী শক্তিকে স্পন্দিত করতে থাকবে। এখন খালি নাভিকুণ্ডে ঐক্য স্থাপন করতে থাকো। বায়ুর সঙ্গে যখন মনের ঐক্য হয়ে যাবে তখন আর চঞ্চল দশার

ঝামেলা থাকবে না।' চিত্তবৃত্তি নিয়ে আমার ভীষণ সমস্যা তবে আরও সমস্যা সাধুদের শুধু জানার কৌতূহল। মাঈয়ের গেরুয়া বসন অথচ তান্ত্রিকী করণ চোখে পড়ছে বারবার। প্রশ্নটা আমাকে আর করতে হল না। তিনি মন পড়তে পারেন। বললেন এবার, 'ভুবনেশ্বরী ছাড়ব তার আগে তোমার ছোট্ট কৌতূহলটা মিটিয়ে দিয়ে যাই। রক্তাম্বর পরিধানের বিধান কিন্তু কোনও তন্ত্রশাস্ত্রের আদি গ্রন্থাদির ভিতর নেই। খুঁজে দেখো। পাবে না কিছু। মায়ের রাঙা চরণ চিন্তা করে বামাচারী, বীরাচারী তান্ত্রিকের কেউ বা এর প্রচলন ঘটিয়েছেন। পরে সেটা গুরু পরম্পরায় বসে গেছে। তন্ত্রমতের পুজোতে প্রধান পূজক লালপাড় শ্বেতবস্ত্র পরেন। সহকারী পূজকরা লাল পরেন। কেবলমাত্র বিশেষ কিছু গুহ্য তান্ত্রিক ক্রিয়ায় নীল-হলুদ, রঞ্জিত বস্ত্রাদি পরিধানের বিধান আছে।' ভুবনেশ্বরী থেকে নামছেন মাঈ। আমি মণিপুরে মন লাগিয়ে নিষ্পলক তাকাতে চেষ্টা চালাচ্ছি মন্দিরের মায়ের দিকে।

ভুবনেশ্বরী থেকে নেমে এলাম কামেশ্বর শিবের কাছে। মন্দিরের ভিতরে কামকুণ্ড। তার পাশে দেখি ভৈরব ঠাকুর বসে আছেন। আমাকে বললেন, 'নীলাচল পাহাড়ে পঞ্চশিবের মন্দির আছে— কামেশ্বর, যা কিনা মূলাধারে সুপ্ত। কামধারা ওখান থেকে নামে। সিদ্ধেশ্বর, দেহ যখন স্বাধিষ্ঠান চক্রে স্থিত হয় তখন সিদ্ধেশ্বর জেগে ওঠেন। নাভি চক্র, মণিপুর হল রক্তবর্ণ। আমার গুরুদেব বলতেন, 'ও হল গিয়ে মহারজঃ। এর সঙ্গে পাণ্ডুবর্ণ বিন্দু শুক্রের যখন মিলন হবে তখন শিবশক্তির সংযোগ আসবে দেহে। কামাখ্যার কোটিলিঙ্গ সেই সংযোগের রূপারূপ। কামাখ্যা হল দেহের গুপ্তস্থান। কামাখ্যা সাধনে দেহচক্র জেগে ওঠে।' হৃদয়ে কামাখ্যার অঘোর শিব আর আজ্ঞাতে আছেন আম্রাতকেশ্বর। গুরুপ্রণাম করতে হয় দেহচক্র চিন্তা করে। গুরুর্বহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বররূপে নাভি, হৃদয় আর সহস্রার কল্পনা করতে হয়। তবে গুরুপ্রণাম সার্থক হয়ে ওঠে। নাভিতে রক্তবর্ণ ব্রহ্মা, হৃদয়ে

নীলমণিসদৃশ বিষু আর সহস্রারে স্বচ্ছ স্ফটিকসদৃশ শঙ্কর অবস্থান করেন। চক্রধ্যান যখন নিরাকর পন্থাতে করা হয় তখন তান্ত্রিকগুরু বলে দেন ওঁর শিষ্যকে নাভিতে রক্তবর্ণ, হৃদয়ে নীলবর্ণ আর সহস্রারে শুভ্র বিন্দুস্পন্দের কল্পনা রাখতে। এভাবে ধ্যান করতে থাকলে মন স্থির হয়ে আসে। চক্রধ্যানে মন আর নাভি এক জায়গায় চলে যায়। নাভি হল সূর্যস্বরূপ আর মন চন্দ্রাত্মিকা। নাভিতে যখন মনকে স্থিতি দেওয়া শুরু হয় তখন চন্দ্র ও সূর্যের মিলন হয়ে যায়। মন বলে আলাদা সত্তা নষ্ট হতে শুরু করে। মন মূলাধারে মিশে যেতে শুরু করে। একসময় মেরুদণ্ড মধ্যস্থিত সুষুম্নাপথে মৃণালসদৃশ যে অতি সূক্ষ্ম তত্ত্ব মূলাধার থেকে সহস্রার পর্যন্ত গেছে এর ভিতর যে রয়েছে ষটচক্রভেদের কমল, সেগুলোকে মন ধরতে শুরু করে এগোতে থাকে। স্থূলমন, সূক্ষ্ম থেকে করণমনে গিয়ে পুরোপুরি যখন রূপান্তরিত হয় তখন সাধন ছাড়াও দেহ স্বাভাবিক সময়ে জাগতিক কর্মাদি করতে থাকলেও দেহচক্র সচল থাকার ফলে তার আর কোনও উৎপাত থাকে না। মন চৈতন্যময়ী কুণ্ডলিনীশক্তির সাহায্যে নির্দিষ্ট দিকে খালি বয়ে যেতে থাকে। মনের ভাবনা সহস্রারে বসে যায় বলে শূন্যময় চিন্তা গিয়ে দেহের ক্ষিতি-অপ-তেজ-মরুৎ-ব্যোমে লাগতে থাক। দেহব্রহ্মাণ্ড বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে বিনিমতি হয়ে পড়ে। দেহ মন সব সরে যায়। এটা সাধনার ঊর্ধ্বমুখীন দশাপ্রাপ্তি। প্রকৃত যোগিদের জেগে ঘুমিয়ে আসনে বসে স্বাভাবিক চলাফেরায় এই দশা থাকে।'

আমি বুঝেছি সাধুবৃত্তে চলাফেরায় দশা বড় স্বাভাবিক জিনিস। প্রকৃত সাধকেরা দশা লুকিয়ে স্বাভাবিকভাবে মিশতে থাকে আমাদের সঙ্গে। আমরা অনেক সময় জানতেও পারি না যে খুব উচ্চ দশাপ্রান্ত সাধুগুরুর সঙ্গে কথা বলছি। এটা জানতে গেলে নিজেকে খানিকটা চক্রোপযোগী করে নিতে হয়। না হলে বাহ্যিক ভাব দেখে সাধু চিনতে গেলে ঠোকে যেতে হবে। সাধুদের সঙ্গে ভেকধারীরাও মিশে থাকে। সাধুদের দেহের ভিতরে সত্য থাকে।

জৈবিক প্রবাহ থেকে দেহ সরিয়ে দেওয়া সাধুসন্তদের সাধনা। দেহের ভিতর তাঁরা শিবশক্তি, রাধাকৃষ্ণের মিলন ঘটাতে তৎপর। দেহের মধ্যে রয়েছে চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, সংবৎসর, মাস-দিবস-তিথি। দেহের প্রত্যঙ্গ নাভি। নাভি দিয়ে সাধনার শুরুয়াত। নাভিতে মনস্থির। নাভিকে বৌদ্ধ তান্ত্রিকেরা বলেন নির্মাণকায়া। নাভি আধ্যাত্মিক মন তৈরি করে। হৃদয়ে ধর্মকায়ার কথা বলেন বৌদ্ধ তান্ত্রিক। কণ্ঠে তাঁদের সম্ভোগকায়া। এই তিন চক্র ছাড়া তাঁরা বজ্রকায়া চক্রের কথা বলেন। এটা সহস্রার। আর পরমতত্ত্বের আলয়কে তাঁরা দেখেন মহাসুখচক্র হিসেবে। বলেন মহাসুখকমল। নাড়ির রূপ তাঁদের কাছে সূর্য-চন্দ্রের নয়—অবধূতিকার। দেহের সর্বনিম্নচক্র মূলাধারে কুণ্ডলিনী শক্তিরূপে ঘুমিয়ে আছে। তাকে জাগিয়ে তুলে সহস্রারে নিয়ে যেতে হবে। বৌদ্ধতন্ত্রে মূলাধার চক্রের নাম নির্মাণকায়া। এখানে কুণ্ডলিনীর রূপ চণ্ডালী। অগ্নির কল্পনা—পদ্ম ও বজ্র মধ্যপথে মিলিত হতে পারলে নাভিপদ্মস্থিত নির্মাণচক্রে চণ্ডালী জ্বলে ওঠে। বোধিচিত্তের প্রকাশ ঘটে।

গনুটিয়া আখড়ার বৈষ্ণবী বলছিলাম আমায় ভাবশক্তির কথা। আদ্যাশক্তি নিজের শরীর থেকে অষ্টসখী তৈরি করলেন। অষ্ট নায়িকার সাধনা সহজিয়া বৈষ্ণবরা করে থাকেন। আবার আট সখীদের প্রত্যেকের শরীর থেকে আটজন করে যোগিনীর উৎপত্তি হয়ে চৌষট্টি যোগিনীর সৃষ্টি হচ্ছে। তন্ত্রমতেও শ্রীকৃষ্ণের পুজো হয়। তন্ত্রোক্ত শ্রীকৃষ্ণ পুজোর বিশেষ পদ্ধতি আছে। বৈষ্ণবরা ওভাবে শ্রীকৃষ্ণের পুজো করেন না। বৈষ্ণবদের নৃসিংহদেব তন্ত্রের দেবতা। ওঁর তন্ত্রোক্ত পুজোর প্রয়োগ অনেক আগমে উল্লেখিত। তন্ত্রোক্ত শ্রীকৃষ্ণের পুজো হয় পাত্রস্থাপন করে। স্থাপনের পর বীজমন্ত্রে প্রাণায়াম তারপর ন্যাস। যুগল উপাসকেরা এই পুজো করে থাকেন। 'ক্রমদীপিকা', 'গৌতমীয়তন্ত্রের' ভিতর এর প্রয়োগবিধিগুলো আছে।

পাত্রস্থাপনের প্রয়োগ পদ্ধতি পুরো তান্ত্রিক আচার। পাত্রস্থাপন বামাচারের অঙ্গ। তন্ত্রের রহস্যপুজোর মতো শ্রীকৃষ্ণের পুজো হয়। বীজ আর ন্যাসে কেবল পার্থক্যাদি আছে। রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তির তন্ত্রোক্ত পুজোর থেকে কৃষ্ণ-রুক্ষ্মিণীর তন্ত্রোক্ত প্রয়োগ ও প্রকরণ অনেক বেশি। পুজোতে কৃষ্ণ-রুক্ষ্মিণীর উদ্দেশে বলিদান আছে। অণ্ডকোষবিশিষ্ট ছাগবলি দিতে হয়। রাধাতন্ত্রে রাধার যন্ত্র পুজো চলে। রাধাকে বৈষ্ণবরা মহাবিদ্যা বলেন ঠিকই কিন্তু তন্ত্রমতে রাধার পুজোর কোনও স্বতন্ত্র ক্রম নেই। কৃষ্ণের উদ্দেশে আরও অনেক রকম বলি আছে। দ্বারকাধীশ তিনি আবার তিনি যখন পূর্ণপুরুষোত্তম তখন তাঁর প্রীতির উদ্দেশে বলিদান অন্যরকম হবে। শ্রীকৃষ্ণের পুজোতে মহিষবলিরও বিধি আছে। রুক্ষ্মিণীকে স্বয়ং মহালক্ষী করেও দেখানো হয়েছে এখানে। তিনি মদ্য-মাংস-মৎস্যপ্রিয়া। বেশ কয়েকটি বৈষ্ণবতন্ত্রের ভিতর উল্লেখিত রয়েছে যে, ভগবান মৎস্যাবতারের রূপখানা শুধুমাত্র পৃথিবীকে বাঁচাতে নেননি বরং স্ত্রী রুক্ষ্মিণী, যিনি মৎস্যপ্রিয়া তিনি দ্বাপর যুগে এসে মাছ খাবেন বলে ভগবান মৎস্যাবতারের রূপ নিয়ে বসলেন। যাতে তাঁকে খেয়ে রুক্ষ্মিণী সন্তুষ্টা হন। এমনই ভালোবাসা। বৈষ্ণবতন্ত্র এমন সব গল্পগাছা করেছে। সব এগুলো বাংলার ব্যাপার। বৈষ্ণবতন্ত্র বলে বাংলাতে যে 'রাধাতন্ত্র', 'গৌতমতন্ত্রের' প্রচলন তার সঙ্গে সহজিয়া মতের বৈষ্ণবদেরও কোনও সম্বন্ধ নেই। সহজিয়া বৈষ্ণবরা তাঁদের ধর্মে প্রবর্তক গুরু হিসেবে নিত্যানন্দ প্রভুকে মান্যতা দেন বেশি। তিনি প্রথম যৌবনে ছিলেন দত্তাত্রেয় সম্প্রদায়ভুক্ত অবধূত সাধক। তিনি প্রথম শাক্ত তান্ত্রিকদের বৈষ্ণব মতের দলভুক্ত করে গৌড়ীয় বৈষ্ণবতার ভিতর তন্ত্রের অনুপ্রবেশ ঘটান। নিত্যানন্দের ছেলে বীরভদ্র - বীরচন্দ্র বৌদ্ধ তান্ত্রিক সহজযানের লোকজনদের দলভুক্ত করেন বাংলার বৈষ্ণব সম্প্রদায়কে শক্তিশালী করে বৃন্দাবনের সঙ্গে পাল্লাপাল্লি করার জন্য। তন্ত্রের শক্তি সাধনার

ভৈরব-ভৈরবীর গোত্রাভুক্ত এখানেও পরবর্তী সময়ে সাধিকা নিয়ে শক্তি সাধনা করবার জন্য তৈরি হয়ে ওঠে বৈষ্ণব - বৈষ্ণবী, গোঁসাই - মা গোঁসাই, বোরেগী - বৈরাগিনীর কনসেপ্ট। এর সঙ্গে অনেকে পুরোপুরি তান্ত্রিকী আচারের বৈষ্ণবতন্ত্রকে গুলিয়ে তোলেন। বোরেগী বৈষ্ণবদের ভিতর এসব আচরণাদি নেই। সেখানে রয়েছে বৈরাগ্য অবলম্বন করে জিতেন্দ্রিয় হওয়ার কথা, অটল বীর্যের কথাবার্তা। সাধনসঙ্গিনীর সংসর্গে রতিকে ইড়া - পিঙ্গলা নাড়িদ্বয়ের মধ্যে বার বার আবর্তন করে নাড়ি দুটোর বন্ধ মুখে যে সাধকের বীর্যের অধোগতি সেই গতিদ্বার আটকে ফেলে সুষুম্নাপথ খুলে মূলাধারে শক্তি জাগিয়ে নেওয়া এখানকার প্রধান সাধন। আন্তর তন্ত্রের সঙ্গে যথেষ্ট মিল রয়েছে। বাহ্যিক তন্ত্রের পঞ্চমকারের ধরনের সঙ্গে তন্ত্রোক্ত শ্রীকৃষ্ণের পুজো পদ্ধতির মিল আছে। যা বৈষ্ণবদের পুজো কিন্তু নয়। তান্ত্রিক মতে কৃষ্ণপুজো। এর সঙ্গে বাংলাদেশের বৈষ্ণবতন্ত্রের নামে প্রচারিত পুঁথিগুলোর কিছু সাদৃশ্য আছে তান্ত্রিকী উপাচারের কারণে। বৈষ্ণবীয় তন্ত্র আদতে পুরো একটা আলাদা বিষয়। তন্ত্রাচার অনেক বৃহত্তর গণ্ডির। তার মধ্যে বৈষ্ণবাচার, শৈবাচার, শাক্তাচার ইত্যাদি পড়ে। আমাদের সমস্ত উপাসনাকাণ্ডগুলো মূলত বীজ প্রধান। বীজের উদ্ভব তন্ত্রে। তন্ত্র মানে শুধু শ্মশান সাধনা নয়, তার বিবিধ ধাপ আছে। তন্ত্রে যে বামমার্গ তাতে গৌড় প্রদেশের শাক্তাচার ঢুকে রয়েছে। দক্ষিণাচারে প্রচলিত বৈষ্ণবীয় উপাসনা। পুজো পদ্ধতিগুলো দেখলে ব্যাপারগুলো আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

বৈষ্ণবীয় তন্ত্র বলতে পাঞ্চরাত্র আগমগুলোকে বোঝায়। দক্ষিণাত্যের বৈষ্ণবগণ, যেমন রামানুজের অনুসারীরা আগমোক্ত মত অনুসরণ করেন। মন্দির নির্মাণ ও উৎসব-অনুষ্ঠান আগম অনুসরণে হয়। বৈষ্ণবাগমের তিনটে শাখা। পাঞ্চরাত্র, বৈখানস, স্মার্ত। বৈষ্ণব আগম সমূহের মধ্যে পাঞ্চরাত্র সর্বাধিক প্রচলিত। পাঞ্চরাত্র আগমগুলোর চারটে শাখা। আগম সংহিতা, মন্ত্র

সংহিতা, তন্ত্র সংহিতা, তন্ত্রান্তর সংহিতা। এদের ভেতর আগম সংহিতাগুলো সর্বাধিক প্রচলিত। শ্রীরঙ্গম, কাঞ্চী, মহীশূর সর্বত্র আগম সংহিতা অনুসরণ করা হয়। আগমের পরম্পরার ভেতর চক্রাব্জ মণ্ডল অর্চনার গুরুত্ব অপরিসীম। শ্রীকুলে যেমন শ্রীযন্ত্র অর্চনাদি সবচেয়ে মান্যতা পায়। তন্ত্র সংহিতার কিছু পরম্পরা পরবর্তী সময়ে শাক্তোপাসনার কুলে মিশে গেছে। লক্ষ্মীতন্ত্রোক্ত পরম্পরা ও সাধন ধারা কালীকুলের কিছু কিছু পরম্পরাতে আছে। বৈখানস আগমে মূলত বেদমন্ত্রাদির ব্যবহার হয়। বৈখানস ব্রাহ্মণেরা এর উত্তরাধিকারী। তিরুপতি, চেন্নাইয়ের পার্থসারথি মন্দিরে বৈখানস অর্চনা পদ্ধতি প্রচলিত। স্মার্ত বৈষ্ণবাগমও বহুল প্রচলিত। গোটা ভারত জুড়ে এই চর্চা বহমান। উত্তরে বদ্রীনাথ, পূর্বে পুরী, পশ্চিমে দ্বারকা, দক্ষিণে অনন্ত পদ্মনাভস্বামী সর্বত্র স্মার্ত বৈষ্ণবাগম প্রচলিত। ভারত জুড়ে এই শাখার সিদ্ধ সাধকেরা বর্তমান। যথেষ্ট জায়মান একটা শাখা। অহোরিল মঠের বর্তমান জীয়র স্বামী, মহীশূরের রাজগুরু ব্রহ্মতন্ত্র স্বতন্ত্র স্বামী, শ্রীবৎসররদাগুরুর বংশধর ভি. এস করুণাকর স্বামী সহ বেশ কয়েকজন দিকপাল আজও রয়েছেন। শ্রীকুল তৃতীয় মহাবিদ্যা ত্রিপুরসুন্দরীর শাক্ত পরম্পরার কুল। এখানে বৈষ্ণবাগমের কোনও প্রচলন নেই। স্মার্তদের মধ্যে বৈষ্ণবাগমের প্রচলন পুরীর অর্চক গোষ্ঠীভুক্ত। তাঁরা আদৌ শ্রীকুলের সঙ্গে কোনওভাবে যুক্ত নন। তন্ত্র ও তন্ত্রান্তর সংহিতাগুলো অত্যন্ত গুহ্যভাবে আজও অনুসরণ করা হয় বংশ পরম্পরায় পাঞ্চরাত্রিক আগমাচার্যদের মধ্যে। কর্ণাটকের মেলকোটে তন্ত্র সংহিতার অবিমিশ্র পরম্পরা এখনও আছে বলে শোনা যায়। অন্ধ্রের শ্রীকূর্মমে তন্ত্রান্তর সংহিতার পরম্পরা কোনওক্রমে টিকে আছে। এর শ্মশান প্রয়োগাদির আচার ক্রিয়া অত্যন্ত গোপন ভাবে করা হয়। পাঞ্চরাত্রিক তন্ত্র সংহিতার পরম্পরা বাংলার কালীকুলের কিছু গুরু পরম্পরার ভিতর এখনও টিকে আছে। জীবিত দীক্ষাচার্য হাতে গোনা কয়েকজন কেবল

আছেন। বৈষ্ণবাগমের কুল নয় শ্রীকুল। শাক্তোপসনার পরম্পরায় পঞ্চদেবতার উপাসনা এখানে শুধু হয়ে থাকে। বামাচার পাঞ্চরাত্রের কিছু শাখাতে প্রচ্ছন্নভাবে রয়েছে। পাঞ্চরাত্রের প্রসিদ্ধি দক্ষিণ ভারত জুড়ে। এর উত্তরাধিকারীরা এসব খুব গোপনীয়তার মোড়কে আজও ধরে রেখেছেন। বাংলায় পাঞ্চরাত্র তন্ত্র সংহিতার পরম্পরা কালীকুলে ঢুকে পড়ে যেটুকু জায়মান তা কখনো মূল ধারা নয়। দক্ষিণাত্যে পাঞ্চরাত্রের মূল পরম্পরা বর্তমান। বাংলায় বলতে গেলে সেই অর্থে বিশুদ্ধ বৈষ্ণব পরম্পরা নেই। বাংলার বৈষ্ণব অর্থাৎ গৌড়ীয়রা ''পদ্মপুরাণে'' বর্ণিত মূল চারটে বৈষ্ণব পরম্পরার মধ্যে পড়েন না। মধ্ব সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীদের মধ্যে পাঞ্চরাত্রের পরম্পরা আছে। তাঁরাও চক্রাব্জ মণ্ডল অর্চনা করেন। অহোবিলের বর্তমান জীয়র শ্রী রঙ্গনাথ যতীন্দ্র মহাদেশিক, মহীশূরের রাজগুরু ব্রহ্মতন্ত্র স্বতন্ত্র পরকাল, জীয়র ভি. এস করুণাকর স্বামী (বর্তমান নাদাদুর অম্মল গদী) ছাড়াও দক্ষিণের বিভিন্ন বিষ্ণু মন্দিরের পাঞ্চরাত্রিক অর্চকদের মধ্যে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত অনেকে আছেন। রাজস্থানের গলতাতে একবার শ্রী সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবদের মুখোমুখি হয়েছিলেন বলদেব বিদ্যাভূষণ। তাঁরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'গৌড়ীয়রা চতুঃ সম্প্রদায়ের কোনটির অন্তর্ভুক্ত? তাঁদের ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য কোথায়?' বলদেব বিদ্যাভূষণ বললেন, 'গোবিন্দভাষ্য।' শ্রী সম্প্রদায়ের আচার্য বললেন, 'যদি গৌড়ীয়রা মধ্বই হন তাহলে তাঁরা মধ্বদের মতন বিষ্ণু উপাসক নন কেন? মধ্বদের তো দ্বৈতভাষ্য আছে তাহলে নতুন করে আর গোবিন্দভাষ্যের দরকার কী?' আলোচনাতে বলদেব বিদ্যাভূষণ এর কোনও সদুত্তর দিতে পারেননি। ঈশ্বরপুরী ছিলেন অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী। তাঁর শিষ্য শ্রীচৈতন্য কী করে মধ্ব হতে পারেন? ব্রহ্ম সংহিতাকে গৌড়ীয়রা মান্যতা দেন। গৌড়ীয়দের পুরোনো পরম্পরার আচার্যরা নিজেদেরকে কখনো মধ্ব-গৌড়ীয় প্রতিপন্ন করেন না। এটা ইস্কনের সৃষ্টি করা। ব্রহ্ম সংহিতা

পাঞ্চরাত্রের একটা অংশ মাত্র, যে শাস্ত্রের শুধু ল্যাজটুকু আছে আগা-মাথা অমিল সেটা প্রামাণ্য কী করে হতে পারে? বাংলার গৌড়ীয় বৈষ্ণবতা এ কারণে বাংলাতে জায়মান একখানি শাখা বলা চলে। সহজিয়া বৈষ্ণবরা যার প্রশাখা। এই সহজ সত্যটা মেনে নেওয়া ভালো। এইসব সত্য প্রামাণ্যতা নিয়ে আখড়ার বৈষ্ণবদের মাথাব্যাথা কিছু নেই। তাঁরা দেহবাদী কায়াসাধন নিয়ে সহজ ধর্মের দার্শনিক ব্যাখ্যাদি রেখেছেন। তাঁরা বলছেন, 'ভজনের মূল হল গিয়ে নরবপু এই দেহ। দেহটাকে জানতে পারলে সহজ বস্তুকে সহজে জানা যাবে। দৈহিক সাধনা দরকার। শুধু তত্ত্ব জেনে পুঁথি পড়ে সহজের উপলব্ধি আসবে না। দেহের বাহ্য অন্ধকার দূর করতে হবে সবার আগে। ইন্দ্রিয়জাত সমস্ত বিকার হল দেহের বাইরের অন্ধকার। অবিদ্যা, মায়া, ভ্রম সব সেখানে লুকিয়ে আছে। এগুলো দেহের অজ্ঞানতা। অবিদ্যা। দেহ আর মনকে সবার আগে নির্বিকার করে তুলতে হবে। মন আর ইন্দ্রিয়ের বিকার নিয়ে সহজ প্রেমের সাধনা কীভাবে হবে?'

গনুটিয়া থেকে আসছি পাঁচপাড়া আখড়া। আসতে আসতে বৈষ্ণবী বললেন, 'দেহচক্রে সাধুর বাজার রে, বাবা। দেহতে লক্ষ্য রাখতে হবে। কামনার বিষবাষ্প দেহের মধ্যে। ইন্দ্রিয়, মন আর বুদ্ধি সব সময় দেহকে ঘিরে আছে। দেহের মধ্যে আত্মা। আত্মারূপী ভগবান তিনের দাপটে চাপা পড়ে আছে। আত্মার মোহ আগে সরাতে হবে তবে না ভগবানের উজ্জ্বল রশ্মির দেখা মিলবে। আমার গোঁসাই বলতেন, 'পদ্মপুষ্প রসে ভরা। রস পুষ্প থেকে প্রবাহিত হতে হতে আট ক্রোশ দূরে থাকা এক নদীতে এসে পড়ে। নদী তখন সরবরের অধিকারী হয়।' গোঁসাই একে বলতেন, 'সর্বদেবা।' এর মানে জানিস কী? বললাম, 'কী মা?' বৈষ্ণবী বললেন, 'সর্বদেবা হলেন সবার অনুচর। সব দেহে তিনি আছেন। দেহের নটা দরজা পেরোলে তার দেখা মেলে। নয় দরজা রস ঢেকে রাখে। এদের বলে রসচোরা। দেহের রস

জানতে পারলে নিজ স্বরূপ আসবে। স্বরূপের রস চিন্ময়। দেহাত্মবোধযুক্ত এ রস নয়। এই রস জানতে দেহচক্র জানতে হয়। সেখানে সাধুর বাজার বসে। নিজের সাধ্যবস্তু হল গিয়ে সাধু। সাধনা হল সাধা। রোজ সাধতে হয়। অভ্যাস করতে হয়। অভ্যাস করতে করতে দেহ একদিন রসরাজ শ্রীকৃষ্ণের লীলা দেখতে পায়। পাঁচপাড়া আখড়ার গোঁসাই ছিলেন বলরাম দাস বাবাজি। তিনি বহুদিন বৃন্দাবনে সাধনা করেছিলেন। সেখানে তিনি রাধারানি মন্দিরের বাগানে মালির কাজ করতেন। একদিন বাগান ঝাঁট দিতে গিয়ে একখানি নূপুর কুড়িয়ে পেলেন। চোর অপবাদ দিয়ে মন্দিরের পান্ডারা তাঁকে বৃন্দাবন ছাড়া করলেন। তিনি ফিরে আসলেন বীরভূম কোতলঘোষা। পদ্মপুকুরের ধারে পথশ্রান্ত হয়ে বিশ্রাম করছিলেন। হঠাৎ দেখলেন একটা বাচ্চা ছেলে জলে ডুবে যাচ্ছে। তিনি বাচ্চাটাকে জল থেকে তুললেন। বাঁচাতে পারলেন না। উলটে পেলেন চোর বদনাম। গাঁয়ের লোকজন ভাবল সোনার নূপুর ওই বাচ্চার। সেটা নেওয়ার জন্য বাবাজি বাচ্চাটাকে জলে চুবিয়ে মেরে ফেলেছে। সেখান থেকে বিতাড়িত হয়ে আসলেন পাঁচপাড়া। এখানে তিনি আখড়া করে ওই নূপুরের ভজনা করতে লাগলেন। নূপুরটা ছিল রাধারানির। নিধুবনে রাতে রাধারানি বেড়াতে বের হলে সে নূপুর পা থেকে খুলে পড়ে যায়। সিদ্ধ পুরুষ বাবাজি সেই নূপুরের জন্য কত অপবাদ সহ্য করলেন আর এই নিয়ে সারা জীবন কাটিয়ে গেলেন। পরে সে নূপুর চুরি যায় আখড়া থেকে। সাধনা হল এটা রে। ভগবানের কিছু একটা স্মারক নিয়ে কাটিয়ে দেওয়া। গুরুনাম, গুরুবস্তু, মূর্তি, মালা, আচার, নিষ্ঠা, দেহচক্রের মার্জনা। এর কোনও একটা করলে তাঁর কাছে পৌঁছনো যায়। সেটা বড় কথা। তত্ত্ব দিয়ে, শাস্ত্র দিয়ে সাধনা হল। সাধনার প্রকাশ দেহে। দেহচক্রে সাধুর বাজার বসাতে হবে। না হলে উপায় নেই।'

বৈষ্ণবীর অমলিন বিশ্বাসের দিকে আমি তাকিয়ে আছি। ভাবছি সত্যি সত্যি নিত্যলীলা করেন গয়ুর রায়। কোনও কোনও ভাগ্যবান দেখিবারে পায়! আমার ভাগ্যবলে এমন একজন বৈষ্ণবী সাধিকার দর্শন পেলাম। যিনি দেহচক্রে সাধুর বাজার বসাতে বললেন। যদিও সে বাজার আজও বসেনি আমার। আমি হাটের মালের ছোট দোকানদার। ঘুরে ঘুরে কেবল রসদ সংগ্রহ করি। বাজার বসানোর সাধ্য কী আছে আমার!

শ্মশান সাধনার আখ্যান

শ্রাবণ মাস। সকাল থেকে অবিরাম বৃষ্টি হচ্ছে। তারাপীঠ মহাশ্মশান লাগোয়া দ্বারকা নদ ফুঁসছে আষাঢ়ের অবরুদ্ধ জলধারা নিয়ে। উত্তরমুখী তারা মায়ের মন্দিরখানির সামনে যে জীবিত কুণ্ডটি বর্তমান তার পশ্চিম দিকের পথ ধরে গেলে তারাপীঠ ভৈরব বামদেব বাবার আশ্রম কুটির। তিনি তারাপীঠ এসে প্রথম প্রথম থাকতেন কখনও মহাশ্মশানে, জীবিত কুণ্ডের ঘাটে, তারা মায়ের বিরামখানায়— কোনওদিন রাতে এসে শুয়ে থাকতেন মন্দিরের খোলা আঙিনায়। বামদেব বাবার ছাব্বিশ বছর বয়সে শ্মশানসিদ্ধি ঘটে। দীর্ঘ তিরিশ বছর তারাপীঠে এভাবে তিনি দিনযাপন করেছেন। ছাপ্পান্ন বছর বয়সে তাঁর ছোটবেলাকার বন্ধু, বামদেবপুরের গৃহীভক্ত নিতাই মণ্ডল খরুন গ্রামের বাবার শিষ্য রসিক গোঁসাইয়ের সহায়তাতে আশ্রম কুটিরটি তৈরি করেন। মাটির ঘরের চালে খড় বিছানোর সময় বামদেব পর্যন্ত হাত লাগিয়েছিলেন! এই ঘরে বাবা দেহ রাখেন ২ রা শ্রাবণ, বাংলার ১৩১৮ সন— ইংরেজির ১৯১২। পঁচাত্তর বছর বয়সি এক মহাপুরুষের অলৌকিক মহাজীবনের অবসান হলেও আজও তারা মায়ের নামের সঙ্গে যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও সম্মান নিয়ে উচ্চারিত হন বামদেব। দেহ রাখার পর তাঁর সর্বক্ষণের সেবক নগেন বাগচী ও উল্লেখ্য শিষ্য শাস্ত্রী হরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায় আশ্রম কুটিরটির রক্ষণাবেক্ষণ করতে থাকেন। বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে, ১৯৭০ সাল নাগাদ আশ্রম ঘরটি বামামিশনের উদ্যোগে পাকা মন্দির ও নাটমন্দিরে রূপায়িত হয়। ভক্তদের কাছে যা এখন পরম পবিত্র জায়গা হিসেবে বিবেচিত।

নগেন বাগচী বামদেব বাবার বহু বিচিত্র লীলার প্রত্যক্ষ সাক্ষী ছিলেন। পরবর্তী সময়ে তিনি গুরুর আশ্রম কুটিরে বসে বসে অধ্যাত্ম জিজ্ঞেসু ও

বামদেবপ্রেমীদের কাছে বাবার অলৌকিক লীলাকাহিনিগুলো বর্ণনা করতেন। শাস্ত্রী হরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন হুগলির মানুষ। সংস্কৃত সাহিত্যে পণ্ডিত। আইন নিয়েও পড়াশোনা করলেন। প্রথমে রিপন কলেজে সংস্কৃত সাহিত্যের অধ্যাপক হলেও আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের আহ্বানে যোগদান করলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজে। হরিচরণ তারাপীঠে বামদেব বাবার কাছে পৌঁছন, ত্রিশের কাছাকাছি বয়সে। বামদেব বাবা শ্মশানে বসেছিলেন তাঁর প্রিয় কুকুর কালু, ভুলুকে নিয়ে। শাস্ত্রী মশাইকে দেখা মাত্র বামদেব বললেন, হুগলি কলকাত্তাসে বাবু আয়া। হরিচরণ চমকে উঠলেন বাবার মুখে স্থান নির্দেশটি শুনে। তিনি তাঁকে প্রণাম করার পর বামদেব বললেন, যাও বাবা, তারা মাকে মার্কেণ্ডেয় চণ্ডী শুনাও। হরিচরণ অবাক হয়ে ভাবলেন তিনি যে সংস্কৃত পাঠে পারদর্শী কেমন ভাবেই বা জানলেন মহাত্মন! রথ দেখলেন হরিচরণ। তারা মায়ের নিত্য পূজিত ভোগমূর্তির বিগ্রহকে শৃঙ্গার বেশে সাজিয়ে রথে উঠিয়ে মন্দির থেকে তখন মহাশ্মশান অবধি পরিক্রমা হত। এখনও তারাপীঠে আষাঢ় মাসে রথযাত্রা ও উল্টোরথ উপলক্ষ্যে সুসজ্জিত রথে একইরকমভাবে মূর্তি স্থাপন করে মহাসমারোহে রথ টানা চলে। শ্রাবণের ২ তারিখ বামদেব বাবার আশ্রমে তিরোভাব দিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হয় দিব্যলীলার স্মৃতিচারণ। এই দিনও তারাপীঠে ভক্ত সমাগম হয়। শাস্ত্রীমশাই দেখলেন, তারা মায়ের রথের সামনে নানান কীর্তনের দল তারানাম ও হরির নাম করছে। বামদেব বাবা এগিয়ে এলেন রথের ধারে। মহানন্দে তিনি নাচতে লাগলেন পৃথুল শরীরটা নিয়ে। শুরু হল তারাপীঠে বাবার কাছে মাঝেমধ্যে কলকাতা থেকে হরিচরণের যাতায়াত। দীক্ষাও হয়ে গেল। দীর্ঘ সঙ্গ ও আলাপচারিতা সব তিনি ধরে রাখতে লাগলেন লেখার খাতায়। বামদেব বাবা দেহ রাখার পর শাস্ত্রী হরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায় বামামিশন প্রতিষ্ঠা করতে উদ্যোগী হলেন। লিখলেন গুরুর

দিব্যজীবনী শ্রীশ্রীবামলীলা। অদ্যাবধি বামদেব বাবার প্রামাণ্য জীবনী হিসেবে গ্রন্থখানি সারস্বত মহলে আদৃত।

গাছগাছালি ভরা ছোট্ট ছবির মতন গ্রাম আটলা। তারাপীঠ থেকে খুব দূরে নয়। এই গ্রামে বামদেব বাবার জন্ম হয় ফাল্গুন মাসে, শিবচতুর্দশীর রাতে ১২৪৪ সনে— ইংরেজির ১৮৩৭। বাবা সর্বানন্দ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন গ্রামীণ শিল্পী। মায়ের গান লিখতেন, আসরে আসরে পরিবেশন করতেন। মা তারার ভক্ত সন্তান তিনি। তাঁর বড় ছেলে হলেন বামাচরণ। বামদেব যখন জন্মান, বোবা শিশু ছিলেন। বোবা ভাইয়ের পরিচর্যা করতেন দিদি জয়কালী। তিনি সর্বানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম সন্তান। দ্বিতীয় বামাচরণ। সর্বানন্দ ও রাজকুমারী দেবীর আরও তিনটি কন্যা সন্তান হয়— দুর্গা, দ্রবময়ী, সুন্দরী। শেষে জন্মান রামচরণ। বর্তমানে আটলা গ্রামে যে বামদেব বাবার বংশধরেরা রয়েছেন তাঁরা হলেন রামচরণের মেয়ের বংশধর, বামদেব বাবার ভাইজির বংশ। রামচরণের চার মেয়ের নাতি - পৌনাতিরা আটলায় বামদেব বাবার পৈতৃক বাড়িতে বসবাস করেন। অন্নপ্রাশনের দিন সকলকে আশ্চর্য করে সর্বানন্দ ঠাকুরের বড় ছেলে প্রথম একখানি শব্দ বলেছিল, বাম। আস্তে আস্তে বোবা দশা কাটতে থাকে শিশুর— শব্দ করে কাঁদে, নির্দিষ্ট সময়ে কথা বলে। বাম থেকে বামা— বামা মানে মা তারা। শিবের বুকে মা বাম চরণ এগিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন— মা হলেন বামা। তাঁর চরণে শব হয়ে পড়ে আছেন শিব। শিব বামার চরণ বুকে নিয়ে হলেন বামাচরণ। সর্বানন্দের বোবা ছেলের মুখ থেকে প্রথম শব্দ বের হয়েছিল বাম, তিনি অন্নপ্রাশনের দিন নামকরণ করলেন বামাচরণ। বামার চরণে রাতদিন বিভোর হয়ে থাকতেন, কোনও জাগতিক হুঁশ তাঁর সেভাবে ছিল না বলে ভক্তমহলে বামাচরণ বামদেব হয়ে ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের চৌহদ্দিতে একেবারে সর্বমান্য হয়ে উঠলেন বামাখ্যাপা নামে।

বামদেব বাবার বড়দিদির বিয়ে হয়েছিল আটলার কাছের গ্রাম কাষ্টগড়ায়। বালবিধবা হয়ে ফিরে এলেন। সূচনা হল আধ্যাত্মিক জীবনের। বাবার মৃত্যুর পর তান্ত্রিক মতে সন্ন্যাস নিলেন। লাল কাপড় পরতেন জয়কালী দেবী, কপাল সিঁদুরে লেপা, হাতে ত্রিশূল। বিভিন্ন তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াতেন। সিদ্ধ সাধিকা হিসেবে জয়কালী দেবীর নাম গোটা বীরভূমে ছড়িয়ে পড়ে। একদিন সিদ্ধান্ত নিলেন তারাপীঠ মহাশ্মশানে সমাধি নেবেন। শ্মশানবাসিনী হলেন। এক বিকেলে মহাশ্মশানের সুপ্রাচীন শিমুলতলায় যোগাসনে বসলেন। কিংবদন্তি যে, তারাপীঠ মহাশ্মশানের পুরোনো সাদা শিমুল গাছের তলাতে সত্যযুগে দেবী সতীর ঊর্দনয়ন পড়ে শিলাময়ী দেবী অপরাজিতা উগ্রতারা রূপে বিরাজিতা ছিলেন। গুপ্তচীনাচার, শাল্মলী দহন তন্ত্রপুঁথির ভিতর মহাশ্বেতশাল্মলী বৃক্ষের কথাটি উল্লেখিত। শিমুল গাছের মূলে শিলাময়ী মূর্তিতে তারা মা বিরাজমানা। মহাশিমুল গাছের তলাতে বসে শ্রীরামচন্দ্রের দীক্ষাগুরু মহামুনি বশিষ্ঠদেব তারা মায়ের সাধনা করেছিলেন বলে জনশ্রুতি। বামদেবের বড়দিদি স্বেচ্ছা সমাধির জন্য বেছে নিলেন পবিত্র মহাশিমুল গাছের তলা। তারা মায়ের পাদপদ্মের নীচে বশিষ্ঠদেবের সাধনার পঞ্চমুণ্ডির আসন। দশমহাবিদ্যার দ্বিতীয় দেবী তারা বিদ্যার সাধনায় সিদ্ধি পাওয়ার পর বশিষ্ঠদেব ফিরে গেলেন নিজের দেশে। উত্তরকালে সিদ্ধ আসনে বসে তারা বিদ্যায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন তারাপীঠ মহাশ্মশানে বামদেব বাবার আগে আসা কয়েকজন মহতী সাধক। জয়কালী দেবী যোগারূঢ় অবস্থাতে সমাধি নিলেন। তখন বামাচরণ বসেননি মহাশ্মশানে তারা বিদ্যার সাধনায়। গুপ্তচীনাচার তন্ত্রের ভিতর উল্লেখিত যে, শাল্মলী বৃক্ষটি যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন এর তলে বসে এগারো হাজার সাধক সিদ্ধিলাভ করবেন। তারপর ঘটবে অভাবনীয় ঘটনা। কলির মধ্যভাগে লক্ষ সাধকদের ভেতর যিনি সিদ্ধিরুদ্র স্বরূপ, গাছখানিকে ছেদন করবেন। বামদেব একদিন রাতের বেলা

শ্বেতশিমুল গাছের কোটোরে আগুন ধরিয়ে দিলেন। তিন দিন ধরে জ্বলতে থাকল বহু পুরোনো গাছ। শাল্মলী দহন তন্ত্রের পুঁথিতেও লেখা রয়েছে গাছ নষ্টের কথা। বামদেব বাবার শিমুলতলায় সিদ্ধিলাভের পর ছয় মানুষের হাত এক করে বেড় না পাওয়া গাছখানি নিমেষে নষ্ট হয়ে গেল। তাঁর সময় থেকে গাছটি শুকিয়ে যেতে থাকে বয়সের ভারে। অনেকের আবার বিশ্বাস, ডাবুকের কৈলাসপতি বাবার ক্রোধে নাকি শ্বেতশিমুল গাছটা শুকিয়ে যায়। তিনি কাশী থেকে তারাপীঠ এসেছিলেন মহাশ্মশানে সাধনা করতে। কাশীর মহাত্মা ব্রহ্মানন্দ স্বামীর শিষ্য ছিলেন। সন্ন্যাস নাম কৈলাসানন্দ স্বামী। তাঁর সাধনার সময় সিদ্ধি দশার পর তিনি জ্বরে পড়েন। কৈলাসপতি বাবার মনে মন্ত্রসংশয় জাগে। সিদ্ধি আদৌ এল কিনা সেটা দেখার জন্য তিনি শ্বেতশিমুল গাছটাকে অভিশাপ দেন। শুকোতে থাকে মহাশ্মশানে অনেক জায়গা জুড়ে ডালপালা মেলে থাকা শ্বেতশিমুল গাছ। বামদেব বাবার সাক্ষাৎ শিষ্য শাস্ত্রী হরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন, বাবা তাঁকে বলেছেন কৈলাসপতি বাবার সাধনার অনেক আগে থেকে শুকোতে থাকে শ্বেতশিমুল। মড়া গাছটি পুড়িয়ে দেন বামদেব বাবা।

অধ্যাত্ম জিজ্ঞেসু, চিত্রকর ও লেখক প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় যখন তারাপীঠ মহাশ্মশানে পৌঁছন, বামদেব বাবার প্রবৃদ্ধ শরীর। কুটিরে বসে থাকেন। শ্মশান ধারে চলাফেরার মতন শক্তি নেই, অর্জিত অভূতপূর্ব শক্তির ছটা বর্তমান। প্রমোদকুমার দেখলেন, এক দীর্ঘকালীন রোগে ভোগা ছেলের মৃতদেহ নিয়ে এসেছে বাবা মা। বামদেব বাবার নির্দেশে তাকে মহাশ্মশানে রেখে আসার পর, চোখ খুলে উঠে দাঁড়িয়েছে সে! একশো কুড়ি-পঁচিশ বছর আগেকার তারাপীঠ মহাশ্মশান। ভয়াবহ— দিনের বেলাতেও ঘুটঘুটে। চারধারে ছড়ানো অজস্র নরকঙ্কাল, সার সার দেহাস্থি। দ্বারকার ধার পর্যন্ত শ্মশানক্ষেত্র বিস্তৃত। মানুষের পড়ে থাকা হাড় - পাঁজরা নিয়ে শেয়াল কুকুর

ঝগড়া বাধায়। শকুন উড়ে এসে বসে মাংস ঠুকরে খায়। নিম গাছের মাথায় তারস্বরে ডেকে ওঠে কাক। এখনকার তারাপীঠ শ্মশানের সঙ্গে পূর্বেকার মহাশ্মশান গুলিয়ে ফেললে চলবে না। তারা মায়ের রথঘরের পাশ দিয়ে গেলে শ্মশান। বিরাট এক নিমের গাছ বামদেব বাবার চালাঘরের উত্তর ধরে এগোলে। ওখানে রয়েছে বামদেবের গুরুদেব মোক্ষদানন্দ বাবার সমাধি। সে সমাধি আজও বর্তমান।

বামদেব বাবার সাধনার বহু আগে তারাপীঠ মহাশ্মশানে সাধনা করে গেছেন বিশে খ্যাপা। তিনি ছিলেন আঠারো শতকের প্রথম দিকের একজন প্রসিদ্ধ কৌলাচার্য। ১৭৮০-র পর দেহ রাখেন তারাপীঠে। তাঁর সমাধির চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় না। তাঁর সম্পর্কে তেমন কিছু জানাও যায় না। তারাপীঠের পুরোনো সাধন পরম্পরার ভিতর ওঁর নামটি কেবল পাওয়া যায়। শোনা যায় তিনিও অলৌকিক সিদ্ধির অধিকারী ছিলেন। বিশে খ্যাপার পর আরেক কৌলাচার্য তারাপীঠ মহাশ্মশানে সাধনা করতে আসেন ১৭৫০ সালের পর। তাঁর নাম আনন্দনাথ। নাটোরের রাজা রাজকৃষ্ণ রায় যখন তারাপীঠ আসা যাওয়া করতে করতে মহাপীঠকে জমিদারির ভিতর এনে তুললেন, মহাশ্মশানে সাধনা করছিলেন আনন্দনাথ ভৈরব। তাঁর কাছে দীক্ষা হল রাজার। মাতৃভক্ত সাধক রাজা বেশ কয়েকটি মায়ের গান রচনা করেন। প্রতি বছর আশ্বিনের শুক্লা চতুর্দশী থেকে যে বিশেষ তারাপুজো ও সাত দিনের মেলা চলে তার প্রবক্তা হলেন রাজা রাজকৃষ্ণ রায়ের তন্ত্রগুরু আনন্দনাথ ভৈরব। তাঁরও সমাধি খুঁজে পাওয়া যায় না। আনন্দনাথ ভৈরব দেহ রাখার পর দ্বিতীয় আনন্দনাথ কৌলমতের সাধনধারা ধরে রাখেন। তাঁর কাছে ছুটে এলেন প্রসিদ্ধ সাধক কবি কমলাকান্ত ভট্টাচার্য। তিনি কমলাকান্তকে বললেন, কৌল সাধনার জন্য স্ত্রী ত্যাগের দরকার নেই। তিনি শক্তি— আছেন যখন, ত্যাগ করবে কেন শুনি? সস্ত্রীক সাধনা করো, সিদ্ধি অবধারিত। দ্বিতীয়

আনন্দনাথ ভৈরবেরও সমাধি পাওয়া যায় না। ওঁর প্রশিষ্য হলেন বিশ্বেশ্বর বাবা। তিনিও তন্ত্রসিদ্ধ ছিলেন গুরুর ঐশী শক্তিতে। তারাপীঠ মহাশ্মশানে দেহ রাখেন তিনি। তাঁরও সমাধি নিশ্চিহ্ন। বিশ্বেশ্বর বাবার শিষ্য হলেন বামদেব বাবার শিক্ষাগুরু মোক্ষদানন্দ বাবা। তারাপীঠের কাছে রাতনা গ্রামে ওঁর জন্ম। গৃহী সাধক ছিলেন প্রথম জীবনে। পূর্বতন নাম মানিকরাম মুখোপাধ্যায়। বিশ্বেশ্বর বাবা ওঁর সন্ন্যাস দেন। নামকরণ করেন মোক্ষদানন্দ। তিনি গৃহী অবস্থাতে কাশী গিয়ে বৈদিক পণ্ডিতদের টোলে পড়াশোনা করেন। বৈদিক দীক্ষাও নেন। বামদেব যখন তরুণ সাধক, মোক্ষদানন্দ বাবা তাঁকে বেদ পড়ে শোনাতেন। মোক্ষদানন্দ বাবার সমাধিতে নিজের হাতে মাটি দেন বামদেব। বামদেব বাবার গুরু পরম্পরাকে নাথপন্থা বলে অনেকে ধরলেও আনন্দনাথজির গুরু পরম্পরার হদিশ মেলে না। বামদেব বাবার আরেক গুরু কৈলাসপতি বাবা। তিনি সাধনসঙ্গিনীর সঙ্গে বৃন্দাবন থেকে তারাপীঠ মহাশ্মশানে এসেছিলেন শ্যামশ্যামার অভেদ সাধনা করবেন বলে। বামদেবের বয়স ছাব্বিশ বছর। তিনি বামদেবকে সন্ন্যাসের পথে আনলেন, মোক্ষদানন্দজির কাছে সঁপে দিয়ে বৃন্দাবন ফিরে গেলেন। আশ্রম কুটিরে বসে আছেন প্রবৃদ্ধ বামদেব। দেখা করতে এসেছেন তরুণ জিজ্ঞেসু প্রমোদকুমার। প্রবৃদ্ধ সাধক জিজ্ঞেসা করছেন, তোমার কী কোনও রোগটোগ হয়েছে, নাকি কোনও সাংসারিক বিপদে পড়েছ তুমি? জিজ্ঞেসু বললেন, না তো! আমি এসেছি আপনাকে দেখতে, আপনার সঙ্গ করতে। তন্ত্রের সম্পর্কে জানতে। বামদেব বাবা অবাক হয়ে বললেন, মানুষ বিপদে না পড়লে তো আমার কাছে আসে না বাবা!

মোক্ষদানন্দ বাবার সমাধির পাশে নিম গাছের নীচে উত্তরমুখী করে বসিয়ে বামদেব বাবার সমাধি দেওয়া হয়। সেবক নগেন বাগচী বামদেবের দেহটিকে সাদা কম্বলের আসনে বসিয়ে দেন। ফটোগ্রাফার পাঁচকড়ি মেউর এসে

পৌঁছোন হাওড়া থেকে শাস্ত্রী হরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে। যে ছবিটি বামদেব বাবার বহুল প্রচারিত— পুজো হয় ঘরে ঘরে, সমাধি দশার ছবি। ১৯৭০ সালের পর বামামিশনের তৎপরতাতে আরেক প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, বামদেবের ইকড়া গ্রামের শিষ্য হৃষিকেশ চট্টোপাধ্যায় সমাধির ওপর ছোট্ট মন্দিরটি তৈরি করে দেন। মহাপবিত্র সমাধি মন্দিরে নিত্যপুজো হয়। বাবার সমাধির পশ্চিম ধারে থাকা তারা মায়ের শ্রীপাদপদ্মের মন্দিরটিও তৈরি করে দেন তিনি। সেখানেও ভক্তেরা পুজো দেন।

তারাপীঠ মহাশ্মশানের ভিতরে ছিল মুণ্ডমালিনী তলার মায়ের ঘাট। সাঁইথিয়া যাওয়ার রাস্তা হওয়ার পর, মহাশ্মশান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কিংবদন্তি যে, ব্রহ্মার মানসপুত্র বশিষ্ঠ মুনি মহাশ্মশানের এই জায়গাতে তারা বিদ্যার সাধনা করতে বসে আদিভূতা ব্রহ্ম সনাতনী দেবীর আটটি রূপ— তারা, উগ্রতারা, মহাউগ্রতারা, নীল সরস্বতী, চামুণ্ডা, বজ্রতারা ও ভদ্রকালী দেবীর ভিতর উগ্রতারা দেবীর রূপটি ধ্যানস্থ দশাতে ঠিকঠাক অনুধাবন করতে পারছিলেন না বলে সিদ্ধি হল না ভেবে প্রচণ্ড মানসিক অস্থিরতার ভিতর ফের তপস্যামগ্ন হলেন। মহাশ্মশানে দৈববাণী হল দেবাদিদেব মহাদেবের, শ্মশানকেন্দ্র মহাশ্বেতশিমুল গাছতলায় নীচে গিয়ে বসো। দর্শনাদির পর তিনি দ্বারকার স্বচ্ছতোয়া জলের ধারাতে নেমে ঘাটের কাছে পড়ে থাকতে দেখলেন মায়ের গলার মুণ্ডমালাখানি। এজন্য জায়গাটি মুণ্ডমালিনী তলা হিসেবে চিহ্নিত। বশিষ্ঠদেব মায়ের মুণ্ডমালা কুড়িয়ে পেয়েছিলেন বলে লোকশ্রুতি। বামদেব বাবা এখানে এসে মধ্যে মধ্যে তারা নামে বিভোর থাকতেন। বামদেবের পর নাপিত গোঁসাই নামক আরেক মাতৃসাধক মুণ্ডমালিনীতলা ঘাটের কাছে একটা কুটির বানিয়ে নিভৃতে সাধনা করেছিলেন। মুণ্ডমালিনীতলার ঘাটে গোঁসাইয়ের সমাধি আছে। অনেক সাধক বিশ্বাস করেন যে, এটাই তারা মায়ের স্নানের ঘাট। এখানে মা গলার

মুণ্ডমালা খুলে রেখে আজও স্নান সারেন। দিব্যচক্ষুর অধিকারীরা কেবল মায়ের উপস্থিতি বুঝতে পারেন বলে ব্রাহ্মমুহূর্তে কেউ এদিকে আসেন না।

শেষে বয়সের বামদেব আশ্রম কুটিরে সময় অতিবাহিত করতেন। কুটির থেকে বেরোতেন না। নানান খানের মানুষ আসতেন নিজ নিজ সমস্যা নিয়ে। বাবা শুনতেন, মানুষের অত্যাচারে গালি দিতেন, নিষ্পলক দৃষ্টিতে বিভোর হয়ে থাকতেন। নগেন বাগচীর সঙ্গে বাবার সেবাতে হাত লাগাতেন শাকম্ভরী মা। হুগলির সাহাগঞ্জের স্বচ্ছল বৈদ্য বংশের মেয়ে। দানধ্যান, সাধুসন্তের সেবার জন্য বৈদ্য পরিবারের সুনাম। সাত বছর বয়স থেকে শাকম্ভরী মায়ের মধ্যে নানান ভাব আসতে থাকে। বাড়িতে আসা সন্তরা বালিকার ঐশী শক্তি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। কৈশোরে বিয়ে হয়ে গেল। নদিয়া, কাঁচরাপাড়ার বৈদ্য পরিবারে। অল্প বয়সে বিধবা হলেন। স্বামীর মৃত্যুর পর পরিবার যখন তাঁকে পুনরায় বিয়ে দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে, জীবনে ঘটে গেল পরিবর্তন। ঘরে বসে তারাপীঠ ভৈরব বামদেব বাবার দেখা পেলেন, স্বপ্নাদিষ্ট হলেন। বিধবা যুবতী একা চলে এলেন তারাপীঠ। কুটিরে ছিলেন না বামদেব, শিমুলতলায় বসে বসে নানান সৎপ্রসঙ্গ করছিলেন। মাঝে মাঝে পথের দিকে তাকাচ্ছিনেন। সেবক নগেন বাগচী বুঝতে পেরে বললেন, বাবা কে আসবেন? শিমুলতলায় এসে দাঁড়ালেন সুদর্শনা যুবতী। বামদেব বললেন, আয়। যেন কত্ত দিনের চেনা! যুবতী এসে বসলেন পাশে। বাবা বললেন, দ্যাখো গো আমার শিষ্যা। কাল এর মন্ত্রপ্রাপ্তি হয়েছে। উপস্থিত সকলে জানতে পারলেন, বাবার সূক্ষ্মদেহ ধারণের শক্তির কথা। যুবতী বললেন, গতকাল বাবা গৃহে উপস্থিত হয়ে তাঁকে দীক্ষা দিয়েছেন, সাধনযোগ শিখিয়েছেন, রাতে স্বপ্নাদেশ দিয়ে আজ এখানে আসতে বলেছেন। শুরু হল শাকম্ভরী মায়ের বামদেবের কুটিরে যাতায়াত। তাঁর ছিল ভৈরবীর বেশ, হাতে ত্রিশূল, তেজময়ী দশা— তারাপীঠে এসে বাবার কুটিরে থাকতেন

মাঝে মাঝে। বামদেব বাবাকে রান্না করে খাওয়াতেন। ক্রমে ক্রমে শাকম্ভরী ভৈরবী মায়ের ঐশী শক্তির কথা নদিয়া সহ নানান পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে প্রচারিত হতে থাকল। বামদেব বাবা তাঁকে গুরুশক্তি দিয়েছিলেন। একদিন শাকম্ভরী ভৈরবী মা এলেন কুটিরে। যথেষ্ট বয়স হয়েছে বামদেবের, ফ্যালফ্যালে দৃষ্টি, মন সর্বদা তারাব্রহ্মে আত্মস্থ। নগেন বাবা সহ গুটিকয়েক ভক্ত সেদিন বাবার কুটিরে। ভৈরবী বললেন, গুরুদেব অনুমতি দিতে হবে যে এবার। সকলে অবাক। কিসের অনুমতি চাইছেন শাকম্ভরী ভৈরবী মা! সবাইকার সামনে মা বললেন, গুরুদেব আপনার দেহ ছাড়ার কাল আসন্ন। জ্যেষ্ঠ চলছে। শ্রাবণে চলে যাবেন। আমি আপনার অপ্রকট দশার বিরহ সইতে পারব না। বাবার দৃষ্টি আরও ফ্যালফ্যালে। মা বললেন, গুরুদেব অনুমতি দিন আমায়। নগেন বাবা দেখলেন বামদেবের আত্মস্থ দশাটি খানিক নড়বড়ে হল। তিনি শিষ্যার মাথাতে হাত রেখে বললেন, আচ্ছা তাই হবে মা। কুটির ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন শাকম্ভরী ভৈরবী মা। সেবক নগেন বাবা সহ উপস্থিত ভক্তরা কিছু বুঝতে পারলেন না। বামদেব বললেন, নগেন মায়েরা সন্তানের বিরহব্যথা সইতে পারেন না কোনওদিন। শাকম্ভরী তারা মায়ের শক্তিতে বলীয়ান। আমি যাওয়ার আগে স্থূলদেহ ছাড়ার অনুমতি চাইতে এসেছিল বেটি। দিন পনেরো বাদে বামদেবের আশ্রম কুটিরে খবর এল, শাকম্ভরী ভৈরবী মা দেহ রেখেছেন! সর্বক্ষণের সেবক নগেন বাগচী বুঝে গেলেন, বাবারও দেহ ছাড়ার সময়কাল আসন্ন।

শাওন ফকির ছিলেন ফরিদপুরের মানুষ। জোলা পরিবারের সন্তান। নৌকা বেয়ে জীবন নির্বাহ করতেন। একতারা বাজিয়ে গাইতেন দেহতত্ত্বের গান। নৌকা বাইতে বাইতে উদাস মাঝি শাওন গঙ্গা ধরে চলে এলেন চব্বিশ পরগনার বিষুপুর গ্রামে। তত্ত্বগানের আখড়া বসাতে গিয়ে স্থিতু হলেন, গেলেন না। গাঁয়ের মেয়েকে বিয়ে করে ঘরজামাই হয়ে রইলেন। শ্বশুরমশাই

আল্লাহর তালাশ করা জামাইকে নিয়ে গেলেন পির সাহেবের দরগায়। পিরের কাছে তত্ত্বজ্ঞান পেতে শাওনের শুরু হল দরগাহে যাতায়াত। পির তাঁকে বললেন, দ্যাখো বাবা, তোমার হিন্দু গুরু হবেন। মূর্তির ভিতর তোমাকে পরমাত্মার খোঁজ করতে হবে। তোমার গুরু আছেন তারাপীঠ মহাশ্মশানে। তুমি বাবা, গুরুর কাছে যাও। শুনে শাওন চমকে উঠলেন। বললেন, আমি যে জোলা মুসলমান! শাওন ফকিরের মনের অবস্থা আরও খারাপ হল। স্ত্রী, শ্বশুর - শাশুড়ি সবাই চলে গেলেন কলেরায়। ফরিদপুরেও কেউ নেই। নিঃসঙ্গ শাওন ফকির শেষমেষ পির সাহেবের কথামতো গিয়ে পৌঁছলেন তারাপীঠের মহাশ্মশান। দেখা পেলেন গুরুর। বামদেব তাঁকে বললেন, সাধনায় কোনও জাতপাত নেই। জগতে একটি জাত— মানুষের জাত। মানুষের ভিতর পরমাত্মা। মানুষ যখন পরমাত্মার সন্ধান পেতে চায়, গুরুর দরকার হয়। বামদেব মধ্য বয়সে পৌঁছে গেছেন। সব হারানো ফকির পঁচিশ বয়সের যুবক। এলেন গুরুর আশ্রয়ে। শুরু হল শিমুলতলায় বামদেব প্রদত্ত শাওনের তারা বিদ্যার পাঠ। জাতে মুসলমান, গুরুদেব রক্তবস্ত্র পরতে বললেন ফকিরদের মতো করে। শাওন তান্ত্রিক ফকির হলেন গুরুর কথামতো লাল আলখাল্লা পরে। গলায় পরলেন বামদেবের দেওয়া তারা বিদ্যার জপ করা রুদ্রাক্ষের মালা, হাতে একতারা। বামদেব একতারা বাজিয়ে তারানাম করতে বললেন। তন্ময় হয়ে তারানাম করতে করতে শাওন ফকিরের ভিতর প্রবেশ করল দিব্যশক্তি। গুরুশক্তি নিয়ে বাবার কথামতো শাওন ফকির দেশ ঘুরতে থাকলেন। ঘুরতে ঘুরতে নীলাচল, চৈতন্যদেবের পার্যদ হরিদাস ঠাকুরের জপস্থান সিদ্ধবকুলের নীচটিতে বসে তারানাম করেন। স্থানীয় মুসলমানেরা তাঁকে গুরু হিসেবে মেনে নিলে মহাত্মা ফকিরের কাছে দীক্ষা পাওয়া একটি সম্প্রদায় গড়ে উঠল রেতনা গ্রামে। শাওন ফকিরের দরগাহ তৈরি হল। দরগাহ আজও বর্তমান। দরগার দালানে রয়েছে

বামদেব বাবার সমাধি দশায় তোলা ছবিটি। বামদেব বাবা যেদিন দেহ রাখলেন, গুরুর শেখানো তারা বিদ্যার যোগশক্তিতে খবর পেয়ে গেলেন শাওন ফকির। ছুটে গেলেন বামদেব বাবার সমাধিতে মাটি দিতে।

বামদেব প্রৌঢ়ত্বের সীমান্তে দাঁড়িয়ে আছেন। ১৯০২ সাল। গভীর রাতে আশ্রম কুটিরে বসে তাঁর করা তারা, তারা নিনাদে দ্বারকানদ তীরস্থ মহাশ্মশান কেঁপে কেঁপে উঠছে। তিনি ছিলেন নাদসিদ্ধ, দীর্ঘকায় কৃষ্ণবর্ণ পুরুষের দেহ থেকে তারানামের নিনাদে ভূমিকম্প হত— প্রত্যক্ষ অনুভূতি হয়েছিল নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের। বিকেল বিকেল তিনি নেমেছেন মল্লারপুর রেলস্টেশন। মেঠো রাস্তা দিয়ে হেঁটে মহুলা গ্রাম। মহুলা পার হয়ে বামদেবের বাড়ি আটলা। কিছুটা হেঁটে মা তারার মন্দির। দ্বারকা নদ, মহাশ্মশান— পঞ্চাশ ফুট ওপরে মায়ের মন্দির। ধূলি ধূসরিত মেঠো রাঙা পথ ধরে হেঁটে পৌঁছতে হয় তারাপীঠ। এটা প্রধান রাস্তা। এ রাস্তা ধরে কত কত মহাত্মন তারাপীঠ এসেছিলেন! মল্লারপুর ধরে তারাপীঠ নিছক কোনও রাস্তা নয়, মুক্তিকামী মানুষের পায়ে চলা পথ। কলকাতা থেকে ট্রেন ধরে মল্লারপুর নেমে সে পথে চলেছেন দিশেহারা একুশ বছরের যুবক নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়, দক্ষিণেশ্বরে ভবতারিণী মায়ের মন্দিরের প্রতিষ্ঠাত্রী রানি রাসমণির দিনাজপুরের কাছারির সুপারভাইজার। বছর তিন আগে বিয়ে হয়েছিল, ওভারশিয়ারী পাশ দিয়ে নারায়ণপুরের জমিদারের কাছারিতে চাকরি করেন। স্ত্রী সুধাংশুবালা নদিয়ার কুতুবপুরে, বাড়িতে। এক রাতে লেখালেখির কাজ করতে গিয়ে টেবিলবাতির আলোয় স্ত্রীর ছায়ামূর্তির দর্শন করলেন! বাড়ি থেকে চিঠি এল। কুতুবপুর পৌঁছে শুনলেন, যে রাতে স্ত্রীর ছায়ামূর্তি দর্শন করেছিলেন, সে সময়টাতে স্ত্রী মারা যান! জীবন এলোমেলো হয়ে গেল নলিনীকান্তের। তাঁর একটাই খোঁজ, স্থূলদেহ খসে যাওয়া সূক্ষ্মদেহী স্ত্রীর আত্মাটির কীভাবে দেখা পাবেন! হিন্দু শাস্ত্র বলে আত্মা

অবিনশ্বর, আত্মার মরণ নেই। বিদেহী স্ত্রীকে দেখতে চান নলিনীকান্ত। কলকাতা পৌঁছে পরলোকতত্ত্বের খোঁজ পেতে চলে গেলেন থিয়োসফিক্যাল সোসাইটিতে। দেখা হল কাশীর তান্ত্রিক পূর্ণানন্দ পরমহংসদেবের সঙ্গে। তিনি বললেন, স্ত্রীর ভিতর রয়েছে আদ্যাশক্তির ছায়া। মহামায়াকে সন্ধান করো, তাঁর ভিতর স্ত্রীকে দেখতে পাবে। মাথা ঘুরে গেল নলিনীকান্তের। পূর্ণানন্দ চলে গেলেন কাশী। নলিনীকান্ত এমন একজন গুরু খুঁজছেন, যিনি স্ত্রী রূপে আদ্যাশক্তি মহামায়াকে দেখাতে সক্ষম। চাকরি থেকে ছুটি করে কাশী ছুটলেন সিদ্ধ মহাত্মাদের সন্ধানে। তাঁরা কেউ তাঁকে আশ্বস্ত করতে পারলেন না। চলে এলেন কলকাতা। পূর্ণানন্দের কাছে আগে দীক্ষা চেয়েছিলেন। মহাত্মা বলেছিলেন, আমি তোমার গুরু নই। তিনি নির্দিষ্ট হয়ে আছেন। সময় মতো ডেকে নেবেন। রাতে ঘুমোতে গেছেন নলিনীকান্ত দরজা জানালা সব বন্ধ করে। খানিকটা ঘুম ঘুম দশার ভিতর দেখলেন এক জ্যোতির্ময় কৃষ্ণবর্ণের সৌম্য মহাপুরুষ। তিনি ডেকে বললেন, নাও মন্ত্র। মহাপুরুষ তাঁকে রক্তচন্দনে বেলপাতার ওপর লেখা একখানি একাক্ষরী মন্ত্র দিয়ে অদৃশ্য হলেন। নলিনীকান্ত ভাবলেন এ নিশ্চয় স্বপ্ন। বন্ধ ঘরে কেউ আসবেন কী করে! আলো জ্বালানো মাত্র চমকে উঠলেন। স্বপ্ন যদি হয়, টাটকা মন্ত্র লেখা বেলপাতাটা এল কীভাবে! পুনরায় সন্ধানে বের হলেন। এ কিসের মন্ত্র, কেমন এর জপপ্রণালী? নলিনীকান্তের জিজ্ঞেসার পণ্ডিতেরা কেউ সমাধান করতে পারলেন না। ফের স্বপ্ন দেখলেন। চুল পাকা সৌম্য কৃষ্ণবর্ণের মহাপুরুষ তাঁর গায়ে হাত বুলাচ্ছেন আর বলছেন, তারাপীঠ মহাশ্মশানে যাও। ওখানে রয়েছেন তোমার গুরু। নলিনীকান্ত চলে এলেন মহাশ্মশান। আশ্রম কুটিরে আরক্তিম নয়ান মেলে বামদেব বাবা বসে। লুটিয়ে পড়লেন যুবক নলিনীকান্ত বাবার পায়ে। সর্বজ্ঞ বামদেব বললেন, ওরে তারা মায়ের ভিতর তো সব। ওই একাক্ষরী মন্ত্রের ক্রিয়া করে কীভাবে মাকে

পেতে হবে, দেখিয়ে দিলেন বামদেব বাবা। নলিনীকান্ত স্ত্রীকে দেখতে চান মায়ের রূপে! সম্মত হলেন গুরু। মহাশ্মশানে শবকে সংস্কার করে দিলেন বামদেব। গুরুর ইশারায় শবের ওপর বসলেন একুশ বছর বয়সি যুবক। গভীর রাত। ভয়ংকর শ্মশান। মড়া মানুষের মাংস নিয়ে টানাটানি করছে কুকুর শেয়াল। কী চিৎকার! সেই সঙ্গে বাদুর, শকুনের ডানা ঝাপটানোর বিকট আওয়াজ। সাপ চলছে সর সর শব্দ তুলে। শবের ওপর বসে নলিনীকান্ত। পাশে একটা প্রদীপ জ্বলছে। বামদেব বাবা তাঁকে বসিয়ে দিয়ে কুটিরে চলে গেছেন। মৃত মানুষের শরীরের ওপর বসে একমনে জপ করার চেষ্টা করছেন নলিনীকান্ত— বামদেব বাবার দেওয়া একাক্ষরী বীজ। মন যখন অনেকটা শান্ত, শুনলেন বজ্রভেদী নাদ— তারা, তারা। বুঝলেন গুরুদেব কাছাকাছি আছেন। জপে তলিয়ে গেলেন সাধক যুবক। রাতের শেষ প্রহর। ধ্যান ভাঙা মাত্র এক দিব্য জ্যোতির্ময়ী মূর্তি দেখলেন প্রথমে, দেখলেন পাশে দাঁড়িয়ে বামদেব। পরক্ষণে মূর্তির রূপ পরিবর্তিত হয়ে গেল। নলিনীকান্ত দেখলেন স্ত্রী দাঁড়িয়ে আছেন! গুরুর নির্দেশে চলে ইষ্টদেবীর মধ্যে স্ত্রীকে দেখতে পেলেন নলিনীকান্ত। পরবর্তী সময়ে তিনি হলে উঠলেন ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের বৈদিক ও তান্ত্রিক ধারার এক উজ্জ্বল আচার্য নিগমানন্দ সরস্বতী পরমহংসদেব। মায়ের কৃপা পুস্তিকাতে তিনি বামদেব বাবার কাছে নেওয়া সাধনপাঠ ও ইষ্টদেবী তারা মাকে স্ত্রী রূপে দেখতে পাওয়ার আনন্দকে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। যুবক সাধক দেখলেন তারা মায়ের স্বরূপ মূর্তি, জ্ঞান হলে চেয়ে দেখলেন দাঁড়িয়ে আছেন বামদেব!

বামদেব দেহ রেখেছেন। তারাপীঠ মহাশ্মশানে রোজ আসছেন হুগলির তেলিখানা শ্মশান থেকে এক যুবক। ভোর ভোর চলে আসেন, মহাশ্মশানে জপধ্যান সেরে ফিরে চলে যান রাতের বেলা তেলিখানা শ্মশান। দূরত্ব কম নয়। তেলিখানা শ্মশান থেকে পায়ে হেঁটে হরিপাল স্টেশন। কয়লার গাড়ি—

পাঁচ ঘণ্টার ট্রেনপথ উজিয়ে নামেন ভোরবেলা মল্লারপুর স্টেশন, পায়ে হেঁটে তারাপীঠের মহাশ্মশান। তেলিখানা শ্মশান থেকে বের হন মাঝ রাতে। তারাপীঠ মহাশ্মশান থেকে যখন ফেরেন তেলিখানা, রাত এগারোটা। কঠোর পরিশ্রম করে রোজ এত এত পথ উজিয়ে আসেন। থাকতে পারেন শ্মশান ধারের কোনও সাধকের কুটিরের বাহির - বারান্দায়! তিনি থাকেন না, কারও সঙ্গে কথাও বলেন না। আত্মমগ্ন সাধক। যুবককে দেখে মহাশ্মশানে থাকা বামদেবকে দেখা পুরোনো সাধুদের, তারাপীঠ মন্দিরের বয়স্ক পাণ্ডাদের ভীমভৈরব বামদেবের যৌবনের চেহারাটি মনে পড়ে। হুবহু একরকম দেহের গড়ন তরুণ তাপসের! বাড়ি তেলিখানা শ্মশান থেকে খানিকটা দূরের গবাটি গ্রামে। বছর বাইশের যুবক। ষোলো বছর বয়সে তাঁর দীক্ষা হয় বামদেব বাবার শিষ্য পঞ্চানন ভট্টাচার্যের কাছে। ছ'বছর বয়সে ঘটে আশ্চর্য ঘটনা। দেখতে পান তাঁকে আগলে রাখছেন সূক্ষ্মদেহী মহাত্মা। কে তিনি? বামদেব পরম্পরায় দীক্ষার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত সূক্ষ্মদেহী মহাত্মার অস্তিত্ব দেখতে পান কিশোর। দীক্ষার ঠিক আগে সূক্ষ্মদেহী মহাত্মার দেহখানা স্পষ্ট দেখতে পেলেন। গুরুর কাছে গিয়ে আরও আশ্চর্য! যাকে দেখেছেন, যিনি বিদেহী দশাতে তাঁকে রোজ আগলাচ্ছেন, মন্ত্র পর্যন্ত দিয়েছেন, সাধনযোগ, জপপ্রণালী দেখিয়ে দিয়েছেন তিনি গুরুর গুরুদেব! পঞ্চানন বাবার গৃহে বামদেব বাবার চিত্রপট দেখে চমকে উঠেন যুবক তাপস। দীক্ষার পর নিয়মিত দর্শন হতে লাগল বামদেবের। স্থুলদেহ আর সূক্ষ্মদেহে কোনও ব্যবধান রইল না! রোজ পাশে পান সাধনরত অবস্থার ভিতর বামদেব বাবাকে। কখনো জ্যোতি, বিদেহী আত্মার আওয়াজ, স্পষ্ট শরীর তারা সাধনার নানান নির্দেশ দিতে থাকে। দেহে থেকে দিব্যলীলা শেষ হওয়ার পর শুরু হয় বামদেব বাবার নিত্যলীলা। যেসব সাধক টের পেয়েছেন, উল্লেখ্য হলেন তেলিখানা শ্মশানের ভৈরব জ্ঞানানন্দ তীর্থাবধূত। নিজেকে বলতেন,

ভৈরব দাস — বামদেব বাবার চেলা। শেষ বয়সেও জ্ঞানানন্দ বাবার চেহারা ও আচরণে বামদেবের প্রতিকৃতি ফুটে উঠত! বলতেন, গুরুর চিন্তা করতে করতে গুরুর মতন আকৃতি প্রকৃতি হয়ে যায়। তন্ত্রের সাধন ও বামদেব বাবার নিত্যলীলা নিয়ে তিনি লিখেছিলেন বামদেব দর্শন আর বাম-ই তন্ত্র নামক দু-খানি বই। আটলাতে আছে বহু প্রাচীন খ্যাপাকালীর থান, জাগ্রত পঞ্চমুণ্ডির আসন। বামদেবের বাবা সর্বানন্দ ঠাকুর কালীতলাতে বসে মায়ের গান গাইতেন। দিদি জয়কালী যেদিন থেকে পঞ্চমুণ্ডির আসনে জপে বসলেন, দিব্য উন্মাদিনী হয়ে গেলেন। বামদেব অনেককে বলেছেন, দিদি আমার আশ্চর্য ভৈরবী গো। খ্যাপাকালীর থানে বসে বামদেবও কৈশোরকালে বাবার মুখ থেকে শোনা মায়ের গানগুলি গাইতেন, পঞ্চমুণ্ডিতে বসার পর দিদির মতন দিব্য উন্মাদ হয়ে গেলেন বলে জনশ্রুতি। জ্ঞানানন্দ বাবাও পঞ্চমুণ্ডিতে এসে বসতেন। বামদেব বাবার বাড়িতে তিনি শ্রীশ্রীবাম মহেশ্বর শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। জ্ঞান বাবা দেহ রাখেন ১৯৮৫ সালে। তেলিখানা শ্মশানে জ্ঞানানন্দ বাবার সমাধি দেন ওঁর ভক্তশিষ্যরা। তারাপীঠ মহাশ্মশানে বামদেবের সমাধির পশ্চিম ধারে তারা মায়ের পাদপদ্ম মন্দিরের গায়ে রয়েছে তারাপীঠ ভৈরব দাস জ্ঞানানন্দ বাবার স্মৃতিমন্দির।

তারাপীঠের উত্তরে বেশ অনেকটা দূরে উদয়পুরে আছে দক্ষিণমুখী কালীর মন্দির। আশ্চর্য ভয়ংকর মাকে এলাকাবাসীরা বলেন, তারা মায়ের বোন। মহাশ্মশান থেকে দ্বারকার জলে আসনমুদ্রা করে ভাসতে ভাসতে বামদেব আসতেন উদয়পুরে, মায়ের কাছে। কিছুটা দূরত্বে মল্লারপুর সিদ্ধনাথ। ডামরা-গণপুরের গভীর জঙ্গলে নানান বন্যজন্তুর চলাফেরা। জঙ্গলের হাতায় সিদ্ধেশ্বর ও সিদ্ধেশ্বরীর থান। এখানে বসে বামদেব তারা নামে বিভোর থাকতেন। কিংবদন্তি যে, রাজা ধৃতরাষ্ট্রের একমাত্র জামাই জয়দ্রথ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের আগে এখানে তপস্যামগ্ন হন। জয়দ্রথের আরাধিত শিব

হলেন সিদ্ধেশ্বর। পঞ্চ পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসের এলাকার ভেতরও পড়ে শিবপাহাড়ীর জঙ্গল। কিংবদন্তি মোড়া জাগ্রত শিবস্থানে অনেক মহাত্মারা এসেছিলেন নিরিবিলিতে সাধনা করবেন বলে। বামদেব শিষ্যভক্তদের বলতেন, মা তারা তাঁকে বলেছেন ওটি হল গিয়ে ত্রিযোজন সীমানা। এর পর থেকে আমার সীমানা। তারা মায়ের সীমানার পূর্বতন নাম ছিল চণ্ডীপুর, পরে তারাপীঠ হয়। প্রতি তিন মাইলে হয় এক যোজন— ত্রিযোজন হল ন মাইল। মায়ের ভক্তদের বিশ্বাস, এর ভিতরও রয়েছে তারা মণ্ডলী। বামদেবের শিষ্যরা বলেন, বাম মণ্ডলী। বামদেব যখন গুরু মোক্ষদানন্দের সঙ্গে কাশীধামে গিয়ে ফিরে আসছেন মহাশ্মশান, কিছুদিন শিবপাহাড়ীর জঙ্গলে নীরবে কাটিয়েছিলেন। এখনও বামদেব বাবার ভক্তরা সব ভিড় করেন। জায়গাটা তারাপীঠের মতন অত ঘনবসতিতে ভরা নয়। তান্ত্রিকেরা অনেকে মহাশ্মশান হয়ে মলেশ্বর সিদ্ধনাথের থানে আসেন বামদেব বাবার ঐশীশক্তি প্রত্যক্ষ করবেন বলে।

তারা মা ভগবতী চণ্ডীরূপে অবস্থান করেন বলে তারাপীঠের আদি নাম চণ্ডীপুর। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি— চার যুগে আছে ভগবতী চণ্ডী দেবীর স্থিতি, এ বক্তব্য গুপ্তচীনাচার তন্ত্রের। তারাপীঠ তারা বিদ্যায় সিদ্ধিলাভের জায়গা। বশিষ্ঠ, ভৃগু, দুর্বাসা, পরশুরাম মুনিদের সাধন ঘিরে তারা বিদ্যায় সিদ্ধিলাভের নানান কাহিনিমালা ছড়িয়ে আছে। তারাপীঠের গহীন জঙ্গল তারাব্রহ্মের সাধনার মহাক্ষেত্র হয়ে ওঠার সঙ্গে জড়িয়ে আছেন বশিষ্ঠদেব। শ্রীবিষ্ণু জনার্দন বশিষ্ঠদেবকে চিন থেকে তারাপীঠ পাঠিয়ে দেন প্রাচীন তারাক্ষেত্র বলে— কিংবদন্তি এমন সব কথা বলে। তিনি আসছিলেন চীন বা মহাচীন থেকে। মহাচীন বা মহাচীনাচারের উৎপত্তিস্থল হিসেবে তিব্বত সহ কিছু পাহাড়ি অঞ্চল, এমনকী কৈলাস-মানস সরোবরের অন্তর্ভুক্তি দিয়ে তিব্বত বা বশিষ্ঠদেবের মহাচীনকে ধরা যেতে পারে। যা তন্ত্রের রথক্রান্তার

অন্তর্ভুক্ত। চীনাচার বা মহাচীনাচারে ভগবতী তারা দেবী হলেন পূজ্য, পুজোর রীতিপদ্ধতি, আচার বশিষ্ঠদেব জনার্দনরূপী বুদ্ধের থেকে শিখে ভারতে ফিরে এসে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। বহুকাল অতিবাহিত। দক্ষিণ ভারতের তন্ত্র সাধক ভৈরবী সঙ্গে করে গেলেন চীনদেশে তারা সাধনা করবেন বলে। দৈববাণী পেলেন তান্ত্রিক কবীন্দ্র কর্ণাভরণম, যোনিপীঠে যাও তোমরা, লতা সাধনায় বসো। তাঁরা কামাখ্যায় চলে এলেন। দৈব নির্দেশে মগধ হয়ে রাঢ়ভূমি বীরভূম। নীলতন্ত্র পুঁথি পড়তে গিয়ে জানলেন, দ্বারকার ধারে গভীর জঙ্গলের ভিতর থাকা বশিষ্ঠদেবের সিদ্ধিআসন, পঞ্চমুণ্ডির কথা। সেখানে সাধন করে কবীন্দ্র আর ভৈরবী তারা মায়ের দর্শন লাভ করলেন। কবীন্দ্র তান্ত্রিকের সাধনার পর আরও আরও কাল অতিবাহিত। রত্নাগড়, বীরভূমের বণিক জয়দত্ত ফিরছিলেন দ্বারকা ধরে নৌকায় বাণিজ্য সম্ভার নিয়ে। ফেরার পথে সামান্য অসুস্থতায় বণিকের ছেলে মারা গেল। দাহকাজের জন্য নামলেন কবিচন্দ্রপুর গ্রামে। অদূরে চণ্ডীপুরের গহীন অরণ্য। শান্তির আশায় অরণ্যে প্রবেশ করে জয়দত্ত বণিক খুঁজে পেলেন শ্বেতশিমুলের তলায় মা তারার শিলাময়ী দেবীমূর্তি। সঙ্গে সঙ্গে খবর পেলেন জয়দত্ত সওদাগর, ছেলে উঠে বসেছে! মহাশ্মশানে দৈববাণী হল, মায়ের মন্দির প্রতিষ্ঠার। পবিত্র শিলার পাশে তিনি পেলেন অনাদি লিঙ্গ চন্দ্রচূড়। মায়ের মন্দিরের সঙ্গে প্রতিষ্ঠা দিলেন ভৈরব চন্দ্রচূড়ের। সেবাপুজো চলতে থাকল মা তারার নামে। কালেদিনে বীরভূমের জমিদারদের তত্ত্বাবধানে মন্দিরের শ্রীবৃদ্ধি শুরু হল। মন্দিরে চোখ পড়ল পাঠান রাজ আলীলকি খাঁয়ের। তিনি চণ্ডীপুর দখল করে নিলেন। তারা মায়ের সেবাপুজো বন্ধ হল। নাটোরের রাজা রাজকৃষ্ণ যখন চণ্ডীপুর উদ্ধার করলেন পাঠান সেনাবাহিনীর কবল থেকে, মা তারার সেবাপুজোর ভার তুলে নিলেন রানি ভবানী। সেই থেকে নাটোরের বংশ পরম্পরায় চলছে মা তারার সেবাপুজো। মায়ের মন্দিরে ব্রহ্মশিলাতে হয়

নিত্যপুজো ও ভোগ। ব্রাহ্মমুহূর্ত থেকে রাত্রি দশটা একে একে চলে স্নান, নববস্ত্র পরিধান, ভোগমূর্তি সুসজ্জিত করা, মঙ্গলারতি, প্রাতঃকালীন ভোগ, বিরাম, দুপুরবেলার অন্নভোগ, ফের বিশ্রাম, সন্ধ্যারতি-নহবতে বাজে ঢাক ও সানাই। মা তারার আরতির পর শীতলভোগ। ভোগ শেষে মূর্তিকে পালঙ্কে শয়ন নিবেদন করে চামর ব্যঞ্জন করেন সেবাইত পান্ডারা। রূপোর মুখমণ্ডল, মুকুট, মুণ্ডমালা, অলংকার খুলে রাখেন পালদাররা। বন্ধ হয় মা তারার দরজা। তারা মায়ের পরম পবিত্র উন্মোচিত ব্রহ্মশিলা আগে ভক্তদের দর্শনে নিষেধ ছিল। সিদ্ধপুরুষ ও মহাকৌলরা বলেন, বশিষ্ঠ আরাধিতা তারা মায়ের অনাবৃত রূপখানি দেখা হল মহা অপরাধ। কেননা মায়ের অনাবৃত রূপ কী সন্তানের পক্ষে দেখা কখনো, কোনওদিন শোভনীয় ব্যাপার হতে পারে? যাঁরা শাস্ত্রীয় যুক্তি মানেন, এখনও অনাবৃত ব্রহ্মশিলা দর্শন করেন না। বর্তমান পান্ডারা অনাবৃত শিলামূর্তির সর্বসাধারণে দর্শন করালেও সাধক তান্ত্রিকেরা মায়ের অমন দশার রূপ দর্শন করতে যান না। ব্রাহ্মমুহূর্তে জগজ্জননী তারা মায়ের ঘুম ভাঙিয়ে গর্ভাবাস পরিষ্কার করেন পালাদার পান্ডারা। সুগন্ধি তেল মাখিয়ে ঘড়া ঘড়া জল ঢেলে করানো হয় ব্রহ্মশিলার স্নান। নতুন কাপড় পরিয়ে, অলংকারভূষিতা করে রুপোর মুখমণ্ডল, মুণ্ডমালা, মুকুট পরিয়ে মা তারাকে সাজিয়ে চলে মঙ্গলারতি। মায়ের এ রূপ সর্বসাধারণে দর্শনের উপযোগী। দুপুরবেলা মায়ের ভোগে দেওয়া হয় আতপের অন্ন, ভাজা, তরকারি, মাছ, চাটনি, মিষ্টান্ন। মাংসভোগ হয় অষ্টমী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, সংক্রান্তি তিথিতে। অষ্টমী, চতুর্দশী, অমাবস্যা, পূর্ণিমাতে হয় বলিদান। মানতের বলি হয় শনি, মঙ্গলবারে। শারদীয় কোজাগরীর চতুর্দশী তিথিতে মা তারার পুজো হয় মহাসমারোহে। মহামুনি বশিষ্ঠদেব কোজাগরী চতুর্দশীতে মহাশ্মশানে ব্রহ্মশিলাতে তারা মায়ের দর্শন পান বলে জনশ্রুতি। জয়দত্ত বণিক মায়ের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন শারদীয় কোজাগরীর চতুর্দশী তিথিতে।

কোজাগরী চতুর্দশীর উৎসব ছাড়া তারাপীঠে রথযাত্রা, জন্মাষ্টমী, শিবচতুর্দশী, দোলযাত্রা, আমবারুণীর পুজোয় উৎসবের সমারোহ চলছে বামদেবের আমল থেকে। ফাল্গুন থেকে মাঘ— শিবচতুর্দশী হতে রটন্তীচতুর্দশী— তারাপীঠে এখনও সাধু মহাত্মারা এসে থাকেন। মলুটির মৌলাক্ষী মন্দির বামদেবের প্রথম সাধনপীঠ। মলুটির রাজবংশের কর্মচারী হয়ে মৌলাক্ষী মায়ের ফুলবাগানে মালির কাজ দিয়ে শুরু হয়েছিল বামদেবের জীবন। ফুল তুলতে তুলতে ভাবসমাধি হত তাঁর। বাবা চলে গেছেন— সংসারে অর্থকষ্ট। মৌলাক্ষী মায়ের মন্দিরে বামদেবের সাধনার হাতেখড়ি। সাধুরা তারাপীঠ এলে মৌলাক্ষী আসেন বামদেবের নিত্যলীলার পরশ পেতে। গর্ভগৃহে দেবীমস্তক ত্রিনয়নী। মৌলা মস্তক, ঈক্ষা মানে দর্শন দেবী মায়ের মস্তক দেখা যায় বলে মায়ের নাম হয়েছে মৌলাক্ষী। সাধকেরা বলেন, সর্বসিদ্ধি প্রদায়িনী মহানাম তারা। তারা নাম জপ করতে করতে অজপা হয় স্পন্দিত শ্বাসে-প্রশ্বাসে। বামদেব ভক্তশিষ্যদের বলতেন, তারা মা তারণ করেন। মা তারিণী, মা-ই তারক। তারক ব্রহ্মনাম যে করিস তোরা, তাও তিনি। তারা মা-ই বিপদআপদ, রোগব্যাধি, সাংসারিক যাতনা তাড়িয়ে দেন। ত্রাণ পাওয়ার জন্য তারা মাকে খুব করে ডাকতে হয়। তারা মায়ের কথা বলতে বলতে সমাধিস্থ হতেন বামদেব।

কায়া সিদ্ধকায়া পরকায়া

অথিক গুরু, পথিক গুরু, গুরু অগণন।

গুরু বলে কারে প্রণাম করবি মন?

দেহের মোহনিদ্রা না কাটলে শিববৎ অস্তিত্ব ধরা পড়ে না। মোহ ও অজ্ঞানের অস্তিত্ব নিয়ে আমাদের জীবন চলে। এর ভেতর আচ্ছন্ন হয়ে আমরা ঘুমিয়ে থাকি। যখন সাধনার দিকে এগোই তখন গুরুর দেখানো পথে শিববৎ দেহতত্ত্ব সম্মুখে উপস্থিত হয়। আত্মা শিববৎ। দেহের মূলাধার চক্র থেকে বিশুদ্ধ চক্র অবধি পাঁচটা ভৌতিকতত্ত্ব যখন ব্যবহারিক দশাতে চলে যাবে তখন শিবস্বরূপ আত্মার অস্তিত্ব টের পাওয়া যাবে গভীর সুষুপ্তির ভিতর। ভৌতিকতত্ত্ব এমনি করে পূর্ণতত্ত্ব হয়ে ফুটে উঠতে পারে দেহের মধ্যে। তত্ত্বের অনুভবপূর্বক শিববৎ অস্তিত্ব ধরতে দেহতত্ত্বের স্মরণাপন্ন হতে হবে। দেহকে না জানলে শিববৎ অস্তিত্ব জানা যাবে না। দেহের প্রথমতত্ত্ব পৃথ্বীতত্ত্ব। পৃথ্বীবীজ লং। গুরু যখন বীজখানাকে স্বীয় শিবরূপী আত্মার ব্যোমতত্ত্বে এনে শব্দরূপে ব্যবহারিক করে দিয়ে পৃথ্বীবীজ শিষ্যের মূলাধারে পুটিত করে দেবেন একমাত্র তখন দেহের মোহনিদ্রার মধ্যে যে এতকাল ধরে শিববৎ অস্তিত্ব লুকিয়ে থাকার দশাপ্রাপ্তি ছিল সেটা বেশ ভালোভাবে বোঝা যাবে। গুরুকরণের আগ অবধি দেহের মোহনিদ্রা কাটতে পারে না। মূলাধারের স্বয়ম্ভূলিঙ্গ দেহের স্বভাবজাত নিদ্রার বলে ঘুমিয়ে থাকে। গুরুর বিশুদ্ধ চক্রে স্পন্দিত করে দেওয়া পৃথ্বীবীজ যখন শিষ্য মূলাধারে জপ করতে থাকেন তখন স্বয়ম্ভূলিঙ্গের গায়ে জড়ানো যে চিৎশক্তি রয়েছে তাতে নাড়া খেতে থাকে। এভাবে রোজকার নাড়ানাড়ির প্রক্রিয়ায় বাতাসের সাড়া পেতে পেতে শববৎ স্বয়ম্ভূশিবের অস্তিত্বে প্রাণ-চৈতন্য আসতে থাকে। দীর্ঘ অভ্যাসযোগে

প্রাণ-চৈতন্য পুরোপুরি জেগে ওঠে। দেহের ভেতরকার ঘুম ভেঙে যায়। ঘুম ভাঙলে তখন অনুমিত হয় যে মূলাধারের শক্তিখানা এক এবং অভিন্ন। এক শক্তি আলাদা আলাদা চক্রে উঠতে উঠতে নতুন নতুন নামে স্থিতি নিচ্ছে। শক্তি যখন বছরের পর বছর ধরে অভ্যাসযোগ করার ফলে চরম অবস্থার ভিতর পৌঁছে যাবে তখন পাঁচটা দেহচক্র মুক্ত হয়ে ব্যোমতত্ত্বে চলে আসবে। শক্তি পুরোপুরি জেগে যাওয়ার ফলে শবরূপী শিব জেগে উঠবে। শিব জাগলে দেহের ভেতর থাকা অনাদি আত্মার নিদ্রা পুরোপুরি ভেঙে গেল। শিব ও শক্তির ক্রিয়া বিশুদ্ধ ছাড়িয়ে দুই ভুরুর মাঝখানে স্থিত আজ্ঞা চক্রে চলতে থাকল। শিবশক্তি এক হয়ে উঠল আজ্ঞাবিন্দুতে এসে। দেহের মধ্যকার এই অভিন্ন দশা, শিবশক্তির একত্ববোধ, মিলন-এর তখনও স্থায়ীত্ব আছে। বেশি সময় ধরে এই দশা দেহ বহন করবার উপযোগী হয়নি বলে মাঝে মাঝে মোহনিদ্রা উঠে ভিতরকার স্বরূপশক্তিকে ঝিমুনি দিতে চায়। যখন আজ্ঞা চক্র ভেদ হয়ে দেহের সীমা পুরো সরতে থাকে একখানা সীমা পরিসীমাহীন শান্ত অভ্যন্তর খুলে যায়, যাকে মনে হতে থাকে দিগন্তপ্রসারী মহাশূন্য তার ভিতর অবস্থান করতে পারলে দেখা যায় নিম্নস্তর ও উর্ধ্বস্তরের সমস্ত বন্ধানাদি কেটে গিয়ে জগৎ বহির্গত একটা স্থিতভূমি। ভূমিখানা আস্তে আস্তে আমার মধ্যে যেন লীন হয়ে যাচ্ছে। আমি যেমন ছিলাম তেমনি আছি। আমার সাকার অবস্থার কোনও পরিবর্তন হয়নি। সাকার সত্তাখানা চরমস্থিতি লাভ করেছে। দেখতে পাচ্ছি, অনুভব শক্তি আছে যখন আমার, আমি সাকার ও নিরাকারের মধ্যস্থলে তার মানে তখনও দাঁড়িয়ে আছি! দেখছি। আমি সাক্ষীস্বরূপ। আমার পরম অবস্থা। একে অধ্যত্মবাদ ব্রহ্ম বলে চিহ্নিত করেছেন। আমার শিবরূপী আত্মার মধ্যে ব্রহ্ম ফুটে উঠছে!

গুরুর প্রধান কাজ কেবলমাত্র বীজমন্ত্র দেওয়া কখনো নয়, তাঁর কাজ হল শিষ্যের দেহাভ্যন্তরের সমস্ত মোহনিদ্রা কাটিয়ে তুলে দেহের শিববৎদশা

দেখিয়ে দেওয়া। সেখানে প্রাণ - চৈতন্য রূপে কুণ্ডলিনীশক্তি ঘুমিয়ে আছে। দেহের ঘুম ভাঙলে শিবত্ব অনুভবপূর্বক দেহাভ্যন্তরের যে পূর্ণতত্ত্বগুলো রয়েছে সেগুলো সম্পর্কে অবগত করে দিয়ে গুরুদেব শিষ্যকে কুণ্ডলিনী জাগানোর জন্য সহায়তা প্রদান করতে থাকবেন। এটাই গুরুর একমাত্র কাজ। দেহের ভিতর জ্যোতিঃস্বরূপ যে শান্তব্রহ্মের অস্তিত্ব সেই ব্রহ্মস্থান আজ্ঞাকে চিনিয়ে দেওয়াও গুরুর কাজ।আজ্ঞা চক্রে শুভ্রজ্যোতি পাওয়ার পর শিষ্যের সাধনা পূর্ণব্রহ্মের অবস্থাদির ভিতরে এগোনো। পূর্ণব্রহ্মের পরাবস্থা পরব্রহ্ম। বৈষ্ণবরা শ্রীকৃষ্ণকে পরব্রহ্ম হতে অভিন্ন মনে করেন। পরব্রহ্মের ধ্যানে কৃষ্ণতেজ বা নীল জ্যোতির কল্পনা করেন বৈষ্ণব দেহসাধকেরা। ব্রহ্মাবস্থা দিগন্তপ্রসারী মহাশূন্যের ভাবনা। মহাশূন্যের ধ্যানে আসার সময় স্বভাবতই দেহ সরিয়ে আসতে হয়। দেহ যখন সরছে তখন কর্মাদিও সরছে। মহাশূন্যে ভাসতে ভাসতে কর্ম একেবারে ছোট হতে হতে শেষ হয়ে আসছে। মহাশূন্যের ধ্যানভাবনায় কর্মবীজ দগ্ধ হয়ে যায়। অর্থাৎ দেহের স্বাভাবিক কর্মধারা শান্ত হয়ে যায়। কর্মের ভিতর থাকে মায়া। কর্ম শেষ হল মানে মায়াও দূর হল। কর্মের প্রীতিকর ও অপ্রীতিকর সমস্ত অবস্থা থেকে সরে পড়ল দেহ। দেহ তখন দেহাতীত। মহাশূন্যে ভেসে ভেসে চলেছে। ব্রহ্মের একখানা শক্তি আছে, তেজ আছে। শক্তি যেমন দেহাভ্যন্তরের ইন্দ্রিয়ানুভূতির ক্রিয়াগুলোকে নষ্ট করে দিচ্ছে তেমনি তার তাপ গিয়ে পড়ছে সরাসরি একেবারে কর্মের প্রবৃত্তিতে। প্রবৃত্তিগুলো আস্তে আস্তে পুড়তে পুড়তে এক সময় কর্মবীজ নষ্ট হয়ে যায়। যখন কর্মবীজের ভস্মাদি উড়তে থাকে কুণ্ডলিনীর আগুনে পুড়ে দেহাতীত মহাশূন্যের বাতাস পেয়ে তখন মহাশক্তির অবতরণ হয়। আত্মা ব্রহ্মত্ব লাভ করে সিদ্ধ হয়। সিদ্ধ আত্মা জ্ঞানচক্ষু লাভ করে শিব-কৃষ্ণ-নারায়ণী-ব্রহ্মময়ী সব এক করে নেয়। জ্ঞান আর চৈতন্যে কোনওরকম কোনও ভেদ থাকে না। ব্রহ্মাবস্থার স্থিত জ্ঞানাগ্নি,

জ্ঞানের আগুনে যাবতীয় অজ্ঞান, দেবদেবীতে ভেদ, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে মনোমালিন্য সব কাটিয়ে দেয়। জ্ঞান তখন মহাজ্ঞান। এর উজ্জ্বল অভিব্যক্তি নিয়ে আমরা ফুটে আছি স্বরূপানন্দে উদ্বুদ্ধ হয়ে। জ্ঞান ও চৈতন্য এক হয়ে গিয়ে কেবল ব্রহ্মশিখা জ্বলছে। কেঁপে কেঁপে উঠছে। আমরা স্থির থেকে নির্বাণ হওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।

কুণ্ডলিনীর সঙ্গে আত্মার জাগরণ বিশেষরূপে সম্পর্কিত। কুণ্ডলিনী না জাগলে আত্মার সাড়া মিলবে না। আত্মা পরমাত্মাকে টেনে আনবে। মূলাধার চক্রে কুণ্ডলিনী জাগতে শুরু করে আর বিশুদ্ধ চক্রে গিয়ে উঠলে কুণ্ডলিনীর শব্দরূপ ধরা পড়ে। বিশুদ্ধ হল কণ্ঠ চক্র। কণ্ঠের ভিতর ব্যোমতত্ত্ব। কণ্ঠ চক্র ব্যোমতত্ত্বের কেন্দ্রাঞ্চল। কণ্ঠ চক্রে কুণ্ডলিনীর হিস হিস ধ্বনি টের পাওয়া যায়। কণ্ঠে ব্রহ্মপথ রুদ্ধ হয়ে আছে। কণ্ঠ জাগলে দিব্যস্বরূপ খুলে যায়। ব্যোম বা আকাশতত্ত্বে শূন্যভাবনার ভিতর কুণ্ডলিনী তার সর্বোচ্চ শক্তি প্রয়োগ করে ছড়িয়ে যেতে চায়। কুণ্ডলিনীর এইরকম প্রচেষ্টার ভিতর আত্মার জাগরণ শুরু হয়। ছটা চক্র ভেদ করে যেমন সহস্রারে পৌঁছে কুণ্ডলিনীর যুগলরূপ ফুটে ওঠে, দেহাভ্যন্তরের শিবশক্তি এক হয়ে পড়ে ঠিক তেমনি আত্মারও ছটা দশা ডিঙিয়ে সপ্তমভাবে পৌঁছে গেলে পরমাত্মার সঙ্গে তার যুগলরূপ ফুটে উঠে। আত্মায় সবার আগে জাগে জ্ঞান। জ্ঞান জাগলে শিবশক্তি, আমি-তুমি ভাব সরে যেতে থাকে আত্মা থেকে। তখন ফুটে ওঠে আমি-আমি ভাব। সর্বব্যাপক আমার চৈতন্য। এটা আত্মার আনন্দসত্তা। আনন্দের ভেতর লীলা ফুটতে থাকে। দ্বৈতলীলা, অদ্বৈতলীলা আত্মার আনন্দসত্তাতে মিশে গিয়ে আত্মার চিত্তসত্তা তৈরি করে দেয়। আত্মা তখন চিৎপ্রধান হয়ে ওঠে। চিদের ভেতর আনন্দসত্তার মেশামেশি। আনন্দ থেকে লীলা বের হচ্ছে। আনন্দ থেকে চিদব্রহ্মে স্থিতি আসতে থাকছে। চিদ থেকে সদব্রহ্মে স্থিতি। আত্মার রয়েছে জ্ঞানসত্তা। জ্ঞান থেকে উঠছে আনন্দসত্তা।

আনন্দের ভিতর চিদ ও সৎসত্তা। যেগুলো ব্রহ্মাবস্থার পর্যায়। তিন পর্যায় এক হয়ে সচ্ছিদানন্দরূপ ফুটে উঠছে। আত্মা পূর্ণসত্তাতে প্রস্ফুটিত হচ্ছে। চার স্তর পেরোনোর পর আত্মার পঞ্চমভাব বা সত্তা দ্রষ্টারও অনেক উঁচুতে। আত্মার তখন অন্তর্দষ্টা ভাব। এরপর তারও উপরে ফুটে উঠছে আত্মার আরেক ভাব। ষষ্ঠভাব আত্মার লীলাতীত। লীলার আনন্দপ্রধান দিকগুলো থেকে আত্মা লীলাতীত হয়েছে। লীলা ছেড়ে বের হয়েছে আত্মা। দ্রষ্টার অতীত অবস্থা লীলাতীত। আত্মার সপ্তমভাব লীলাতীতেরও অতীত। লীলাতীতাতীত। ওইখানে কোনও গণ্ডি নেই। উর্দতন অবস্থার ভিতর মিলন থেকে মহামিলন হয়ে গণ্ডি ভেঙে গিয়েছে। গণ্ডি যখন ভেঙে পড়েছে তখন আর লিঙ্গশরীর নেই। বিন্দুরূপে অলিঙ্গশরীর নিয়ে বসে আছেন সাধক। কায়াভেদ হয়ে গিয়েছে তাঁর।

গুরুশক্তি শিষ্যের দেহে প্রবেশ করে দিব্যজ্ঞান প্রদান করে অভিন্ন হৃদয় হয়ে যায়। একে বলা হয় শক্তিসঞ্চার। দেহরক্ষার আগে গুরুদেব তাঁর সবচেয়ে প্রিয় আধারকে শক্তিপাত দিয়ে যান। একে অনেকে বলেন আত্মাকর্ষণী। গুরুর আত্মার সঙ্গে শিষ্য বা তাঁর প্রিয় আধারের আত্মার সংযোগ স্থাপন হয়। গুরু শিষ্যের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে অভিন্ন হয়ে ওঠেন। পরকায়া প্রবেশে যেমন অন্যের যত অজ্ঞান, অবিদ্যা, দুঃখ টেনে আনা যায় আর নিজের জ্ঞান, আনন্দ, বিদ্যা সব অপরের দেহের মধ্যে সঞ্চার করে দেওয়া যায় এও তার একখানা স্থূলপ্রকাশ। একে জ্ঞানকায়া বা শক্তিকায়া বলা চলে। গুরু তাঁর প্রিয় আধারে নিজের সমস্ত বিদ্যা, শিক্ষা, সাধনা ভরে দিয়ে যান। এটা হল শিষ্যের দেহমধ্যে গুরুর জ্ঞানকায়া প্রবেশ। গুরুদেব যখন তাঁর সম্পূর্ণ সাধনশক্তি, কুণ্ডলিনীশক্তি শিষ্যের মধ্যে প্রবিষ্ট করে দিয়ে নিজেকে একেবারে নিজস্ব, ফকির ঘোষণা করেন তাকে বলা হয় শক্তিকায়া প্রবেশ। একে শক্তিপাত, শক্তিপাতদীক্ষাও বলা চলে। গুরুর এতদিনকার

জ্ঞান, সাধনা, তপস্যা তখন আর কিছু নেই। শিষ্যের আত্মা সমস্ত টেনে নিয়েছে। দুই আধারে মিল না থাকলে কখনো আত্মাকর্ষণী বিদ্যার প্রয়োগ হয় না। গুরুর শক্তি শিষ্যের দেহে প্রবেশ করে স্বীয় সহস্রার চক্রের পথে। সম্পূর্ণ খোলা সহস্রার নিয়ে গুরুকে তখন বসতে হয় সাধন আসনে। পূর্ণিমার রাতে যখন চাঁদে চকোর রাত্রি চলে কিংবা যখন যক্ষরাত্রি থাকে তখন গুরুদেব স্বীয় শক্তিকে সহস্রারের ঊর্ধ্বমুখীনদশা থেকে ফের আজ্ঞা চক্রে প্রতিস্থাপন না করে শিষ্যের সহস্রারের মুখের কাছে নিয়ে যেতে থাকেন। শিষ্যের খোলা সহস্রার গুরুশক্তি তখন টেনে নিতে থাকে। গুরুর অর্জিত বিদ্যাশক্তি শিষ্য নিজের সহস্রার থেকে নামিয়ে এনে মস্তিকে ভরে আজ্ঞার বিন্দুস্পন্দে বসিয়ে কিছুক্ষণ ধ্যান করতে থাকেন। তারপর গুরুশক্তিকে শিষ্য বিশুদ্ধ বা কণ্ঠ চক্রে এনে গুরুর মতন জ্ঞানমাধুর্য পাওয়ার আশায় একমনে শক্তিকে কণ্ঠকেন্দ্রে স্থির বিন্দুবৎ করে নিয়ে ধ্যানচিন্তায় ধরে রাখতে থাকেন। এগুলো একদিনের কাজ নয়। নির্দিষ্ট সেই তিথিযোগে শক্তি, দিব্যজ্ঞান এভাবে প্রবিষ্ট হতে থাকে গুরুদেহ থেকে শিষ্যদেহে। একে বলে শক্তিবীজবপন। কণ্ঠের গুরুশক্তি, দিব্যজ্ঞান দিয়ে এই ঘটনার পর হতে শিষ্য সকলকে তখন গুরুদেবের মতন আকর্ষণ করতে থাকেন। এগুলো ধরবার মতো আধার যাঁদের আছে, অন্তত যাঁদের মূলাধার খুলে কুণ্ডলিনী স্বাধিষ্ঠান চক্রে স্থিত হয়ে গেছে তাঁরা এইসব গুরু শিষ্যের ভিতর শক্তি সঞ্চারণের সূক্ষ্ম ক্রিয়াদিগুলো বুঝতে পারেন। এগুলো সাধারণ চোখে ধরা পরার বিষয় যেমন নয় ঠিক তেমনি গুরুর দিব্যজ্ঞানশক্তি সব শিষ্যের দেহে প্রবিষ্ট হওয়ার মতন ক্ষমতা থাকে না। সাধনায় দেহ তৈরি করতে হয়। সূক্ষ্মদেহ সূক্ষ্ম থেকে কারণ দর্শাতে গেলে শিষ্য গুরুদেবের জ্ঞানদান, বীজদান, শক্তিদানের সঞ্চারিত বাতাসগুলো সাধনরত মুদ্রাযোগের সময় গুরুর মস্তিক ছাড়ানো সহস্রারের ক্রিয়া থেকে টেনে এনে নিজের সহস্রারের বাতাস দিয়ে এগিয়ে এনে উপ্ত

সমস্ত জ্ঞান, মন্ত্র, শক্তির বীজগুলোকে মস্তিক পথে ভরে আজ্ঞা থেকে কণ্ঠ চক্রে ঢোকাতে থাকেন। এ হল গিয়ে পরকায়া বিদ্যার মতন শক্তিকায়া বিদ্যার প্রতিস্থাপন। এক দেহ থেকে আরেক দেহে শক্তি, জ্ঞান, মন্ত্রবীজ প্রবিষ্ট করে দেওয়া। গুরু ও শিষ্যের পূর্বতন অভিন্ন হৃদয়ের সম্পর্ক না থাকলে এগুলো কিন্তু হঠাৎ করে করা যায় না। সেজন্য উপযুক্ত সাধনদেহ আর দীর্ঘদিনের গুরুসঙ্গে শিষ্যের একত্র বাস না হলে কোনও শিষ্য গুরুদেবের শক্তিপাত গ্রহণ করতে সক্ষম হন না। অনেক শিষ্যদেহের পূর্বজ সংস্কারবলে একটা উপযুক্ত সাধনদেহ থাকে সেই দেহাদি গুরুদেব আবার চিনেও যান সেইসব দেহে বীজমন্ত্রের শক্তি সাধনবিদ্যার জ্ঞান, গুরুদেবের দীর্ঘ সময় ধরে তপস্ক্রিয়ায় তরঙ্গাদি চট করে ক্রিয়াবান হয়ে পড়ে। কণ্ঠ থেকে শক্তিপাতের তরঙ্গ নামিয়ে শিষ্য অনাহত বা হৃদয় চক্রপদ্মে প্রতিস্থাপন করে আটকে রাখেন কিছুক্ষণ। হৃদয় থেকে নাভি চক্রে, মণিপুরে তাকে এনে আরও দীর্ঘ সময় স্থির করে দেন। নাভি থেকে লিঙ্গমূলে, মূলাধারে নামিয়ে এনে বেশ কিছু সময় রেখে তাকে বিদ্যুৎলতা কুণ্ডলিনীর ল্যাজে জড়িয়ে দেন। পরবর্তী সাধনার সময় শিষ্য যখন ফের সাধন আসনে বসেন তখন নিজ কুণ্ডলিনীর ভেতর গুরুর শক্তিপাতের ক্রিয়াদি লেগে থাকার ফলে প্রাণ-চৈতন্য সরাসরি আজ্ঞাবিন্দুতে গিয়ে সহস্রারে উঠতে থাকে। বাকি চক্রসাধনগুলো আর প্রয়োজন হয় না। একে বলে মহাবিদেহা অভ্যাস। গুরুর দেহহীন বিদেহ শক্তি শিষ্যের ভিতরে যখন সহস্রার ক্রিয়াদিতে বিদেহ হয়ে উঠছে তখন গুরু ও শিষ্যের দুই বিদেহ কায়া গিয়ে মহাবিদেহা দশা সম্পন্ন করে দিচ্ছে। এভাবে শিষ্যের ভিতর গুরুদেবের শক্তিকায়া প্রবেশের মাধ্যমে শক্তির পরকায়া প্রবেশ ঘটে থাকে।

চার রকমের সিদ্ধ মহাত্মাদের সন্ধান মেলে ভারতীয় অধ্যাত্মবাদে। সাধন করতে করতে কোনও কোনও মহাত্মা সিদ্ধ হয়ে ওঠেন। এটা সাধারণ পথ।

সাধনা করতে এসে হঠাৎ করে কেউ গুরুশক্তির সম্পূর্ণ কৃপা পেয়ে যান। এঁরা হলেন হঠাৎসিদ্ধ সাধক। হঠাৎসিদ্ধরা গুরুর শক্তিকায়া নিয়ে সাধনরাজ্যে সম্মাননীয় হয়ে ওঠেন। কেউ স্বপ্নে দর্শনাদির মাধ্যমেও অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন হয়ে ওঠেন। এঁদের বলা হয় স্বপ্নসিদ্ধ। আর সর্বোচ্চ সিদ্ধদশার যাঁরা তাঁদের মন সর্বক্ষণ ষটচক্রভেদের ফলে সপ্তম চক্র সহস্রারে উঠে মাঝে মধ্যে লয় হয়ে যায়। বৌদ্ধমতে এই দশাপ্রাপ্তিকে নির্বাণ বলা হয়। ওই অবস্থার ভিতর দিয়ে ব্রহ্মজ্ঞান আসে। বেদান্তমত বলছে জগতের জ্ঞান ডুবে যাচ্ছে আত্মার মধ্যে আর আত্মা তখন অজ্ঞান জগতে বিচরণ করছে। একে পতঞ্জলদর্শন বলছে অসম্প্রতজ্ঞাত সমাধি। এমন সমাধি হলে পরে মহাত্মার কোনও দেহজ্ঞান থাকে না। যখন খুব ধ্যান ও একাগ্রতার ভিতর দিয়ে সমাধি আসে যার ভিতর দেহবোধ পুরোপুরি লুপ্ত হয় না, গাঢ় ধ্যানে মন পরমাত্মাতে একমুখী হয়ে পড়ে বলে একটা ধারণাবোধ উঠে আসে, একরূপভাবনা খুলতে থাকে — ব্রহ্ম, ঈশ্বর এক হয়ে পড়ে, এমন দশাপ্রাপ্তিকে পতঞ্জলি বলেছেন সম্প্রজ্ঞান সমাধি। যখন মহাত্মার দেহবোধ থাকে না তখন ব্রহ্মজ্ঞান হওয়ার পূর্ববৎ একখানা অবস্থার কথা বলে থাকেন তান্ত্রিকেরা। তাঁরা বলেন এমন দশাতে মন, বুদ্ধি, অহংজ্ঞানের লয় হচ্ছে। এটাই হচ্ছে অন্তঃশ্মশান। দেহের শেষাঙ্কের রঙ্গভূতি। এই ভূমিতে পৌঁছনোর জন্যে তন্ত্রের বাহ্যশ্মশান সাধনা। তান্ত্রিকেরা বলেন অন্তঃশ্মশান হল অজ্ঞানমণ্ডল। দেহের ছটা চক্র পেরোতে পারলে অসম্প্রতজ্ঞাত সমাধি, ব্রহ্মজ্ঞান, নির্বাণ, অজ্ঞানমণ্ডলের ছবিগুলো আসতে থাকবে। এই স্তরে দেহকায়াতে পরকায়া প্রবেশ ঘটে। অনেক মহাত্মাদের জীবনে এমন অলৌকিক ঘটনাদি ঘটেছে। এটা হল সাধনার সিদ্ধের সিদ্ধাবস্থা। মহাজাগতিক অস্তিত্বের নাভিকেন্দ্র, অখণ্ড চেতনার ধারা নিজের ধ্যান চক্র, নাভি চক্রে এনে ত্রিভৌমিক বোধকে সবার আগে নষ্ট করতে হবে। দেহবোধ

নষ্ট হলে মন সাড়া ফেলতে থাকবে। মন গেলে আত্মার ব্যাপ্তি ঘটতে থাকবে। আত্মা তখন দেহস্থ মেরুদণ্ডের নীচস্থ মূলাধারের প্রসুপ্ত জৈবীশক্তিকে উপ্ত করে কুলকুণ্ডলিনীকে জাগিয়ে বিভিন্ন চক্রের মধ্য দিয়ে ওপরে তুলতে তুলতে শেষপর্যন্ত সহস্রারে পরম শিবে মিলিয়ে দিতে সচেষ্ট হবে। জীবাত্মা আর পরমাত্মার একাত্মবোধ যখন দেহভূমিতে গিয়ে পড়বে তখন সেই দেহকায়াতে শক্তিকায়া, মন্ত্রকায়া তাড়াতাড়ি ফলাফল এনে দেবে। এমন মহাত্মাদের বলা মন্ত্রে হিত বা কল্যাণ অতি তাড়াতাড়ি হয়ে আসে। তাঁরা যদি যন্ত্র, কবচ ইত্যাদি ধারণের জন্য কাউকে দিয়ে থাকেন সেগুলো দ্রুত ফলাফল দিতে থাকে। এর প্রধান কারণ তাবিজে, যন্ত্রে মহাত্মা তাঁর দেহকায়া সরানো যে সহস্রারশক্তি তার সঞ্চার ঘটিয়েছেন। জৈবীশক্তি সেটা নয়। সাধারণ স্তরের তান্ত্রিকেরা জৈবীশক্তি নিয়ে কবজ, তাবিজ, যন্ত্র ইত্যাদি বানান বলে সেগুলো কাজ করে না কোনওভাবে। প্রক্রিয়া সার হয়। সাধকের থাকে ত্রিভৌমিক অস্তিত্ব। তিনখানা আধার। জড়াধার, ভাবাধার, চেতনাধার। জড়াধার সকল মানুষের থাকে। জড়াধার হল স্থূলদেহ। ভাবাধার হল মন। মনও সব দেহাধারে আবদ্ধ কিন্তু সমস্ত দেহাদিতে যা থাকে না তা হল চেতনাধার। আধ্যাত্মিক উপলব্ধি যখন আসতে থাকে তখন তিনটে আধারে আসতে থাকে। সাধনায় বসে তিনটে আধারকে উন্নত করতে হবে। দেহ উন্নত যে সাধকদের তাঁদের কল্যাণময়দশা থেকে কিছু সাংসারিক মঙ্গলাদির চিহ্ন আসতে পারে আমাদের লৌকিক জীবনে। মন শক্তিশালী যাঁদের সে সমস্ত সাধকদের মঙ্গলবোধ থেকে আমরা ক্রিয়াকল্প পেতে পারি। যেমন, রোগব্যাধি নাশ, আধ্যাত্মিক অনুশীলনের সাধনক্রম— যেগুলো শিখতে পারলে ইহজীবনে কিছু উন্নত প্রভাব আসতে বাধ্য। আর যেসব মহাত্মাদের চেতনাধার পুরোপুরি খোলা তাঁদের দেহকায়া কখন যে শক্তিকায়া, মন্ত্রকায়ার মুদ্রা ও ভঙ্গিমা দিয়ে হিতের উদ্দেশ্য ভরা কোনও দেহকায়াকে সঞ্চারিত

করতে থাকবে তা সঞ্চারিত দেহ নিজেও জানে না। এই হল গিয়ে মহাত্মাদের অযাচিত কৃপা। যা চাইলেও পাওয়া যায় না। গুরু তাঁর সবচেয়ে প্রিয় আধারে কিংবা অনেক মহাত্মারা অচেনা কোনও দেহাধারকে পূর্বজ সংস্কারের বলে এই কৃপাশক্তি দিয়ে যান। এমন ভাবে কৃপাসিদ্ধ সাধকদের জন্ম হয়। আরেক স্তর থাকে নিত্যসিদ্ধ। এমন অনেক সাধক সাধিকা আছেন যাঁদের গুরু, সাধনা, তপস্যা ইত্যাদির আলাদা করে প্রয়োজন হয় না। আপনে থেকে সমস্ত প্রক্রিয়াদি দেহের ভিতর ফুটতে থাকে। আধ্যাত্মিক বাতাবরণ দেহকে তখন শক্তিকায়া, মন্ত্রকায়া, যোগকায়ার উপাদান দিতে থাকে। নিত্যসিদ্ধদেহ এগুলো গ্রহণ করবার উপযুক্ত থাকে। ফলত শ্রীদেহে তখন সমস্ত কায়াসিদ্ধি ফুটে উঠতে থাকে। নিত্যসিদ্ধ মহাত্মাদের হৃদয়খানা সর্বক্ষণ ভক্তিমথিত থাকে। ভক্তিপথ দিয়েও কুণ্ডলিনী জাগতে পারে। ভক্তির প্রভাবে যখন কুণ্ডলিনী নাভির কাছে আপনা আপনি ঘোরাঘুরি করতে থাকে তখন রাধাভাব জেগে ওঠে। নামাচার্য বৈষ্ণব সাধকেরা এমনই বলে থাকেন। তাঁরা বলেন রাধারানি কোনও মানবীয় অস্তিত্ব নয়। রাধা হল নাভিশক্তি। তারকব্রহ্ম নাম নাভি দিয়ে করতে পারলে হ্লাদিনীশক্তি বা রাধাশক্তি জেগে যাবে। নাভির ভিতর রয়েছে ব্রজভাব। নাভি যখন ত্রিকুটির মধ্যে ঘোরাফেরা করে তখন গোপীভাব জেগে ওঠে। ত্রিকুটির ওপরে শক্তি উঠলে দেহাধারে রাধাভাব ফুটিয়ে তোলে। তারকব্রহ্ম নাম, কীর্তনাদি ভক্তির সর্বোচ্চ স্তরের ব্যাপার। কীর্তন বা নাম করার সময় মনকে আজ্ঞা চক্র ও সহস্রারে যদি ঘোরাফেরা করানো যায় তবে সিদ্ধ কীর্তন শ্রবণে নিত্যসিদ্ধ সাধক সাধিকাদের সমাধি হতে বাধ্য। তীব্র ও গভীর আনন্দানুভূতির অবস্থা না হলে সমাধি হয় না। সমাধির ভিতর যখন দেহকায়া আজ্ঞাবিন্দুতে উঠে সহস্রারের শক্তি টানতে থাকে তখন তাকে বলে আনন্দযোগ। দেহকায়া শুধু যখন আসনে পড়ে থাকে আর দেহ দেহাতীত হয়ে যায়, এমন দশাতে যোগিরা

পরকায়া প্রবেশের পথে চলে যান, গুরু প্রিয় আধারকে শক্তিকায়া প্রদান করেন এমন দশাপ্রাপ্তির ভিতর দিয়ে। দেহের এমন অবস্থাকে বলা হয় কঙ্কালমালিনী দশা। এগুলো সব যোগি শরীরের পরকায়া প্রবেশের ছোট্ট ছোট্ট প্রক্রিয়া। কুণ্ডলিনী যখন সহস্রারে থাকে তখন উপ্ত চক্র থেকে এক ধরনের রস গড়াতে থাকে। এই রস জারিত হয় সহস্রারে। সহস্রারকে অনেকেই গুরু চক্র বলে থাকেন। সহস্রারের রস যদি রক্তের সঙ্গে মেশার সুযোগ পায়, সারা দেহে তখন অনাস্বাদিত আনন্দ বইতে থাকে। একে বলে অনিন্দ্যনন্দরসাবস্থা। একমাত্র নিত্যসিদ্ধরা এই অবস্থাতে থাকতে সক্ষম। তাঁদের জীবনে পরকায়া প্রবেশের ক্রিয়াত্মক ঐশ্বর্যগুলো আসতে দেখা গেছে। ভারতীয় অধ্যাত্মবাদে এর কিছু নজির রয়েছে। যোগিদের পরকায়া প্রবেশ নিয়ে প্রসিদ্ধি ও কিংবদন্তি কম নেই। কিন্তু কিংবদন্তি ও প্রসিদ্ধির বাইরে গিয়ে এটা বলা যায় যে, পরকায়া প্রবেশ নিত্যসিদ্ধ মহাত্মাদের অতি উচ্চ ক্ষমতার প্রদর্শন। একে যোগের শ্রেষ্ঠ বিভূতি হিসেবেও দেখা হচ্ছে।

দেহসিদ্ধির প্রধান শর্ত হল রক্তশোষণ। কুণ্ডলিনীর ক্রিয়া যখন ঊর্ধ্বমুখীন তখন সত্তা রক্তহীন হয়ে পড়ে। বিরাট চৈতন্যের মধ্যে যোগির সত্তা লয়প্রাপ্ত হয়। রক্তশূন্য সত্তা বলে যোগসত্তা স্থূল সারবত্তা হারিয়ে ফেললেও পুরোপুরি মৃত্যুর অধীনে চলে যায় না। দেহে যখন পূর্ণব্রহ্মের আবির্ভাব ঘটে তখন সিদ্ধকায়া সম্পন্ন হয়। এই কায়া দিয়ে অনেক অলৌকিক কার্যাবলি নিষ্পন্ন হয়ে যায়। কায়াসিদ্ধ মানে হল তখন আর দেহ ও আত্মার ভেদ থাকে না। দেহের কর্ম সমাপ্ত হয়ে পড়ে, আত্মা ক্রিয়া করতে থাকে। আত্মার ক্রিয়াদি ঊর্ধ্বলোকের। দেহে যখন ঊর্ধ্বলোকের দশাপ্রাপ্তি ঘটে তখন তা জাগতিক কর্মাদির বাইরে বেরিয়ে পড়ে। কর্মের মায়া থাকে না বলে এই দেহাদি দিয়ে এমন সব কার্যাবলি সম্পন্ন হয় যেগুলো কালের গণ্ডিতে আটকে থাকে না। কালবিনাশ হয়ে যায়। এমন অবস্থাকে বলা হয় মরকায়। মরকায় দেহাদি

নিয়ে ইচ্ছে হলে শিষ্যের দেহাদির প্রারব্ধভোগ কমিয়ে দিতে পারেন গুরু। দেহপাতও ঠেকিয়ে দেওয়া যায় বারতি কিছু নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। স্থূলদেহ, সূক্ষ্মদেহ, কারণ দেহাদির কথা আমরা সকলে জানি। কারণের পর আছে মহাকারণ। মহাকারণে মহামায়া অচিৎ হয়ে স্বচ্ছ উপাদান তৈরি করতে থাকে। তখন স্থূল, সূক্ষ্ম দেহাদিতে যে মায়াময় কার্যাদি থাকে সেগুলো বন্ধ হয়ে পড়ে, কারণদেহ থেকে মায়া ও প্রকৃতি অভিন্ন হয়ে গিয়ে কার্যদেহের স্থূলভাগ, সূক্ষ্মভাগ যেগুলো পঞ্চভূতের উপাদান দিয়ে তৈরি সেই পাঁচটা তত্ত্বকে নষ্ট করে ফ্যালে। দেহের তত্ত্বময় উপাদানাদি সরে গেলে কারণদেহ মহাকারণদেহাদিতে পরিগণিত হয়। মহাকারণে আসে দেহের কৈবল্যবোধ। বিদেহ হওয়ার প্রক্রিয়াদি এখান থেকে শুরু হয়। মায়াপ্রবিষ্ট দেহের কর্মাদি থামা মানে দেহ বিদেহ। কৈবল্যদেহ বিদেহ স্তরের। এই স্তর থেকে যোগিদেহের অপার্থিব লীলাদি শুরু হয়। গুরুকৃপা যদি শিষ্যদেহে প্রবেশ করে কিছু, তা আসে এই বিদেহ কৈবল্যদশা থেকে। এই দশার পর দেহ হংসদেহে রূপ নেয়।' হংসদেহ হল দেহের ভাসমান অবস্থাদি। ভারতীয় মহাত্মাদের সম্পর্কে অনেক আকাশ গমন বা যোগাসন ভূমিতল থেকে ওপরে তোলার কিংবদন্তি আছে যাকে বলা হচ্ছে অধ্যাত্মবাদে শূন্যমার্গে বিচরণ—এটার সূচনা হয় হংসদেহ থেকে। আচার্য শঙ্কর ও গুরু গোরক্ষনাথের আকাশ গমনের প্রসিদ্ধির কথা শোনা যায়। মহাত্মা রাম ঠাকুর যুবক বয়সে নোয়াখালির এক বাড়িতে রান্নার কাজ করতেন। সবাইকে খাইয়ে দাইয়ে তিনি নিজের খাদ্যাদি গবাদি পশুকে দিয়ে এসে স্নান সেরে বসতেন ধ্যানাসনে। একদিন গভীর রাতে পাচকের প্রয়োজন হলে মনিব এসে দেখলেন যে, ঠাকুর মশাই বিছানাতে মশারির নীচে আসনে উপবিষ্ট আছেন কিন্তু দেহ শূন্যে উত্থিত এবং উজ্জ্বল এক আলোক বলয় তৈরি করে নিয়েছে। গৃহস্বামী এই দৃশ্য দেখার পর তাঁকে রান্নার কাজ থেকে অব্যাহতি

দেন ঠিকই কিন্তু মাসিক বেতন বন্ধ করেন না। রাম ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র মহেন্দ্র চক্রবর্তী লিখেছেন যে, নোয়াখালি থেকে ঠাকুর যখন নিজের বাড়ি ডিঙ্গামাণিক যেতেন তখন সমস্ত ঘর থেকে দূরের এক খড়ের ঘরে থাকতেন। এক রাতে বেড়ার ফাঁক দিয়ে তিনি দেখলেন রাম ঠাকুর পদ্মাসনে গভীর ধ্যানমগ্ন। দেহ নিস্পন্দ। গ্রীবা স্ফিত। ওই অবস্থায় ঠাকুর ঘণ্টার পর ঘণ্টা উপবিষ্ট রয়েছেন। এমন দশাতে দেহ বিদেহ হয়ে গিয়ে অন্য স্থানে নতুন দেহধারণ করে গুরুনির্দিষ্ট কার্যাবলি করতে পারে। মহাকারণদেহ থেকে কৈবল্য ও হংসদেহ গুরুকৃপা ব্যতিরেকে প্রাপ্ত হতে পারে না। গুরুনির্দিষ্ট কর্মাদির জন্য এই দেহগুলো রূপ নেয়। আকাশ গমন, সাধকের আসন উত্থানাদির কারণও ওই সকল নির্দিষ্ট কর্মাদির জন্য। আঠারো শতকের শেষ দিকে জন্মেছিলেন বিশিষ্ট তান্ত্রিক লেখক ভাস্কর রায়। তিনি ছিলেন দক্ষিণদেশের মানুষ। শেষ জীবন কাশীতে কাটিয়েছিলেন। উনিশ শতকের প্রথম দিকে দেহ রাখেন। তাঁর সম্পর্কেও আসন উত্থানের প্রসিদ্ধি রয়েছে। কাশীর প্রাচীন গ্রন্থাদি গুরুপরম্পরাচরিতের ভিতর লেখা রয়েছে যে, তাঁর আসন যখন শূন্যে উত্থিত হত, গোটা কুঠিয়া উজ্জ্বল আলোকে ভরে যেত। প্রথম অঘোর গুরু কিনারাম বাবা ছিলেন সতেরো শতকের মানুষ। হিমালয় ও বিন্ধ্যাচলের গিরনা ছিল তাঁর সাধনক্ষেত্র। বলা হয় যে গুরু দত্তাত্রেয় কালরাম বাবার দেহে পরকায়া প্রবেশের মাধ্যমে প্রবিষ্ট হয়ে কিনারাম বাবাকে দীক্ষা দিয়েছিলেন। দত্তাত্রেয়ের আকাশ গমনের কথাও সুপ্রসিদ্ধ। কথিত যে, তিনি এক অহোরাত্রে ভারতের বিভিন্ন তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়িয়ে গুরুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদন করতেন। ভাগবতে দত্তাত্রেয়কে বিষু ভগবানের ষষ্ঠ অবতার বলা হয়েছে। অত্রি ঋষি ও অনুসূয়ার ছেলে দত্তাত্রেয় অলর্ক ও প্রহ্লাদাদিকে আত্মবিদ্যা প্রদান করছেন, এ বর্ণনাও ভাগবতপুরাণের। মার্কেণ্ডেয়পুরাণে রয়েছে, দত্তাত্রেয় বহুকাল লোক-সংসর্গ পরিত্যাগ করে

সরোবরে সাধনা করেছিলেন। দত্তাত্রেয় ছিলেন যোগি। তাঁর নামে প্রসিদ্ধ দত্তাত্রেয়সংহিতাখানা যোগি সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠেয় আসনপ্রণালীর সমুদায় অঙ্গের জন্য সবিশেষ উল্লেখ্য। গুরু গোরক্ষনাথের নামে প্রসিদ্ধ গোরক্ষসংহিতাতে যেসব আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার সহ যোগাঙ্গের বিবরণ ও ষটচক্রভেদের সবিশেষ বৃত্তান্ত রয়েছে সেগুলো হঠপ্রদীপিকা ও দত্তাত্রেয়সংহিতার প্রণালীক্রম ধরে লিখিত। অঘোরী কাল্টের প্রধান গুরু কিনারাম বাবার সাধন আসন আছে কাশীতে। সেই আসন লোহার শিকল দিয়ে বাঁধা রয়েছে। বাবার শিষ্যরা বলেন, খোলা আসন সকলের চোখের সামনে মাটি ছেড়ে উপরে ভেসে থাকত বলে সেটাকে এখন বেঁধে রাখা হয়েছে। তন্ত্রের পঞ্চমুণ্ডি আসনও সিদ্ধকায় তান্ত্রিকদের ক্রিয়াদি করার ফলে খুব জাগ্রত হয়ে ওঠে আর সেই আসনে যদি কোনও স্থূলকায়, সূক্ষ্মকায়, কারণকায় মানুষ বসে পড়ে ক্রিয়াদি করতে থাকেন তাহলে ক্ষতি হতে পারে ভেবে সিদ্ধকায় তান্ত্রিকেরা তাঁদের আসন সাধন শেষে নিষ্ক্রিয় করে রাখতেন। এইসব ঘটনাদি থেকে অনুমেয় যে, আসন উত্থান আর আকাশ গমন একটা সাধন প্রক্রিয়া। সিদ্ধকায় দেহের লঘুতানাশের ফলে আসন উত্থানের ঘটনাদি ঘটে। সাধনা, তপস্ক্রিয়া এগুলো সব রজোগুণের ক্রিয়াদি। এগুলো করতে করতে সত্ত্বগুণের আধিক্য বাড়তে থাকে দেহের আর তমোময় গুণাবলি একেবারে চলে যায়। এর ফলে দেহের গুরুত্বাদিও কমতে শুরু করে। স্থূল আবরণ দেহকে আর আচ্ছন্ন করে রাখে না বলে দেহ হালকা ও তেজোময় হতে থাকে। যত দেহে সত্ত্বগুণের উৎকর্ষ বাড়তে থাকে তত দেহের লঘুত্বনাশ হতে থাকে। এর ফলে দেহের বায়ু ঊর্ধ্বস্তরের দিকে ক্রমশ ক্রমশ এগিয়ে যেতে থাকে আর দেহের লঘুতা যখন অনেকক্ষণ ধরে তপস্ক্রিয়ায় একেবারে বর্জিত হয়ে যায় তখন উত্থান হতে থাকে সিদ্ধকায়ের। কুণ্ডলিনী প্রবলভাবে চৈতন্যশক্তিকে আঘাত করলে দেহ শূন্যে উত্থিত হয়। সাধক যদি

কুম্ভক আসনাদি ভালোভাবে অভ্যাস করতে থাকেন তাহলে আসন উত্থানের আভাস পাওয়া যায় সাধন জীবনে। তবে সিদ্ধকায় না হলে ভেসে বেড়ানো আর এক জায়গা থেকে অন্যখানে যাওয়া কিংবা দুই দেহ ধারন করা সম্ভবপর নয়। এই ঘটনা গুটিকয়েক সিদ্ধ মহাত্মাদের জীবনপঞ্জিতে খালি মেলে।

রাম ঠাকুর, লোকনাথ ব্রহ্মচারী, বিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেব, রামদাস কাঠিয়া বাবাজি— সকল মহাত্মাদের জীবনলীলা উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে বিশ শতকের প্রথমার্ধ। এঁদের জীবনেও আসন উত্থানের ঘটনাদি স্বীয় স্বীয় শিষ্যভক্ত মহলে প্রচারিত আছে। প্রত্যক্ষদর্শী পুরোনো শিষ্যমহল থেকে এগুলো অল্পাধিক প্রচারিত হতে হতে এখন তাঁদের জীবনীগ্রন্থাদির ভিতরও অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছে।

দেহে যখন ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া, প্রাণের ক্রিয়া ও মনের ক্রিয়াদি একেবারে বন্ধ হয়ে যায় তখন নিষ্ক্রিয় আত্মা বিশ্রাম করতে থাকে আর আত্মার চোখ দিয়ে দৃকশক্তি প্রকাশমান হতে থাকে। গুরুর এমন দশাতে প্রিয় শিষ্য বা আধার যদি গুরুর কাছে থাকেন, তিনিও যদি খানিক ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও মনের ক্রিয়াদি স্তব্ধ করে নিয়ে গুরুর দৃকশক্তিকে নিজ আত্মায় টেনে আনবার ক্ষমতা রাখেন তবে শিষ্যের দৃকশক্তিও গুরুর দেহ থেকে অখণ্ড দৃষ্টিশক্তির নিরীক্ষণ ধারায় তৎক্ষণাৎ নিজের মধ্যেকার ইড়া, পিঙ্গলা নাড়ির বাতাসকে বের করে সূক্ষ্মভাবের সুষুম্নামার্গে প্রবিষ্ট করে নিয়ে বজ্রিণী ও চিত্রাণী নাড়িদ্বয়ের আবরণ সরিয়ে ফেলে মূল ব্রহ্ম নাড়িকে সহস্রারে উঠিয়ে দিতেই পারে আর গুরুর প্রাণপ্রবাহ থেকে বইতে থাকা ব্রহ্মবিন্দুর ক্ষরণাত্মক অমৃতপ্রবাহের সামরস্যকে অনুভব করতে পারে। তান্ত্রিকেরা একে বলেন, শিবশক্তির সামরস্যের রসসাগর। গুরু যদি এই অমৃতসাগরে অবগাহন করতে থাকেন আর প্রিয় আধার যদি সামনে থাকেন, তিনি দৃকশক্তি দিয়ে গুরুদেবের

নির্বাণদশার বাতাসকে নিজ দেহে এনে অমৃতের সঞ্চার করতে পারেন। তবে এই ক্রিয়াদি আবার সাধারণ শিষ্যের কম্ম নয়। শিষ্যের চিদালোকে যদি প্রাণের ক্রিয়া নিরন্তর অচল লক্ষ্যে বইতে থাকে তাহলে সেই অতিরিক্ত জাগ্রত মন গুরুদেবের দেহে ঘটা চৈতন্যের আলোকে আলোকিত হতে পারে। নচেৎ এ ক্রিয়া সম্ভব নয়। বহিরাকাশ, অন্তরাকাশ পেরোলে মহাকাশ। এই অবস্থাদি যখন দেহাভ্যন্তরে হয়, আন্তর ও বাহ্য উভয় আকাশ সমরূপে ব্যাপ্ত থাকে। এই সাম্যভাবে মহাকাশে স্থিত কৈবল্যদেহের প্রকৃতি লয় হয়ে যায়। গুরুর লয়দশাস্থ সিদ্ধকায়া থেকে যে চিদানন্দময়ী পরাশক্তির আত্মলীলা বের হয় সেই আত্মদর্শনস্থ সিদ্ধ আত্মশক্তির স্ফূরণে প্রায় সমদৃষ্টিসম্পন্ন শিষ্যের দেহাদি পড়লে গুরুদেবের উন্মনীশক্তির সঞ্চারণ প্রক্রিয়ার অন্তর্মুখী ও ঊর্ধ্বমুখী গতির সাধন ঘরের পরিবেশগত বাতাস অনায়াসে স্বীয় দেহাভ্যন্তরে তিনি টেনে নিতে সক্ষম। এভাবেও গুরুদেবের সিদ্ধকায়া পরোক্ষ পরকায়া হয়ে শিষ্যের দেহে প্রবিষ্ট হতে পারে। তার জন্য শিষ্যকে স্থিরকৃত মনে ঊর্ধ্বমুখ আকর্ষণের ক্রিয়াদি ভালোরকমভাবে রপ্ত রাখতে হবে। না হলে গুরুদেহের এমন দুর্লভ সাধনদশার কৈবল্যাবস্থার বাতাস নিজের দিকে কখনো টানা সম্ভবপর নয়। কোনও সিদ্ধ মহাত্মার হঠাৎ সমাধিদশার ভিতর যদি কোনও যোগি গিয়ে পড়েন তিনিও এভাবেও মহাত্মার আন্তরপ্রবাহের চেতনাকে নিজের দিকে অনেকটা আনতে সক্ষম হবেন। এসব সাধারণ দেহের কাজ তো নয়। সিদ্ধকায়দের পরকায়া প্রবেশ সেজন্য সমস্ত দেহাদিতে সম্ভবপর নয়। এর জন্য যোগিদেহের আধার চাই। মস্তিক, হৃদয় আর নাভি দিয়ে যাঁরা করণ করেন অবিরত, অর্থাৎ আজ্ঞা চক্র, অনাহত চক্র, মণিপুর চক্রকে প্রত্যহ ব্যবহার করে কুণ্ডলিনীধ্যান বা চক্রধ্যানে বসেন তাঁদের মস্তিষ্কের vision হৃদয়ে অবতরণ হয়ে যায় চট করে। সেখান থেকে নাভিতে power শীঘ্র শীঘ্র নেমে আনন্দেন্দ্রিয় তৈরি করে নেয় দেহভূমি। স্থূল

ইন্দ্রিয়াদির নির্বাপণ হয়ে যায়। এমন দেহাদি সিদ্ধকায়দের জ্ঞান, ভাব, শক্তি, কর্ম স্বীয়দেহে টেনে নিতে সক্ষম। এমন দেহাদিতে কেবল পরকায়া প্রবেশ সম্ভব।

শংকরাচার্য পরকায়া প্রবেশ করেছিলেন বলে প্রসিদ্ধি আছে। তিনি প্রবেশ করেছিলেন অমেরু রাজার দেহে। আজন্ম ব্রহ্মচারী শংকর। মণ্ডন মিশ্রের স্ত্রীর সঙ্গে যখন শাস্ত্রর্স্তথ প্রসঙ্গ শুরু হবে তখন ভাবলেন যে, কামকলাজ্ঞান তো আমার একদম নেই। ব্রহ্মচারী কামকলা সম্পর্কে অবগত হবেন বা কীরূপে! মণ্ডনপত্নীর সঙ্গে তিনি তর্ক যুদ্ধে যাবেন বলেই এরপর অমেরু রাজার দেহে প্রবিষ্ট হয়ে কামকলাতত্ত্বের পরিশীলন করে এই তত্ত্ব সম্পর্কে প্রকৃষ্ট জ্ঞান লাভ করে মণ্ডনপত্নীকে তাক লাগিয়ে দিলেন। শংকরাচার্য ছিলেন বৈদান্তিক, কামকলাতত্ত্ব তন্ত্রের প্রয়োগবিদ্যা। এই বিদ্যা জানতে আচার্য শংকর নিজ ব্রহ্মপথ দিয়ে বের হয়ে অমেরু রাজার অঙ্গুষ্ঠ পর্যন্ত ব্যাপ্ত হয়ে রাজাধিরাজের দেহস্থ কামকলার শৈলীজ্ঞান তুলে এনে মণ্ডনপত্নীর সঙ্গে কামকলাদির শাস্ত্রর্স্তথ প্রসঙ্গাদি নিষ্পন্ন করেন। যোগিরা এমন কার্য করতে পারেন এতে সন্দেহ নেই। তবে শঙ্করাচার্য সম্বন্ধে এই কিংবদন্তির প্রামাণিকতা সম্পর্কে সকল পণ্ডিত একেবারে নিঃসন্দেহ নন। কিন্তু আচার্য শঙ্কর সম্পর্কিত প্রাচীন গ্রন্থাদিতে তাঁর পরকায়া প্রবেশের বর্ণনাদি পরিদৃষ্ট হয়। পতঞ্জলির যোগদর্শনে ধারণা উল্লেখযোগ্য বিষয়। মনকে দেহের কোনও বিশিষ্ট প্রদেশ বা প্রত্যঙ্গে কীভাবে প্রবেশ করাতে হবে পতঞ্জলি তা ধারণা যোগাদির অন্তরঙ্গ সাধনক্রমে বর্ণনা করেছেন। হৃদয় চক্র, আজ্ঞা চক্র সহ দেহের গুরুত্বপূর্ণ উত্তেজক প্রত্যঙ্গে কীভাবে ধারণা রাখতে রাখতে দেহকে বিদেহ করে দেওয়া যায় সেই প্রক্রিয়াদি তিনি লিপিবদ্ধ করে গেছেন। যিশুখ্রিস্টের জন্মের দুশো বছর আগে ভারতে জন্মেছিলেন ঋষি পতঞ্জলি। তিনি ক্রিয়াযোগের সূচনা করেছিলেন তাঁর ১৯৫টি যোগসূত্র আবিষ্কার করে। তাঁর যোগসূত্র

খ্রিস্টীয় তিন শতকের পূর্ববর্তী কালের রচনা বলে পণ্ডিতদের অনুমান। পতঞ্জলি বলেছেন দেহ ধারণা হতে পৃথক একটা ধারণার কথা, যা বিদেহ ধারণা নামে পরিচিত। বিদেহ ধারণা থেকে একাধিক শরীরে আবির্ভূত হওয়ার ঘটনাদি আসছে। যা একপ্রকার যোগসিদ্ধি। উভয়ত্র আত্মপ্রকাশের ঘটনা বহু সাধুসন্তদের জীবনে প্রদর্শিত হতে দেখা গিয়েছে। গভীর ধ্যানে প্রথম ব্রহ্মানুভূতির আবির্ভাব হয় মেরুদণ্ডের বেদিতে। তারপর তা মস্তিকে গিয়ে ওঠে। মন যখন দেহের বাইরে তখন দেহের বৃত্তিগুলোও দেহবিচ্ছিন্ন। নিজের দেহ ধারণাতে মন যেমন দেহের অন্তর্ভুক্ত থাকে ঠিক তেমন যখন বিদেহ ধারণা আসে তখনও তা দেহসাপেক্ষ বটে। মনের বৃত্তি দেহের বাইরে চলে যায় ধারণা অভ্যাস করতে করতে। কিন্তু দেহাবচ্ছিন্ন প্রদেশ থেকে তো আর বৃত্তি পুরোপুরি বের হয়ে যায় না। দূরবর্তী স্থানে গিয়ে তা প্রতিবিম্ব নিতে পারে। মহাত্মা যোগিদের এক সময়ে দুই জায়গায় উপস্থিতির ঘটনাদি বিদেহ ধারণা থেকে হয়। বিদেহ থেকে মহাবিদেহা। মপুনাবিদেহাতে মন ইচ্ছামতন যে কোনও জায়গায় চলে যেতে পারে। তার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ফুটে উঠেছে মহাত্মা রাম ঠাকুরের জীবনলীলায়।

১৩৪০ সনের শারদীয় পুজোর সময় ঠাকুর এসেছেন ফেনীতে ফণীন্দ্র মালাকারদের বাড়িতে। এ বাড়ির সকলে রাম ঠাকুরের শিষ্য। ফণীন্দ্রবাবু কলেজ পড়ুয়া। অধ্যাত্ম জিজ্ঞেসু। চট করে ঠাকুরের স্মরণাপন্ন হননি। বাবা, বড়দাদাদের মতন ঠাকুরের কাছ থেকে নাম নিতেও তিনি চাননি। তিনি চেয়েছিলেন বীজমন্ত্র। অধিক জোরাজুরিতেও ঠাকুর তা দিতে সম্মত হননি। বরং যুবক ফণীন্দ্রকে নাম ও বীজের পার্থক্য বলে নামের মধ্যে দিয়ে কীভাবে গুরুর কৃপাশক্তি সর্বক্ষণ বর্ষিত হয় তা বুঝিয়ে দেওয়ার পর তাঁর নামদীক্ষা সম্পন্ন করেন। ঠাকুর আজ বললেন, ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্রের উপাস্য দেবতা ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্ট হলেও সবই এক ও অভিন্ন। মূলত একই শক্তি ভিন্ন

ভিন্ন রূপে প্রকাশ। সেইজন্য উপাস্য দেবতা কখনো ভিন্ন হয় না। মন্ত্রের অর্থ হল মনকে ত্রাণ করা। যতক্ষণ মন থাকে ততক্ষণ ভিন্ন ভিন্ন উপাস্য দেবতা থাকে, ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় থাকে। মনের ত্রাণ হলে সব এক। তখন কোনও বিরোধ থাকে না। এসব প্রসঙ্গাদি হতে হতে অষ্টমী পুজোর সময় হলে ফণীন্দ্রবাবুর বাবা মা ঠাকুরের পুজোতে বসে পড়লেন। পুজোর পর ঠাকুর সাত তাড়াতাড়ি একখানা চাদর গায়ে দিয়ে শুয়ে পড়লেন কেন সকলকে পুজোর ঘর বের করে দিয়ে— তরুণ ফণীন্দ্রকুমারের মনে সন্দেহ এল হঠাৎ করে। ফণীন্দ্রবাবু ঠাকুরকে পাহারা দিতে লাগলেন। ঘরের জানালা দিয়ে দেখলেন ঠাকুর চাদরের নীচে নেই। চাদরখানা বিছানার সঙ্গে মিশে আছে। তিনি ঘরে ঢুকে চাদর তুলে নিজের সন্দেহ দূর করে চাদরখানা পূর্ববৎ শয্যায় পেতে এবার খাটের অদূরে বসে রইলেন আর দরজায় খিল তুলে দিলেন। সময় দুপুর একটা। ঠাকুর নেই। তিনি ঠিক বিকেল চারটের সময় চাদরের নীচে যে কীভাবে ঢুকে গেলেন তা ভেবে আশ্চর্য হলেন ফণীন্দ্র মালাকার। তিনি দেখলেন চাদরখানা নড়ছে। ঠাকুর তৎক্ষণাৎ চাদর ফেলে উঠে বসে জিজ্ঞেসা করলেন, তুমি এইখানে বসে আছো কেন? যুবক ফণীন্দ্র বলল, তোমাকে পাহারা দিচ্ছি। ঠাকুর বললেন, তুমি কী চাদর তুইলা দেখেছ? উত্তর করলেন ফণীন্দ্রবাবু, চাদর তুলতে হবে কেন? চাদরের ওপর দিয়া পরিষ্কার দেখা গেছে তুমি এখানে নাই। তখন চাদর সম্পূর্ণ উঠিয়ে দেখেছি। ধরা পড়ে গিয়ে ঠাকুর বললেন, দেবীপূজায় গেছিলাম। সেইখানের দেবগন্ধ এখনও গায়ে আছে বলে তার সৌরভ পাচ্ছ। ফণীন্দ্র বলল, কী করে গেলে, পুনরায় চাদরের নীচে এলে, কিছুই দেখতে পেলাম না। ঠাকুর বললেন, প্রয়োজন হলে দেহ সমেত যত্রতত্র বিচরণ করা যায়। অণিমা সিদ্ধির কাজ চোখে দেখা যায় না। এই সঙ্গে লঘিমা সিদ্ধি কাজ কইরা যায়। ঠাকুর বলতে লাগলেন সিদ্ধকায়ের সমস্ত উপাদানাদির কথা। ফণীন্দ্রকুমার মালাকার

লিখছেন, অষ্টাদশ সিদ্ধি আছে। তার মধ্যে চাইর সিদ্ধি প্রধান। এইগুলির ক্ষমতা অসীম। অণিমা সিদ্ধি হইল অণুর মতো সূক্ষ্ম হওয়ার ক্ষমতা। লঘিমা সিদ্ধি হইল বায়ুর থাইকা হালকা হইয়া যত্রতত্র বিচরণ করার ক্ষমতা। গরিমা বা মহিমা সিদ্ধি বিরাট আকার ধারণ করার ক্ষমতা। প্রাপ্তি সিদ্ধি হাত বাড়াইলে ঈপ্সিত বস্তু লাভ করার ক্ষমতা। প্রাকাম্য সিদ্ধি যে কোনও পার্থিব বস্তু লাভ করার ক্ষমতা। বশিত্বা সিদ্ধি সকলেরে বশে রাখার ক্ষমতা। সত্য সংকল্পতা সিদ্ধির ক্ষমতা হইল মরারে বাঁচানো, বিষেরে অমৃতে পরিণত করা। সাধক এইগুলির যে কোনও একটা কিংবা দুইটা সিদ্ধি অর্জন করতে পারলে প্রতিষ্ঠা বিষে ভুইগা মরে, ভগবৎপদ পায় না। এই বলিয়া ঠাকুর নীরব হইলেন।

তন্ত্রের রহস্যময় চৌষট্টি যোগিনী

মেখলা ও কনখলা দুই বোন। দেবীকোট দেশের সাধারণ ঘরের মেয়ে। সওদাগরের দুই ছেলের সঙ্গে বিয়ে হল। ভাগ্য পিছু ছাড়ে না। কেউ পছন্দ করে না। বিনা কারণে নিন্দামন্দ করে। অতিষ্ঠ হয়ে ছোট বোন কনখলা বললেন, কেউ যখন আমাদের পছন্দ করে না, অন্য জায়গায় চলে যাওয়া ভালো দিদি। অচেনা জায়গায় গেলে আমাদের চিনবে না। নিন্দামন্দ বাদ দিয়ে নতুন জীবন শুরু করা যাবে। বড়দিদি মেখলা বললেন, যেখানে যাও না কেন, ভাগ্য যদি খারাপ থাকে এর চেয়ে ভালো কিছু হবে না। আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশী, এমনকী স্বামীরাও যখন নিন্দা করে, বুঝতে হবে ফাটা কপালের দোষ। কনখলা বললেন, দিদি, গ্রামে এক যোগি এসেছেন। তাঁর শরীর থেকে জ্যোতি বের হচ্ছে। দূর থেকে দেখে এসেছি, যোগির দলে অনেক অনুচর। গ্রামের সবাই বলছে, ওঁরা হলেন যোগি যোগিনী। চল, আমরা যাই। গিয়ে জিজ্ঞেস করি, কী করলে মানুষের গালমন্দের হাত থেকে নিস্তার পাবো? দুই বোন গেলেন যোগিগুরু কাহ্নের কাছে। যোগি তাঁদের বজ্রবাহারী দেবীর বীজমন্ত্র দিলেন। বললেন, সব ভুলে খুব করে জপ করো। যেসব দেহভঙ্গিমা, যোগ সাধনের আসন মুদ্রাগুলো দেখিয়ে দিচ্ছি, মন দিয়ে করে যাও। দীক্ষা পেয়ে ফিরে এলেন কনখলা, মেখলা। সংসারের কাজকর্ম করে দায়িত্ব কর্তব্য তাড়াতাড়ি সেরে তাঁরা সাধনাতে বসে যান। বারো বছর ধরে চলল বজ্রবাহারী দেবীর সাধনা। দেবীর গায়ের রং লাল। দ্বিভুজা। শবের উপর দাঁড়িয়ে নাচ করছেন। সারা মুখে ভয় আর রাগের ছায়া। মাথার এক পাশ থেকে একটা বরাহের মুখ বের হয়ে আছে। বিকৃতির জন্য দেবীর নাম বজ্রবাহারী। কনখলা, মেখলা দুই হাত বন্ধ করে বুকের কাছে এনে গুরুর

শেখানো অঞ্জলিমুদ্রা দিয়ে দেবীকে ভক্তি প্রদর্শন করেন। একটা পা হাঁটু মোড়া অবস্থাতে রেখে অপর পায়ে দাঁড়িয়ে আসনপিঁড়ি যোগ করে তর্জনী আর ছোট আঙুলটা বজ্রবাহারী দেবীর দিকে উঠিয়ে বুড়ো আঙুল দিয়ে বাদবাকি আঙুলগুলো চেপে ধরে করণমুদ্রা করে দেবীর সাধনা শেষ করেন। আস্তে আস্তে তাঁরা সকলের প্রিয় হয়ে ওঠেন। সবাই তাঁদের ভক্তিভাবের প্রশংসা করতে থাকে। বারো বছর পর তাঁরা যান গুরুদেবের কাছে। কাহ্ন পা তাঁদের চিনতে পারেন না। বলেন, তোমরা কে মা? তাঁরা দীক্ষা পাওয়া, সাধনা করে জীবন বদলে যাওয়ার ঘটনাগুলো গুরুকে বলতে থাকেন। গুরু বলেন, তোমরা গুরুদক্ষিণা দেও তবে। দুই বোন বলেন, আপনি যা চাইবেন, তাই আমরা দেব। গুরু বললেন, তাহলে তোমাদের দু'জনের মাথাটা আমাকে দেও। জ্ঞান তরবারি বের করে মানুষজনের যাবতীয় অজ্ঞানতার মাথা তোমরা কেটে ফ্যালো। দেহের শ্রেষ্ঠ জায়গা মাথা। মাথাতে থাকে জ্ঞান। সাধনা করে পাওয়া উপলব্ধ জ্ঞানযোগ দিয়ে তোমরা সকলকে বদলাতে থাকো। নিন্দামন্দ থেকে দূরে রাখো। কনখলা, মেখলা গুরুর কাছ থেকে ফিরে মানুষজনকে সাধনা, যোগের মুদ্রা শেখাতে লাগলেন। লোকেরা তাঁদের বলতে লাগল, যোগিনী। আশ্চর্য যোগশক্তির অধিকারিণী দুইবোন। গুরু যখন মাথা চাইলেন, তাঁরা ধাঁরালো ছুরিকা দিয়ে কেটে ফেললেন মাথা। যোগবলে মাথা জুড়ে দিলেন কাহ্ন পা। সকলে এঁদেরকে ডাকতে লাগল ছিন্নমস্তা দুই বোন বলে। আট শতক থেকে বারো শতকের ভেতর যেসব যোগি যোগিনীদের দেহাচরণ, সাধন যোগের কাব্যগাথাগুলো বলে গেছেন ভারতের চম্পারণের মহাগুরু অভয়দত্তশ্রী, গুরুর মুখ থেকে তুলে সেগুলো লিখে রেখেছিলেন শিষ্য মনোড়ুপ শেরব। এগুলো তিব্বতি চতুরশতী সিদ্ধ প্রবৃত্তি নামে পরিচিত। বাংলায় বলা হচ্ছে চুরাশি সিদ্ধর কাহিনি। কাহিনিগুলোর ভিতর দেখা মিলছে নারী তান্ত্রিক, তান্ত্রিক যোগিনীদের।

কনখলা, মেখলার পাশাপাশি রয়েছেন ডোম্বি, লক্ষ্মীঙ্করা, সিদ্ধরাজ্ঞী, গঙ্গাধরাদের মতন তান্ত্রিক যোগিনীরা। তিব্বতি ভাষাতে যোগি যোগিনীদের বলা হয়েছে, ডুপ থোব, অর্থাৎ এঁরা সকলে সিদ্ধ। সেই সময়কার শক্তিশালী তান্ত্রিক।

তিব্বতে এখনও রয়েছে গুটিকয়েক মহিলা মঠ। মঠ ঘিরেও তান্ত্রিক যোগিনীদের নানান গল্পমালা প্রচারিত। ১৭১৬ সালে মুঘল সৈন্যরা তিব্বত আক্রমণ করলে আঘাত এসেছিল সামিদং মহিলা মঠে। মঠের মহিলাদের ওপর তাদের আকর্ষণ গেল। সৈন্যরা গিয়ে দাঁড়াল মঠের দরজায়, অধ্যক্ষা যোগিনী দোরজে ফাগ্মো মঠ বাঁচাতে জাদুবিদ্যা প্রয়োগ করলেন। নিজে গিয়ে দাঁড়ালেন গ্রামবাসী বৃদ্ধা সেজে। মুঘল সৈন্যরা জিজ্ঞেস করল, ঘরে কারা থাকে? তান্ত্রিক যোগিনী বললেন, আমি গরিব। পশু চড়িয়ে পেট চালাই। সৈন্যরা বৃদ্ধাকে মঠের দরজা থেকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে ভিতর ঢুকে অবাক। ঘরে কোনও রূপবতী সন্ন্যাসিনীরা নেই। ঘর ভরা শুয়োর! খোলা দরজা পেয়ে শুয়োরগুলো বেরিয়ে পড়ল। সৈন্যদল হতাশ হয়ে ফিরে চলল— তিব্বতিদের মুখে মুখে কাহিনিমালা ফেরে। মঠটা আজও বর্তমান। সন্ন্যাসিনীরা বসবাস করেন খাম্বা পাশ পেরোনো মহিলা মঠে। যোগিরা বলেন, দেহ মানে ছায়া। দেহ থাকলে ছায়া থাকবে। যোগে দেহখানা রূপান্তরিত হয়। ছায়া সরে কায়া হয়ে দাঁড়ায়। ধর্মকায়া, সম্ভোগকায়া, নির্মাণকায়া— তিন ধরনের পরিবর্তন হয়। যোগিনীরা সকলে ছিলেন কায়াকল্পী। তাঁরা শরীর বদলের বিদ্যা জানতেন। যাঁরা সিদ্ধ কায়াকল্পী, দেহ যাওয়ার পরও বার্দো এলাকাতে বসবাস করেন। দেহের সঙ্গে লেগে আছে মন, বুদ্ধি, অহংকার। এসব নিয়ে বার্দো যাওয়া চলে না। দেহ যখন সংস্কার মুক্ত হয়, কর্মবন্ধন কেটে যায়, তান্ত্রিক যোগিনীরা বার্দো যেতে পারেন। সিদ্ধযোগিরা বার্দোতে বাস করা যোগিনী আত্মাদের ডেকে এনে কোনও ঘুমন্ত

দেহ কিংবা রুগ্ন দেহের ভিতর পুরে ফেলে দেহটাকে মানব কল্যাণে কাজ করাতে পারেন। তিব্বতিরা বলেন, বার্দো ভূমির আকাশ বাতাসে দেহশূন্য হয়ে যোগিনীরা ঘুরে বেড়ান। জগতের কল্যাণের জন্য এঁদেরকে কায়াকল্পী করা যায়।

যোগিনীদের যোগসিদ্ধি নিয়ে নানান সব কথিকা প্রচলিত রয়েছে ভারতীয় অধ্যাত্মবাদেও। যোগিনীদের আসন উত্থান হত। ধ্যানরত অবস্থাতে তাঁরা শূন্যমার্গে বিচরণ করতে পারতেন। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের ভিতর রয়েছে বীতহব্য, চূড়লা, শিখিধ্বজদের কথা। এঁরা যোগি যোগিনী। চূড়লা প্রথমে ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করেন তারপর একান্তে যোগাভ্যাস করে আকাশ গমনের শক্তি অর্জন করলেন। কিংবদন্তি যে, শঙ্করাচার্য ও গোরক্ষনাথও আকাশ গমনে দক্ষ ছিলেন। বুদ্ধদেব সম্পর্কেও কিংবদন্তি চালু আছে। তিনি একবার শ্রাবন্তী হতে নিজের থাকার জায়গা ধনিরে আকাশ মার্গে গিয়ে কুটিরের সামনে দাঁড়িয়ে পড়লেন। দত্তাত্রেয় সংহিতা প্রসিদ্ধ দত্তাত্রেয় মুনির নামেও আকাশ গমনের কথা প্রচলিত। ভারতবর্ষের তীর্থে তীর্থে যোগী যোগিনীরা রোজ রাতের বেলায় আকাশ গমন বিদ্যাটা কাজে লাগিয়ে নিজেদের নানান প্রাত্যহিক কাজকর্মগুলো সেরে নিতেন। যোগিনীরা খুব যোগদক্ষ ছিলেন। খেচরী মুদ্রাযোগের সিদ্ধি কাজে লাগিয়ে আসনে বসে দেহটাকে আলগা করে আসন সহ এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় উড়ে যেতেন। এঁদের বলা হত, মায়াবী। তন্ত্রবিদ্যার সিদ্ধ যোগিনী যাঁরা, যাঁদের চৌষট্টি যোগিনী বলে চিহ্নিত করা হয়, তাঁদের নামে যখন ভারতের বিভিন্ন জায়গাতে নবম শতক হতে তান্ত্রিক মন্দিরগুলো তৈরি করার চল শুরু হল, কোনও যোগিনী মন্দিরের মাথাতে ছাদ রাখা হল না। কারণ তাঁদের যোগিনী বিদ্যার সিদ্ধি আছে, সকলে অতিপ্রাকৃত শক্তির অধিশ্বরী। এঁরা দেহটাকে আশ্রয় করে কুম্ভক যোগে আসনটাকে খানিকটা জমি থেকে উপরে তুলে নিতেন।

চারদিকে থাকা বায়ুর থেকে নিজের দেহের ভিতরকার বায়ুকে হালকা করে বায়ুমণ্ডলের ঊর্ধ্ব দিকে উঠতে থাকতেন। মূলাধারে কুণ্ডলি রূপ চিদাগ্নি জ্বলে উঠে দেহের মধ্যে থাকা সমস্ত বায়ুকে ওই আগুনের তাপ পুড়িয়ে হালকা করে দিত বলে যোগিনীদের আসন ভূমি থেকে অনেক উপরে উঠে যেত তৎক্ষণাৎ। কালচক্র আবর্তন বিদ্যা কাজে লাগাতেন এঁরা। দিন ও রাতের মধ্যে যেমন সন্ধিস্থান আছে, দেহের ভিতরও দুটি বিরুদ্ধ শক্তিকে একত্র করার জায়গা আছে। ভালো আর মন্দ শক্তির সবসময় প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছে দেহের মধ্যে। যোগিনীরা মন্দ শক্তিটাকে ক্ষয় করে ভালো শক্তিটাকে দেহের ভিতর উঠানো-নামানোর বিদ্যাবত্তা প্রয়োগ করে কুণ্ডলিনীর ঊর্ধ্বমুখীন দশাপ্রাপ্তিতে ওপরে তুলে কালচক্র আবর্তনে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাতায়াত করতে পারতেন। সেই বিশ্বাস থেকে ভারতের যেসব জায়গাতে চৌষট্টি যোগিনীদের মন্দির নির্মাণ করা হয়েছে, তাঁদের যাতায়াতের সুবিধার কথা মাথাতে রেখে কোনও মন্দিরের ছাদ দেওয়া হয়নি। যাতে ছাদহীন মন্দির থেকে চৌষট্টি যোগিনীরা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় সুবিধা মতো যাতায়াত করতে পারেন।

তন্ত্রে শক্তিলক্ষণ আছে। যে যে প্রকার শক্তি প্রশস্তা সেগুলোকে বিশদে বলা শক্তিলক্ষণ। শক্তির নানান কার্যভেদ আছে। নিরুত্তরতন্ত্রে পঞ্চমশক্তি হিসেবে যোগিনীর উল্লেখ রয়েছে। সাধকের মনে যখন শিবশক্তি অভেদ—বুদ্ধিখানি আসে, তাকে বলে শিবশক্তিসমাযোগবুদ্ধি। সমবুদ্ধিতে শিবশক্তি এক হচ্ছেন, এজন্য বুদ্ধিরূপে তিনি যোগিনী। চক্রানুষ্ঠানে বসলে পাঁচটি চক্রের পুজো করতে হয়। রাজচক্র, মহাচক্র, দেবচক্র, বীরচক্র আর পশুচক্র। পঞ্চ চক্রে আলাদা আলাদা শক্তি রয়েছে। বীরচক্রের শক্তি হলেন যোগিনী, অর্থাৎ সাধকের নিজ শক্তিকে যোগিনী হিসেবে দেখানো হচ্ছে। তান্ত্রিকেরা ইষ্টদেবীর পুজোর সময় কারণপাত্র দেবীকে নিবেদন করেন। ন'রকমের তান্ত্রিকী পাত্র

হয়। দেবীপাত্র, গুরুপাত্র, ভোগপাত্র, পুজোপাত্র, বীরপাত্র, বলিপাত্র, পাদ্যপাত্র আর আচমনীয়পাত্র। পুজোপাত্রটিকে যোগিনীপাত্রও বলা হয়। যোগিনী যেহেতু শক্তিনাম, শক্তিময়ীর পুজোর উদ্দেশে নিবেদিত পাত্রটি যোগিনীপাত্র। তন্ত্রের নব চক্রে ন'জন চক্রেশ্বরী ও ন'জন আবরণ দেবতা থাকেন। আবরণ দেবতাদের যোগিনী বলা হয়। বামকেশ্বরতন্ত্রের ভেতর ন''জন আবরণ দেবতা, অর্থাৎ ন'জন যোগিনীর নাম পাওয়া যায়। এঁরা হলেন গুপ্ততারা, সম্প্রদায়া, কুলকৌলা, নিগর্ভা, রহস্য, অতিরহস্যা, পরাপররহস্যা। হিন্দু তন্ত্র ও বৌদ্ধ তন্ত্রের ভিতর যেমন যোগকৌশলী নারী হিসেবে যোগিনীদের দেখা মিলছে, জৈনদের দুই সম্প্রদায়— দিগম্বর ও শ্বেতাম্বরদের ভিতর শক্তি উপাসনায় শাসনদেবী, যক্ষিণীর পাশাপাশি যোগিনী দেবী রয়েছেন। বৌদ্ধ ও হিন্দু তন্ত্রে যক্ষিণী, অপ্সরা, যোগিনীরা হলেন উপদেবী। এঁরা সকলে আত্মাকর্ষণী বিদ্যা জানেন। যক্ষিণী, অপ্সরা, যোগিনীরা ভারত, নেপাল আর তিব্বত জুড়ে থাকা যোগের অভিজ্ঞ অনুশীলনকারী গুরুমা। এঁদের কাছে দীক্ষা নিয়ে গুহ্য দেহচর্চা শিখে রাজা, রাজপুত্রের মতন উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিরাও তন্ত্রের মুদ্রাযোগে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন, সেসব বৃত্তান্ত চুরাশি সিদ্ধর কাহিনিমালার ভিতর রয়েছে। আবার দেবীদেরও রূপান্তর যে ঘটেছে উপদেবী, পার্শ্বচরী, সহচরী যোগিনী হিসেবে সে কাহিনি দেবী ভাগবতে উল্লেখিত— পুরাকালে অষ্টমীতিথিতে দক্ষযজ্ঞবিনাশিনী ভদ্রকালী কোটি যোগিনীদের সঙ্গে আবির্ভূতা হয়েছিলেন। যোগিনীতন্ত্রে কালী শিবকে বলছেন, দেবেশ, ভদ্রকালীরূপে আমি আবির্ভূতা হব যখন তোমার আর মহিষীর একত্র মিলনে মহিষাসুর জন্ম নেবে। তার অসুরভাবকে প্রতিহত করতে মহাযুদ্ধ করে তোমাকে পর্যন্ত বিনাশ করব বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুল বুকের ওপর স্থাপন করে। সেটা আমার ভদ্রকালীরূপ। বিষ্ণুপুরাণের অনিরুদ্ধ যখন বন্দি হয়ে আত্মরক্ষার জন্য দেবীস্তব করতে থাকলেন, ভগবান শ্রীহরি

দেবীর যে সব নামে স্তব করেছিলেন সেগুলো সব বলতে থাকলেন। সেখানে দেবীকে যোগিনী নামে রক্ষাহুতি দেওয়া হচ্ছে। ভারত জুড়ে প্রসিদ্ধ নাথযোগিদের উদ্ভব দশ শতকে। সেখানে রয়েছে চৌরাশি সিদ্ধার কথা। নাথপন্থীদের যোগপ্রণালীর আসন প্রাণায়ামদির বৃত্তান্ত রয়েছে প্রধান যে তিনটি গ্রন্থে তার অন্যতম হঠযোগপ্রদীপিকার ভিতর রয়েছে নাথযোগিনীদের উল্লেখ। নাথযোগিনীরা গেরুয়া বস্ত্রাদি পরেন, শরীরে থাকে শিবচিহ্ন আর দু'কানের ভিতর বড়সড় ফুটো করে কর্ণমুদ্রা ধারন করেন বলে এঁরা কণ্ট যোগিনী হিসেবেও প্রসিদ্ধা। সকলে রুদ্রপন্থী, অবধূত, তন্ত্রাচারী। নানান সিদ্ধি এঁদের আয়ত্তাধীন। মধ্যযুগীয় সময়ের কাহিনি ও গল্পে সমসাময়িক আবহে নাথযোগিনীরা উল্লেখ্যা। মধ্যযুগীয় পুরাণ কথাসরিৎসাগরের ভিতরও যোগিনী, জাদুশক্তিধর নারী ও পরীদের উল্লেখ রয়েছে, যাদের সাংখ্যিক চিহ্নায়ন করা রয়েছে আট, ষাট, চৌষট্টি, পয়ষট্টি হিসেবে। যোগিনীরা যে সকলে যোগশাস্ত্র ও তন্ত্রের করণবিদ্যার অনুশীলন করতেন এতে কোনও সন্দেহ নেই। এঁরা কেবল হিন্দু ধর্মের ক্ষেত্রে যে সীমাবদ্ধ ছিলেন না তাও অনুমেয়। বরং বলা চলে যে, বৌদ্ধ তন্ত্রের ঐতিহ্যের মধ্যে যোগিনীদের অন্তর্ভুক্তি ছিল। তন্ত্রের মাতৃকাদের সঙ্গে যোগিনীদের কিংবদন্তিকে জুড়ে দিয়ে এঁদের সংখ্যাকে চৌষট্টি বা একাশিতে নিয়ে যাওয়া হয়। সংস্কৃত কাহিনিমালায় যোগিনীদের বিরাট প্রকাশ ঘটেছে দেবী দুর্গার শুম্ভ ও নিশুম্ভের সঙ্গে যুদ্ধরত অবস্থার ভিতর। এঁরা সকলে মাতৃকার সহচরী। তন্ত্রের প্রধানা মাতৃকাদের সঙ্গে যোগিনীরাও প্রাধান্য পেয়ে এসেছেন। মাতৃকাদের থেকে যোগিনীদের আবির্ভাব দেখানো হয়েছে তন্ত্রপুঁথির পাতায়। আটজন মাতৃকা থেকে তন্ত্রের চৌষট্টি যোগিনীদের উৎপত্তির একটি রূপরেখা তৈরি করা হয়েছে। তন্ত্রে উল্লেখ্যা যোগিনীদের সকলের মণ্ডল চক্র রয়েছে। একাশি জন যোগিনী মণ্ডল বা চক্রের ভিতর আবর্তিত হন নয়জন মাতৃকাশক্তি ঘিরে।

ব্রাহ্মী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, ইন্দ্রাণী ও চামুণ্ডা মাতৃকার সঙ্গে চণ্ডীকা এবংমহালক্ষ্মী জুড়ে গিয়ে নব মাতৃকার সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন তান্ত্রিক ও পৌরাণিক পুথিগুলোর ভিতর। একজন মাতৃকা একজন যোগিনী হিসেবে গণ্যা হয়ে একাশি জনের মণ্ডল তৈরি করে নিয়েছেন নানান সব তান্ত্রিকী পৌরাণিকী গ্রন্থাদির ভিতর। ভারতে চৌষট্টি যোগিনীদের যে প্রধান চারটি মন্দির রয়েছে ওড়িশা ও মধ্যপ্রদেশে, সবখানের যোগিনী মূর্তিগুলোর খেয়াল করার মতো প্রধান বৈশিষ্ট্যটি হল এঁরা সকলে উন্মত্ততা, দুঃখ, আনন্দ, সুখ, বাসনা ইত্যাদি নানান প্রবৃত্তির প্রকাশক। সকলের মূর্তিতে পশু, দৈত্য, ক্ষমতা শক্তির জয় পাওয়া কোনও না কোনও চিহ্নাদি লেগে। নানান খানের যোগিনী মূর্তিগুলো যেন বুঝিয়ে দিচ্ছে যে, যোগিনী সাধনার ভিতর দিয়ে তন্ত্রগুরুরা জাগতিক কাজ হাসিল করতে পারার কার্যক্রমগুলোকে ভালোভাবে করতে পারতেন। এজন্য প্রবৃত্তি মার্গের তান্ত্রিকেরা যোগিনী সাধনা করে থাকেন। সন্ন্যাসীদের জন্য এ সাধনা নয়। সংসারে আবদ্ধ সাধক কিংবা সাধনসঙ্গিনী সহযোগে শ্মশান ডেরাতে বাস করা তান্ত্রিকেরা যোগিনী সাধনা করে থাকেন। এঁদের কাছে কামনা বাসনা নানান চাহিদা নিয়ে হাজির হয়ে যান সাধারণ মানুষেরাও।

তন্ত্রের উপবিদ্যা হলেন যোগিনী। উপবিদ্যাগুলোর সঙ্গে জড়িয়ে আছে অবিদ্যা। অবিদ্যার সাধনাগুলো সাধারণত করা হয় নিজের লোভ লালসা ক্ষমতা হিংসা ইত্যাদি মেটাতে গিয়ে অপরের ক্ষতি করার জন্য। যোগিনীরা অবিদ্যা অবশ্য নন। এঁরা উপবিদ্যা। তন্ত্রের মূলবিদ্যা এঁরা কখনো নন। তান্ত্রিক দেবী এঁরা নন বলে তন্ত্র সাধনার আরাধ্যা উপবিদ্যা হলেন যোগিনীরা। তন্ত্রগুরুরা যোগিনী সাধনায় সিদ্ধি পেতে চান কেবলমাত্র নিজেদের ভোগবাসনাগুলো চরিতার্থ করার জন্য। মহাবিদ্যার সাধক এইসব তান্ত্রিকেরা নন। যোগিনীরা যেহেতু তন্ত্রের মহাবিদ্যার সহচরী, এঁদের সাধনা

করতে করতে সাধক একসময় আবার মহাবিদ্যার সাধনার দিকে এগিয়ে গিয়ে নিজের ইষ্টদেবীর দর্শনাদি পেয়ে খুব উচ্চ দশাপ্রাপ্তির ভিতর ঢুকে যান। তখন তাঁর যোগিনী সিদ্ধির তকমা সরে যায়।

যোগিনী সাধনা লোকালয়ে করা চলে না। ফাঁকা জায়গা, ধু ধু মাঠ যোগিনী সাধনা করার উপযুক্ত জায়গা, আর কামরূপ কামাখ্যাতে গিয়ে যদি সাধনা করা যায়, তাড়াতাড়ি সিদ্ধিলাভ করা যায়, একথার উল্লেখ আছে ডামরতন্ত্রের ভিতর— উজ্জটে প্রান্তরে বাপি কামরূপে বিশেষতঃ। যোগিনীবিদ্যা পুরো গুরুমুখী। গুরুর দেখানো পথে এ সাধনা করতে হয় দীর্ঘদিন ধরে। যোগিনীরা প্রসন্না হলে সাধক তান্ত্রিকদের দেখা যেমন দেন, সাধন সিদ্ধির পথে যেতে থাকলে আবার আসন থেকে বিচ্ছিন্ন করতে উঠে-পড়ে পর্যন্ত লাগেন। নানান রকমভাবে ভয় দেখান, ভয়ংকর উগ্রা মূর্তিতে প্রকট হয়ে সাধককে ভ্রষ্টপথে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টাও করতে থাকেন। যোগিনী সাধনা যাঁরা করেন তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে একেবারে লোকচক্ষুর আড়ালে চলে গিয়ে একাগ্র মনে গুরুর সহায়তায় এগোতে থাকেন। তাহলে সিদ্ধি আসে। পূর্ব অথবা উত্তর দিকে আসন পেতে যোগিনীর মূল মন্ত্র জপ করে তন্ত্রবিদ্যায় নানান ক্রিয়াদি করতে হয় বছরের পর বছর। তবে যোগিনীদের দর্শন পেলে। তান্ত্রিকদের মোক্ষ লাভ হয়। তন্ত্রপুথির চৌষট্টি জন যোগিনীদের ভিতর আট জন হলেন প্রধানা যোগিনী। আট জন যোগিনীদের অধীনে আবার আট জন করে যোগিনী নিয়োজিতা থাকেন। প্রধানা আট জন যোগিনীর মধ্যে একজনের সাধনা করে সিদ্ধি পেলে তন্ত্রগুরু নিজের সমস্ত চাহিদা তাঁর মাধ্যমে মেটাতে মেটাতে একসময় ভোগসুখে ক্লান্ত হয়ে শেষমেষ নিবৃত্তির পথে চলে যান। চৌষট্টি যোগিনীর সাধনা অত্যন্ত কঠিন সাধনা। পদে পদে বাঁধা। সিদ্ধ গুরু না পেলে এ সাধনা করাও সম্ভবপর নয়। যোগিনী সিদ্ধ তান্ত্রিকেরা যাঁদের দীক্ষা দেন তাঁদের মন্ত্র সিদ্ধি এজন্য তাড়াতাড়ি ঘটে। অষ্ট

যোগিনীদের প্রথমা হলেন সুরসুন্দরী। তন্ত্রগুরু বলেন, ইনি হলেন জগৎপ্রিয়া, উজ্জ্বল চাঁদের মতন গায়ের রং। সাধককে অভয় প্রদান যদি করেন সুরসুন্দরী যোগিনী, স্ত্রী বোন, মা কোনও এক রূপে আবির্ভূতা হয়ে সমস্ত কর্মাদি করে দেন। সুরসুন্দরী যোগিনীর সাধনা করতে হয় গভীর অরণ্যে গিয়ে। মনোহরা যোগিনী ত্রিনয়নী। গোটা দেহ চন্দন চর্চিত। কামধেনুর মতো সাধকের সমস্ত বাসনা পূরণ করে দেন। নির্জন নদীর ধারে বসে মনোহরা যোগিনীর সাধনা করতে হয়। ঘোর রক্তবর্ণা কনকবতী যোগিনী। বহু পুরনো বট গাছের নীচে এই যোগিনীর সাধনা করতে হয়। সিদ্ধি এলে কনকবতী যোগিনী সখীদের দলবল নিয়ে সাধককে সহায়তা করেন। কামেশ্বরী যোগিনী অতি চঞ্চলা। যোগিনীর হাতে কুসুমবান। ব্রাহ্ম মুহূর্তে সাধনে বসতে হয় এই যোগিনী সিদ্ধির জন্য। সিদ্ধি পেলে সাধককে কামেশ্বরী যোগিনী স্ত্রীর মতন সকল সময়ে সহায়তা প্রদান করেন। রতিসুন্দরী যোগিনীর গায়ের রং কাঁচা সোনার মতন। নির্জন জায়গায় রতিসুন্দরীর সাধনাতে বসতে হয়। সিদ্ধি এলে যোগিনী স্ত্রীর মতন সাধককে সহায়তা দেন। শ্যামবর্ণা পদ্মিনী যোগিনী। সাধক নিজ গৃহমন্দিরে পদ্মিনী যোগিনীর সাধনা করতে পারেন। সিদ্ধি আসলে যোগিনী স্ত্রীর মতন সহায়তা করে থাকেন। গৌরবর্ণা নটিনী যোগিনী। বিশ্বামিত্র মুনি নটিনী যোগিনী সিদ্ধ ছিলেন বলে কিংবদন্তি রয়েছে। পুরোনো অশোক গাছের নীচে এই যোগিনীর সাধনা করতে হয়। সিদ্ধিতে নটিনী যোগিনী স্ত্রীর মতন কার্য করতে থাকেন। সমস্ত যোগিনীদের ভিতর মধুমতী যোগিনীর সাধনা সর্বশ্রেষ্ঠ। স্ফটিকের মতন যোগিনীর গায়ের রং। মধুমতী সাধনাতে সিদ্ধি পেলে সাধক নিরোগ নিটোল শরীরের অধিকারী হন। যোগিনী সাধনা এক রাতের সাধনা নয়। অনেক কঠিন সাধনা। দীর্ঘদিন ধরে একনিষ্ঠভাবে গুরুর দেখানো পথে সাধনা করলে যোগিনী সিদ্ধির অধিকারী হন সাধক। তিনি যোগিনীদের সহায়তা পেয়ে অনেক অলৌকিক কার্যক্রম ঘটানোর ক্ষমতা

লাভ করেন। মার্কেণ্ডেয় চণ্ডীর ভিতর রয়েছে, রক্তবীজ অসুর বধের সময় দুর্গা দেবী চৌষট্টি রূপ ধারণ করেন। দিক নির্ণয় করতে গিয়ে তান্ত্রিকেরা বলেন আবার প্রতিপদ আর নবমী তিথিতে যোগিনীর অবস্থান থাকে পূর্বে, একাদশীতে অবস্থান হয় অগ্নিকোণে, পঞ্চমী ও ত্রয়োদশীতে দক্ষিণে, চতুর্থী ও দ্বাদশীতে নৈঋত কোণে, ষষ্ঠী ও চতুর্দশী তিথিতে পশ্চিমে, সপ্তমী ও পূর্ণিমাতে বায়ুকোণে, দ্বিতীয়া ও দশমী তিথিতে উত্তরে, অষ্টমী ও অমাবস্যাতে ঈষাণ কোণে অবস্থান করেন। যোগিনী যাত্রার কথাও তন্ত্রমতে মানা হয়। তান্ত্রিকগুরু বলেন দক্ষিণে আর সামনে চলতে যোগিনীতে যাত্রা করলে বাজে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ার একটা ব্যাপার থাকে আর বাঁ দিক ও পেছন দিকে যোগিনী অবস্থান কালে গেলে সমস্ত কাজে সাফল্য আসে। তিথি বিশেষে যোগিনীদের একেক দিকে অবস্থান হয় এটি জ্যোতিষ মতেও মানা হয়। তান্ত্রিকগুরু বলেন যোগিনীদের এই অবস্থান চক্রকে যোগিনী চক্র আর জ্যোতিষীর কাছে যোগিনীদের অবস্থান থাকে জ্যোতিষ চক্রে। ভাগবত পুরাণ আর মার্কেণ্ডেয় পুরাণে আদি শক্তির সহচরী হিসেবে অষ্ট মাতৃকাদের সঙ্গে যোগিনীদের দেখা পাওয়া যায়। অষ্ট মাতৃকা হিসেবে অনেক তন্ত্রপুথি সুরসুন্দরী, মনোহরা, কনকবতী, কামেশ্বরী, রতিসুন্দরী, পদ্মিনী, নটিনী, মধুমতী দেবীর নাম পাওয়া যায়। যোগিনী সাধনায় এঁরাই চৌষট্টি যোগিনীদের ভিতর অষ্ট যোগিনী হিসেবে আবার বিশেষ ভাবে চিহ্নিতা। সাধকের অতিপ্রাকৃত শক্তির অধীশ্বরী হলেন অষ্ট যোগিনী। এঁদের আয়ত্তাধীন সিদ্ধি পেলে সাধক শরীর, মন ও প্রকৃতিকে পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। কোনও জায়গায় হঠাৎ করে বৃষ্টিপাত ঘটিয়ে দেওয়া, অসুস্থকে সুস্থ করে তোলা, ধ্বংসাত্মক ক্ষমতার প্রয়োগ করে কারওকে পরাস্ত করতে পারার যোগিনী বশীকরণ সিদ্ধি তান্ত্রিকদের আয়ত্তাধীন হয়ে যায়। তান্ত্রিকগুরুরা বলে থাকেন, অষ্ট মাতৃকা ও তাঁদের চৌষট্টি জন সহচরীরা সকলে আদ্যাশক্তির অংশ।

আদ্যাশক্তিতে জগৎ পরিচালিত হয়। পৃথিবী ধ্বংস হলে আদ্যাশক্তিতে বিলীন হয়ে যাবে অষ্ট মাতৃকা আর চৌষট্টি যোগিনীর শক্তি। নাথযোগিরা চৌষট্টি মনীষার কথা বলেন, যাঁরা তপস্যার মাধ্যমে শিবের দেখা পেয়েছিলেন বলে নাথপন্থীদের বিশ্বাস। নাথযোগিদের চৌষট্টি মনীষার সাজুয্য রয়েছে তন্ত্রের চৌষট্টি যোগিনীদের সঙ্গে। গার্গী, বিমলা, মুক্তাবাঈ, তারাদেবী, মৈত্রেয়ীরা সকলে যোগসিদ্ধা বিদূষী যোগিনী। এঁরা চৌষট্টি যোগিনীদের অন্তর্ভুক্তও বটে। সমস্ত যোগিনী মন্দিরগুলোতে যোগসিদ্ধা বিদূষী রমণীরা বৃত্তাকারে তন্ত্রের বিভিন্ন যোগযুক্ত অবস্থাতে দাঁড়িয়ে আছেন। জব্বলপুরের চৌষট্টি যোগিনী মন্দিরটি দশ শতকে কলচুরি রাজত্বকালে নির্মিত। মন্দিরে দেবী দুর্গা তাঁর চৌষট্টি জন সহচরী যোগিনীদের নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। নর্মদা নদীর গায়ে চৌষট্টি যোগিনী মন্দির। মধ্যপ্রদেশের মোরেনাতেও একটি চৌষট্টি যোগিনী মন্দির রয়েছে। এই মন্দিরটি চৌষট্টি প্রকোষ্ঠযুক্ত একটি বৃত্তকার পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। মধ্যখানে একটি উন্মুক্ত মণ্ডপ। এগারো শতকের মন্দির এটি। কচ্ছপঘাতবংশীয় মহারাজা দেবপাল চৌষট্টি যোগিনী মন্দিরটি তৈরি করেন। প্রাচীন কালে এই মন্দিরটিতে সূর্যের আপাত বার্ষিক গতিপথের উপর ভিত্তি করে গণিত ও জ্যোতিষ বিদ্যার শিক্ষা দেওয়া হত। ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগ মোরেনার চৌষট্টি যোগিনী মন্দিরটিকে একটি প্রাচীন ঐতিহাসিক সৌধ হিসেবে ঘোষণা করেছে। অনেকে বলেন, দিল্লির পার্লামেন্ট হাউসটি এই মন্দিরের আদতে তৈরি। ছতরপুরেও আরও একটি যোগিনী মন্দির রয়েছে খাজুরাহো মন্দিরের পশ্চিম দিকে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ করে। এটি নবম শতকের তৈরি। ভারতের সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক চৌষট্টি যোগিনী মন্দিরটি রয়েছে ভুবনেশ্বর থেকে পনেরো কিলোমিটার দক্ষিণে খুরদা জেলার হীরাপুরে। নয় শতকে ব্রাহ্ম রাজবংশের রানি হীর দেবী এই মন্দিরটি তৈরি করেন। চৌষট্টি যোগিনীর মন্দিরগুলো সব তৈরি হয়েছে তান্ত্রিকী চক্র ভৈরবী

চক্রের আদলে। এজন্য চৌষট্টি যোগিনীর মন্দিরগুলোর বৃত্তাকার গঠন। বৃত্তাকার প্রাচীরের অভ্যন্তরে তন্ত্রের চক্রাধীশের মতন দেবী বা দেবতার অধিষ্ঠান। এখানে চক্রেশ্বীর হলেন দেবী কালিকা। তিনি নরমুণ্ডের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছেন। চাঁদি মণ্ডপে দেবীর অধিষ্ঠান। মোরেনার চৌষট্টি যোগিনী মন্দিরে চক্রাধীশ হলেন মহাদেব। জব্বলপুরের চৌষট্টি যোগিনী মন্দিরে চক্রেশ্বরী হলেন মাতা পার্বতী আর চক্রাধীশ শিব। ওড়িশার আরেকটা চৌষট্টি যোগিনী মন্দির রয়েছে বালাঙ্গীর জেলার তিতীলগড়ের কাছে রানিপুর ঝড়িয়ালে। হীরাপুর মন্দিরের বাইরে রয়েছেন আবার নব কাত্যায়নী — ন'জন কাত্যায়নী দেবী দাঁড়িয়ে আছেন বিভিন্ন তান্ত্রিকী গুহ্য ভঙ্গিমায়। প্রথম জনের হাতে উদ্ধৃত তরোয়াল। দ্বিতীয় কাত্যায়নী সারমেয় আর শৃগাল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তৃতীয় জনের হাতে ধারালো ছুরিকা। চতুর্থ ও পঞ্চম কাত্যায়নী মূর্তির ভঙ্গিটি দ্বিতীয়ার মতো। ষষ্ঠ দেবী সহচরীর সঙ্গে রয়েছেন একটি গাছের পাশে দাঁড়িয়ে। সপ্তম আর অষ্টম কাত্যায়নী মূর্তির ভঙ্গি তৃতীয়ার মতো। নবম কাত্যায়নী দেবী রুদ্ররূপী নগ্নিকা। দেবীর হাতে তরোয়াল। চৌষট্টি যোগিনীরা সব দাঁড়িয়ে আছেন গুপ্ততন্ত্রের গুহ্য ভঙ্গিতে। যোগিনীদের হরিণ হল চঞ্চলতার প্রতীক, পাখি প্রাণচেতনা, শব শিববৎ দশা, হস্তী মদ মত্ততা, পদ্ম চক্রসূচক, সাপ কুণ্ডলিনীর দশাপ্রাপ্তি ইত্যাদি নানান তান্ত্রিকী নিগূঢ়ীর চিহ্নায়ন।

চৌষট্টি যোগিনীরা শক্তিদ্যোতক নানান সব গুহ্যবিদ্যাদির প্রকাশক। সকলে নানান অলংকারদি পরে তন্ত্রের মুদ্রাযোগকে প্রকাশ করে হীরাপুরের মন্দির গাত্রে শোভা পাচ্ছেন। বহুরূপা যোগিনী চতুর্ভূজা, শবের ওপর দাঁড়িয়ে আছেন। দ্বিভুজা যোগিনী তারা দেবীর অবস্থান শবের ওপর। নর্মদা যোগিনী হাতির ওপর অবস্থান করছেন, গলাতে মুণ্ডমালা ঝুলছে, এক হাতে রক্ত ভরা মানুষের মাথার খুলি ধরে আরেক হাতে ঢক ঢক করে পান করছেন।

চতুর্ভুজা যোগিনী যমুনা দাঁড়িয়ে আছেন কচ্ছপের ওপর, তাঁর ডান হাতে মানুষের মাথার খুলি। দ্বিভুজা শান্তি যোগিনী পদ্মের ওপর দাঁড়িয়ে আছেন, দুই বাহুতে সাপ জড়ানো রয়েছে। বারুণী যোগিনী দ্বিভূজা। প্রচুর গয়নাগাটি পরে রয়েছেন। কুমিরের উপর দাঁড়িয়ে আছেন চতুর্ভুজা যোগিনী ক্ষেমঙ্করী। আদ্রি যোগিনী দ্বিভুজা, হাতির ওপর দাঁড়িয়ে আছেন। চতুর্ভুজা যোগিনী বরাহী। যোগিনীর মুখ বন্য শুয়োরের মতন, মোষের ওপর দাঁড়িয়ে আছেন যোগিনী, এক হাতে রয়েছে মুণ্ডপাত্র আরেক হাতে ধনুক। সাপের ফণার ওপর দাঁড়িয়ে আছেন রণভীরা যোগিনী। রুদ্রাণী রূপ, ডান হাতে খড়গ ধরে আছেন। চতুর্ভুজা যোগিনী বানরমুখী। মুখটা স্বভাবত বানরের মতন, উটের পীঠের ওপর দাঁড়িয়ে আছেন। বৈষ্ণবী যোগিনী দ্বিভুজা, গরুড়ের ওপর দাঁড়ানো। কালরাত্রি যোগিনী ভাল্লুকের পিঠে দাঁড়িয়ে আছেন, দ্বিভুজা যোগিনী। বৈদ্যরূপা যোগিনীও দ্বিভুজা। ঢাকের ওপর দাঁড়িয়ে আছেন। এক পুরুষের ওপর দাঁড়িয়ে আছেন চর্চিকা যোগিনী, দ্বিভুজা, এক হাতে ধারালো দা, আরেক হাতে পদ্ম ধরে আছেন। বৈতালী যোগিনী চতুর্ভুজা। মাছের ওপর দাঁড়ানো। ছিন্ন মস্তকের ওপর দাঁড়িয়ে আছেন চতুর্ভুজা যোগিনী ছিন্নমস্তা। গুহার ছাদের মাথায় দাঁড়ানো বৃহবাহন যোগিনী, দ্বিভুজা, মাথাটা মহিষের আদলে। জ্বালাকামিনী যোগিনী দ্বিভুজা, বড় একটা ব্যাঙের মাথার ওপর দাঁড়ানো। দ্বিভুজা যোগিনী ঘটভরা, মুখ হাতির মতন, সিংহের ওপর দাঁড়িয়ে আছেন। করাকালী যোগিনী দ্বিভুজা, সারমেয়ের ওপর দাঁড়ানো। সরস্বতী যোগিনী চতুর্ভুজা, নাগের ওপর দাঁড়িয়ে। দ্বিভুজা যোগিনী বিরূপা জলের ঢেউয়ের ওপর দাঁড়িয়ে আছেন। রত্নভরা ঘড়ার ওপর দাঁড়ানো দ্বিভুজা যোগিনী কাবেরী। ভাল্লুকা যোগিনীর মুখ ভাল্লুকের মতন, সারা শরীর লোমে ভরা, দ্বিভুজা। সিংহমুখী যোগিনী নরসিংহী। চুল পর্যন্ত সিংহের কেশরের মতন। বির্যা যোগিনী দ্বিভুজা, পায়ের কাছে পদ্ম ফুটে আছে।

বিকটাননা যোগিনীর ঠোঁটটা পাখির মতন, দ্বিভুজা। মহালক্ষী যোগিনী দ্বিভুজা, ফুটন্ত পদ্মের ওপর দাঁড়ানো। ময়ূরের ওপর দাঁড়িয়ে আছেন দ্বিভুজা যোগিনী কৌমারী, হাতে ধরা রুদ্রাক্ষের মালা। অষ্টভুজা যোগিনী মহামায়া পদ্মের ওপর দাঁড়ানো। কালিকাপুরাণস্থ দেবী মহামায়ার সঙ্গে এঁর প্রভূত মিল রয়েছে। রতি যোগিনী দ্বিভুজা, পায়ের নীচে শুয়ে রয়েছেন মদনদেব। দ্বিভূজা কর্করী যোগিনী বড় কাঁকড়ার ওপর দাঁড়ানো। চতুর্ভুজা যোগিনী সর্বমায়া, মুখ সাপের মতন। চার পায়া টেবিলের ওপর দাঁড়িয়ে আছেন দ্বিভুজা যক্ষিণী যোগিনী। অঘোরা যোগিনী দ্বিভুজা, শিংওয়ালা ছাগের ওপর দাঁড়ানো। কাকের ওপর হাতে তরোয়াল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন দ্বিভুজা যোগিনী রুদ্রকালী। দ্বিভূজা যোগিনী বিনায়কী, মুখ হাতির। ইঁদুরের ওপর দাঁড়িয়ে বাঁ হাতে ধনুক ধরে ডান হাতে টঙ্কার দিচ্ছেন দ্বিভুজা যোগিনী বিদ্ধবাসিনী। বিছের ওপর দাঁড়িয়ে আছেন চতুর্ভুজা যোগিনী কুমারী। চতুর্ভুজা মাহেশ্বরী যোগিনী ষাঁড়ের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছেন। বেজির ওপর দাঁড়ানো দ্বিভুজা অম্বিকা যোগিনী। কামিনী আর ঘটাবরী দু-জনই দ্বিভুজা যোগিনী। প্রথম জনের বাহন মোরগ, দ্বিতীয় জনের সিংহ। চতুর্ভুজা স্তুতি যোগিনীর হাতে হলুদের কৌটো। দ্বিভুজা কালী যোগিনী অর্ধশায়িত পুরুষের ওপর দাঁড়িয়ে আছেন, হাতে ধরা ত্রিশূল। উমা যোগিনী চার হাতে শোভিতা, নীচের বাঁ হাতে ধরা নাগপাশ, পদ্মের ওপর দাঁড়ানো। এক হাতে সুরা পাত্র আরেক হাতে তরোয়াল ধরে আছেন দ্বিভুজা যোগিনী নারায়ণী। সমুদ্রা যোগিনী শঙ্খের ওপর দাঁড়ানো। চতুর্ভুজা ব্রাহ্মণী যোগিনীর তিন তিনটে মাথা। জ্বালামুখী যোগিনী আট পায়া চৌকির ওপর দাঁড়িয়ে আছেন। ভেড়ার ওপর অবস্থান করছেন দ্বিভুজা যোগিনী অগ্নি। টিয়া পাখির ওপর দাঁড়ানো অদিতি যোগিনী। চন্দ্রকান্তী যোগিনী চার পায়া চৌকির ওপর দাঁড়িয়ে। চমরি গাইয়ের ওপর দাঁড়িয়ে আছেন বায়ুবেগা যোগিনী। চামুণ্ডা যোগিনী চতুভুজা, কস্তুরী

মৃগের ওপর দাঁড়ানো, যোগিনীর চুল ছাড়া, কঙ্কালসার দেহ। একশৃঙ্গ হরিণের ওপর দাঁড়িয়ে আছেন মূর্তি যোগিনী। চতুর্ভুজা গঙ্গা যোগিনীর অবস্থান মাছের ওপরে। দ্বিভুজা ধূমাবতী যোগিনীর বাহন রাজহাঁস। গান্ধারী যোগিনীর দু-চোখে ফেট্টি বেঁধে আছেন। দ্বিভুজা সর্বমঙ্গলার মঙ্গলময়ী রূপ। ঘোড়ার পিঠে চড়েছেন চতুর্ভুজা সূর্যপুরী যোগিনী। অজিতা যোগিনী হরিণের পিঠে চেপে বসেছেন। দ্বিভুজা যোগিনী বায়বীণা নৃত্যের ভঙ্গিমা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

চৌষট্টি যোগিনীদের নাম ও রূপের কিছু কিছু পরিবর্তন আছে বিভিন্ন পুরাণ ও তন্ত্রপুঁথি অনুসারে। যোগিনীদের দাঁড়ানোর ভঙ্গিমা, হাতের অস্ত্র, খুলি, সুরাপাত্র, বাহন ইত্যাদির ভিতর লেগে রয়েছে তন্ত্রবিদ্যার নানান নিগূঢ়ী। এখানে চৌষট্টি যোগিনীদের বিশেষত্ব। এঁরা সকলে তান্ত্রিক সাধকদের সাধন নির্দেশিকা পেশ করছেন। যোগিনীদের তিনটে মাথা সত্ত্ব রজঃ তমঃগুণের প্রতীক, আট পায়া চৌকি অষ্ট সিদ্ধির ইঙ্গিত, চার পায়া টেবিল চার প্রধান দিকের নিশানা, শঙ্খ হল বীজমন্ত্রের নাদময় চিহ্ন, সুরাপাত্রে রয়েছে তন্ত্রের পঞ্চমকারের স্পষ্টতা, তীর সাধন নিশানার ইঙ্গিতবাহী, রাজহাঁস সাধক জীবন থেকে সার তুলে নেওয়ার লক্ষ্যবাহী— রাজহাঁসকে দুধ জল মিশিয়ে দিলে জল থেকে দুধ তুলে নিতে পারে, তেমন তন্ত্র সাধককে সাধন বস্তু তুলতে হবে গুরুর কাছ থেকে, তরোয়াল - ছুরি এগুলো সব ইন্দ্রিয়সূচক— কাম ক্রোধ লোভ মোহ ইত্যাদির দমন ইঙ্গিত। চৌষট্টি যোগিনীরা তাঁদের ভঙ্গিমা, অস্ত্র, বাহন দিয়ে গুহ্য বিদ্যাদির অনুশীলনের মাধ্যমে যে কেবল যোগিনী সিদ্ধি আসতে পারে তার ইঙ্গিত রাখছেন তান্ত্রিক সাধকদের কাছে। চৌষট্টি যোগিনীদের সাধনা আলাদা আলাদা স্থানে করতে নয়। সব যোগিনীদের সাধনা এক জায়গায় করা চলে না। বীরাচারী তান্ত্রিকেরা সাধারণত যোগিনী সাধনা করেন গুরুর দেখানো

পথে। যতদিন না সিদ্ধিলাভ হচ্ছে, সাধকদের সংকল্প নিয়ে রোজ যোগিনী অর্চনা, পুজোপাঠ, যোগিনী মন্ত্র জপ করতে হয়। যোগিনী প্রসন্না হলে দেখা দেন সাধকদের। যখন সিদ্ধির কাল একেবারে আসন্ন, সাধকদের আসন থেকে তুলে দেওয়ার জন্য নানান ছল করতে থাকেন যোগিনীরা। কখনো ভয় দেখান, সাপের রূপ ধরে আসনের সামনে ফনা তুলে ধরেন, উগ্রা মূর্তিতে এসে হাজির হন নিজে, সাধকদের যখন এইসব ভয়ভীতি নিয়ে হেলদোল থাকে না তখন সুন্দরী রমণী হিসেবে হাজির হয়ে সাধকদের ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা হারিয়ে যাওয়ার নানান ছলাকলা করতে থাকেন। সাধক এক লক্ষ্যে থাকলে যোগিনী সিদ্ধি আসে। সিদ্ধি পেলে যোগিনীরা সব সাধক তান্ত্রিকদের নানান কাজের সহায়ক হন। সাধক ইচ্ছেমতো যোগ বিভূতির প্রকাশ করতে পারেন চৌষট্টি যোগিনীদের মধ্যে কোনও এক যোগিনী সিদ্ধি পেয়ে। তিনি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিমেষে পৌঁছতে পারেন, পার্থিব বস্তু— রত্ন, রাজসিক খাবার অনায়াসে নিজের সামনে হাজির করে সাধারণজনকে ভেলকি দেখাতে পারেন। অপ্রয়োজনে, কেবলমাত্র যদি নিজের ক্ষমতা প্রকাশের জন্য তন্ত্র সাধকেরা যোগিনী সিদ্ধি ব্যবহার করতে থাকেন, ক্ষয় হতে থাকে আস্তে ধীরে সিদ্ধাই। একসময় সিদ্ধির ক্ষমতা পুরোপুরি হারিয়ে ফেলে সাধকেরা একেবারে বদ্ধ উন্মাদ হয়ে পড়েন। যোগিনী সিদ্ধি যাঁরা পান তাঁরা খুব একটা মনুষ্য সমাজের ভিতর চট করে আসেন না। তাঁরা গুপ্ত সাধক। গুটিকয়েক মানুষ কেবল এঁদের সিদ্ধি সম্পর্কে অবগত থাকেন। এঁরা অকাতরে বিভূতি বিলিয়ে নিজেকে নষ্ট করেন না। এখন চৌষট্টি যোগিনীর সাধনক্রম প্রায় নেই বললে চলে, যাঁরা আছেন যোগিনী সিদ্ধ সাধক খুব গুপ্ত ভাবে নেপাল, অসম, বাংলাতে ছড়িয়ে আছেন। অতিশয় প্রবীণ সাধক এঁরা, শিষ্য করতে নিতান্ত অনাগ্রহী, যথার্থ শিষ্যের অভাবে কেউ কেউ দীক্ষা দেওয়া পর্যন্ত বন্ধ করে রেখেছেন।

গুটিকয়েক প্রাজ্ঞ প্রবীণ যোগিনী সিদ্ধাই তন্ত্রগুরুরা দেহ রাখলে গোটা ভারত থেকে যোগিনীক্রমটি একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। উত্তরপ্রদেশ, ওড়িশার দিকে কিছু অবশ্য যোগিনী সিদ্ধক্রমের সাধকরা আছেন, কিন্তু বেশিরভাগ সামান্য সিদ্ধাই পেয়ে বিভূতি প্রকাশ করে করে নিজেদের শক্তি নষ্ট করে ফেলে এখন গুরুগিরিতে আটকে গেছেন। বহু প্রাচীন ও সমৃদ্ধ এই বিদ্যা যোগ্য গুরুর অভাবে নষ্ট হয়ে যেতে বসেছে। চৌষট্টি যোগিনীর সাধনা হঠাৎ করে করা চলে না। স্কন্দপুরাণে রয়েছে, যোগিনী পীঠে সাধনা করবার কথামালা। ধূপ-দীপ জ্বালিয়ে যোগিনীদের প্রসন্ন করতে হয়। শারদীয় মহাপুজোর অনুষ্ঠান করতে হয় আগে, তারপর হয় যোগিনীদের পুজো। পুজোর পর বলিদান। আশ্বিন মাসের শুক্ল প্রতিপদ থেকে নবমী পর্যন্ত যোগিনী পীঠে অর্চনা করতে হয় সাধককে। পীঠে চলে নিশা জাগরণ। বদরী কাঠ দিয়ে চৌষট্টি যোগিনীদের প্রত্যেককে প্রণবযুক্ত নামে নামে অষ্টোত্তরশত আহুতি প্রদান করতে হয়। এভাবে করতে হয় যোগিনী পীঠের সাধনা। চৌষট্টি যোগিনীরা সাধারণত নিরাকার, যদি না এঁরা অবতীর্ণা হন। যোগিনীদের দেখা পেতে হলে সাধকের আত্মা জাগরণের সিদ্ধি থাকতে হবে। শরীর নেই যাদের সেই নিরাকার আত্মাদের সঙ্গে যে সমস্ত তান্ত্রিকদের একাত্মতা রয়েছে তাঁরাই কেবল যোগিনী সিদ্ধি পেতে পারেন। আত্মার সঙ্গে কথা বলতে হবে মনের দ্বারা, ভাব বিনিময়ে চলবে কথোপকথন। মৃত্যু হল নিগম আর জন্ম আগম। চৌষট্টি যোগিনীর সাধনা করতে গেলে সাধকের সচেতন অবস্থার মৃত্যু ঘটাতে হবে। জন্ম আর মৃত্যুকে পৃথক চোখে কখনো দেখা চলবে না। ভাবতে হবে দুটোই স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। গুরুর শেখানো ধ্যানবিদ্যা দিয়ে চেতন অবস্থা থেকে অচেতনের মধ্যে প্রবেশ করতে হবে। প্রতি ক্ষণে ক্ষণে মৃত্যুর চিন্তা করতে করতে যখন বৈরাগ্য চলে আসবে সাধক তান্ত্রিকের, ধ্যানমুদ্রাতে বসে চেতনযুক্ত থেকে অচেতনে প্রবেশ করার

অভ্যাস শিখতে হবে। শরীর হল আত্মার প্রথম বস্ত্র। ভৌতিক স্থূল বস্ত্র ত্যাগ করতে পারলে সূক্ষ্ম শরীর বেরিয়ে পড়বে। সূক্ষ্ম শরীর থেকে বিদ্যুৎকণা বের হয় কুণ্ডলিনী যোগে। আত্মা ওই সূক্ষ্ম শরীর নিয়ে গর্ভে প্রবেশ করে আবার মৃত্যুর পর সূক্ষ্ম শরীর নিয়ে পরবর্তী যাত্রাপথে বেরিয়ে পড়ে। আত্মার আগমন আর গমন, আত্মার সূক্ষ্ম শরীরের সাহায্যে যাওয়া আসা এগুলো সমস্ত যোগিনী বিদ্যা রপ্ত করতে হলে শিখতে হবে গুরুর কাছ থেকে। চৌষট্টি যোগিনীরা সাধকের প্রাণশক্তি আর আত্মশক্তির সামঞ্জস্য অনুসারে সাধকদের সঙ্গে একাত্মতা তৈরি করেন। তাঁরা রতিপ্রিয়া, কামুক হয়ে সাধকদের যেমন ভ্রষ্ট করতে পারেন, কখনো কখনো সশরীরে প্রকট হয়ে তাঁদের ইচ্ছা অনুযায়ী রূপও ধারণ করতে পারেন। এজন্য চৌষট্টি যোগিনীদের রূপের নানান বৈপরীত্য দেখা যায় পুরাণ ও তন্ত্রপুথির পাতায়।

বৈদিক যুগে নারী ঋষিদের দেখা মেলে নারী দেবতাদের পাশাপাশি। বৈদিক সাহিত্যে ঊষা, পৃথ্বী, অদিতি, সরস্বতী, বাক, নিঋতি এমন সব নারী দেবতাদের দেখা মেলে। ঊষা সেখানে ভোরের চিহ্নায়ন, পৃথ্বী আদিগন্ত প্রাণের, অদিতি মহাজাগতিক নৈতিক নিয়মের প্রকাশক, সরস্বতী জ্ঞানের বাহক, বাক শব্দ, নিঋতি ধ্বংসের ইঙ্গিত। এমন সব প্রাকৃতিক অভিজ্ঞান ভরা নারী দেবতার পাশাপাশি রয়েছেন দিনশনা, রাকা, পুরমধী, পরেন্দী, ভারতী, মাহীরা। কিন্তু পুরুষ দেবতাদের মতো নারী দেবতাদের কথা বারংবার আলোচিত হয়নি। তেমন ঋষিদের কার্যকলাপের পাশে নারী ঋষি বা ঋষিকারা একেবারে ম্লান। উত্তর বৈদিক কালে গিয়ে দেবীশক্তি পরব্রহ্মের প্রকাশ হিসেবে উঠে আসে। নারীশক্তির অভ্যুদয় ঘটতে থাকে। যোগি ঐতিহ্যের সঙ্গে যোগিনীরাও ঢুকে পড়েন। তাঁরাও যোগ অনুশীলন করেন। এঁদের ঐতিহ্যের একটি বড় অংশ হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল। গোরক্ষনাথ প্রবর্তিত নাথপন্থীদের ঐতিহ্য, বৌদ্ধদের বজ্রযান শাখা

যোগিনী ঐতিহ্যে দৃষ্টান্ত রাখতে থাকে। যোগসিদ্ধা নারীদের দেখা মিলতে থাকে হিন্দু তন্ত্রের সীমানায়, বৌদ্ধ তন্ত্রের চৌহদ্দিতে, যোগিনীদের নিয়ে চর্চাবহুল একটা সক্রিয় অংশ যে অতি প্রবল ছিল তার উল্লেখ্য প্রমাণ মন্দিরের গায়ে তাঁদের যোগচর্চার নানান নিদর্শন আর আলাদা করে গুরুত্ব সহকারে যোগিনীদের মন্দির নির্মাণ হতে শুরু করা নয় শতক হতে। তখন হতে চৌষট্টি যোগিনীদের সঙ্গে কৌল তান্ত্রিক সমাজের যোগাযোগ গড়ে ওঠে। তন্ত্রের দেহচর্চা, মুদ্রার শৈলী ও ভঙ্গিমা, যুগল ক্রিয়াকরণের সঙ্গে যোগিনী ঐতিহ্য জুড়ে যেতে থাকে। শেষমেষ ভারতীয় পুরাণ ও তন্ত্রশাস্ত্রের কৃষ্টিকলাতে চৌষট্টি যোগিনীরা যথেষ্ট সম্মাননীয়ার সিংহাসন দখল করেন। আজও চৌষট্টি যোগিনীদের নিয়ে নানান মহলে যথেষ্ট কৌতূহল রয়ে গেছে।

খুঁজে ফেরা কুণ্ডলিনী

।। কুণ্ডলিনী ধ্যান।।

নিজেকেই তৈরি করতে হয় কৃপা অবতরণের রাস্তাটা। ভগবৎ কৃপা, গুরু কৃপা এগুলো এমনি-এমনি মেলে না। এর জন্য নিজের দীর্ঘ প্রস্তুতি একটা দরকার।

কেবলমাত্র বীজমন্ত্র জপ আর কিছু পুজো - হোম - বিধি করে মায়ের নিত্য উপস্থিতি কেউ টের পেয়েছেন এটা হতে পারে না।

মায়ের উপস্থিতি বুঝতে হলে সবার আগে মায়ের আগমনের রাস্তাটি তৈরি করতে হবে। মা আসবেন সবার আগে মনে। সেজন্যই সাধনার সবচেয়ে দরকারি কাজটা হল মনটাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নীরব করে নেওয়া।

যাঁদের মন নীরব নয়, স্থির নয়, স্থিতির অভ্যাস নেই, তাঁদের সাধনাতে সাফল্যলাভ কোনওভাবেই সম্ভবপর নয়।

দুটো ফুল দেওয়া, তিনটে বেলপাতা শিবের মাথাতে দেওয়া আর নৈবেদ্য সাজিয়ে কিছু মুদ্রা দেখিয়ে পুজোটা করা যাবে কিন্তু মায়ের উপস্থিতি কোনও বিধি দিয়ে পাওয়া যাবে না। যদি যেত তাহলে পুরোহিতশ্রেণি সব সময়ই মায়ের উপস্থিতি টের পেতেন।

ধরুন, আজ নিজের মায়ের জন্মদিন। মা ইলিশ মাছ খেতে খুব ভালোবাসেন। জন্মদিন উপলক্ষ্যে সেজন্য মাছ কিনে খুব সুস্বাদু করে রান্না করে মাকে সামনে বসিয়ে তৃপ্তি করে খাওয়ানোটাই বড় কথা। নিশ্চয়ই মাকে খাওয়ার আগে তাঁর থালাতে দুটো ফুল, তিনটে বেলপাতা সাজিয়ে আমরা মুদ্রা দেখিয়ে-টেকিয়ে মাকে নিবেদন করি না!

তেমনই আমাদের চিন্ময়ী মা। মনে করতে হবে আমার ঘরে তাঁর নিত্য উপস্থিতি। সেজন্যই তাঁর ভালো-লাগা, মন্দ-লাগা সব আমি জানি।

তাঁকে যখন খেতে দেব নিবেদন করব কেন? যত্ন করে আসন পেতে ভাতের থালা সাজিয়ে অপেক্ষা করব তাঁর খাওয়ার।

মনে করতে হবে চিন্ময়ী মা সত্যি - সত্যি খাচ্ছেন।

এটাই ভাবের পুজো। বিধির পুজো দিয়ে খুব বেশিদূর যে এগোনো যাবে না তা আমাদের অনেক মহাত্মাই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। তাও আমাদের হুঁস ফেরেনি। বিধিতে আটকে আছি আমরা।

বিধি দিয়ে ভগবানকে পাওয়া যায় না কখনো। বড় একটা মন আর আকুল-পারা ভালোবাসা দরকার তাঁকে পেতে।

সেজন্যই মনকে নীরব করে নিত্য স্থিতি দরকার সবার আগে তাঁকে লাভ করার জন্য।

মন নীরব হলে, স্থিতি এলেই মায়ের নিত্য উপস্থিতি চট করে টের পাওয়া যাবে।

মনকে নীরব করতে গেলে অনেকেই ধ্যান, জপ ইত্যাদি অনুশীলনের কথা বলেন।

ওগুলো খুব উপরের থাকের বিষয়। ধ্যান আর জপ কোনওটাই সহজ কাজ নয়। ধ্যান বলতে আমরা চোখ বোজা আর জপ বলতে মালা বা আঙুলের কর গোনা কিছু সংখ্যাগত শব্দের সমষ্টি বুঝি।

ঈশ্বর কখনো সংখ্যবাচক নন। সংখ্যা গুনে তাঁকে পাওয়া যাবে না। তাঁকে পাওয়ার রাস্তাটা তৈরি করতে হবে নিজের মনে।

সেজন্যই মনকে সবার আগে নীরব করতে হবে। মন নীরব হলেই স্থিতি।

মন নীরব করার সবচেয়ে সহজ রাস্তা হল, যে কোনও অবস্থাতেই আমরা থাকি না কেন সেই অবস্থার ভিতর খুব সচেতন হয়ে নিজের শ্বাস-প্রশ্বাসের

দিকে নজর রাখা।

এই ধরুন, বাজারে গিয়ে ইলিশ মাছেরই দর করছি মাকে খাওয়াব বলে। দোকানির সঙ্গে কথা বলতে-বলতেই বাজারের কলতানের ভিতরও আমার নজর থাকবে শ্বাসে।

এই আমি শ্বাস নিচ্ছি আর শ্বাস ছাড়ছি।

এটা যদি খুব সচেতন অবস্থায় আমরা রোজ কোনও-কোনও কাজের ভিতরই একটু অভ্যাস করতে পারি এক মাসের ভিতর মন নীরব হতে বাধ্য।

এছাড়া রোজ দুবেলা আসনে বসেও কিছুটা সময় নিজের শ্বাসের ধ্বনিটা শুনতে হবে।

এতে মন নীরব হবেই। তখনই নীরব মনে মায়ের জপ, মায়ের ধ্যান আরও সহজতর হয়ে উঠবে।

মনের ভিতর ঈশ্বরের উপস্থিতি বোধটা তৈরি করতে হবে। জানতে হবে আমাকে How 1 can talk with god. কেমন করে আমি ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলব।

এর অনেকগুলো পদ্ধতি আছে। যাঁর যাঁর নিজের গুরু নিশ্চয়ই এগুলো শিখিয়ে দিয়েছেন কীভাবে মনকে নীরব করে ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করতে হবে।

আর একাত্মতা থেকেই কথা উঠবে মনে। নীরব কথা। আর নীরব কথার ভিতর থেকেই সদর্থক উত্তর পাওয়া যাবে আরাধ্যের।

এটা দীর্ঘ চর্চা সাপেক্ষ একটা অধ্যায়। খুব সহজ কাজ নয়।

গুরুর সাহায্য ছাড়া এই কাজ করা যায় না। এর জন্যে নানান ধ্যান ও তন্ত্রের মুদ্রার প্রয়োগ আছে। যেগুলোকে দিয়ে কুণ্ডলিনীকে আঘাত করে-করে কথা বলার প্রক্রিয়াটি তৈরি করতে হবে নিজের নীরব মনে।

এটা পুরোটাই গুরুগম্য পথ। নিজের-নিজের গুরুর কাছ থেকে অনেকেই এ রাস্তাটা নিশ্চিত পেয়েও গেছেন।

মন যখনই নীরব হল, তখনই স্থিতি। স্থিতি মানে দেহাশ্রিত মন ও প্রাণকেই দেহাশ্রিত মহাশক্তির সান্নিধ্যে উপস্থিত করানো।

কুণ্ডলিনীধ্যান দিয়ে, চক্রধ্যানের ভিতর দিয়ে উপস্থিতির প্রক্রিয়াগুলো একটি বছর অভ্যাস করলেই নিত্য চেতনটা চলে আসবে।

ওটাই স্থিতি। মোদ্দা কথা স্থির হলেই স্থিতি আসবে।

স্থিতিকে বাড়ানোটাই এবারকার সাধনা।

শরীরের একটা স্থিতি আছে। সেই স্থিতি ধরে ঈশ্বরের স্থিতিতে আগে পৌঁছতে হবে, তবেই পরমেশ্বরের স্থিতিটিতে যাওয়া যাবে।

শরীরে যেমন গুণত্রয় আছে— সত্ত্ব, রজঃ আর তমঃ তেমনই ঈশ্বরের সঙ্গে বাক্যালাপের জন্য তিনটি স্তর আছে। তিন স্তরের তিন স্থিতি।

পরমেশ্বরের এলাকাতে নিশ্চল স্থিতি।

চাঁদের যেমন ষোলোটি কলা থাকে পূর্ণচন্দ্রে পৌঁছনোর আগে তেমনই স্থিতিতে পৌঁছতে হবে কলাভেদ করেই। শরীরের মধ্যেই সাধনজ কলার বিকাশ ঘটবে।

ষোলোটি কলার সমষ্টি হচ্ছে বিন্দু।

বিন্দু দিয়েই পূর্ণজ্যোতি।

আমরা যখনই ধ্যানে বসে চোখটা বুজে ফেলি, তখনই খুব অন্ধকার দেখি প্রথম - প্রথম।

এর কারণ হল, মনটা আমাদের নীরব নয়, অস্থির মনে স্বচ্ছ স্ফটিকের ছায়াটা আসবে কী করে?

মনে ইন্দ্রিয়গুলোর সজাগ উপস্থিতি। ওগুলো মনের ময়লা।

সেজন্যই চোখ বুজলেই প্রথম-প্রথম আমরা ঘুটঘুটে অন্ধকার দেখি।

মনের ময়লা থাকে মূলাধার চক্রে। মূলাধার খোলার প্রক্রিয়াটি শুরু করলেই মনের ময়লা কেটে যাবে, চিত্তমল দূর হবে, অন্ধকারের পর্দাটা সরে গিয়ে বিন্দুর দেখা মিলবে।

চোখ বুজলেই যদি অন্ধকার সরে গিয়ে খানিকটা আভা আসে তাহলে বুঝতে হবে তখন অভ্যাস করতে-করতেই স্থূল দেহাত্মবোধটা সরে সরে যাচ্ছে।

এরপরই বিন্দু থেকে জ্যোতির এলাকা।

জ্যোতির অবস্থান সহস্রারে। ওখানেই ষোলোকলা।

যদি স্থিতি দিয়ে গুরুর সহায়তায় তীব্র অভ্যাসে পনেরো কলা অবধি চলে যাওয়া যায় তবেই অমৃতবিন্দুরূপে মায়ের ষোড়শী কলা পাওয়া যাবে।

ওটাই মায়ের ষোড়শী রূপ। এই কলাতেই মাতৃদর্শন।

তখনই মায়ের ভাষাটা রপ্ত করতে-করতে অনায়াসেই মায়ের সঙ্গে, ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলাটা তখন রপ্ত হয়ে যাবে।

তবে এর জন্যে নিজের প্রচেষ্টা আর গুরুর শেখানো পদ্ধতিগুলোর অভ্যাস যেমন দরকার তেমনই দরকার অন্তত আধ ঘণ্টা নিয়মিত বিভিন্ন সাধকদের লেখা আধ্যাত্মিক অনুভূতির নানান গ্রন্থাদি পাঠ।

স্থিতি আনতে পড়াটা সবার আগে দরকারি।

গুরুমুখী বিদ্যা বলে বাঁধা বুলি বলে গেলে স্থিতি কখনো আসবে না।

কোনও গুরুরই ক্ষমতা নেই স্থিতি এনে দেওয়ার।

নিজের স্থিতি নিজেকেই আনতে হবে।

তারপরই কৃপার প্রসঙ্গটি আসতে পারে।

তা গুরু কৃপা হোক কিংবা ভগবৎ কৃপা।

সেটা অনেক পরের ব্যাপার।

।। গুণত্রয়।।

গুণত্রয় নিয়েই আমাদের শরীর। গুণের বৃত্তিগুলোতে স্বভাবতই পথ চলা। চলতে-চলতেই যদি বৃত্তিগুলোকে চিনতে না পারি তাহলে বৃত্তিগুলোকে সংযত ও শান্ত করতে পারা কোনওভাবেই সম্ভবপর নয়।

যাবতীয়, যতরকমের ইন্দ্রিয় সংযুক্ত মনের বৃত্তি, এগুলো সমস্তটাই তমঃগুণের বৃত্তি। জাগতিক সমস্ত বৃত্তিই তমঃগুণের। চাহিদা পূরণের, আর যতরকমের নিবৃত্তির জন্য আমাদের ছোটাছুটি, সমস্তটাই তমঃগুণের।

জীবনে বেঁচে থাকতে গেলে, থাকা-খাওয়া ও একটু নিশ্চিন্তির জন্য তো কিছু চিন্তারপ্রবাহ মনে ওঠাটাই স্বাভাবিক!

মনে ওঠা সমস্ত বৃত্তিই তমঃগুণের। এগুলোর ভিতর যদি একটু ভালো থাকার জন্য চাহিদা মেটানোর চিন্তাপ্রবাহ আসে মনে, সেগুলো তখন রজঃগুণের বৃত্তি।

তমের থেকে রজঃ ভালো। তমের বৃত্তিতে লোভ-লালসা-হিংসা-ক্ষোভ-পরশ্রীকাতরতা থাকে।

রজঃগুণের বৃত্তিতে একটু বৈরাগ্যের ছায়া দেখা যায়। এই যেমন, কেবলমাত্র জীবনধারণের জন্য ন্যূনতম কিছু চাহিদা মেটানো। চাই-চাই, এগুলো না হলে চলবে না, একে মারব ওকে ধরব, ওকে কটু কথা বলব, কারও একটু কাজে আসব না, সবসময়ই আমার-আমার করব, অহংকার আর ঈর্ষাতে ভরপুর হয়ে সমাজকে গালি দেব নিজের বাসনা পূরণ হচ্ছে না বলে— এমন বৃত্তিধারীরা কখনো আধ্যাত্মিক পথে যেতে পারবেন না।

তমের শরীর, স্থূল শরীর নিয়ে আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশ করে লাভ নেই। আধ্যাত্মিক জগৎ চাহিদা পূরণের জগৎ নয়। আধ্যাত্মিক জগৎ হল, আত্মপ্রত্যয় আর আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর জগৎ। এ দুটো যদি সদর্থকভাবে আসে মনে, আর থাকে যদি অসম্ভব মনের জোর তবে তখনই জানতে হবে রজঃগুণের এলাকা ভেদ করছে শরীর।

এই পর্বেই গুরু চলে আসেন। তিনিই শিখিতে দেন আত্মপ্রত্যয়, আত্মবিশ্বাস, আর মনের জোর বাড়ানোর মন্ত্র।

মন্ত্র নিয়েই জীবনের সব সমস্যার সমাধান করে আধ্যাত্মিক চিন্তার ভিতর ডুবে থাকা যায়। এমত যখন দশা, তখনই সেটা সত্ত্বগুণের। শরীর তখন সূক্ষ্ম থেকে কারণের দিকে।

মনের বৃত্তিগুলো খানিকটা শান্ত হলেই মনের ভিতরকার যে অন্তঃকরণ, ওখানে একটা প্রস্রবণের দেখা মিলবে। একে অধ্যাত্মবাদের ভাষাতে বলা হয়, চিত্তহ্রদ।

চিত্তহ্রদে চিন্তার প্রবাহ যখন আধ্যাত্মিক জিজ্ঞেসার দিকে ঝুঁকবে, তখনই শাস্ত্রীয় গ্রন্থাদির দিকে মন নজর টানবে।

বেদ, পুরাণ ও বিভিন্ন সাধকদের লেখা গ্রন্থাদি পড়তে-পড়তেই স্থূল থেকে শরীর সূক্ষ্মের দিকে এগোবে।

পড়ার বিকল্প কিছু নেই। আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য বিবিধ সাধকদের লেখা গ্রন্থাদির নিয়মিত পাঠ না হলে শরীরে গুণত্রয়ের ভেদ হবে না কখনোই।

গুরু কিছুই করতে পারবেন না গুণত্রয় ভেদের। নিজের ভিতরকার তমঃ ও রজঃগুণের ভাব শরীর ও মন থেকে তাড়িয়ে দিতে হলে গ্রন্থাদি পাঠের বিকল্প কিছু নেই।

গুরু এক্ষেত্রে সহায়ক হতে পারেন কেবল। তিনি নিশ্চয়ই বলে দেবেন শিষ্যর অন্তঃকরণ এখন কোনও জায়গায় আছে, সেই অনুযায়ী চিত্তহ্রদে নিবৃত্তির চিন্তা তুলতে পারে এমন উপযোগী গ্রন্থাদির কথা। এটা গুরুর দায়িত্ব। সেজন্যই গুরু করতে হয় খুব বুঝেশুনে।

গুণত্রয়ের মতনই তিন ধরনের গুরু থাকেন। উত্তম গুরু, মধ্যম গুরু, আর অধম গুরু।

যিনি অধম গুরু, তিনি কেবল মন্ত্রদীক্ষা দিয়েই খালাস। শত-শত শিষ্য ওঁর। মন্ত্র দিয়েই দায় তুলে নেন তিনি। এত শিষ্যর কারণে ভালো করে সকলকেই চিনতেও পারেন না।

মধ্যম গুরু যিনি, তিনি মন্ত্রদীক্ষার পাশাপাশি একটু বলে দেবেন কীভাবে ধ্যানজপ করবে। ওখানেই তাঁর দায় শেষ। তাঁরও অনেক শিষ্যাদি। অত সময় নেই রোজকার সহায়তায়।

যিনি উত্তম গুরু, তিনি বুঝেশুনে শিষ্য করবেন। তাঁর কাছে আসতে হলে শিষ্যকে অনেক পরীক্ষা দিতে হয়। তিনি চট করে কাউকে শিষ্য করেন না। বরং ভাগিয়ে দিতে ওস্তাদ। তিনি তমঃগুণের ও রজঃগুণের মানুষের জন্য নন। তাঁর দায় আধ্যাত্মিক প্রয়োজনেই নির্ধারিত।

সেজন্যই সত্ত্বগুণের অধিকারী মানুষদের তিনি কেবল টানেন। তাঁদের মন্ত্রদীক্ষা দেন, কুণ্ডলিনী চালনায় প্রবল সহায়তা করেন একেবারেই বন্ধুর মতন।

এমন গুরুর সঙ্গেই শিষ্যর প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সেই প্রেমে শক্তিময়ী মায়ের দরজা খুলে যায়।

উত্তম গুরুরা জীবনে এসে চিন্তা-চেতনাটাই বদলে দেন। আগে যেভাবে ভাবনা ছিল, এখন দেখার চোখ খুলে গিয়ে ভাবনা পরিবর্তন হয়ে গেছে।

তাঁরাই বলেন, তমঃগুণের ও রজঃগুণের মানুষদের সঙ্গে ওঠাবসা বন্ধ করতে হবে। এটা করতে পারলে মনে প্রবল সত্ত্বগুণের বিকাশ। অনেক আত্মবিশ্বাস, আর মনের জোর নিয়ে মন তখন ভালো-ভালো কাজের জন্য এগিয়ে যায়।

তখন যাঁরা কেবল ওই ধর্ম-ধর্ম নিয়ে ছেঁদো কথা বলে না জেনে না শুনে, যাঁরা কেবল বলে এই উপোস এই বিধি, এই গুরু ভালো এই গুরু মন্দ, এই কালী বড় ওই কৃষ্ণ ছাড়া দেবতা নেই, তাঁদের আর ভালো লাগে না।

এঁরা সব তমঃ ও রজঃগুণের ধারাতে আটকে। তা গুরুই হন আর শিষ্য।

এই থাকে পুজো-উপাসনা চলতে পারে। কিন্তু সাধনা পুরো উঁচু থাকের আধার।

ওখানে যেতে উত্তম গুরু চাই, আর চাই উত্তম শরীর।

উত্তম শরীর মানে তমের ভাব কেটে যাওয়া শরীর। এই শরীর নিজেকে তৈরি করতে হবে ভালো-ভালো শাস্ত্রীয় গ্রন্থাদি পাঠ করে।

তবেই উত্তম গুরু আসবেন। ভালো গুরু লাভ করতে গেলে উপযুক্ত শরীর দরকার।

তমের শরীর নিয়ে উত্তম গুরু পাওয়া যায় না। ওই অধম গুরু লাভ হয় এক্ষেত্রে।

রজের শরীরে মধ্যম গুরু লাভ হয়।

সেজন্যই উত্তম গুরু পেতে নিজেকে তৈরি করতে হয়। না হলে আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্ভব নয়। সাধনা ওই পুজো-হোম-মন্ত্র-ন্যাস-মুদ্রা-বেলপাতা-ফুলে আটকে যাবে।

গুণত্রয় সর্বত্রই আছে। তা শুধু মানুষের নয় কেবল।

বাতাসেরও গুণত্রয় আছে।

ভোরের বাতাস সত্ত্বগুণের। এ বাতাস গায়ে লাগাতে পারলে শরীরে সত্ত্বগুণের আধার আসবে।

দুপুরের বাতাস রজঃগুণের।

সন্ধ্যার বাতাস তমঃগুণের।

ফুলেরও গুণত্রয় আছে।

সত্ত্বগুণী ফুল তন্ত্রের। মায়ের পুজোতে লাগে। জবা ফুল পাপড়ি মেলে সকালের আলোতে।

যে ফুলগুলো আলো ফোটার পর ফোটে, সেগুলো সত্ত্বগুণী ফুল। এই ফুলই পুজোতে লাগে।

রজঃগুণের ফুলগুলো শেষ রাতে বা মাঝ রাতে ফুটে যায়।

তমঃগুণের ফুল সন্ধ্যায় ফোটে, এই ফুলগুলো পুজোতে লাগে না।

সেজন্যই গুণত্রয় ভেদ প্রবল দরকারী। এই ভেদ না জানলে, না বুঝলে সাধক জীবন শুরু হতে পারে না।

ধর্মীয় জীবন আর আধ্যাত্মিক জীবন দুটো আলাদা।

ধর্মীয় জীবন পুজো-উপাসনা-স্তবপাঠ-স্থূল দীক্ষা-অমুক গুরু তমুক গুরু-কালী কৃষ্ণ ইত্যাদিতে আটকে।

ধর্মীয় জীবনের জন্যই মধ্যম আর অধম গুরু।

যদি মনে থাকে আধ্যাত্মিক জীবনযাপন করব, জগৎ জানব, জানব আমি কে, ব্রহ্ম কী, মৃত্যু কী, কোথায় কীভাবে চেতনা আসে— এসব জানার জন্য গ্রন্থাদি পড়ে, সাধুসঙ্গ করে তৈরি হলে উত্তম গুরু এসে হাজির হবেন।

তিনি বন্ধুরূপে এসে জীবনখানাই বদলে দেবেন তখন।

যাঁদের এমন গুরু লাভ হয়েছে, তাঁরাই এটা ভালো জানেন।

সেজন্যই নিজেকে তৈরি করতে হবে সবার আগে। না হলে কিছুই হওয়ার নয়।

মনের জোর রাখতে হবে। মনের জোর বাড়ানোটাই বড় সাধনা।

সাধনা দুর্বলের হতে পারে না।

সাধনার জন্য শক্তিশালী মন চাই।

তবেই উত্তম গুরু লাভ হবেই, হবে।

বিন্দুস্পন্দ

একাগ্র চেতনাটাই অতি সূক্ষ্ম এক সংকেত এনে দেবে দুই ভুরুর মাঝখানে। ওটাই স্থিতি। স্থির দশা।

ও দশাতে গেলেই ওঙ্কারের টিপখানি দেখা যায়। বিন্দুস্পন্দ।

তন্ত্র একেই বলছে, শ্বেতবিন্দু। এটাই স্থিতি। স্থির দশা। শিবের।

আরেকটা দশা তন্ত্রের, শক্তির। একে বলা হচ্ছে শোণিতবিন্দু।

তন্ত্রে শক্তির স্থান মূলাধারে। ওখানকারই বিন্দু শোণিত।

কুণ্ডলিনীধ্যানে গুরু এই শোণিত ভাবনার প্রক্রিয়াটি দেখিয়ে দেন।

শোণিতবিন্দু গিয়ে বদলে যাবে নীলবিন্দুতে। এটা অনাহত পদ্মের ধ্যানপ্রণালী।

অনাহত থেকে সহস্রারে গিয়েই তন্ত্রের শ্বেতবিন্দু। স্থিতি। শিবের এলাকা।

শিব কখনো শক্তিহীন তো হতে পারেন না। সেজন্যই স্থিতির ভিতরও শক্তির বিলোপ তো হয় না।

নিস্পদ অবস্থায় যখন শরীরটা চলে যায় তন্ত্রের কুণ্ডলিনী ধ্যানে, তখনও ওর ভিতরও আলোর উদ্ভাস দেখা যায়। ওটা সহস্রারে গিয়ে দাঁড়ানো মায়ের জ্যোতি।

মায়ের জ্যোতির কাছেই পৌঁছনোটা তন্ত্রের আসল সাধনা।

জ্যোতির কাছেই পৌঁছতে হবে। তবেই মায়ের দেখা পাওয়া যাবে।

তন্ত্র বলছে, শ্বাস-প্রশ্বাসে প্রাণের কদর যদি করতে না পারো, তাহলে শুধু ঘণ্টা নেড়ে, পুজো করে মায়ের এলাকায় যাওয়া যাবে না।

হকারেণ বহির্য়াতি— হকার দেহের বাইরে, মহাশূন্যে শিব হয়ে ছড়িয়ে পড়ে, আর সকারেণ বিশেৎ পুনঃ— আবার সকারে শক্তি ভিতরে গুটিয়ে গিয়ে জীবের এলাকায় পৌঁছে যায়।

মায়ের এলাকা থেকে শরীরের সাধারণ দশা বা জীবের এলাকা, আবার জীবের এলাকা থেকে মায়ের এলাকা— কুণ্ডলিনীচক্রে এভাবেই আমরা ঘুরতে থাকি।

এরই ভিতর যে গুরুর শেখানো শ্বাস-প্রশ্বাসের ছন্দময় আনন্দময়ী স্থিতি, ওখানেই মাতৃদর্শন।

বৈষ্ণবে আর শাক্তে কামড়াকামড়ি করেন, আর সাধক বোঝেন, সতী আর রাধা একই।

তত্ত্বগত দিক থেকে এক। দুজনের কেউই সন্তানের মা নন। অর্থাৎ, শক্তি তখনও সৃষ্টির মধ্যে ঢুকে পড়েনি।

সৃষ্টি হল এক ভেঙে গিয়ে দুই হওয়া। শিব আর শক্তি। কৃষ্ণ আর রাধা। এটাই সাধনগত দ্বৈত এলাকা।

উচ্চকোটির সাধন যাঁরা, জ্ঞানমার্গী, আর সমদর্শীপন্থার যাঁরা, তাঁরা চট করে বুঝে ভেদহীন সাধনায় মায়ের জ্যোতির কাছেই পৌঁছে যান।

যাঁরা স্থূল পূজক, কেবল কৃষ্ণ, আর কালী পুজো নিয়ে মত্ত, যাঁদের ভেদজ্ঞান যায়নি, তাঁরা মারামারি করেন।

সাধনা মারামারি করার বিষয় নয়। সাধনা জ্ঞানের ও ভাবের।

সাধনা সত্যের। সাধনা কুসংস্কার, আর অন্ধ বিশ্বাসের নয়।

পরমাপ্রকৃতি ও মহাপ্রকৃতি, শিব ও শ্রীকৃষ্ণের আক্ষরিক এলাকা ধরতে তাই সদর্থক গুরু, জ্ঞান, আর স্থিতির সাধনাটা প্রয়োজন।

শুধু পুজো করে, রুদ্রাক্ষ পেঁচিয়ে, আর তুলসী মালা পরে, রসকলি টেনে কোনও মহাত্মাই কালীকৃষ্ণকে পাননি।

সাধনা করতে গেলে সেজন্যই জ্ঞানীগুরু প্রচণ্ড প্রয়োজন।

যিনি শিষ্যর ভেদজ্ঞান সরিয়ে সঠিক রাস্তাটি দেখিয়ে দেবেন।

দিব্যচক্ষু

তন্ত্রে মাতৃদর্শনই সবচেয়ে বড় কথা। মায়ের মূর্তিখানিকে চিন্ময়ী, সজীব করে নেওয়ার জন্যই সাধকদের নানান তৎপরতা।

পুজোর ভিতর দিয়ে মূর্তি সজীব ও চিন্ময়ী হয়ে ওঠেন এতে কোনও সন্দেহ নেই।

তবে সাধকের পুজো, আর পূজকের পুজো করার মধ্যে বিস্তর ফারাক আছে বলেই আমাদের করা পুজোতে মূর্তি চট করে সজীব, চিন্ময়ী হয়ে ওঠেন না। মাতৃদর্শন আমাদের হয় না।

মাতৃদর্শন তো সহজ কথা নয়। একাগ্র হয়ে সাধকেরা মূর্তির চিন্তা করতে-করতেই মূর্তিকে শুদ্ধ করে তোলেন।

মূর্তি শুদ্ধ হয় দৃষ্টি দ্বারা। আমাদের চোখের দৃষ্টি দিয়ে তো আর মূর্তি শুদ্ধ হতে পারে না। মূর্তি শুদ্ধ করে নিতে হলে দিব্যচক্ষু চাই। চামড়ার চোখ দিয়ে ক্ষণিকের জন্য মায়ের মূর্তির দিকে তাকিয়ে কিছু জপ-মন্ত্রাদিই দ্বারা তো মূর্তি শুদ্ধ হয় না। সেজন্যই ও মূর্তি মৃন্ময়ী থেকে যান, ধাতু বা পাথরের। যে বস্তু দিয়ে মাতৃমূর্তি গড়া হয়, সেই বস্তুর সার নিয়ে মূর্তি দাঁড়িয়ে থাকেন। সজীব, চিন্ময়ী আর হয়ে ওঠেন না মা।

পূজক পুজো করেন। নৈবেদ্য সাজান, ভোগ দেন। কিন্তু মূর্তি সজীব হয় না। এর প্রধান কারণ মূর্তির দিকে চাইবার সময় পূজক বা সাধারণের দৃষ্টির শুদ্ধতা নেই বলে।

দৃষ্টির শুদ্ধতার জন্যই চোখ তৈরি করতে হয়। যাকে বলা হচ্ছে, দিব্যচক্ষু আর জ্ঞানচক্ষু। এ দুটি চোখ চামড়ার চোখ নয়। এ চোখ তৈরি করতে সহায়তা করতে পারেন নিজের-নিজের গুরু।

তিনিই বলেন, বীজ চিন্তা করতে। বীজের চিন্তা করতে-করতেই বীজে চেতন আসে। বীজে প্রতিবিম্ব পড়ে, আর যদি জ্ঞানচক্ষু, দিব্যচক্ষু খোলার দিকে থাকে শরীরখানা, প্রথম-প্রথম মায়ের আবেশ আসে।

শরীর আমাদের রক্তে-মাংসে-হাড়ে স্পন্দিত হলেও আদতে তা জড়। তন্ত্র বলছে, অবোধ শরীর।

গুরুর দেওয়া বীজমন্ত্র যদি প্রণালী মেনে একাগ্র হয়ে, নিয়ম করে জপ করা যায় তাহলে ওই অবোধ, জড় শরীরে একটু হলেও প্রথম-প্রথম আবেশ আসে। অর্থাৎ, জড়তা ভেঙে গেল শরীরের। আবেশদশা এসে গেল।

আবেশের পরই রূপ— মায়ের মূর্তির দিকে ঝোঁক। পুজো-জপ ইত্যাদির জন্য নিষ্ঠা বেড়ে যায়। মন্ত্র দ্বারা, ভক্তি সহকারে পুজো করতে করতেই রূপের ধারণা তৈরি হয়ে ওঠে মনে। সেজন্যই প্রথম-প্রথম মাতৃসাধনায় পুজোর কোনও বিকল্প নেই।

তবে পুজোর নিয়মের আসল উদ্দেশ্যগুলো গুরুর কাছ থেকে জেনেবুঝে নিলে রোজকার পুজো অতি দ্রুত মানসে চলে যায়। তখনই রূপের ছায়া পড়ে।

ছায়ার পরই নাম স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মূর্তির সজীবতার দিকে চলে যান সাধক। তারপরই বাহিরে আর যোগাযোগ নেই কোনও।

জ্যোতি উঠছে, নাদ আসছে। নাদের পরই আবার সেই অবোধ শূন্যতা। তবে এবার আর স্থূল শরীরের নয় সেটা। শরীর স্থূল ভেঙে, সূক্ষ্ম হয়ে তখন কারণ দশায়।

এভাবেই মায়ের সঙ্গে একীভূত দশাপ্রাপ্তি ঘটে সাধকদের। মাতৃদর্শন হয়। মায়ের সঙ্গে কথা বলা যায়। তবে এর জন্যে স্বীয় গুরুর কাছে প্রণালীর দীর্ঘ অনুশীলন চাই। চট করে এই জায়গায় পৌঁছতে পারা যায় না। প্রচুর ধৈর্য, অধ্যাবসায়, আর অক্ষরে - অক্ষরে গুরুর কথাগুলো পালন করা চাই।

তন্ত্রের ধরতাইটি হল মূদ্রাযোগ। এই যোগে কুণ্ডলিনী দেবী সক্রিয় হয়ে ওঠেন।

পুজো করার সঙ্গে-সঙ্গে এই যোগপথে না গেলে মূর্তির সজীবতা আসবে না।

বিভিন্ন তন্ত্রপীঠে নানান সব যে মায়ের মূর্তি, ওগুলো কোনও না কোনও সাধক কিন্তু সাধনার বলে সজীব করে রেখেছেন।

সেজন্যই ওগুলো সব জাগ্রত মূর্তি। পূজকের পুজোতে মূর্তি না জাগলে পূজক কখনো সাধক হতে পারবেন না।

মূর্তি জাগাতে গেলে কুণ্ডলিনী জাগাতে হয়। তন্ত্রের প্রধান সাধনা এটাই।

মায়ের মূর্তির উদ্দেশে যে ফুল নিবেদন করি আমরা তা হল ব্যোমের প্রতীক।

ধূপ হল বায়ুর চিহ্ন।

প্রদীপ অগ্নির অভিজ্ঞান।

নৈবেদ্য জলের স্মারক।

চন্দন ও অন্যান্য সুগন্ধি মাটির দ্যোতক।

কুণ্ডলিনী ব্যবহারের সঙ্গে সবগুলো এখানেও রঞ্জিত। সেজন্যই কুণ্ডলিনীকে সাধক তান্ত্রিকেরা দেবী বলেন।

তন্ত্রের যে পঞ্চমকার, পাঁচটি প্রতীক তাও কুণ্ডলিনী সংযুক্ত দেবীর আধার।

মাটি হল মুদ্রার প্রতীক।

মৎস্য জলের চিহ্ন।

মদ্য আগুন দ্যোতক।

মাংস বায়ুর অভিজ্ঞান।

মৈথুন ব্যোমের স্মারক।

কুণ্ডলিনী যখন মস্তিষ্কে প্রবল বলবাহী তখনই ব্রহ্মরন্ধ্র থেকে সুধা ঝরে পড়ে, সেই রসই হল তন্ত্রের মদ, সোমধারা ক্ষরেদ যাতু ব্রহ্মরন্ধ্রাদবরাননে।

মাংস হল রসনা। জিভ ও কথার সংযম এই মাংসের সঙ্গে যুক্ত। মৌন সাধকই মাংস সাধক, মাশব্দাসনা জ্ঞেয়া তদংশান রসনা প্রিয়ান। সদা যো ভক্ষয়েন্দেবি স মাংস এব।

দেহের ভেতরই গঙ্গা ও যমুনা। স্বীয় গুরুরা এ সমস্ত চিনিয়ে দেন। গঙ্গারূপা নাড়ি, আর যমুনারূপী নাড়ির ভেতর গুণত্রয়ের চলাচল। রজঃ ও তমের গুণ যিনি ভক্ষণ করতে পারেন, তিনিই মৎস্য সাধক, গঙ্গাযমুনয়ো মধ্যে মৎস্য দ্বৌ চরতঃ সদা। তৌ মৎস্যৈ ভক্ষয়েদ যস্তু স ভবেন্মৎস্য সাধক।

মস্তিষ্কের ভিতর মহাপদ্ম আছে। ওর ভিতরেই মূলাধারের ধাতুকে ঊর্ধ্বারেতার দিকে বেগবান করার প্রণালীখানাই তন্ত্রের মুদ্রা। ওখানে জ্ঞানের বিকাশ। জ্ঞানচক্ষু, দিব্যচক্ষু এখানে এসেই খোলে। এই চোখেই মূর্তিকে দেখলে মূর্তি সজীব হয়ে ওঠে। মাতৃদর্শন হয়।

নাদ ও বিন্দু যখন যোগ হল, সেই মিলনই প্রকৃত মৈথুন। যিনি এটি করতে অভ্যস্ত, তিনিই ব্রহ্মানন্দরূপী মায়ের এলাকাতে চলে যান।

তন্ত্রের সাধনা এখানে ওঠারই। সেজন্যই কুণ্ডলিনী দেবীর ঊর্ধ্বগামিনী ধারা। এই ধারাপ্রাপ্তির জন্যই দিব্যচক্ষু, জ্ঞানচক্ষু, দিব্যদেহের দিকে এগোতে হয়।

এজন্যই গুরুর সাহচর্য সবসময়ই প্রয়োজন। গুরুই শিখিয়ে দেবেন মূর্তিকে সজীব করে কীভাবে কুণ্ডলিনী দেবীর সহায়তায় মায়ের দেখা পাওয়া যায়।

এর জন্যই সাধকের প্রচেষ্টা। এর জন্যই পূজক সাধকের ভেদ আছে তন্ত্রে।

যাঁর - যাঁর শরীরের আধার অনুযায়ী স্বীয় গুরু মেলে। তাঁর জন্যই অভীপ্সা জাগিয়ে নিজেকে তৈরি করতে হয় আগে।

এর জন্য দরকার নিয়মিত একাগ্র চেতনা, আর আধ্যাত্মিক গ্রন্থাদির পাঠ।

এতে করে স্থূল জ্ঞান নিয়ে তৈরি থাকা যায়। তারপরই গুরু চামড়ার চোখ সরিয়ে জ্ঞানচক্ষু বিকাশের দিকে অগ্রসর হতে সাহায্য করেন।

গুরুর খোঁজ এমনি - এমনি মেলে না। এর জন্য নিজেকে তৈরি করতে হয় সবার আগে।

যাঁর যেমন ভাব, তাঁর তেমন লাভ।

ঊর্ধ্বমুখীন

আসনে বসে চোখ বুঝলেই যে, চারদিকে অন্ধকার আর নানান চিন্তা ছড়িয়ে পড়ে, ওগুলো আদতে মনের তমোময় আকাশ।

ত্রিগুণাত্মক মনের তিনখানি আকাশ আছে। এই আকাশ না চিনে আসনে বসে পড়লে ধ্যানে কখনো স্বাভাবিক স্বাচ্ছন্দ্য আসতে পারে না।

ধ্যানেরও ত্রিবিধ মাত্রা আছে। জগৎকে ব্রহ্মরূপে দর্শন করার যে ধ্যান, সেই ধ্যানের ভিতর আকাশ ভাবনাটা খুব কাজ করে।

আসনে বসে আকাশের পরিব্যপ্ত চিন্তা মনে ওঠাতে পারলে মনের অন্ধকার কাটাতে অনেক সুবিধা হবে। এটাই তমোময় আকাশের দশা।

ধ্যানের ভিতর জ্ঞানক্ষেত্র না খুললে, ইন্দ্রিয়গোচর দৃশ্যজগতের চিন্তা উঠে মনের আকাশ তমোময় হয়ে ওঠে।

সেজন্যই ধ্যানের আসনে বসে চোখের পাতা যেমন বন্ধ করতে হয়, তেমনই ইন্দ্রিয়ের চোখও আটকে দিতে হয়।

ইন্দ্রিয়ের চোখ আটকে মূলাধারের দিকে যদি চোখ বুজে ভাবনা করা যায় কিছুটা, তবে সেখানে মনের ধারাকে আটকে দেওয়া যায়।

মনের ধারা মূলাধারের নীচেই নিরুদ্ধ থাকে। গুরু সেই নিরুদ্ধ ধারাটি দেখিয়ে দেন এবং অবশ্যই বলে দেন নিরুদ্ধ ধারার ভেতর দিয়ে কীভাবে মূলাধারের বীজ শব্দের স্পন্দন দিয়ে শ্বাসে-শ্বাসে উচ্চারণ করে তমোময় আকাশের অন্ধকারটা কাটাতে হয়।

তমোময় আকাশ যখন সরল, তখনই ধ্যানের দ্বিতীয় দশাটির সূচনা হল। জীব ও জগৎ থেকে এইবার বেরিয়ে যাওয়ার পালা।

নিরুদ্ধ মূলাধারে শ্বাসের আঘাতে বীজ যত স্পন্দন দিয়ে উচ্চারণ করা যাবে, ততই মনের ধারা ওপরে উঠতে থাকবে।

মন তখন একাগ্র হয়ে আসতে থাকবে। এটা স্থায়ী হলেই চিদাকাশের দেখা মিলবে। একে তখন আঁকড়ে ধরতে না পারলে মন নিবৃত্ত হবে না।

একাগ্রতার অবস্থা যত বাড়বে, ততই শরীরের পাঁচটি ইন্দ্রিয় অন্তঃকরণে লীন হয়ে যাবে। জেগে উঠবে তখন অন্তরাকাশ।

ইন্দ্রিয় রুদ্ধ করতে পারলেই অন্তরাকাশের উপলব্ধি আসবে।

উপলব্ধির পরই আভাস। চিত্তাকাশ বা মনের আকাশের অনেকগুলো স্তর তো থাকে।

ধ্যানে বসলেই যে সব চিন্তা ওঠে, ওগুলো খুব নীচের স্তরের চিন্তা। নিরুদ্ধ মূলাধারের চিন্তা।

এই চিন্তা থেকে সরতে পারলেই মূলাধার খুলবে। ওপরের চিন্তার হদিশ পাওয়া যাবে তখন।

ধ্যানের ধারা জ্ঞানের। ঊর্ধ্বমুখীন সমস্ত ধারাই জ্ঞানের।

জ্ঞানের ধারা উঠলেই কর্ম আসবে। আর ঊর্ধ্বমুখীন প্রবাহ যখন শান্ত হয়ে যাবে সহস্রারের দিকে চলতে-চলতে, সেটাই ঠান্ডা শীতল প্রবাহ। ভক্তির ধারা এটাই।

সুতরাং জ্ঞানক্রিয়ার ভিতর না গেলে ভক্তি কখনো আসতে পারে না।

কাউকে যদি আমরা ভালো করে না জানি, তাঁকে ভক্তি করব বা কী করে?

দেবতা বা দেবীর রূপের কার্যকারণ সম্পর্কে জ্ঞান না থাকলে ভক্তি কীভাবে আসবে?

মা কেন কালো, কেন ওঁর আলুলায়িত কেশ, কেনই বা তিনি শবাসীনা—এসব জ্ঞান, কর্মের পাঠ না পেয়ে যদি কেবল উপোস, বিধি দিয়ে মায়ের

পুজোটা করে যাই তবে সেটা হবে বৈধী ভক্তি।

ধ্যানের উপলব্ধি জ্ঞানের। এটাই জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি।

ধ্যানের শেষ ধারাতে আসে পরা ভক্তি। তখন আত্মবুদ্ধি লোপ পায়।

ব্রহ্মময়ীর দরজাতে গিয়ে দাঁড়িয়ে যায় মন। কর্মশক্তি থাকে না।

জ্ঞানশক্তি তো আগেই সরে গেছে। কর্মশক্তি বা কুণ্ডলিনীর প্রবাহে যে ঊর্ধ্বমুখীন টানের সুতো, সেটি ছিঁড়লেই তখন ব্রহ্মময়ী মায়ের এলাকা।

যোগাবস্থার পূর্ণ স্তরেই ব্রহ্মময়ীর দরজা।

গুরুর শেখানো ধ্যানপ্রণালী দিয়ে এ দরজা অনায়াসে খোলা যায়।

তারপর দেখা না দেখার দৃষ্টি, ওটা তৈরি হয় আধার অনুসারে আর গুরুর সক্রিয় সহায়তায়।

আত্মদৃষ্টি

শুধু মায়ের মূর্তির দিকে তাকিয়ে থাকলে তো চলবে না। আত্মদৃষ্টি চাই। এই দৃষ্টি না পেলে কখনো আধ্যাত্মিক উন্নতির দিকে যাওয়া চলে না।

একমাত্র গুরুই দিতে পারেন আত্মদৃষ্টি।

সাধনার প্রথম শর্ত হচ্ছে, গুরুগত হয়ে ওঠা।

যিনি যত বেশি গুরুগত, তাঁর তত তাড়াতাড়ি আত্মদৃষ্টিটা খুলে যায়।

আত্মদৃষ্টি কেবলমাত্র গুরুর কৃপাশক্তিতে খুলতে পারে না। এর জন্য চাই প্রবল অধ্যবসায়।

দৃষ্টি কথার প্রধান মানে হল, জ্ঞান। আত্মদৃষ্টিটা আসতে পারে কেবল আত্মজ্ঞানেই।

গুরু কখনোই আত্মজ্ঞান দিতে তো পারেন না। আত্মজ্ঞান হল গিয়ে অর্জন। এটা লাভ করতে হয়।

গুরুমুখী বিদ্যা বলে সবকিছুই গুরুর ওপর চাপিয়ে অবিদ্যা বা অজ্ঞান নিয়ে কেবল মায়ের মূর্তির দিকে চেয়ে বসে থাকাটা কোনও কাজের কাজ

নয়।

আত্মদৃষ্টি না থাকলে পুজো, জপ, আচার, বিধি সবই নিষ্ফল হয়ে ওঠে। কাজের কাজ কিছুই হয় না।

আত্মদৃষ্টি খুলতে পারে একমাত্র নিজের তৎপরতায়।

নিজে যিনি তৎপর, এমন শিষ্যেরই একমাত্র গুরুর কৃপাশক্তিটি চট করে মেলে।

ভালো ছাত্রকে কোন মাস্টারমশাই না ভালোবাসেন!

সেজন্যই কৃপাশক্তিটি পেতে হলে গুরুগত হওয়ার পাশাপাশি নিজের প্রচণ্ড পরিমাণে তৎপরতা প্রয়োজন।

পড়ার বিকল্প কিছু নেই। স্থির জ্ঞান পেতে স্থির বিদ্যাটা ভীষণ ভীষণ প্রয়োজন।

আধ্যাত্মিক অনুশীলনের জন্য কিছু উল্লেখ্য গ্রন্থাদি আছে। নিজের নিজের আধার অনুযায়ী স্বীয় গুরুদেবই বলে দেন, কী কী গ্রন্থাদি পড়তে হবে।

না পড়লে স্থির দৃঢ় জ্ঞান আসতে পারে না।

ভিতরকার অবিদ্যা কাটতে পারে একমাত্র পড়াশোনার মাধ্যমে। সেজন্যই আত্মজ্ঞান চাই।

জ্ঞান গুরুদেব কোনওভাবেই দিতে পারেন না। এটা শিষ্যকে অর্জন করতে হয়। শিষ্য এগোলেই গুরুর কৃপাশক্তি নেমে আসে।

আত্মজ্ঞান এলেই আত্মদৃষ্টি চলে এল। আত্মদৃষ্টিটা এলেই বিচারশীল হওয়া যায়।

বিচার না থাকলে সাধনা এগোবে না। সংস্কার দিয়ে বেশিদূর এগিয়ে যাওয়া যাবে না।

কেন পুজো করছি, কেন হোম করছি, কেনই বা আদিভূতা দেবী মুক্তকেশীর উপাসনাতে নানান আচার করছি, এর পেছনে অসম্ভব রকমের

বিচারশীল যুক্তি আছে।

সেই যুক্তিগুলো না জেনে, না বুঝে কেবল যদি করে যাওয়াটা চলে তাহলে তা হয়ে উঠল সংস্কার।

আর যদি আত্মজ্ঞান, আত্মদৃষ্টিটা থাকে তাহলে তার ভেতর বিচারশীল ধারাটা আপনেই নেমে আসবে।

বিচার করতে করতেই সাধনাতে এগোতে হবে। বেদান্ত বারবারই বিচারের ওপর জোর দিয়েছে।

বিচারবোধ না আসলে জ্ঞান আসবে না। জ্ঞানের জন্যই গুরু।

সবার আগে দরকার একজন জ্ঞানীগুরু। গুরু যদি জ্ঞানী না হন, কেবল আচারশীল হন সেই শিষ্যের তেমন কিছু হওয়ার নেই।

সেজন্যই সাধনায় বিচারশীল একজন জ্ঞানীগুরু খুঁজে নেওয়াটা সবার আগে দরকার। জ্ঞানীগুরু মানে কিন্তু তাঁর পিএইচডি ডিগ্রি আছে ব্যাপারটা এমন নয়।

জ্ঞানীগুরু মানে, যিনি আত্মজ্ঞানী, বিচারশীল সাধক। এমন সাধক খুঁজতে গেলে নিজেকে তৈরি হতে হয়।

কেননা এঁদের চিনতে পারার জন্যে নিজের কিছুটা বিচারশক্তি ও পড়াশোনা দরকার।

ভালো গুরু লাভ করতে গেলে নিজের যথেষ্ট আধ্যাত্মিক তৎপরতা দরকার। তা না হলে চিরকালই, গুরু কোথায় পাব, গুরু কোথায় পাব বলে হাঁ-হুতাশ করে যেতে হবে।

গুরুর হদিশ পেতে হলে আত্মদৃষ্টি চাই। আত্মদৃষ্টি না হলে জ্ঞানীগুরু পাওয়া কখনো সম্ভবপর নয়।

জ্ঞান না হলে ভক্তিও পাকা হয় না কখনোই। ভক্তি না পাকলে তা শুধু সংস্কার হয়ে দাঁড়ায়।

এদেশে ব্রহ্মবাদ থেকেই দেবভাব এসেছে।

ব্রহ্ম হল, সাধকগণের নিজের নিজের ভিতরকার বিস্ফোরণ।

সত্যং জ্ঞানমঅনন্তং হল ব্রহ্ম।

ব্রহ্মের বিভূতি হলেন দেবতা।

আত্মচৈতন্য না হলে দেবতার দেখা পাওয়া যাবে না।

আত্মচৈতন্যর জন্যই আত্মদৃষ্টিটা তৈরি করতে হবে সবার আগে।

মৃন্ময়ী মাকে আমরা যে জাগাই, প্রাণপ্রতিষ্ঠা করি, ও হল গিয়ে প্রাণবৃত্তি।

মনোবৃত্তির ভিতরই প্রাণবৃত্তি জাগে।

মা জাগবেন মনে, তারপর তো প্রাণের সদর্থক জায়গায় তিনি প্রতিষ্ঠিত হবেন।

মূর্তিতে প্রাণপ্রতিষ্ঠার তাই আসল অর্থটা হল, আত্মদৃষ্টিটা খুলে দেওয়া।

আত্মদৃষ্টিটা না খুললে প্রতীক মূর্তি কখনো জাগতে পারে না।

দেবতা হলেন বিভূতি। তাঁর কাছে পৌঁছতে হলে নিজের ইষ্টকে ধরেই এগোতে হবে।

গুরুই চিনিয়ে দেবেন ইষ্ট।

গুরুকে চিনতে হবে নিজেকেই।

নিজের গুরু নিজেকে খুঁজতে হলে, আত্মদৃষ্টিটা সবার আগে তৈরি হওয়া প্রয়োজন।

চিত্তবিন্দু

জপের প্রথম উদ্দেশ্য ইষ্টের আবেশকেই আসনে বসে বসে নিজের দিকে একাগ্র ক্ষমতা দিয়ে আকুতি ভরে ডেকে নিয়ে আসা। বীজমন্ত্র জপ সবসময়ই আমন্ত্রণমূলক। গুরু, ইষ্ট, আর শব্দের ত্রিগুণাত্মক শক্তিকেই জপের ভিতর ডেকে নিয়ে আসার প্রচেষ্টা করেই আসনে বসতে হয়।

দীক্ষা হওয়ার পর পরই যাঁর যাঁর গুরু অবশ্যই জানিয়ে দেন জপ করার উদ্দেশ্য আর জপের প্রণালী।

প্রণালী মেনে জপ না করলে তা শুধু করগোনা, পদ্মবীজ, রুদ্রাক্ষ, স্ফটিক বা মহাশঙ্খে কিছু সংখ্যাবাচক কার্যবিধি হয়ে উঠে। সেই জপ থেকে ফলাফল তেমন আসে না বলেই পরে আর জপ করার আগ্রহটি থাকে না। শেষমেষ একেবারেই হারিয়ে যায়।

কোনও বিষয়ে আগ্রহ তখনই তো জাগে যখন সেই বিষয়টি গিয়ে সরাসরি আমাদের চেতনাতে আঘাত করে। চেতনার গভীর পরত থেকেই নানান গুরুত্বপূর্ণ কাজে আগ্রহ জাগে।

জপের বীজ বা নাম যাই হোক না কেন সেটা তো শব্দাত্মক। শব্দের উত্থিত শক্তি জপ থেকে অবশ্যই আসনস্থিত শরীরে চলে আসা উচিত। এলেই জপে প্রবল আগ্রহ ওঠে। জপ জমে যায়। এক সময় এমন আসে যে, নির্দিষ্ট মুহূর্তে জপে বসে বীজ বা নামের শক্তিকে অনেকটা ক্ষণ ধরে আমন্ত্রণ করতে না পারলেই মনে হয় দিনের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ কাজটাই হল না আজ।

বীজ বা নামের ভিতর যেমন গুরু পরম্পরায় প্রাপ্ত সিদ্ধ শব্দের বাচ্য ও বাচক একখানি সম্বন্ধবোধ থাকে তেমনই শব্দের আবির্ভাব তো শক্তি নিয়ে আসে।

যদি না আসে তাহলে সেই জপের প্রণালী ঠিক নেই এটা বুঝে নিতে হবে। তখন আবার গুরুর স্মরণাপন্ন হয়ে তাঁর কাছ থেকেই বীজ বা নামের বাচ্য অর্থাৎ উচ্চারণের কায়দা ও বাচক অর্থাৎ অর্থজ্ঞাপক ক্রিয়াটি ভালো করে শিখে নিতে হয়। এটা সম্পূর্ণভাবেই গুরুর দায়িত্ব।

গুরুই শিখিয়ে দেবেন একেবারেই হাতে ধরে ধরে আসনে বসে কীভাবে জপের বীজ বা নামের বাচ্য বা শব্দগত সম্বন্ধকে কেমন করে কুণ্ডলিনীর

শব্দশক্তির সঙ্গে মিলিয়ে দিতে হবে।

যখন মিলে যায় তখনই জপের থেকে কল্পনাতীত ফলাফল মেলে। সে ফলাফল যে কী পরিমাণ জ্ঞানচক্ষুর উন্মীলন করে তা যাঁরা পেয়েছেন এবং দেখেছেন তাঁরাই একমাত্র জানেন।

বীজ বা নামের অর্থজ্ঞাপক ক্রিয়া তখনই শুরু হয় যখন গুরু দেখিয়ে দেন বীজমন্ত্রের শব্দ কুণ্ডলিনীশক্তি থেকে কীভাবে উঠে এসে মহামায়ার স্বরূপ হয়ে ওঠে। বীজের শব্দশক্তি মুখে উচ্চারণ করে যে ফল তার তিনগুণ বেশি ফলাফল আসে যখন বীজ বা নামের শব্দ কুণ্ডলিনীর থেকে উঠতে থাকে।

জপে বসে আগে ইষ্টকে কখনোই নয়, স্মরণ করতে হয় গুরুকেই। চোখ বুজে কিছু সময় ধরে গুরুর সঙ্গে নিজের যে সখ্য, আনন্দ, প্রেম— সেই সম্বন্ধচিন্তা করার পরই জপ শুরু করতে পারলে গুরুর কৃপাশক্তি চট করে চলে আসে।

গুরুদেবকে নমস্কার করবার যে শ্লোক সেখানে বলা হচ্ছে, শ্রীগুরবে নমঃ। এর মানে যদি জানা না থাকে তবে রোজ গুরুবন্দনার শ্লোক উচ্চারণ করে গেলেও ফলাফল কিছু আসবে না।

নমঃ অর্থাৎ নমস্কার করা হচ্ছে শক্তিসংযুক্ত পরম গুরুতত্ত্বকেই। কী এই তত্ত্ব তা দীক্ষার সময় নিজের নিজের গুরুদেব এগুলো সব ভালো করে বুঝিয়ে দেন।

নমঃ যখন বলা হল তখন আর কিছুই নিজের যে রইল না, সবই তখন গুরুর বা ইষ্টের হয়ে গেল।

সব তোমার বা তাঁর। সাধনায় গুরু এমনই নির্বাচন করতে হয় যাকে সবসময়ই কাছে পাওয়া যায়। যিনি গুরুর থেকে বন্ধু বেশি। এমন গুরু যাঁরা পেয়ে গেছেন তাঁরা জানেন এই নিত্যকার গুরুকে স্মরণ বা নমস্কারের কী মহিমা!

গুরুকে নিজের লিঙ্গগত গুণে যদি প্রেমিকা বা প্রেমিক ভেবে ফেলা যায় তবে সেই শিষ্যর জপগত ফলাফল আরও তাড়াতাড়ি চলে আসে।

গুরুর পায়ে ধরা অত দরকার নেই। যদি গুরুকে দু-বাহু দিয়ে আগলে রাখার অধিকারী কেউ হন তিনি গুরুর সবটুকু পাবেন এতে কোনও চিন্তা নেই।

গুরু তো কেবল একজন মানুষ নন, গুরু হলেন মূলাধার - নিষ্পন্নশক্তি। শক্তিটি গুরু লাভ করেছেন তাঁর গুরুদেবের কাছ থেকেই।

শক্তির চক্র ঘুরতে থাকে। ভেদ হয় যখন শক্তি তখনই ভ্রূদ্বয়ে বিন্দুস্থানে গুরুকে পাওয়া যায়।

চিত্তবিন্দু উঠাবার নানান ধ্যানাদি আছে সেগুলো পরম্পরা অনুযায়ী হয়। নিজের নিজের পরম্পরা অনুযায়ী গুরুকে বন্ধু করে এগোলেই জপের ফলাফল এসে ধরা দেয়।

গুরুকে নমঃ, নমস্কার করে তাঁর হয়ে যাওয়ার পরই গুরুর সঙ্গে নিজের কোনও ভেদ রইল না। তখন গুরুর পা ছুঁয়ে প্রণামের আর কোনও অর্থ নেই। গুরুর নমস্কারী শ্লোকে বলা হচ্ছে, শ্রীগুরবে নমঃ।

শ্রী হল পরাশক্তি বাচক। শব্দ যখন বাচ্য থেকে বাচক হয়ে গেল তখনই ওর অন্তর্ভুক্ত শক্তি কাজ করবে তো।

তন্ত্রে স্বরূপভূতা শক্তির সঙ্গে গুরু জড়িয়ে থাকেন। কুণ্ডলিনীর একেকখানি কমল যখন বিদ্ধ করি আমরা তখনই নিজের স্বরূপভূতা শক্তির সঙ্গে গুরুর মিলনটা, প্রেমটা, সম্বন্ধবোধটা বেশ বোঝা যায়।

প্রক্রিয়াগুলো সব গুরুদেবই শিখিয়ে দেন। নিজেকে শুধু গুরুর শেখানো পদ্ধতিগুলো মেনে বীজ বা নামের শব্দ বাচ্য থেকে বাচকে নিয়ে আসতে হয় আসনে রোজ নির্দিষ্ট সময়ে বসে।

জপের নির্দিষ্ট একই সময় রাখতে পারলে বীজ বা নামের শব্দ ওই একই সময়ে কুণ্ডলিনীকে আঘাত করতে করতেই মূলাধারকে আলগা করে নেয়।

আলগা মূলাধারে গুরুর শ্রী অর্থাৎ শক্তিখানি খেলে যায়। গুরু তখনই শ্রীগুরু হলেন।

গুরু, শ্রীগুরু সহায়ক না হলে, তাঁকে সবসময়ই নিত্যদিনকার অনুভূতিতে যদি পাওয়াই না গেল তাহলে খামোখা তাঁকে নমঃ, নমস্কার করলে জপের মতনই সেই নমস্কারও নিষ্ফল।

গুরু শ্রীশক্তিতে ধরা দিলেই তাঁকে নমঃ, নমস্কার করে তাঁর হয়ে যাওয়া যায়। কীভাবে গুরুরতি দিয়ে জপের বীজ বা নামের শব্দ দিয়ে কুণ্ডলিনীর নাদ থেকে মহানাদের দিকে যাওয়া যায় তা নিজের নিজের গুরুদেব শিখিয়ে দেন।

যদি না শেখা থাকে তাহলে গুরুর দেওয়া বীজ বা নাম তেমন কাজে আসে না। শেখা থাকলে বীজ পাওয়ার মাস তিনেকের মধ্যেই ফল ফলতে শুরু করে।

তখন এক গুরুর কাছে বসে গিয়েই সাধনশক্তির মহিমা বোঝা যায়। উতলা হয়ে এখানে সেখানে ছুটে বেড়াতে হয় না।

জপের মাধ্যমেই সবটা হয়ে যায়। ধ্যান আর সমাধি তখন অনুশীলনের অপেক্ষা নিয়ে গুরুকেই যেন প্রণাম করতে থাকে আসননস্থ স্বীয় শরীরখানি।

গুরু তখনই বন্ধু ও সখা। তখনই গুরুর নমস্কারী শ্লোকের সার্থকতা,

অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরমতৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ

মা আছেন হৃদয় চক্রে

মাতৃকাপীঠ

মায়ের গলার মুণ্ডমালা তন্ত্রের মাতৃকার চিহ্নই বহন করে। প্রতিটি মাতৃকার আলাদা আলাদা সত্তা আছে।

সত্তা ধরে গুরুর সহায়তায় সাধনাতে এগোতে পারলেই দেহের ভিতর ইচ্ছাশক্তির দ্রুত উন্মেষ ঘটতে থাকে আর দেহ তৎক্ষণাৎ বদলে যায়।

সাধকের প্রধান কাজ হল গুরুর সহায়তাতে স্থূল দেহটার বদল ঘটানো। এটা না করতে পারলে হাজার মন্ত্র পড়ে পুজো হোম বিধি পালন করেও মাতৃকার সাড়া মিলবে না।

পুজোর অর্থ জেনে পুজো করলে তবেই মাতৃকায় শক্তি আসবে। পুজো করতে হবে স্থূল ভাবনা থেকে বের হয়ে সূক্ষ্ম উন্মেষের রসধারায়।

তন্ত্রের শিবশক্তির যে পরস্পর নিবন্ধন ক্রিয়া ওটি উচ্ছলিত রসের তরঙ্গ। দেহের ভিতর যদি মাতৃকার অক্ষর বিকশিত হয় তবেই তরঙ্গ জাগে।

জাগা তরঙ্গের ভিতর মন্ত্রের শক্তি একমাত্র কাজ করে। এই যে আমাদের এত এত কল্যাণমন্ত্র বলেও বিন্দুমাত্র মঙ্গলকামী ধারা বয় না শরীরে ও চারপাশে তার প্রধান কারণ মাতৃকার তরঙ্গ নিয়ে দেহ তো মঙ্গলময়ীর নিত্যলীলার ভিতর প্রবেশ করেনি।

দেহ জাগেনি, মন্ত্রের ভিতর সুপ্ত কল্যাণ তবে প্রাণশক্তি পাবে কী করে?

দেহে আমাদের তিন ধরনের প্রকাশ থাকে। প্রথম প্রকাশ যোনিসম্ভব— এ হল স্বতঃস্ফূর্ত স্বাভাবিক দেহের প্রকাশ। এই দেহ নিয়ে মাতৃকার স্থূল পুজোটা কেবল চলতে পারে কিন্তু মাতৃকার শক্তি অনুভূত করবে যে দেহ সেই দেহকে হতে হবে অযোনিসম্ভব।

প্রাকৃত কাম বা মদন থেকে সরে গিয়ে— অপ্রাকৃত নবীন মদন— এভাবেই বৈষ্ণব আচার্যরা বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণের উপলব্ধিটি রাখেন। এটি হল মানস বৃন্দাবন। স্থূল বৃন্দাবন জায়গায় নাম, ঠিক আমাদের দেহজমির মতন।

বৃন্দাবন যখন মানসে তখনই শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত দশা। যোনিসম্ভব মানুষের স্থিতি থেকে বের হয়ে গিয়ে অযোনিসম্ভব সাধক দশাতে স্থিতি। এই স্থিতি হলে তখন আর স্থূল তিলকমাটি নেই, মস্তক মুণ্ডন নেই, আহার নিয়ে বাদবিচার নেই— নিত্য শুদ্ধি যখন দেহের তখনই অপ্রাকৃত মদনমোহনের নিত্যলীলার প্রকাশ।

মানস বৃন্দাবনে গেলেই নিত্যলীলার প্রকাশে দেহে তখন নিত্য বৃন্দাবন।

স্থূল বৃন্দাবন হল আমাদের স্বাভাবিক দেহ, দেহ যখন সাধন করে কিছুটা কিছুটা রূপ থেকে অরূপের দিকে যাচ্ছে তখনই স্থূল সরে সূক্ষ্মের আবির্ভাবভূমি। এখানেই মানস বৃন্দাবনের দেখা পাওয়া যাবে।

যখন রাধাকৃষ্ণ, শিবশক্তির নিগূঢ়ার্থ প্রকাশবলী ধরবার মতন জায়গায় যাবে দেহ তখনই নিত্য বৃন্দাবনের স্বতঃসিদ্ধ প্রকাশ বা মাতৃকাশক্তির চিন্ময় আনন্দঘন আবেশ। এখানে যেতে সিদ্ধ দেহ, সিদ্ধ গুরু, আর শাস্ত্রীয় জ্ঞানের অতি উচ্চদশা— অর্থাৎ কিনা সিদ্ধজ্ঞান লাগে।

জ্ঞান ছাড়া কর্মের প্রকাশ হয় না। ঠিক ঠিক জ্ঞান হলেই কর্মও ঠিক দিকে চলে যায়। জ্ঞানীগুরু দেহের ভিতর থাকা যোনিসম্ভব স্বাভাবিক মানুষের স্থিতিটি কীভাবে বদলাতে হবে তার চিন্তা প্রক্রিয়া কর্মপ্রণালীগুলো সব দেখিয়ে দেন। তখনই অযোনিসম্ভব দেহ নিয়ে মাতৃকা প্রকাশের সাধনাটা এগোতে থাকে।

এগোতে এগোতেই ধরতে পারা যায় তন্ত্রের মাতৃকার আসল রহস্যগুলো। তন্ত্র তো সবার জন্য নয়। তন্ত্রের বাহ্যিক প্রকাশ তাই পুজোয়। এ পর্যন্ত সবার জায়গা।

যখন আন্তর তন্ত্রের ক্রিয়া শুরু হল তখন সেখানে কেবল সাধকদের প্রবেশাধিকার। পূজকদের নয়।

আন্তর তন্ত্রের সাধনে এলেই মাতৃকার প্রকাশ ঘটবে দেহে। দেহে ভাব উঠবে তারপর বদলাতে বদলাতে সিদ্ধদেহের দিকে চলে যাওয়ার পরই মাতৃকার প্রকাশ হবে।

নিত্যলীলার ভিতর থাকে রাগের আখর। রাগ হল রসের রেতধা। শিবশক্তির যুগল কিংবা রাধাকৃষ্ণের একত্রিত দশা হল দেহের ভিতর লীলারাগের রেতধাকে ঊর্ধ্বদিকে নিয়ে যাওয়ার গুহ্যসাধন প্রক্রিয়া।

যখন তা হল তখনই সিদ্ধ, তখনই দেহে রাধাকৃষ্ণের প্রেমপ্রাপ্তির রাগ কিংবা শিবশক্তির প্রেমপ্রাপ্তির মাতৃকা রাগের আখরকে আস্বাদন করা যাবে।

তন্ত্রের বর্ণমাতৃকা তেমনই প্রকাশকে ইঙ্গিত করে। মাতৃকার অ বর্ণ হল অকুল। দেহের মূলাধার না ভাঙতে পারলে কী কুল, কী বা অকুল!

তন্ত্রের সাধনা কুণ্ডলিনী খোলার সাধনা। মূলাধারে অকুল দশা এলেই মাতৃকা আ অর্থাৎ আনন্দের প্রকাশ আসতে শুরু করবে দেহে। সাধনার ইচ্ছা জাগবে— মাতৃকার ই বর্ণ হল সাধকের ইচ্ছাশক্তি।

মায়ের মুণ্ডমালা সুপ্ত রয়েছে একেকখানি মাতৃকাবর্ণের স্বরূপশক্তি নিয়ে। গুরু এগুলো চিনিয়ে দিলেই দেহে মাতৃকার প্রকাশ অনায়াসে ধরা যাবে।

তখন দেহেই পরমপুরুষ-পরমপ্রকৃতি শিবশক্তি রাধাকৃষ্ণ যিনি যেমন দ্বৈতপ্রকাশের সাধনে রত তাঁর তেমন ধারণা উঠে অদ্বৈতের স্থিতি আসবে।

ওটাই নিত্য বৃন্দাবন, মাতৃকাপীঠ। এখানে পৌঁছতে পারলে সমদর্শন।

যাঁর সমদর্শন হয়নি, কালীকৃষ্ণের অভেদতত্ত্বটির শিক্ষা হয়নি তাঁর সাধনা শুরুই হয়নি। যেটুকু হয়েছে তা হল কেবলই বাদবিচার। বাদবিচার নিয়ে মাতৃকা কেন কোনও সাধনাই হবে না।

গুরু চক্র

জড় বুদ্ধি, মায়ের মূর্তিতে শিলা বুদ্ধি, আর গুরুতে মনুষ্য বুদ্ধি নিয়ে বেশিদূর তো এগোনো যাবে না। এগোতে গেলে সবচেয়ে সহজ পথ যেটা হল, গুরুসেবা।

গুরুকে ভাবতে হবে higher man— উচ্চতর মানুষ। তিনিই highest ideal — সর্বোচ্চ আদর্শ।

গুরুর উপাসনা সবার আগে দরকার। গুরুকে মানুষ ভেবে যতটা সময় আমরা এগোতে থাকব ততক্ষণ spiritual evolution— আত্মিক বিকাশের রাস্তাটি কোনওভাবেই খুলতে তো পারে না।

গুরুই দেখিয়ে দেবেন রাস্তাটি। যাঁর গুরু হয়নি তাঁর কিছু শুরুই হয়নি।

গুরুর সঙ্গে নিত্য সম্বন্ধবোধ তৈরি করতেই হবে। না হলে আধ্যাত্মিক উন্নতির কোনওরকম কোনও সম্ভাবনা নেই।

গুরুর সঙ্গে যদি কেবল দীক্ষার সম্পর্কটুকু হয়ে থাকে এতদিন, সম্বন্ধবোধ তৈরি না হয়ে ওঠে তাহলে বুঝতে হবে নিজের জায়গাটি এখনও preliminary requirements— প্রাথমিক সাধনে আছে।

শুধু নামজপ, পুজোটুজো চলছে। Next stap— পরবর্তী সাধন কিছু হয়নি।

পরবর্তী সাধনের জন্যই গুরুর সঙ্গে সম্বন্ধবোধ তৈরি করতে হবে। তারই নাম হল গিয়ে গুরুসেবা।

গুরুসেবা মানে কিন্তু গুরুর পায়ে তেল মালিশ করে দেওয়া কিংবা ওঁর কিছু কাজকর্ম করে দেওয়া নয়।

গুরুসেবা মানে গুরুর দেখানো পথে যেতে যেতে একটা inconceivable points— অভাবনীয় ভাবদ্বয় গড়ে তোলা। একেই বলে অচিন্ত্য ভেদাভেদ।

জীবত্বে যেমন শিবত্ব স্থাপন হয় সেইরূপ perfectly saturated with— সম্পূর্ণরূপে সংপৃক্ত হতে হবে গুরুর সঙ্গে।

এভাবে মিলিত না হতে পারলে গুরুসেবা হবে না। নিজেকে identify — অঙ্গীভূত করতে হবে তাঁর সঙ্গে।

যে যার সেবা করে সে তার সত্তা পায়। যদি কোনও জ্ঞানী মানুষের সঙ্গে একাত্মতা গড়ে ওঠে জ্ঞান আপনা থেকেই তো উঠবে হৃদয়ে।

আত্মজ্ঞান বা অধ্যাত্মজ্ঞানের জন্যই গুরুর সেবাটা করতে হবে। তাহলেই গুরুর সত্তাটি নিজের মধ্যেই ফুটে উঠবে।

যেমন দেবতার প্রতি ভক্তি থাকবে তেমনই গুরুর প্রতিও একরকম শ্রদ্ধাটি বজায় রাখতে হবে।

রাখতে পারলে গুরুতে মনুষ্য বুদ্ধি আসবে না, যস্য দেবে পরা ভক্তিঃ যথা দেবে তথা গুরৌ — শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের কথা। একই কথা বলছে গীতা, তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন, পরিপ্রশ্নেন সেবয়া। গুরুসেবা ছাড়া জ্ঞান আর ভক্তি কোনওটাই লাভ করা যায় না।

শিষ্যের গুরুভক্তি, গুরুসেবার চেহারাটি গুরুদেব ধরতে পারেন ভালোভাবেই। এজন্যই যে শিষ্য গুরুসেবাতে মনোযোগী নন তাঁকে গুরুদেব কখনো সাধনার গুহ্যতন্ত্র শেখান না বা বলেন না, ন চাশুশ্রূষাবে।

অনেককেই আমরা বলতে শুনি, দীক্ষা নিয়েছি, বীজমন্ত্রের পর আর কিছুই তো পাইনি, গুরুসংযোগও নেই, গুরুদেব সময় দেন না।

যখন এমত দশা হয় বুঝতে হবে দোষ গুরুর কিছু নেই, শিষ্য গুরুসেবা করছেন না বলেই গুরুদেব বস্তু দিচ্ছেন না।

গুহ্যমূল খোলার যে সাধনা, গুরু একমাত্র তাঁদেরই দেন যাঁরা গুরুসেবা করেন।

স্থূল যে গুরুসেবা— গুরুর কিছু কাজ করে দেওয়া, গুরুর কষ্ট লাগব করা, খেয়াল করলে দেখা যাবে এগুলো পর্যন্ত সব শিষ্য করতে পারেন না।

গুরুদেব সত্ত্বগুণী শিষ্য ছাড়া কারও হাতের স্থূলসেবা অবধি গ্রহণ করেন না। গুরুর পা টিপতে গেলেও সাধন-যোগ্যতা দরকার।

সাধুদের ভিতর যেমন বহুদক, কুটিচক থাকে তেমনই শিষ্যদের ভিতরও এ গুণগুলি বর্তমান।

যে সাধু কেবল তীর্থে তীর্থে ঘোরেন, এক জায়গায় বসেন না তিনি বহুদক সাধু— তেমনই যে শিষ্য স্বীয় গুরুর সেবা না করে আজ এ গুরু কাল ও গুরু করে বেড়ান তাঁরা বৃহদক শিষ্য।

বৃহদক সাধু বুঝতে হবে বস্তু পাননি এখনও। বস্তু পেলে তিনি কুটিচক সাধুদের মতন অত ঘোরাঘুরি না করে এক জায়গায় স্থিতধী হতেন।

ভোগ-বাসনা মিটলেই কুটিচক সাধু হওয়া যায়— তেমনই তাঁরাই কুটিচক শিষ্য যাঁরা গুরুসেবাতে রত।

বৃহদক সাধু আর বৃহদক শিষ্যরা সাধনার প্রথম স্তরেই আটকে আছে।

কুটিচক শিষ্যরাই গুরুর সমস্তটা পান। তাঁদেরই গুরুদেব গুহ্যতন্ত্রের মুদ্রাযোগগুলো দেখান।

মুদ্রা পেলেই দেহ থেকে জড় বুদ্ধি সরে যায়, প্রতিমায় শিলা বুদ্ধি থাকে না, আর গুরু হয়ে ওঠেন বন্ধুসম।

ভগবানের সঙ্গে সখ্যের সম্পর্ক সবচেয়ে কাজ দেয় আধ্যাত্মিক উন্নতিতে — তেমনই গুরুর সঙ্গে যদি সখ্য থাকে তাহলে অনেকখানি চলে যাওয়া যায়।

আত্মবিনিগ্রহ— শরীর আর ইন্দ্রিয়ের সংযম। কথাটা গীতার ভিতর আছে। এই সংযমযোগটি পাওয়া যেতে পারে একমাত্র গুরুসেবায়।

গুরুসেবাতেই deep seated aversion — গভীর বৈরাগ্য আসতে পারে।

গভীর বৈরাগ্য মানে মাছ মাংস ছেড়ে দেওয়া নয়, গেরুয়া নেওয়াও নয় — গভীর বৈরাগ্য হল গুরুসেবা করে eternal bliss and happiness—

পরমানন্দ, পরম সুখ লাভ করা।

গুরুসেবা করতে গেলে গুরুদেবের শেখানো ক্রিয়ায় শক্তিমণ্ডল জাগ্রত করতে হবে। ওটাই মায়ের স্থান।

শক্তিমণ্ডলের ভিতর তেজোময় বিন্দু ও নাদ। এখানে আসতে গেলে সহস্রারের এলাকা ছাড়তে হবে।

ওর ওপরেও এক চক্র আছে— ললনা চক্র। এখানে থাকে অহংতত্ত্ব। গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা, সন্তোষ, প্রেম ইত্যাদি বৃত্তিগুলো আসতে পারে ললনা চক্রে গেলেই।

তারপরই ব্রহ্মরন্ধ্রে সাদা একশো পাপড়ির পদ্ম। এই পদ্ম চক্র হল গুরু চক্র।

এর ভিতর রয়েছে বাকবীজ বা গুরুবীজ। গুরুদেব আছেন ওই বীজের ভিতর।

বীজের প্রতি ধ্যান রেখে যদি এগোতে পারা যায় তবেই প্রকৃত গুরুসেবাটা হয়। এর জন্য দরকার সূক্ষ্মদেহের রাস্তাগুলি চেনা।

যে শিষ্য স্থূল সূক্ষ্ম সব দিক থেকেই গুরুসেবাতে মনোযোগী তাঁরাই একমাত্র ওই রাস্তাতে হাঁটতে পারেন। এটাই প্রাণময়ে যাওয়ার রাস্তা।

গুরুসেবা ছাড়া সুষুম্নার পথ দিয়ে প্রাণময়ে যাওয়া চলে না।

এজন্য দরকার রোজ রোজ আপন আপন শ্রীনাথের সঙ্গে প্রবল, প্রবলতর, প্রবলতম সংযোগ।

সংযোগেই জাগতে পারে একমাত্র অন্তর্লীন শিব।

মাতৃকাস্ফুরণ

মূলাধারে টান পড়লেই শক্তিময়ীর প্রতি আকর্ষণটি ক্রমশ বাড়তে থাকে আর রোজকার অভ্যাসে তা বাড়তে বাড়তে এক সময় এমন জায়গায় চলে

যায় যে দশাপ্রকাশ ঘটে। তখনই বীজমন্ত্রে স্থিত শক্তিময়ী দেবীর রূপটি দেখা যায়।

দেবী দর্শন অনেক দূরের ব্যাপার। দিব্যনেত্র না খুললে রূপ কখনো দেখা যায় না।

ধ্যানের ভিতর যদি মূলাধারে টান পড়ে তবেই আসনে বসে একটু স্থিত হওয়ার পরই শরীর কেঁপে কেঁপে উঠবে।

যদি কারও শরীর আসনে কিছু সময় বসে জপধ্যান করার মুহূর্তে মাঝেমধ্যে একটু একটু কেঁপে যায় তাহলে বুঝতে হবে মূলাধারের কমল ভেদ করবার সময় হয়ে উঠেছে।

কারও শরীরের বাইরের গঠনই বলে দেবে তাঁর মূলাধার আদৌ খুলে গেছে কিনা। তবে এটি সকলে বুঝতে পারেন না। চক্রস্থ মূলাধারের কমলের পাপড়ি যদি খোলে তাহলে বাহ্যিক চিন্তারও পরিবর্তন হয়ে যাবে।

স্থূল দেহে থাকে তামস। অন্ধকারের ইশারা। সাধনা করতে হবে ওই অন্ধকার নিয়েই। সেজন্যই মাসের শুক্লপক্ষ হল তন্ত্র সাধনার প্রশস্ত সময়।

এ সময় থেকেই সাধনে বসতে হয়। শুক্লপক্ষ থেকেই চাঁদের কলা বাড়তে থাকে। দেহের কলাও এই সময়টায় ক্রমে ক্রমেই বাড়ে। কলা বাড়তে বাড়তেই পূর্ণিমায় হবে কলার পূর্ণত্ব। এখানে এসে দেহ আবার স্থিতি নেবে।

স্থিতি আসবে দু'দিন— শুক্লতিথি আর কৃষ্ণতিথিতেই দেহের পূর্ণত্ব বিকাশ হয়। কলার পূর্ণত্ব প্রকাশ ঘটে। সেজন্যই সাধনাতে অমাবস্যা আর পূর্ণিমার এত এত গুরুত্ব।

অমাবস্যা শক্তিময়ী মায়ের তিথি। অনাহত চক্রের কমল ফুটলেই অমাবস্যার কলা বিকাশ হয় দেহে।

অনাহত হল হৃদয় পথ। হৃদয় চক্রে যদি বীজমন্ত্রের প্রকাশ না ঘটে তাহলে অনাহত নাদে এসে অমাবস্যার প্রকাশ কোনওভাবেই বোঝা যাবে

না।

অমাবস্যার প্রকাশই যদি না হয় দেহে তাহলে তো পূর্ণিমার স্থিতি ও তিথি সাধনপথে অনেক দূরের ব্যাপার।

ভ্রূমধ্য আর সহস্রারে পূর্ণিমার স্থিতি। সহস্রারের সঙ্গে হৃদয়ের গুপ্ত সম্বন্ধও আছে।

ভ্রূমধ্যে যখন কৃষ্ণজ্যোতির প্রথম প্রকাশ ঘটতে থাকে ধ্যানে তখন থেকেই অনাহত বা হৃদয়ে কৃষ্ণপক্ষের শুরুয়াত হয়ে যায়।

কলা বাড়তে বাড়তেই তারপর গহীন অমানিশা আসে।

অমানিশাতেই পূর্ণিমা আর অমাবস্যার মহাসমন্বয় ঘটে যায়।

শক্তিময়ী মায়ের নিশ্চল দশার দেহে প্রকাশ ঘটলে শক্তির তখন আবার শিবত্ব প্রাপ্তিটি ঘটে যায়।

হৃদয় বা অনাহত চক্রে অমাবস্যার দেখা যদি মেলে তবেই কৃষ্ণজ্যোতির ময়লা কেটে জ্যোতির উজ্জ্বল প্রকাশ ঘটে। মাতৃদেহে টান পড়ে।

বীজ দিয়ে মায়ের প্রকাশ পেতে গেলে সেজন্যই আগে ভালো করে বীজকে বুঝতে হবে।

দীক্ষা দেওয়ার সময় গুরু যদি প্রদত্ত বীজমন্ত্রের স্বরূপপ্রাপ্তির প্রকাশ কীভাবে আসবে দেহে, এটা আলাদা করে শিখিয়ে না দেন তাহলে ওই শুক্লতিথি, কৃষ্ণতিথিগুলো হবে খালি কথার কথা।

মায়ের মন্ত্র রূপায়িত আছে অক্ষরের সমাবেশে। প্রত্যেক দেবদেবীর উদ্দেশ্যে করা মন্ত্রের স্তব ও স্তুতি আমরা না বুঝে কেবল মুখস্থ বলে চলি বলেই মন্ত্রে উপ্ত শব্দের ধ্বনিগত প্রকাশটি বুঝতেই তো পারি না। সেজন্যই বলা মন্ত্রগুলোর ভিতর থেকে শক্তিময়ীর কোনওরকম কোনও স্ফুরণও ঘটে না।

আমরা শুধু শুক্লতিথি অমানিশাতে মায়ের পুজোই করে চলি। মন্ত্রের স্তুতি লাগাই খুব। হবন করি। কিন্তু মন্ত্রে উপ্ত অক্ষরের উচ্চারিত শব্দে মূলাধারে টান পড়ে না বলেই মাতৃদেহে টান লাগে না।

অমাবস্যার পুজোতে মা প্রতিমার দেহ হয়েই থাকে। সাড়া আসে না। কেননা মন্ত্রে রূপায়িত অক্ষরমালার sound দিয়ে আমরা মূলাধারকে আলগা করার প্রক্রিয়াটি তো শিখিইনি গুরুর কাছে। তাহলে কীভাবে মন্ত্র শক্তির পর্যায়ে যাবে?

ধরা যাক হংসঃ মন্ত্রের শক্তির প্রয়োগ ঘটাব এখন মূলাধারে। হংসের অক্ষরব্যাপ্তি যদি না জেনে কেবল হংসঃ হংসঃ জপ করে মূলাধারে শক্তির প্রয়োগ করতে থাকি তাহলে তা কখনো তেজের ক্রিয়া করবে না।

মন্ত্রের অক্ষরব্যাপ্তি নিয়ে তান্ত্রিক ও বৈদিক অনেক আচার্যরাই নানান পুঁথি-পাতরা লিখে গেছেন। মন্ত্র সেজন্যই আর গোপন দশাতে নেই। কিন্তু সেই মন্ত্র যদি আমরা সেখান থেকে নিয়ে জপ করতে থাকি তাহলে মন্ত্রের স্থিত শক্তি আবার লাগবে না গিয়ে কুণ্ডলিনীতে। সেজন্যই প্রকৃত গুরুরা মন্ত্র জাগিয়ে তবেই বীজ দেন জপের জন্য শিষ্যদের আর বলেও দেন মন্ত্রের অক্ষরব্যাপ্তি।

আমাদের অনেকেরই ভ্রান্ত ধারণা আছে মন্ত্র গোপন বীজ গোপন ইত্যাদি নিয়ে। আসলে কোনও কিছুই গোপন নয়।

তন্ত্রের সমস্ত দুর্গম পাঠের অনুভূতি তান্ত্রিক আচার্যরা প্রকাশ করে গেছেন।

শুধুমাত্র সামান্য বৃহৎ তন্ত্রসার আর সর্বোল্লাসতন্ত্রপুথি যদি কারও কাছে থাকে তাহলেই ওর ভিতর সমস্ত মন্ত্র ও বীজের প্রায়োগিক দিক নিয়ে আলোচনাগুলো পাওয়া যাবে।

তন্ত্রের পুঁথিগুলোতে যা নেই তা হল বীজমন্ত্রে শক্তির প্রয়োগ। সেজন্যই অনেকেই নানান বীজ জেনে ফেলেন তন্ত্রের আচার্য গুরুদের লেখা

বইটইগুলো পড়াশোনার কারণে, কিন্তু বীজ শক্তিহীন বলে সেই বীজ থেকে ফলাফল আসে না।

পুঁথি-পাতরার ভিতর বীজ থাকে, কবজ থাকে ইত্যাদি আরও নানান মন্ত্রগুপ্তি থাকে কিন্তু ওগুলো সব নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকে। ওর থেকে ফলাফল পেতে হলে গুরুর স্মরণাপন্ন হতেই হয়। এজন্যই বলা হয় তন্ত্রের বিদ্যা গুরুগম্য পথে লাভ করার কথা।

হংসঃ মন্ত্রের ভিতর আছে তিনখানি ভিন্ন ভিন্ন অক্ষরে অর্থ ও ভাবের প্রকাশ। জপের আগে এগুলো না জেনে জপ করলে কাজের কাজ কিছুই হবে না।

হংসঃ বীজে হ হল অধিষ্ঠান। প্রাণশক্তির উৎস। সেজন্যই জপের ক্রিয়াতে হ অক্ষরের মন্ত্রতন্ত্র এমনভাবে করতে হবে যাতে গিয়ে শব্দের আঘাত লাগে মূলাধার চক্রে। যদি হ অক্ষরের মন্ত্রতন্ত্র মূলাধারের কমলের গায়ে গিয়ে লাগে তাহলে তো স্ফুরণ হবেই তা। সেজন্যই ং অর্থে স্ফীতি বা স্ফুরণে বিন্দুর পরিণতিকে চিহ্নিত করছে বীজটি। স্ফুরণ হলেই নাদের বিস্তৃতি আসবে। তারপরই দীপ্তি বা পরিণতি। বীজে স্থিত স অর্থ সেই পরিণতিকেই বোঝাচ্ছে।

একই ভাবেই ঐং মন্ত্রের অক্ষরেও আছে প্রাণিক ক্রিয়া। ঐং হল বাক। বর্ণকে প্রকাশ করবে মূলাধার থেকে। সেজন্যই একেক চক্রস্থ কমলে ধ্যানের সময় একেক রঙের কল্পনা থাকে।

ঐং মন্ত্রে আছে বর্ণ রসায়ন। হ্রীং মন্ত্রে আছে প্রাণ রসায়ন, আর শ্রীং মন্ত্রে আছে ছন্দ রসায়ন।

কুণ্ডলিনীকে জাগতে সাহায্য করে হ্রীং। ঐং মন্ত্রে মাতৃটান ওঠে আর শ্রীং মন্ত্রের ধ্বনি কুণ্ডলিনীর সাম্যরস ধরে রাখে।

একই ভাবে ক্রীং, ক্লীং কুণ্ডলিনীর স্বভাবটা বুঝিয়ে দেয়।

মন্ত্রের বীজগুলো ক্রিয়াশীল। ক্রিয়া তখনই করবে গুরু যদি জাগিয়ে দেন।

ক্রিয়া, ভাব ও প্রাণ উঠবে মূলাধারে। তারপরই আস্তে আস্তে মন্ত্রাশ্রিত অক্ষরগুলো দিয়েই দেহের কলাবৃদ্ধি হবে।

কৃষ্ণকলা শুক্লকলা যদি না ধরার জায়গায় থাকে দেহ, তাহলে আর বীজমন্ত্রে মাতৃস্ফুরণ কীভাবে বা হবে?

হিতা থেকে হিত

হৃদয় থেকে সহস্রার আত্মচৈতন্য দিয়ে ব্রহ্মচৈতন্যকে বিস্ফোরিত করতে হবে। না হলে পর জ্যোতির প্রকাশ ঘটবে না। জ্যোতি ব্রহ্মবাচক। জ্যোতি কখনও প্রাকৃত আলো— সূর্যাদির আলোক নয়, যা আমাদের বাহ্যিক দৃষ্টির সহায়ক। জ্যোতির সঙ্গে আন্তর দৃষ্টির সম্পর্ক রয়েছে। বাহ্য বস্তুর সঙ্গে যোগ রেখে ব্যবহারিক জগতে আমরা নিমজ্জিত হতে পারি কিন্তু জ্যোতি বা আদিত্যর প্রকাশটি বুঝতে হলে আমাদের আন্তর রাজ্যে, মনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে হবে গুহ্যবিদ্যাদির অনুশীলনের মাধ্যমে।

অনুশীলনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে অধ্যয়ন। পড়তে আমাদের হবে। না পড়লে জানা যাবে না। পড়ার একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি আছে। পদ্ধতি না মেনে পড়তে বসলে, গুহ্যবিদ্যাদির অভ্যাস করতে বসলে প্রাপ্ত ফলাফল আসবে না। পড়া হল গিয়ে শব্দবিদ্যা। শব্দরাশি দিয়ে আমাদের জ্ঞান অর্জন করতে হবে। পড়াশোনা হল গুহ্যবিদ্যাদির কর্মপন্থা রপ্ত করার ফলাফল। কাজ করলে ফলাফল আসবে। শুদ্ধ বেগ হৃদয়ে গিয়ে লাগবে। হৃদয় তখন বেগকে সহস্রার চক্রে টেনে তুলবে। জেগে যাবে হিতা নাড়ি।

নাড়ি জাগানোর কিছু কর্মপন্থা আছে। রহস্যবিদ্যা চর্চার প্রথম পদক্ষেপ হবে অধ্যয়ন অনুশীলনাদির জন্য আগে দিক নির্ণয় করা। বৈদিক শাস্ত্রাদির ভিতর সমস্ত কাজের ক্ষেত্রে দিগবিজ্ঞানকে ভীষণভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আচার্য গুরুরা অধ্যয়নের বিধি বলে দেন শিক্ষার্থী, শিষ্য, অনুগামীদের। তাঁরা বলেন, সূর্য ওঠে পূর্ব দিকে, আর উত্তরায়ণে সূর্যের আলো বেড়ে চলে। অধ্যয়ন বা গুহ্যবিদ্যাদির অনুশীলনের জন্য পূর্ব ও উত্তর দিকটি প্রশস্ত। দেবতার মন্দির, ঘরে ঠাকুরের সিংহাসন এ দিকে রাখাটি উত্তম।

বৈদিক আচার্য ঋষিরা এ দুটো দিক ছাড়া আরও একটি দিক নির্দেশনা দিয়েছিলেন। সেটা হল অপরাজিতা দিক। অর্থাৎ উত্তর পূর্ব দিক। এ দিকে বসেও সাধনবিদ্যাদি অভ্যাস করা চলে। অধ্যয়ন হল একখানি ক্রিয়া। পড়াশোনা করে যে জ্ঞানপ্রাপ্তিটি ঘটে আমাদের সেটা বাহ্যিক মনের ক্রিয়া কিন্তু নয়। জ্ঞান যখন হয়, বিশুদ্ধ একটি মানস পদ্ধতির মধ্য দিয়ে তা আসে। এজন্য গুহ্যবিদ্যাদির অনুশীলনকারীদের সবসময় আচার্য গুরুরা বলে থাকেন, তোমার ওই চৈতন্যময় সত্তাটি খোলো। ওটা মনোজগতের আদি কারণ। মন-ব্রহ্মাণ্ডকে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে মিলিয়ে দেও শাস্ত্রীয় নির্দেশিকার নির্দিষ্ট দিকগুলো মেনে। তবে তুমি বুঝতে পারবে হৃদয় থেকে সহস্রার চক্র পর্যন্ত একটা নাড়ি আছে যা দিয়ে আদিত্যরশ্মিটি ছড়িয়ে পড়ছে গোটা দেহে।

চেতনাকে সূর্যবৎ করতে বলেন আচার্য গুরুরা। সূর্য মুখ্য দেবতা, এটা বৈদিক আচার্য ঋষিদের অভিমত। সূর্য থেকে প্রাণ ও জ্যোতি, বৈদিকাঃ প্রাণবাদিনঃ, আর্যা জ্যোতিরগ্রাঃ। সূর্য মুখ্য হলেও বৈদিক মিত্র, বরণ, ইন্দ্র, বিষু সহ যত দেবতাদির উল্লেখ আছে, সকলকে জ্যোতি ও চৈতন্যের বিভিন্ন নামরূপের ভিতর রেখে দিয়েছেন আচার্য ঋষিরা। সব দেবতা সেখানে ব্রহ্মজ্যোতির নামরূপ। অগ্নি জ্যোতিস্বরূপ। বায়ুও তাই। অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে বায়ু প্রাণ, বায়ু ব্রহ্ম। আকাশে বায়ু ছড়িয়ে যাচ্ছে, বায়ু আবার সূর্যরূপ গ্রহণ করছে, প্রাণঃ প্রজানামউদয়তি এষঃ সূর্যঃ। ব্রহ্মসূত্রের স্পষ্ট নির্দেশ আকাশ, বায়ু, সূর্য শব্দের দ্বারা ব্রহ্মকে বুঝতে হবে। আর ব্রহ্ম জ্যোতির রূপ। সূর্যও ব্রহ্ম। আদিত্য এবং চক্ষুর অন্তঃস্থিত পুরুষ ব্রহ্ম। নিজের অন্তঃ, অভ্যন্তরেও আদিত্যের গুণগুলোকে নিতে হবে আমাদের। ব্রহ্মসূত্রে বলা হচ্ছে, অন্তস্তদ্ধর্মোপদেশাৎ। অভ্যন্তরে, ভিতর মনে আদিত্য সূর্যের গুণসমূহের উপদেশ করা হয়েছে। বলা হচ্ছে, সূর্যমণ্ডল ও চোখের মধ্যকার পুরুষ সম্পর্কে যেসব গুণাবলির উল্লেখ আছে তা পরমাত্মা ছাড়া অন্য কারও থাকা

সম্ভব নয়। পরমাত্মাও ব্রহ্মস্বরূপ। সূর্যমণ্ডলের মধ্যে সোনার রঙের মতো দেহের লোম ও মাথার চুল বিন্যস্ত হয়ে যে পুরুষ আছেন তিনি হলেন উৎ। অর্থাৎ তিনি সমস্ত আবরণ ভেদ করে ঊর্ধ্বে উদিত হচ্ছেন।

উদয়টা হচ্ছে হৃদয়ে। ওখানেও রয়েছে আকাশ। মনোময় হিরন্ময় অমৃত। এই অমৃত দেহের আন্তরে, অন্তরাবৃত্তে ছেয়ে আছে। পূর্ব, উত্তর বা পূর্বোত্তর দিকে অধ্যয়নে বসে প্রথমে তাঁকে অনুভব করতে হবে। ভাবতে হবে হৃদয় থেকে সহস্রার পর্যন্ত যে হিতা নাড়িটি আছে সেই সাহায্যকারী নাড়িটি আদিত্য বা জ্যোতি পর্যন্ত আমাদেরকে পৌঁছে দেবে। তিনি প্রতিভাত হয়ে উঠবেন। ব্রহ্মতালু থেকে মূর্ধার দিকে বয়ে যাওয়া যে নাড়ি ওটি হল গিয়ে আদতে হিতা। আচার্য গুরুরা বলছেন আবার একে সুষুম্না। অনেক আচার্যদেব এর নামকরণ করেছেন ইন্দ্রযোনি। যোগশাস্ত্র একে ব্রহ্মরন্ধ্র বলছে।

বৈদান্তিকদের ইন্দ্রযোনি বলার কারণটি হল, ঋকবেদে ইন্দ্র প্রধান দেবতা, এখানকার সব থেকে বেশি সংখ্যক সূক্ত তাঁর উদ্দেশ্যে লিখেছেন আচার্য ঋষিরা। ইন্দ্রও জ্যোতিস্বরূপ— ঊর্ধ্বারেতা চেতনায় বা ঊর্ধ্বস্রোতা হওয়ার সময় শিরঃকপাল ফাটিয়ে দিয়ে জ্যোতি মহাশূন্যের ভিতর মিলিয়ে যাচ্ছে, অনেকে একে বলছেন ব্রহ্মশির— ঋকবেদের সূক্তকাররা আদিত্যের জায়গায় ইন্দ্রকে প্রাধান্য দিয়ে ঊর্ধ্বারেতা পদ্ধতিটিকে ইন্দ্রযোনি বলে উল্লেখ করেছেন। আদিত্যের জায়গায় ইন্দ্র এলেন মাত্র। কিন্তু দুই দেবতার প্রধান কাজ আলোটি ফোটানো। হিতা নাড়ির পথ ধরে গেলে আলোটি ফুটবে। আলো ফোটানোর জন্য আসনে নির্দিষ্ট দিকে বসে অধ্যয়ন করে করে সেই কর্মপন্থার প্রয়োগ ঘটিয়ে হৃদয় চক্রে আধ্যাত্মোপলব্ধি আনতে হবে। হৃদয় থেকে নাড়িপথের সূচনা। নাড়িপথ দিয়ে প্রাণ, বায়ু বা বিদ্যুৎ ঊর্ধ্বস্রোতা হয়ে আদিত্যের দিকে চলে যাবে। আদিত্য, ইন্দ্র হিতসাধন করছেন বলে হিতা

নাড়িতে সমস্ত রূপারূপ খুলে এঁরা একাকার। আলাদা কিছু আর নেই মূলকেন্দ্রে পৌঁছে। বায়ু যেমন প্রাণ, কঠোপনিষদে বায়ু আবার বিদ্যুৎ। শ্রুতি বলছে যে, ঈশ্বর নিজের নিশ্বাস থেকে বেদ সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ কিনা আত্মব্রহ্মে নিজের প্রাণ, নিজের বায়ু ও নিজের অর্জিত জ্ঞান দিয়ে সেই অনন্ত জ্যোতির দরজায় পৌঁছনো যাবে। সর্বজ্ঞ ও শক্তিমান হওয়া যাবে। অধ্যয়ন এ পথে প্রবল সহায়ক। পড়াশোনার ভিতর রয়েছে আচরণীয় কতগুলো বিধি। আচার্য ঋষিরা লিখে গেছেন কোন কোন কাজে আমাদের লেগে পড়তে হবে , আর কোন কোন কাজ থেকে নিবৃত্ত হতে হবে, নিজেকে গুটিয়ে নিতে হবে। অধ্যয়নে সেইসব বিধি-নিষেধ সম্পর্কে আমরা অবগত হব। শাস্ত্রে সেই দিগবিজ্ঞানটিও রয়েছে। শাস্ত্র কথার মানে শাসন। কিছু করতে হবে এবং কিছু কিছু জিনিস কোনওভাবে করা চলবে না আত্মাকে জানতে, জ্যোতিকে জানতে, ব্রহ্মকে জানতে, ঈশ্বরকে জানতে। শেষমেষ হিতা নাড়ির ভিতর নিয়ে যেতে হবে আমাদের সমস্ত অধ্যয়নকর্ম। তবে আদিত্যজ্যোতির কাছে আমরা পৌঁছতে পারব।

আদিত্য ভাবনা বা আদিত্যজ্যোতির প্রতি অধ্যয়নকালে দৃষ্টিটা রাখতে হবে হৃদয় থেকে। হৃদয় ভেঙে জ্যোতি আরও অন্তরে প্রবেশ করবে। হৃদয়কে ভেদ করতে হবে। হৃদয় হল অনাহত চক্র। হৃদয়ে সূর্যের আবেশ। হৃদয় চক্রকে স্পষ্ট করতে হবে। হৃদয়ের অন্ধকার দূর হলে আবিষ্ট চেতনার ভিতর প্রবেশ করা যাবে। আবিষ্ট চেতনার ভিতর ঢোকার সময় অনাহত হৃদয় ভেদ করতে হচ্ছে, ভাঙতে হচ্ছে অন্ধকারকাল আদিত্যজ্যোতির উদয়ের কারণে। জ্যোতির যখন প্রকাশ ঘটছে, অন্তরে একটা আবেশের শক্তি আসছে। অন্ধকার ভাঙছে বলে সেটি ভগ। অন্তরে আবিষ্ট অন্ধকারের চেতনা ভাঙাটি হল ভগ। ভগ দেবতার স্বরূপ। এভাবে ভেবে আসছেন অধ্যাত্মবাদীরা। ভাগবত ধর্মের আদি দেবতা হিসেবে দেখা হয় ভগকে।

বৈষ্ণবদের বালগোপালের রূপটি হল ভগ। তিনি যখন কিশোর, সূর্যের নতুন উদয়। যখন যুবা, বিষু। ভগ শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেব। ভাগবতদের মহামন্ত্রেও লেগেছে ভগের ছোঁয়া, ওঁ নমঃ ভগবতে বাসুদেবায়...। ভগ কাছের দেবতা। আত্মন হৃদয় চক্রে অন্ধকার ভেঙে বালগোপালস্বরূপ কিশোর সূর্যের প্রকাশটি ঘটাচ্ছেন বৈদিক ধারায় ভগ। ভগ যখন হৃদয়ে অনাহত চক্রে প্রবেশ করলেন, আমরা ভক্ত হলাম। অর্থাৎ আবিষ্ট বালসূর্যের ভিতর অধ্যয়নের প্রকাশ ঘটল।

এত পড়েশুনে উপলব্ধি এল হৃদয়ের মধ্যে আছে অগ্নির প্রতীক। একটি আগুনের শিখা নীচ থেকে উপরে উঠে আসছে, অপর শিখা উপর থেকে নীচে নামছে, ঊর্ধ্বমূলবাকশাখঃ। গীতার মধ্যে এমত দশাপ্রাপ্তির রূপটি দেখানো হয়েছে অশ্বত্থ গাছের ছবি দিয়ে, সহস্রশাখ বনস্পতি। ঋকবেদে রয়েছে, অধ্যয়নকালে যখন হৃদয়ে গভীর জ্ঞান এল, পড়ুয়া ঋষিরা সেই জ্ঞান নিয়ে সহস্রশাখ সংসারের ভিতর অনায়াসে প্রবেশ করতে পারলেন, সহস্রবলশমভি সংচরন্তি। জ্ঞান হৃদয়ে অনাহত চক্রে এল বলে অগ্নির বিস্তার হচ্ছে খালি। চক্রস্থ জ্যোতি যখন উপর দিকে উঠছে তখন ওটি অগ্নি — আগুন কখনো নিচে নামে না, বনস্পতির ডালপালার মতো তার উপর দিকে বিস্তার। আর আগুন যখন নীচে নামছে, হয়ে উঠছে দেবতার প্রসাদস্বরূপ সোম। সোমও একটি জ্যোতি। যখন বাহ্যিক দৃষ্টির জ্যোতি নিভে যাবে, বোধের ভিতর সোমজ্যোতি জ্বলে উঠবে। আমাদের যাবতীয় বাইরের চেতনাগুলো হল অন্ধকার বা রাত্রির প্রতীক। বরুণকে বলা হচ্ছে রাত্রির দেবতা। যখন বাইরের অন্ধকার কাটল, জ্যোতির আগুনসম তেজ কমে এল। বোধ তখন অমৃতময়, বোধের প্রকাশ চান্দ্রজ্যোতি সোমজ্যোতিতে।

অধ্যয়ন হল অবিদ্যা দূরীকরণের। অবিদ্যার অন্ধকার সরানো গুহ্যবিদ্যাদির কর্মপন্থার মধ্যে পড়ে। গুহ্যবিদ্যাদির চর্চা এজন্য বীরভাবের,

অন্ধকারের। অজ্ঞানের অন্ধকার, বাহ্যিক চেতনা যখন মৃতবৎ হয়ে দেখা দেবে দেহে এবং জীবনে, চান্দ্রজ্যোতির প্রকাশ ঘটতে থাকবে। এটি হল সোমের প্রসাদ। দেবতার প্রসাদ পাওয়া যায় পুজো সম্পন্ন হলে। দেহের ভেতর করতে হবে অগ্নি আর সোম দেবতার পুজো। যোগিগুরুরা বলে থাকেন, দেহটা তোমার হল গিয়ে উলটানো গাছ। মাথাটা হল মূল শিকড়। সুষুম্নাকাণ্ডটি হল গাছটার গুঁড়ি। মেরুদন্ডের ভিতর সুষুম্না হিতা নাড়ি। সুষুম্না হিতা নাড়ির মুখ না খুলতে পারলে আগুনের শিখা উপরে উঠবে না, সোমের ধারা নীচের দিকেও নামবে না।

আমাদের অধ্যয়ন শুরু হবে সূর্য উদয়ের আগে। সূর্য স্পষ্ট করবে জ্যোতি। জ্যোতির সাহায্য নিয়ে আমরা আহ্বান করতে থাকব দেবতাকে। বৈদিক উপাসকরা আদিত্য সূর্যের আহ্বান করছেন। সাত জন আদিত্যের কথা আছে ঋকবেদে— মিত্র, বরুণ, অর্যমা, ভগ, দক্ষ, অংশ — ছ-জনের নাম বলে সপ্ত আদিত্যের শেষজনের নামটি উহ্য রাখা হয়েছে। বলা হয়েছে, সপ্তম আদিত্য তুবিজাত। অর্থাৎ তিনি বীর্যজাত। স্বভাবত তাঁর স্থান মূর্ধার দিকে। কেননা ঊর্ধ্বস্রোতা বীর্যচেতনা ধরে অধ্যয়ন চলছে আমাদের। সপ্তম আদিত্যের দেখা মিলছে স্বর্জেতিরূপে। গুহ্যবিদ্যাদির অনুশীলনের মাধ্যমে জ্যোতিভেদকে বুঝতে হবে। অভয়ং জ্যোতি, স্বর্জেতি। অর্থাৎ আমি তাঁর স্বয়ং প্রকাশ।

মন্ত্রের নিজস্ব শক্তি সম্পর্কে কখনো সন্দিহান ছিলেন না যাজ্ঞিক পুরোহিতরা। তাঁরা শ্রদ্ধা নিয়ে বৈদিক মন্ত্রাদি উচ্চারণ করতেন। মন্ত্রের মানে জানার ইচ্ছেটিচ্ছে তাঁদের হয়নি। মন্ত্রের অর্থভাবনার দিকে ঝুঁকে গেলেন যখন আচার্য ঋষিরা, বেদের শিক্ষাগ্রন্থ রচিত হতে থাকল তাঁদের হাত ধরে। পাণিনীর হাত থেকে বের হল ঋকও যজুর্বেদ শিক্ষার গ্রন্থাদি। পাণিনীয় শিক্ষার পর সামবেদের শিক্ষাগ্রন্থ রচিত হল নারদ মুনির হাত ধরে।

সামবেদের নারদশিক্ষা রচনার পর যজুর্বেদের শিক্ষাগ্রন্থ লিখতে বসলেন ঋষিরা। মহর্ষি ব্যাস লিখলেন কৃষ্ণযজুর্বেদের শিক্ষাগ্রন্থখানি। কৃষ্ণযজুর্বেদের ব্যাসশিক্ষা রচনার পর ঋষি যাজ্ঞবল্ক লিখে ফেললেন শুক্লযজুর্বেদের শিক্ষাগ্রন্থখানি। ঋষিমণ্ডলীতে তা যাজ্ঞবল্ক শিক্ষা নামে সবিশেষ পরিচিত। অথর্ববেদের মাণ্ডুক্যশিক্ষাও বের হয়ে গেল। ঋষিমুনিদের হাত ধরে শব্দব্রহ্মের অনুশীলন পদ্ধতিটি এল এভাবে।

ঋষিরা কেউ সংসারবিমুখ নন। তাঁরা যখন প্রার্থনাতে বসলেন বেদমন্ত্র নিয়ে, উপাসনার একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি গড়ে উঠেছে বৈদিক সমাজে। পাণিনী, নারদ, ব্যাস, যাজ্ঞবল্ক, মাণ্ডুক ঋষিরা লিখে ফেলেছেন বেদমন্ত্র অধ্যয়নের নানান সব উচ্চারণপ্রক্রিয়া। এগুলো কাজে লাগাতে থাকলেন ঋষিরা বৈদিক উপাসনার ভিতর। তাঁরা চাইলেন অন্ন, পশু, সন্তান, দেহ, আর প্রাণ। জীবনধারণের জন্য পাঁচটি জিনিস অতীব দরকারি। পরবর্তী ঋষিদের উপাসনাতে অনন্ত ব্রহ্মশক্তির কাছে চাইবার এই পদ্ধতিগুলো চিহ্নিত হয়ে উঠল পঞ্চধা বিভক্ত মহাসংহিতা হিসেবে। অধ্যয়নসিদ্ধির ভিতর ঢুকে পড়ল জাগতিক চাওয়া-পাওয়া। ফলকামী উপাসনার চল সেই হতে। ঋষিরা সব সকাম উপাসক। মুনিরা যেহেতু সংসারবিমুখ, তাঁদের অধ্যয়ন ও সাধন ধারার ভিতর নেমে এল নিষ্কাম ভাব। জাগতিক কিছু তাঁরা আর চাইলেন না। তাঁরা ব্রহ্মবিদ্যা লাভের সামর্থ্য অর্জন করতে চাইলেন। শুরু হল বেদমন্ত্রের অধ্যয়ন।

ঋষিরা চাইলেন সাংসারিক শ্রী। তাঁদের গুরুকুল আছে। যারা এখানে বিদ্যার্থী হয়ে আসছে, দেখভালের দায়িত্ব গিয়ে পড়ছে আচার্য ঋষিদের ওপর। আশ্রমের অন্তেবাসী ও বিদ্যার্থীদের যাবতীয় দায়দায়িত্ব তুলে নিতে দেখা যাচ্ছে ঋষিদের। তাঁরা আশ্রমবাড়ির প্রতিটি সদস্যদের জন্য অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা করছেন, আবার বিদ্যার্থী ও সাধকদের দেহ, মন, প্রাণের বিকাশ

যাতে ঠিকমতো হয় সেদিকেও রাখছেন খেয়াল। আচার্য গুরু এই শ্রী লাভ করতেন রাজা ও শ্রেষ্ঠীদের কাছ থেকে। আশ্রম গুরুকুলের দান আসত ওখান হতে। দানের সমস্তটা ব্যবহার করতেন ঋষিরা আশ্রমবাসীদের জন্য। সংসারবিমুখ তাঁরা যেমন নন তেমন আবার বৃহত্তর দায়দায়িত্বেরও অংশীদারও বটে। সাধারণ মানুষের চাওয়া-পাওয়ার সঙ্গে ঋষিদের যজন-যাজনকে গুলোলে চলবে না। বিদ্যাদান যেহেতু তাঁদের অবশ্য কর্তব্য, বিদ্যাশিক্ষার প্রয়োজনে এই দান গ্রহণ। আচার্য ঋষিদের লোভী বলা চলে না। যদিও বেদমন্ত্রের ভেতর যোগ্যস্থানে-কালে-পাত্রে দানের মহিমা তাঁরা লিপিবদ্ধ করেছিলেন। দানের গ্রহীতা আচার্য ঋষিরা। তাঁরা ব্রহ্মকে জেনে ব্রহ্মবিদ্যা দান করছেন, এজন্য ব্রাহ্মণ একমাত্র আচার্য ঋষিরা। তাঁরা শ্রী-এর আহবান করছেন আশ্রম চালাতে গিয়ে, ব্রহ্মবিদ্যার শিক্ষা দিতে। এছাড়া তাঁদের অন্য কোনও উদ্দেশ্য ছিল না।

ঋষিরা চাইছেন অন্ন, পান, বাস ও পশু। আশ্রম চালাতে গেলে এগুলো দরকারি। পশু চাইছেন তাঁরা অশ্ব ও গোধন গরু। অশ্বের পিঠে চড়ে যাতায়াতের জন্য দরকারি এই পশু। গোধন লাগত যজ্ঞ - হবি করার জন্য আর দুধ খাওয়ার জন্য। দুধের দ্রবাদি থেকে পুষ্টি মিলবে। অধ্যয়নকারীদের দেহ, প্রাণ, মনের বাহ্যিক পুষ্টি গোধন থেকে আসবে। সেজন্য রাজার কাছে এসব চাওয়া, আর আন্তর পুষ্টি মিলে যাবে ব্রহ্মবিদ্যার অধ্যয়ন করতে করতে। ঋষিরা চাইছেন উত্তরপুরুষ, এজন্য সন্তানের প্রার্থনা, আর পশু ও অন্ন এসব চাওয়া তাঁদের বৃহত্তর সংসার চালানোর জন্য। এর প্রধান চালিকা শক্তি হল ব্রহ্মতেজ। আচার্য ঋষিদের প্রার্থনাতে লেগে রয়েছে, ব্রহ্মবর্চস অর্থাৎ ব্রহ্মলাভের জন্য সদর্থক সাধন - উপাসনার কর্মগুলো। এভাবে তাঁরা এগিয়ে যাবেন নিঃশ্রেয়সের পথে।

বরুণ ভৃগুকে বলছেন, ব্রহ্মোপলব্ধির প্রধান দরজাটা হল অন্নের। অন্ন হল চৈতন্যে রূপান্তরিত হয়ে যাওয়া শরীর। স্থূল ছেড়ে চৈতন্যকে আত্তিকরণ করতে হবে আমাদের। অন্নকে গ্রহণ করছে বলে জীব অন্নাদ। অন্নাদ হল, স্থূল জড়তা ঘোচার পর পর যে চৈতন্য দশাপ্রান্তিটির আবেশ আসে তার ঊর্ধ্বদশা। একে বলছে পরম চৈতন্য। অন্নরসময় পরম চৈতন্যকে আত্মস্বাদ করতে হবে আমাদের। অন্ন আছে শরীর, প্রাণ, চোখ, কান, মন ও কথার ভিতর। এসবের একত্র সহযোগে আমরা অন্নরসময় গভীর স্পন্দনটি টের পাবো ভিতরবাড়ির প্রাণের ধারায়। প্রাণ থেকে সুষুপ্তি আসবে আমাদের। চেতনা তখন নির্বিষয় হয়ে গিয়ে আকাশবৎ সূক্ষ্ম মনে অর্থাৎ ঊর্ধ্বপরিণামে যে চৈতন্যের ধারা, তাকে আস্বাদ করতে থাকবে। মনের মধ্যে দু-দুটো সত্তা আমাদের। প্রথম সত্তা স্থূল অন্নবৎ। সেজন্য দেবদেবীর ভোগের অন্ন আমরা পরম পবিত্রভাবে প্রসাদ বলে গ্রহণ করি। অর্থাৎ অন্নের ভিতর দেবদেবীর স্পন্দমান শক্তির আহার আমরা গ্রহণ করি। আমরা ভাবি, মূর্তির প্রাণময় চৈতন্য আমাদের দেবতার উদ্দেশ্যে সাজিয়ে দেওয়া ভোগ গ্রহণ করেছে। তার রসময় ধারা আমরা অন্নরূপে, প্রসাদ হিসেবে তুলে নিচ্ছি এবার। যখন পবিত্রভাবে তা নিচ্ছি, গ্রহণ করছি আমরা, সেটা সত্তার সূক্ষ্মভাবে গিয়ে স্থূল চৈতন্যশক্তির রূপান্তর ঘটিয়ে তুলছে। জীব তখন সেটা গ্রহণ করছে বলে জীব হয়ে উঠছে অন্নাদ। আমাদের দ্বিসত্তার চৈতন্যের স্তরে রয়েছে অন্নাদের প্রসাদ। এটা আমরা লাভ করছি জড় অন্ন থেকে। রোজকার খাদ্যদ্রব্য এভাবে চৈতন্যসত্তার রূপান্তর ঘটিয়ে ভোগস্বরূপ অন্নাদ হয়ে যাচ্ছে। আদতে এই প্রসাদ আমাদের গ্রহণ করতে হবে। এভাবে যখন আমরা গ্রহণ করতে থাকব অন্ন, দেহের জড়বিকার সরে যাবে। অন্নময় আমির মধ্যে যে প্রাণময় আমি এতকাল লুকিয়ে ছিল তাকে তখন দেখতে পাব। প্রাণের ভিতর আত্মা। প্রাণের ভিতর মনোময় পুরুষের অন্তরে তখন বিজ্ঞানময় চেতনা জেগে উঠবে

আস্তে - ধীরে। বিজ্ঞানদশা যখন আনন্দময়ে, আত্মার ছায়াতে ব্রহ্মভাবটি প্রকট হবে। সমগ্র সৃষ্টি হল দেবতার অন্ন। মহাবিশাল সৃষ্টির সমস্তটা যখন আমাদের চৈতন্যের সত্তা দিয়ে ভোগ করতে শিখি, অন্নের ভোক্তা আমরা। অন্ন ভক্ষণ করছি, ভগবানের প্রসাদ নিচ্ছি। বরণ এ শিক্ষাবল্লির পাঠ দিয়েছেন ভৃগুকে, এজন্য ব্রহ্মবিদ্যার এই উপদেশগুলো ভার্গবী বারুণীবিদ্যা নামে চিহ্নিত।

হিতা থেকে আসবে আমাদের যাবতীয় পরম চৈতন্যরূপী হিত। হিতা নাড়িতে সুষুম্নার উৎক্রমণ। দেহের যে আত্মা বা পুরুষ, তিনি রয়েছেন হৃদয় চক্রে, হৃদি হি এষ আত্মা। এজন্য হৃদয় অনাহতে দেহ-মন-প্রাণকে স্থির করে এগোতে হবে হিতার পথে। হৃদয় চক্রে হিতার রাস্তা। এ রাস্তা দিয়ে পরম চৈতন্যের সত্তাটিকে ঊর্ধ্বদিকে তুলতে হবে। একে বলা হচ্ছে সুষুম্নার উৎক্রমণ। অর্থাৎ ক্রমের বিপরীত রাস্তা এটি। ক্রম আমাদের মূলাধারে। ওখান হতে গুহ্যদ্বার। ওই দ্বারে আছে গুপ্ত এক বায়ু। স্থির হয়ে আছে বায়ু গুহ্যদ্বারের ঠিক উপরে। ওখান থেকে শুরু হচ্ছে দেহের আধার। আধারটি শক্তিস্বরূপ বলে, কন্দর্প বায়ু একটা আট পাপড়ির পদ্মের ভিতর আটকে আছে। তার ভেতর আবার ষোলো পাপড়ির পদ্ম তিনটি স্তরে সাজানো। নাভির সঙ্গে এর প্রত্যক্ষ সংযোগ। এজন্য নাভি দিয়ে চৈতন্যশক্তির কাজটি আমাদের আরম্ভ করতে হবে। নাভির ভেতর প্রাণ আর অপান বায়ু। দুই বায়ুকে একসঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে নাভিপদ্মে আটকে রেখে মূলাধারে পাঠাতে হবে আগে। মূলাধার বায়ুর তাপে গরম হয়ে উঠলে চৈতন্যশক্তি জেগে উঠবে। চৈতন্যের দুটো রূপ। স্বাভাবিক রূপ নীচের দিকে। তার বিপরীত রূপটি সুষুম্নার উৎক্রমণের। ওখান থেকে দেহে স্থিত সূক্ষ্ম চৈতন্যশক্তির যাত্রা শুরু। এ পথে এগোলে হিত আসবে। চৈতন্যের পরম দশাটি বোঝা যাবে। চৈতন্যশক্তি রয়েছে নাভিতে। এজন্য নাভিলক্ষ্য, নাভিচিন্তা করে করে

কুম্ভকযোগে প্রাণ ও অপান বায়ুকে এক রেখে নীচের দিকে, মূলাধারে নামিয়ে এনে তাকে দিতে হবে এবার উৎক্রমণের রাস্তা। নাভির উপর দেহের পুর, পুরি শয়নাৎ পুরুষঃ। দেহপুরে ঘুমিয়ে আছেন পুরুষ। পুরুষকে বলা হচ্ছে চিজ্জ্যোতি। চিজ্জ্যোতি হল দেহপুর, মণিপুরের আগুন। এই আগুনের ভেতর ভূঃ , ভুবঃ, স্বঃ— এই তিনখানি লোক অর্থাৎ কিনা সর্বলোক ব্যাপ্ত হয়ে আছেন পুরুষ। তিনি চৈতন্যশক্তির আধার, পূর্ণাঃ ভুরাদয়ঃ লোকাঃ যেন ইতি পুরুষঃ। তিনলোক পূর্ণ করে দেহপুরে পুরুষ জেগে আছেন। পুরুষ আগুনের মতো উজ্জ্বল শিখাধারী। আগুন ওপরের দিকে উঠছে। চৈতন্যশক্তির উৎক্রমণ হচ্ছে। হিতা নাড়ি দিয়ে সুষুম্নার লতা ধরে ভুরুর মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে চৈতন্যশক্তি। ভুরু ভেদ করলে সহস্রার চক্র, ব্রহ্মরন্ধ্র। ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ হলে ভূঃ অর্থাৎ আগুনের স্থান, ভুবঃ মানে বায়ুর জায়গা আর স্বঃ হল আদিত্যের রূপান্তরিত জ্যোতি। অধ্যয়নরত তিনখানি বেদও চৈতন্যশক্তির শেষ আবাস— জ্যোতিস্থিতিতে ফুটে আছে যেন। বেদ পড়ে জ্যোতির পথকে আমাদের প্রশস্ত করতে হবে, আর্যা জ্যোতিরগ্রাঃ। জ্যোতির পথে দিশারি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে বৈদিক ঋষিদের মন্ত্রভাবনাগুলো। সেগুলোকে অধ্যয়ন করে, পড়ে, উপলব্ধি করে, দেহে প্রয়োগ ঘটিয়ে জ্যোতির্ময় অমৃতকে আহরণ করতে হবে। এগুলোকে বলা হচ্ছে ব্যাহাতিবিদ্যা। ব্যাহাতির ধ্যান আমাদের করতে হবে। ব্যাহাতির ধ্যানে ব্রহ্মের সর্বব্যাপী উপলব্ধি আসবে। ঋষিরা বলছেন, তিন ব্যাহাতির তিনজন দেবতা আছেন। ভূঃ লোকে আছেন অগ্নি, ভুবঃ লোকে বায়ু আর স্বঃ লোকে আদিত্য। বেদের সমস্ত বীজমন্ত্রগুলোকে বিশেষ রূপে আহরণ করাটা হল ব্যাহাতিবিদ্যা। ব্যাহাতির ভিতর রয়েছে সৃষ্টিবীজ। মন্ত্রের শক্তি অধ্যয়ন করতে করতে, উপলব্ধিতে আনতে আনতে ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ তিনলোক সৃষ্টি হচ্ছে। এজন্য বেদে স্থিত বীজমন্ত্রগুলোকে বলা হচ্ছে লোকসৃষ্টির মন্ত্র। বেদে

রয়েছে ভূঃ অর্থাৎ প্রাণ, ভুবঃ মানে অপান আর স্বঃ যা হল ব্যান বায়ু। এই তিন বায়ু দিয়ে অন্ন পরিপাক করতে হবে। সেজন্য ব্যাহাতিবিদ্যা চারভাগে বিভক্ত। ঋকবেদে রয়েছে অগ্নিজ্যোতি। আগুন ভূঃ লোকে ছড়িয়ে যাচ্ছে। সামবেদ অধ্যয়ন করলে ভুবঃ লোকে তখন বায়ুর আভাস আসবে আর যজুর্বেদ অধ্যয়ন করলে স্বঃ লোকের ভাবনা খুলবে। ভাবনা ছড়াতে হবে দেহে। দেহে রয়েছে প্রাণশক্তি। ভূঃ হল প্রাণ। শ্বাস ছাড়ছি আমরা, এটা প্রাণের ক্রিয়া। ভুবঃ হল অপান। শ্বাস নিচ্ছি, এটা হল অপান। আর সন্ধিবায়ু হল ব্যান। দেহের সর্বত্র ছড়িয়ে যাচ্ছে ব্যান বায়ু। ব্যান হল স্বঃ। নিশ্বাস-প্রশ্বাসের ছন্দময় ক্রিয়াতে দেহ জ্যোতির্ময় হচ্ছে আমাদের। এমন জায়গায় পৌঁছে দিচ্ছে আমাদের হিতা। হিতা নাড়ির ভিতর গিয়ে সহস্রার ভেদের পর ভূঃ ব্যাহাতির ধ্যান করলে দিব্যজ্যোতি জাগবে। ভূঃ লোক ব্যাপ্ত করবে জ্যোতি। যথাক্রমে ভুবঃ ও স্বঃ। বায়ুর সাহায্য নিয়ে আদিত্য প্রতিষ্ঠা পেলে অন্তে মহঃ অর্থাৎ সর্বব্যাপী ব্রহ্ম। ব্রহ্মকে, ঈশ্বরকে, আত্মাকে দেহে পেতে, অনুভব করতে, তন্ময় দশাপ্রাপ্তিতে চলে যেতে সাহায্য নিতে হবে আদিত্যরশ্মির। হৃদয় চক্র থেকে এজন্য আদিত্যভাবনা শুরু করতে বলা হচ্ছে। আদিত্য নাড়িকে প্রচোদিত করতে হবে। আদিত্য হিত করবে। এজন্য বেদে সূর্য মুখ্য দেবতা। সকল হিতের তিনি কার্য ও কারণ।

ব্রহ্মবিদ্যার ভিতর রয়েছে শক্তিপাত। আচার্য গুরু স্বীয় শক্তি দিয়ে মন্ত্রকে শিষ্যর হৃদয়ে জাগিয়ে দেন। শক্তিপাতের দ্বারা মন্ত্রকে জাগানো হয়। মন্ত্রের নিজস্ব স্বাভাবিক একটা শক্তি আছে। মন্ত্রের ভিতর আছে তত্ত্বরাশি। তত্ত্বগুলো হৃদয়ে আলোর মতন উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে আর মন্ত্রের শক্তি হৃদয়ে জেগে যাওয়া নিজের শ্রদ্ধা ও ভক্তির ওপর অনেকখানি নির্ভর করে। উপনিষদে মন্ত্রকে বলা হচ্ছে, দিব্য বাক। অধিকার ভেদে মন্ত্র দেওয়া হয়। যাঁরা উত্তর অধিকারী, শোনা মাত্র মন্ত্র থেকে জ্ঞান অর্জন করতে পারেন। নিজের হৃদয়

গুহাতে পরম ব্রহ্ম রয়েছেন। ঋকমন্ত্রে তাঁকে জাগানো হচ্ছে। ব্রহ্ম সম্পর্কে অবগত না হলে ঋকের ভিতর যে তত্ত্বের স্থাপনা করে গিয়েছেন আচার্য ঋষিরা তাকে বোঝা একটু শক্ত হয়ে উঠবে। তত্ত্ব না জেনে মন্ত্র গড়গড়িয়ে পড়ে গেলেও শক্তি আসবে না কখনো স্বীয় শরীরে। মন্ত্র হল শ্রুতি। গুরুর মুখ থেকে শোনা মন্ত্র নিলে কাজ করে বেশি। শ্রুতি থেকে স্মৃতিপ্রস্থানগুলো সব এসেছে। ব্রাহ্মণগুলোর ভিতর রয়েছে আবার অর্থবাদ। সমস্তরকম মীমাংসাদি ওতে নিষ্পন্ন হয়েছে। সমস্ত জেনে মন্ত্রাদি যদি স্ফূরিত হয়ে ওঠে হৃদয় গুহা থেকে, শক্তি চরম পর্যায়ে পৌঁছে যায়। সাধককে ব্রহ্ম বিষয়ে অবগত করার জন্যে মন্ত্র, অর্থবাদ, মীমাংসা। এর থেকে অনুভূতি আনতে হবে মনে। অনুভূতির অভ্যুদয় ঘটলে মন্ত্রের শক্তি কাজ করবে। ব্রহ্মকে দেখতে হবে তখন স্বরূপে। ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ। ব্রহ্মের ভিতর আনন্দের যাবতীয় মীমাংসাগুলো করে দিয়েছে ব্রাহ্মণ, সংহিতা, শ্রুতি। আত্মচৈতন্যের ব্যাপ্তি না এলে মন্ত্রশক্তির গুণাগুণও বোঝা যাবে না। মনকে প্রকাশ করতে হবে বুদ্ধিতে, বুদ্ধিকে নিয়ে যেতে হবে জ্ঞানে, জ্ঞানকে আত্মার কিনার ঘেঁষে রেখে আসতে হবে তবে অস্তিত্বে নিবিষ্টতা আসবে। অন্তরে নিবিষ্ট না হলে ব্রহ্মের উপলব্ধি আসবে না। আবৃতচক্ষু হয়ে অন্তরাবৃত্তির বোধ দিয়ে হৃদয়ের গভীর গুহাতে পৌঁছতে হবে। মন নিয়ে এখানে যাওয়া চলে না। মনের উপরে আছে একাগ্রভূমি, তারপর রয়েছে অন্তরভূমি। এখানে এলে প্রচণ্ড এক শূন্যতা বোধ আপনা হতে আসবে। শূন্য, ফাঁকা সেই বোধ দিয়ে তখন ব্রহ্মরন্ধ্রকে বুঝতে হবে। একে আচার্য শঙ্কর বলেছেন, বুদ্ধিগুহা। গুহার ভিতর দিয়ে পরম ব্যোম উঠে যাচ্ছে। ঊর্ধ্বমুখীন দশাপ্রাপ্তির ভিতর রয়েছে রন্ধ্র বা বিন্দু। সেই বিন্দুতে একাগ্র হয়ে থাকাটা অভ্যাস করতে হবে রোজ। তবে মন্ত্রের থেকে প্রাপ্ত অনুভূতাদির আনন্দ ওখানে গিয়ে কাজ করবে। একে বলা হচ্ছে, সম্ভোগ। ব্রহ্মানন্দের সম্ভোগ করে তাঁর প্রসাদরূপি আনন্দ আমি

ভোগ করছি। এই বোধ যদি শেষমেষ আসে, ব্রহ্মের ভিতর গিয়ে পরম স্বরূপকে আস্বাদন করার প্রক্রিয়াগুলো রপ্ত হবে। এভাবে হবে ব্রহ্মবিদ্যর অধ্যয়ন।

ব্রহ্মের ভেতর রয়েছে আনন্দ আর সিসৃক্ষা। এ দুটিকে বলা হয় ব্রহ্মের বিভাব। আনন্দের সৃষ্টি হচ্ছে, ব্রহ্মবিদ্যা অধ্যয়নে এলে সৃষ্টির ইচ্ছেটা জাগছে। এটা হল ব্রহ্মবিভাব সিসৃক্ষা। অন্তরে আমার ব্রহ্মবোধটা সৃষ্টি হচ্ছে, তৈরি হচ্ছে, আত্মার আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে। দেখতে পাচ্ছি আমি এবার আনন্দব্রহ্মকে। মনের ওপর ফেলতে হবে সবার আগে অন্তরের ছাপ। আত্মচৈতন্যকে বিস্ফোরিত করতে হবে। তবে সর্বব্যাপী ব্রহ্মসত্তার অনুভূতিটা আসতে থাকবে। একে বলা হচ্ছে, ব্রহ্মঘোষ। অগ্নি হচ্ছে আত্মচৈতন্য। সোমযাগে আগুনের কথাটা বলা রয়েছে। যাগ হচ্ছে কর্মবাদ। দেহকে চিন্ময় করে নেওয়ার কাজটা আমাদের করতে হবে। ঋত্বিকমণ্ডলী শপথ নিয়ে কর্মের অনুষ্ঠান করতেন। কর্ম করতে হবে এবার গুরুর কথামতো। গুরুদেব হৃদয়ে মন্ত্রকে জাগিয়ে দিয়েছেন। শক্তিপাত দিয়েছেন তিনি। তা নিয়ে আমাদের অধ্যয়ন - কর্মাদি নিষ্পন্ন করতে হবে। সেখান থেকে আকাশ স্পন্দিত হবে। আকাশ থেকে বায়ু। বায়ুর কেশ ধরে আমাদের নাড়াতে হবে। তিনটি কেশের কথা বলছে ঋকবেদ, ত্রয়ঃ কেশিনঃ। প্রথম কেশ অগ্নি, শিখা তাঁর কেশ। আদিত্য কেশী তাঁর আলো সর্বত্র ছড়িয়ে দিচ্ছে। এর ভেতর রয়েছে বায়ু। খালি চোখে বাতাসকে আমরা দেখতে পাচ্ছি না। আমরা মেঘ, রুদ্ররূপ, ঝড় এ সমস্ত দেখতে পাচ্ছি আকাশের শক্তিরূপে। ঝলমল করছে আকাশ। স্পন্দিত হচ্ছে বায়ু আর প্রাণ। সূর্যবিম্ব পড়ছে তখন। আলো, ঝড়, জল সব বেরিয়ে আসছে। একে বলা হচ্ছে, দেবীঃ আপঃ। আদিত্য থেকে বায়ুর ভিতর দিয়ে বৃষ্টি। বর্ষণ দেবীরাপঃ। রূপকে আমাদের ধরতে হবে নিষ্পন্ন চৈতন্যের ভেতর প্রাণের স্পন্দন দিয়ে। এটা সাধনা।

ব্রহ্মপুরে যিনি আছেন তিনি পুরুষ— পুরুষঃ পুরে শেতে। পুরুষ হল আমাদের জ্যোতি, আলো আর চৈতন্য ভরা সত্তা। যা আবিষ্ট করে ব্রহ্মের সঞ্চারটি ঘটিয়ে থাকে এই দেহে, এজন্য দেহ হল গিয়ে ব্রহ্মপুর। দেহের ভিতর রয়েছে আত্মা। আত্মার অনুভবে দেহ দিয়ে আসতে গেলে অন্তর্মুখী হতে হবে। অন্তর্মুখী হতে পারলে অন্তরপুরুষ জেগে উঠবে। অন্নময় কোষ থেকে আনন্দময় কোষাধিকারী— সকলে পুরুষ। উষ ধাতু যুক্ত হয়ে পুরুষ আর ওষধি শব্দদুটো নিষ্পন্ন হয়েছে। ঊষার আলো যার ভেতর নিহিত রয়েছে তাই-ই উষ আলো— ওষধি। আমাদের জড় চেতনায় যখন আলোর প্রকাশ ঘটছে তখন তা ওষুধিতে পরিগণিত হচ্ছে। অন্নকেও ওষধি বলা হচ্ছে। অন্নময় কোষ হল আমাদের স্থূল দেহ। দেহ অন্নের পুষ্টি নিচ্ছে। সেজন্য বলা হচ্ছে, অন্নঃ সর্বৌষধমউচ্যতে। দেহের ওষুধ খাদ্য, অন্ন, শস্যাদি। দেহের স্থূল ওষুধ যেমন অন্ন— দেহ ধারণের জন্য খাবার দরকার, তেমন যখন জড় দেহে খাবার ছাড়া চেতনা, জ্ঞান, বোধ, আধ্যাত্মিক জিজ্ঞেসাদির প্রবেশ ঘটল, অন্নময় কোষে প্রাণের ব্যাপ্তি ঘটে গেল! প্রাণ, মন, বিজ্ঞান— প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ আর বিজ্ঞানময় কোষ— যখন আমাদের ভিতর জড় জগৎ নিষ্পন্ন হয়ে আধ্যাত্মিক চেতনা ও উপলব্ধি আনবার জন্য শাস্ত্রীয় জ্ঞানাদি ঢুকছে আর গুরুকরণ হয়ে গিয়ে আত্মবোধ, চেতনবোধ, ঈশ্বরবোধের একটা সত্তার নাড়াচাড়া নিজেদের ভিতর ধরতে পারছি তখন সূক্ষ্ম শরীরের প্রকাশ ঘটছে। যার শুরু প্রাণময় কোষ থেকে। প্রাণে চৈতন্য, জ্ঞান ও আধ্যাত্মিক বোধাদির প্রকাশ ঘটে। ক্রমে ক্রমে তা মন ও বিজ্ঞানময় দশাতে গিয়ে শেষে একেবারে আনন্দময় দশা বা কোষে দাঁড়িয়ে যায়। সমস্ত প্রকাশে পুরুষ বর্তমান। অন্নকে ব্রহ্ম দেখা হচ্ছে। অন্ন রূপান্তরিত হচ্ছে বিরাট চেতনায়। অন্ন থেকে অন্নাদ— শক্তি, চৈতন্য। যা গিয়ে সরাসরি প্রাণে লাগছে। এজন্য ছান্দোগ্য উপনিষদ বলছে, প্রাণাগ্নিহোত্র। প্রাণে আগুন

জ্বালাতে হবে। আগুন জ্বালানোর অর্থ চেতনার বিকাশ। ঊষ আলো— ওষধি, যা পেলে অন্নময় সত্তা সরে প্রাণের আকাশটা আমরা পাচ্ছি। অন্নকে আশ্রয় করে জীবনধারণ করছি, বেঁচে আছি, এজন্য অন্ন সর্বৌষধ— অন্নকে ব্রহ্ম বলে উপাসনা। সকল প্রাণীর ওষধি অন্ন। অন্ন ভক্ষণ করে প্রাণ ধারণ যেমন হচ্ছে তেমন অন্ন অর্থাৎ কিনা চেতনা, জ্ঞান— আধ্যাত্মিক অধ্যয়নদি করে আমরা জীব থেকে শিব, জড় থেকে চেতনে চলে যাচ্ছি। এও আমাদের দেহের ওষধি। দুইভাবে আমাদের দেহে অন্নের আত্তীকরণ হচ্ছে। চেতনা খুলছে। ব্রহ্ম বা পরমাত্মার ভাবনা ঘিরে ধরছে আমাদের। অন্তর্মুখী দশাতে এভাবে অন্তরপুরুষের ব্যাপ্তি ঘটছে আমাদের মধ্যে।

অন্নময় ভাবনাটা হল আমাদের স্থূল চেতনার ভাবনা। যখন সে ভাবনা সরে প্রাণময় হতে শুরু করল, তখনও দেহ আছে যেহেতু তা থেকে নানান সব বাসনারও প্রকাশ হচ্ছে! প্রাণ সরে যখন মনোময়, বিচারবুদ্ধি কাজ করছে! ভাল বুদ্ধি, খারাপ বুদ্ধি, সব এই স্তরে বর্তমান। দুটোকে আলাদা না করে সমজ্ঞান করতে হবে। অর্থাৎ জীবনের আনন্দ - দুঃখ, ভালো-মন্দ— সবেতে এক মনের অবস্থা, একই মনোভাব পোষণ! এটা যখন গুরুর কাছ থেকে পাওয়া শ্রুতবিদ্যা ও শাস্ত্রীয় অধ্যয়নাদি দিয়ে আমরা উপলব্ধি করতে পারব, মনের যখন সত্যি এই অবস্থাটা হবে, বিজ্ঞানময় সত্তা জেগে উঠছে এটা বুঝতে হবে। সেখান হতে আনন্দের উন্মেষ। এই আনন্দ বিষয়সংস্পর্শ -জনিত আনন্দ কিন্তু নয়। এই আনন্দ অমৃতভূমিতে পৌঁছে যাওয়ার আনন্দ। ওখানে পৌঁছতে পারলে বিষয়ানন্দে ব্রহ্মানন্দ লেগে যাবে। চেতনা তখন রসাপ্লুত। আনন্দ থেকে সুখ উথলে উঠছে। এই আনন্দময় পুরুষের ভিতর সচ্ছিদানন্দ ব্রহ্ম, পরমেশ্বর, ইষ্ট, সব এক হয়ে রসাপ্লুতি ঘটে আনন্দ তখন রূপ বদলে সহজানন্দে স্থিতি পাবে। এই স্থিতির সঙ্গে আমাদের ব্রহ্মের সত্তা জড়িয়ে আছে। একে বুঝতে হলে অন্তরাবৃত্তির পথে যেতে হবে। শুরু করতে

হবে দেহ নিয়ে অন্নময় পুরুষ দিয়ে। তারপর অভ্যাস ও অধ্যয়ন করে করে ভিতরে ঢোকা— প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময়। শেষমেষ আনন্দময়। এই যাত্রাটাকে আচার্য গুরুরা বলছেন অন্তরাবৃত্তির পথ। এ পথ দিয়ে গেলে অন্তরাত্মাকে চট করে খুঁজে পাওয়া সম্ভব। কঠোপনিষদে এর সহজপন্থাটা রয়েছে। কঠোপনিষদ বলছে, আবৃত্তচক্ষুর কথা। অর্থাৎ চোখ বন্ধ করে দেহকে নিশ্চল করে বসাটা অভ্যাস করতে হবে। অধ্যয়ন করে, পড়ে, আচার্য গুরুর কাছে বুঝে সমস্ত পন্থাগুলো আমরা জেনে ফেলেছি। এবার অভ্যাস করব রোজ। কঠোপনিষদ বলছে, সমস্ত জেনেছি বলে আমরা বিবেকপুরুষ হয়ে গেছি। ধীর একটা ভাব এসছে আমাদের মধ্যে। আমরা এবার অমৃতের অভিলাষী হতে চোখ দুটো বন্ধ করে দেব। চোখ বন্ধ করে অন্তর্মুখী হয়ে যাব। অন্তর্মুখী হতে পারলে আমরা প্রত্যগত্মাকে দর্শন করতে পারব। অর্থাৎ নিজের ভিতর মোড় ফিরিয়ে নিয়ে সাধন নিশ্চলতার ভিতর ব্রহ্মসত্তাটাকে উপলব্ধি করতে পারব, ব্রহ্মের আনন্দময় দশাপ্রাপ্তি থেকে রসঘন চিদানন্দময় রূপটাকেও দেখতে পারব। বলতে পারব তখন, শিবোহমশিবোহম ওখানে অমৃত ঝরছে। কঠোপনিষদ বলছে তাই, কশ্চিত ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমঐক্ষত আবৃত্তচক্ষুঃ অমৃতত্বমিচ্ছন।

দৃষ্টিতে সৃষ্টি হচ্ছে। চেয়ে আমাদেরকে দেখতে হচ্ছে। দেখতে গেলে তখন আমরা আবার দেখতে পাচ্ছি দেহের পুরুষ হল সৎ, চিৎ ও আনন্দ। ইচ্ছা, জ্ঞান-অধ্যয়ন আর ক্রিয়া তপঃ-তপস্যা-সাধনা দিয়ে আমরা ঈক্ষা করছি। দৃষ্টির ভিতর সৃষ্টি করে নিচ্ছি। সৃষ্টি যখন হচ্ছে তখন পুরুষের ভিতর প্রকৃতির সত্তা জেগে যাচ্ছে। ইচ্ছা যখন জাগছে সাধনা-তপস্যা করার তখন সেটাও কাম। তপস্যা-সাধনা করতে জ্ঞান চাই— দেহজ্ঞান, শাস্ত্রজ্ঞান দুটোই দরকার সাধনা করতে গেলে আর দরকার একজন সদগুরু। এগুলো পেয়ে গেলে অভ্যাস— সাধনা শুরু, ক্রিয়া তপঃ। যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ— যখন

জ্ঞান আসছে তখন তপস্যার শুরু হচ্ছে। তপস্যামগ্ন হয়ে বুঝছি যে দেহটা পুরুষ ঠিকই কিন্তু ওর ভিতর সৃষ্টি হচ্ছে যে শক্তির ক্রিয়া তাকে এবার কী বলব! তন্ত্র দেহের এই সত্তাটাকে বলছে তখন প্রকৃতি। বৈদিক আচার্য ঋষিদের ব্রহ্মতত্ত্ব এভাবে দুটো ভাগে তখন ভাগ হয়ে গেল। আর যাঁরা এই ভাগটা করলেন তাঁরা হলেন তান্ত্রিক তন্ত্রগুরু। বেদ থেকে তন্ত্রের ধারাটা এভাবে আদতে নিষ্পন্ন হয়েছে। তপঃ করে তপস্যা করে সবকিছু সৃষ্টি করতে হবে। বুঝতে হবে অনুভব করতে হবে দেহের পুরুষতত্ত্বে উপ্ত হয়ে আছে প্রকৃতি প্রকৃতিতত্ত্ব। সেটাকে আস্বাদন করতে পারাটা হল গিয়ে সাধনা। আনন্দময় কোষ পেরিয়ে আনন্দের উপলব্ধি। আনন্দ এজন্য রতি। কেননা আনন্দের ভিতর রয়েছে প্রকৃতিতত্ত্ব। এটা শুধুমাত্র তন্ত্রের দর্শন কিন্তু নয়। বৈষ্ণবরাও একই কথাটা বলেছেন— আনন্দ রতি। সাধন অনুভূত রস ও আনন্দভূত পুরুষ ও প্রকৃতি। আচার্য বৈষ্ণব, আনন্দময় পুরুষ প্রকৃতির সত্তায় আনন্দকে সম্ভোগ করছেন। বৈষ্ণব দর্শনে রসতত্ত্ব এভাবে নিষ্পন্ন হয়েছে। প্রকৃতিময়ী রাধিকাকে আস্বাদন করছেন আচার্য গোঁসাই। রাধিকা রাধারানি হচ্ছেন বৈষ্ণবদের আনন্দতত্ত্ব। আনন্দময় দশার উপরে গেলে রস পাওয়া যাবে। পুরুষের রস। রস আস্বাদন করে সাধক পুরুষ বৈদিক সাধনায়, তন্ত্রে ও বৈষ্ণব ভাবধারায় রসিক হচ্ছেন। পুরুষের ছোঁয়া পেয়ে রস আনন্দী হচ্ছে, প্রকৃতি হচ্ছে। তান্ত্রিকেরা এই দশাপ্রাপ্তিকে বলছেন ব্রহ্মময়ী মায়ের দর্শন, বৈষ্ণব গোঁসাই বলছেন দেহস্থ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ রাধারানিকে আস্বাদন করছেন। যত তুমি আনন্দ পাবে তত রস লাভ করবে। রস সবখানে ছড়িয়ে রয়েছে— পুরুষ থেকে প্রকৃতিতত্ত্বে। বেদ থেকে তন্ত্রে। শ্রীকৃষ্ণ রস আস্বাদন করে হয়েছেন রসিকশেখর। আনন্দ থেকে রস আসছে। আনন্দের সম্ভোগ করতে হবে সেজন্য দিব্যমন দিয়ে। তার জন্য অধ্যয়ন ও গুরুকরণ। কর্মপ্রসূত শক্তির আধারে না গেলে সাধনা হবে না। সাধনা করলে পরিণাম আসবে,

হিতা থেকে হিত— পুরুষ থেকে প্রকৃতির। আপ্লুত হতে হবে এভাবে। আনন্দের রসে আপ্লুত হতে পারলে সমস্তটা বোঝা যাবে তখন। আনন্দ ঘিরে প্রজ্ঞা, প্রজ্ঞানমএব আপ্লুয়াত।

দেবতার প্রকাশ

বারুণী শূন্যতায়

দেবতার দেখা আমরা তিনভাবে পেতে পারি। মনের জ্যোতিতে, প্রাণের শক্তিতে আর দেহের তপস্ক্রিয়ায়। সকলের মনের ভিতর শিব রয়েছেন অগোচরে। শিব হলেন আমাদের মনের সাক্ষী। কালী মনের ভাঙা-গড়া। মনের মধ্যে আমাদের কত কত সৃষ্টি-প্রলয়!

ভাঙা-গড়ার খেলা চলছে মনের ভিতর। সম্পর্ক ভাঙছে, সময় ভাঙছে, সংসার ভাঙছে আর বয়সটা ক্রমশ বাড়ছে ফলত দেহটাও যে ভাঙছে। এত এত ভাঙা-গড়াটা দেহের সূক্ষ্ম ধাঁচা নিয়ে যদি রোজ দেখাটা আমরা কিছু সময় ধরে অভ্যাস করি, মন অক্রিয় হয়ে পড়বে— কোনওরকম কোনও কাজ করবে না সেই সময়। মন তখন সাক্ষী ও দ্রষ্টা। ভাঙা-গড়া দেখছে সে। যখন সে এগুলো দেখতে পাচ্ছে আর দৃশ্যগত অভ্যাস থেকে কামনা কমানোর অভীপ্সাগুলো কিছু সময়ের জন্য বন্ধ করে ফেলেছে, শিবকে আশ্রয় করেছে মন।

শূন্য মৃতবৎ মনে কোনও বিকার উঠতে পারে না। সেই মনটা কেবল দেখতে পারে— দ্রষ্টা ও সাক্ষী হতে পারে। মনের তখন আর দেখা ছাড়া কোনও কাজ থাকে না। মন অক্রিয় হয়ে পড়ে। মন দেখতে থাকে নানান সব ভাঙা-গড়ার খেলা। মনে তখন সৃষ্টি ও প্রলয়। একটা একটা করে তরঙ্গ উঠছে আর মিলিয়ে যাচ্ছে। শিববৎ শূন্য মনে তখন আর মনোরথ নেই।

মনোরথ মানে বাসনা। মন জেগে আছে কিন্তু কাজ করছে না বলে বাসনার উদ্রেক হচ্ছে না। এটা সূক্ষ্ম মনের দশা। বাসনাগুলোর নিষ্পত্তি হয়

সূক্ষ্ম মনে এলে। সূক্ষ্ম মন অক্রিয়— কোনও কাজ করে না। সে শুধু দেখে। দ্রষ্টা ও সাক্ষী সে।

রোজ আসনে বসে ভাঙা-গড়াগুলো দেখতে দেখতে একসময় সূক্ষ্ম মনের ভেতর শিবদশা জেগে ওঠে। শিব যখন নিত্য, কালী ত্রিগুণাত্মিকা, লীলাময়ী। শিবকে আশ্রয় করে তাঁর ভাঙা - গড়ার খেলা।

সূক্ষ্ম মন যখন ভাঙতে শুরু করে, সেখানে সম্পর্ক নেই, সময় নেই, সংসার নেই। স্থূল দেহটা নেই— বয়সের ছাপ পড়বে বা কী করে সূক্ষ্ম মনের ভাঙা-গড়ায়? সূক্ষ্ম মন তখন ভাঙছে, ভাঙতে ভাঙতে একটা শূন্যতারও দেখা পাচ্ছে। একে আমরা বলছি বারুণী শূন্যতা।

বরুণ হল বায়ু। দেহের মধ্যে বায়ু আছে, বাইরেও আছে। দেহের মধ্যেকার বায়ু নিয়ে যখন আমরা ভাবছি, অধ্যাত্মবাদের দৃষ্টি তৈরি করে নিচ্ছি নিজেরা। এই দৃষ্টি যখন তৈরি হয়ে উঠল আর বায়ু নেই দেহের ভিতর। বায়ু তখন প্রাণে রূপান্তরিত।

প্রাণপ্রবাহটি বুঝব আমরা এবার সূক্ষ্ম মন দিয়ে।

আসনে বসে বসে রোজ নির্দিষ্ট সময় মেনে অনেকক্ষণ ধরে নিজের শ্বাস-প্রশ্বাসের ধ্বনিটা কেবল শুনব। মন তখন অক্রিয়, দৃষ্টা ও সাক্ষী বলে সেখানে নিজের শ্বাস-প্রশ্বাসের ধ্বনি শিববৎ শূন্য হয়ে পড়ে আপনে থেকে একটা জ্যোতি তৈরি করে নেবে। ওই জ্যোতিতে আমাদের আরাধ্যা মা কিংবা যাঁর যাঁর ইষ্টের প্রকাশ।

সূক্ষ্ম মনও তখন আর নেই, প্রাণের শক্তি— শ্বাস-প্রশ্বাসে ধ্যান যখন, দেহে তাপের সৃষ্টি হচ্ছে। শ্বাসে প্রাণ আসছে, ছেড়েও যাচ্ছে। এমন অভ্যাসযোগে দেহে তপস্ক্রিয়ায় সৃষ্টি হচ্ছে। তারই ভিতর মায়ের ত্রিগুণাত্মিকা শক্তিটিকে তখন আমরা ঠিক অনুধাবন করতে পারছি। এই কাজটি যখন আমরা করতে শিখব, সেটা সাধনকর্ম হয়ে উঠবে।

সাধনা দু-ভাবে করা চলে— যজ্ঞ আর ভাবনায়। যজ্ঞ হল পুজো অনুষ্ঠান। এটা বাইরের— বাহ্যিক তন্ত্র বলে আমরা চিহ্নিত করি একে। আর আসনে বসে বসে রোজ নির্দিষ্ট কিছু সময় ধরে মনের রূপগত ভাবনাগুলোকে আমরা বলি দৃষ্টির বিধান। এটাই আন্তর তন্ত্রের কাজ।

যজ্ঞ অর্থাৎ পুজো অনুষ্ঠান দু'রকমের হয়। দেবযজ্ঞ আর মনুষ্যযজ্ঞ। দেবযজ্ঞের মাধ্যমে পরমপুরুষ, ব্রহ্ম, মা— যাকে আমরা আরাধ্য করি না কেন, তিনি নেমে আসছেন দেহের ভিতর — জ্যোতিতে, প্রাণে আর তপস্ক্রিয়ায়। মনুষ্যযজ্ঞ অর্থাৎ আমাদের পুজো অনুষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে সেই ঊর্ধ্বমুখী প্রেষণা।

পুজো অনুষ্ঠান হোম যজ্ঞ করতে নানা ধরনের কৃচ্ছ্রসাধনা করতে হয়। হোমের আগে স্নান করতে হবে, অন্তর শুদ্ধিটাও বিশেষ প্রয়োজন। ধৌতিকরণও অত্যন্ত জরুরি। হোমকারীকে সকল প্রকার দুর্গন্ধ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে হবে। কারণ দেবতারা গন্ধ দ্বারা ভোজন করে থাকেন। এই জন্য ভোগের দ্রব্যের ঘ্রাণ দেবতাকে উৎসর্গ করার আগে নিতে নেই।

হোমের শেষে অগ্নিতে নারকেল ছুঁড়ে দিতে হয়। নারকেল আমাদের মাথার প্রতীক। নারকেল জলপূর্ণ আর মাথা রক্তপূর্ণ। মাথার ঘিলুর মতো নারকেলের মধ্যেও শ্বেত পদার্থ, শ্বাস আছে। স্নায়ুর যেরকম ক্ষরণ হয় তেমন নারকেলের ভিতর থেকে ক্ষরণ হয় বলে যজ্ঞাগ্নিতে নারকেল ছুঁড়ে দিয়ে আমাদের চিৎসত্তাকে আমরা চৈতন্যসত্তায় পরিণত করার প্রক্রিয়াটি রাখি। এভাবে বাহ্যিক থেকে আন্তর ক্রিয়ার ভিতর আমরা ঢুকতে থাকি।

আমাদের মনকে পুজো অনুষ্ঠান দিয়ে সেই আন্তরে শেষমেষ নিয়ে যেতে হবে। মন সেখানে পৌঁছতে পারলে দিব্যসত্তার প্রাপ্তি ঘটবে। তা নিয়ে আমরা দেবতার প্রকাশের দিকে ক্রমশ ক্রমশ এগিয়ে যেতে পারব মনের জ্যোতিতে, প্রাণের শক্তিতে আর দেহের তপস্ক্রিয়ায়।

মায়ের চেতনায়

মস্তিষ্ক, হৃদয় আর নাভি তিন নিয়ে এগোতে হবে আমাদের মায়ের চেতনায়। সাধনা ও অধ্যাত্মবাদে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থান হল মস্তিষ্ক। মস্তিষ্কেই শক্তিচেতনার যে উপলব্ধ জ্ঞান, তা সঞ্চারিত হয়। এরপর সঞ্চারিত বোধ নীচে নেমে আসে। কণ্ঠ চক্র থেকে হৃদয় চক্রে ভাবরূপে অবতরণ করেন চেতনময়ী দেবী। ভাব যখন আরও নীচে নেমে এসে নাভিতে সঞ্চারিত হয়, শক্তিরূপ ধারণ করার প্রক্রিয়াটি যথাযথভাবে সম্পন্ন হয়। নাভি চক্রে শক্তিময়ী দেবীর যতক্ষণ অধিষ্ঠান, আনন্দেন্দ্রিয়ের ততক্ষণ সৃজন। মস্তিষ্কের জ্ঞান হৃদয়ে ভাব তুলছে, ভাব আনন্দেন্দ্রিয়— শক্তিরূপ ধারণ করে নাভি চক্রে সক্রিয় হচ্ছে। এমত দশা হলে বুঝতে হবে দেহ চলছে, সাধন ক্রিয়া শুরু হয়েছে। নাভি চক্রে স্থিত শক্তি নিয়ে আমাদের মায়ের কাজ করতে হবে। একে তন্ত্র বলছে করণ। সাধনার প্রধান চারটি স্তর— জ্ঞান, ভাব, শক্তি আর কর্ম। সাধনা মানে সৃষ্টি। সৃষ্টি যখন মহাসৃষ্টির ভিতর যাবে, মায়ের দেখা আমরা পেয়ে যাব। মাকে দেখতে গেলে সবার আগে হৃদয় চক্রকে সক্রিয় করতে হবে আমাদের। হৃদয়েই ভাবের অবতরণ হয়। মস্তিষ্কের জ্ঞানচেতনার ভাবরূপে অবতরণ হয় হৃদয়ে। এজন্য সাধনার ক্ষেত্রে প্রধান জায়গা হৃদয়, হৃদয়ে তান্ত্রিকী চক্রের কল্পনাটি এই কারণেই।

ভাব হল আনন্দেন্দ্রিয়। আনন্দেন্দ্রিয় সজাগ হলে দেহের মধ্যেকার পাঁচটি ইন্দ্রিয় নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। আনন্দেন্দ্রিয় সজাগ থাকলেই নাভিতে চেতনময়ীর উপলব্ধিটি বলবৎ হতে পারে। নাভি এজন্য সাধনাতে হৃদয়ের সমগোত্রীয় গুরুত্বপূর্ণ আরও একটি জায়গা। নাভিতেও তান্ত্রিকী চক্র রয়েছে। নাভিতে শক্তির ক্রিয়া রাখতে না পারলে শক্তি যখন ঊর্ধ্বমুখীন দশার ভিতর চলবে, তখন তার থেকে হৃদয় চক্রে ভাব সৃষ্টি হবে না। ভাব যদি বলিষ্ঠ, পাকাপোক্ত না হয়, সাধনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা মস্তিষ্কে গিয়ে জ্ঞানের

সঞ্চারণ ক্রিয়াটি তো করবে না। চেতনময়ীর জ্ঞান সৃষ্টি হলে পর মহাসৃষ্টির ভিতর অবতরণ করতে আমরা সক্ষম হব।

মা হলেন জ্ঞানক্রিয়াময়ী। আমাদের মস্তিষ্কে রয়েছে জ্ঞানের ধারা। এজন্য মায়ের সাধনায় সবচেয়ে দুইখানি তান্ত্রিকী চক্রের সঙ্গে মস্তিষ্কটি জড়িয়ে আছে। সাধনা হল মাথার কাজ। হৃদয় চক্রের ভাবকে ঊর্ধ্বমুখীন করতে শিখলে মস্তিষ্ক জ্ঞানের কর্মটি করতে শিখবে। সাধনা করতে হলে জ্ঞান গুরুত্বপূর্ণ বলে তান্ত্রিকী জ্ঞান চক্রের কল্পনা যেমন করা হচ্ছে মস্তিকে, তেমনই মস্তক সংলগ্ন এলাকার ভিতর রয়েছে জ্ঞান নেত্র। বাহ্য নেত্র, স্থূল চোখ যতক্ষণ ক্রিয়াশীল, জ্ঞান নেত্র দিয়ে কিচ্ছু দেখা যাবে না। মায়ের সাধনাতে জ্ঞান নেত্রকে আগে জাগাতে হবে। মস্তিষ্কে যখন হৃদয় চক্রের ভাব উঠাতে পারাটা আমরা শিখে ফেলব, তখন জ্ঞান আপনে থেকে কাজ করতে শুরু করে দেবে। জ্ঞান আর কর্মের তখন আর আলাদা করে কিছু পার্থক্য থাকবে না। যখন এমত দশা হবে আমাদের, সেটি হবে অদ্বয় দশা। ভিতর-বাইরের আর কোনওরকম কোনও পার্থক্য নেই। সব তখন এক। এভাবে যদি দেখার চোখটি তৈরি হয়ে যায় আমাদের ভিতর, তখন বুঝতে হবে বাহ্য নেত্র আপনা হতে তার পাতা বন্ধ করতে শুরু করেছে। তখন সমস্ত এক। অদ্বয় দশা চলছে আমাদের। কী বা কালী কী বা কৃষ্ণ, কে বৈষ্ণব কে বা শাক্ত-শৈব— সমস্ত দেবদেবী, সম্প্রদায়ে সমজ্ঞান যখন আসছে মনের ভিতর, বুঝতে হবে জ্ঞান নেত্র পাতা খোলা শুরু করেছে। দেবদেবী, সম্প্রদায়, সকল আচার্য গুরুদের মিলিত ভাবধারা যখন মনে হবে যে তাঁকে খোঁজার দিচ্ছে ধাবিত হচ্ছে, জ্ঞান নেত্র পাতা খোলা শুরু করে দিয়েছে। ওটাই মায়ের তৃতীয় নয়ন। সাধনা করতে গেলে এই নয়নে স্থিত হয়ে সবকিছু আমাদের দেখতে হবে। এভাবে যখন দেখাটা আমরা শিখে যাব, বুঝতে হবে আন্তর সাধনা শুরু হয়ে গেছে আমাদের। এতদিন ছিল সাধনার

বাহ্যিক দশা। দৃষ্টিতে ছিল দ্বৈত ভাবনা। কালী আলাদা, কৃষ্ণ আলাদা, শিব আলাদা, বৈষ্ণব আলাদা, শাক্ত আলাদা— এইসব করে কাটিয়ে গেছি। যখন আন্তর দৃষ্টি পেলাম মস্তিক, হৃদয় আর নাভিকে সক্রিয় করে, তখন আমাদের মধ্যে উন্মনী শক্তির আবির্ভাব হল। সব জায়গাতেই তখন এক দর্শন হচ্ছে। যাঁর যাঁর আরাধ্য ইষ্টকে আমরা যখন সবখানে দেখতে পাচ্ছি— শ্যামের ভিতর শ্যামা আর শ্যামার ভিতর শ্যাম, যখন এ বোধটি আসছে বুঝতে হবে মস্তিক, হৃদয় আর নাভির সাধনা থেকে আমাদের ভেতর সর্বত্র এক দেখার প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হয়েছে। যখন সব এক হয়ে গেল আমাদের, তখন মা হলেন পরাশক্তি— সমগ্র সৃষ্টির মূলে দাঁড়িয়ে আছেন তিনিই। এই পরাশক্তি শ্রীভগবানের স্বরূপভূতা শক্তি। শ্রীভগবান যেমন সচ্ছিদানন্দময়, তেমনি তাঁর শক্তিও সচ্ছিদানন্দময়ী। স্বরূপত এক ও অভিন্ন।

অদ্বয় বোধ দিয়ে অব্যক্ত ও নিরাকরের দিকে আমাদের এগোতে হবে। এভাবে যেতে পারলেই দেহের সর্বত্র সমভাবে চৈতন্যসত্তাটি ফুটে উঠবে। মস্তিক, হৃদয় আর নাভির ক্রিয়াতে অভিব্যক্তিগুলোকে ঠিক ঠিক তখনই আমরা কেবল ধরতে পারব। বুঝতে শিখব দেহের ওই তিনখানি প্রধান স্থল দিয়ে শক্তির স্ফূরণ নিরন্তর হয়ে চলছে, তার দ্বারাই দেহের যাবতীয় কাজগুলো হচ্ছে। জ্ঞান, ভাব, শক্তি সব রয়েছে আমাদের দেহের ভেতর। দেহটাকে সবার আগে জাগাতে হবে। দেহ জাগলে জ্ঞান, ভাব, শক্তি কাজ করবে। দ্বৈত, অদ্বয় নিয়ে তখন আর ভাবনা থাকবে না কোনও। কেননা ওগুলো সব তখন আর জ্ঞান নেত্র দিয়ে ধরা পড়বে না আমাদের। ওগুলো সব অজ্ঞান নেত্রের কাজ। এই কাজগুলো যদি কারও থেকে থাকে, বুঝতে হবে অদ্বয় জগতে তিনি প্রবেশই করেননি। তিনি কীভাবে আর আমাকেও পথ দেখাতে পারবেন?

মাতৃযোগ

নির্জনে, একান্তে যেতেই হবে আমাদের। না হলে ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধিকে নিজের ভিতরে ঢুকিয়ে শান্ত হয়ে বসার অভ্যাস গড়ে উঠবে না। সাধনার প্রথম শর্ত হল গিয়ে অভ্যাস। নিজের ইন্দ্রিয়-মন -বুদ্ধিকে আটকাতে হবে, নিরোধ করতে হবে, সংরোধে যেতে হবে— এটাই হল গিয়ে সাধনা, এটাই যোগ। মাতৃযোগে যেতে হলে সবার আগে নির্জনে, একান্তে মায়ের সঙ্গে থাকাটা অভ্যাস করতে হবে আমাদের। ইন্দ্রিয়কে দমন করতে হবে। অষ্টাঙ্গ যোগের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দম। দম হল বহিরিন্দ্রিয়ের দমন। ইন্দ্রিয় দু'ধরনের। অন্তরিন্দ্রিয় আর বহিরিন্দ্রিয়। দেহের প্রত্যঙ্গ আমাদের চোখ - কান এগুলো সব অবিরত বাইরে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মাতৃযোগে যেতে হলে চোখ, কানকে সবার আগে থামানো দরকার। আটকে ফেলতে হবে, দমন করতে হবে চোখের স্থূল দেখা ও কানে জাগতিক সুখদুঃখের আওয়াজগুলোকে মনের ভিতর নিয়ে। একেই বলা হচ্ছে বহিরিন্দ্রিয়ের দমন। বহির্মুখী মনকে যখন অন্তর্মুখী করে তোলা গেল তখন মাতৃযোগের আসনে বসে অন্তরিন্দ্রিয়কে এবার আটকাতে হবে। মাতৃসাধনার শুরু হবে অন্তরিন্দ্রিয় থেকে। নির্জনে, একান্তে থাকতে শেখার অভ্যাস করতে শুরু করে দিলে বহিরিন্দ্রিয় আপনেই দমন হয়ে যাবে। তারপর মাতৃযোগের শুরুয়াত।

শুরুতে আসনে বসে অন্তরিন্দ্রিয়কে আটকাতে হবে। একে বলা হচ্ছে শম। আটকাতে হবে আমাদের জাগতিক সুখদুঃখের গতিকে, বিষয় বাসনাকে, চাওয়া পাওয়াগুলোকে। এগুলোকে যদি মাতৃযোগে বসে থামাতে পারি তখন দেহের ভিতরকার স্থিতি একটু একটু করে উপলব্ধি করতে পারব। এভাবে আসনে বসে নির্দিষ্ট একটা সুবিধামতো সময়ে মাতৃযোগ অভ্যাস করতে করতেই স্বরূপে অবস্থান করা আমরা অনায়াসে শিখে ফেলতে পারব। স্বরূপে যখন আমাদের অবস্থান, ইন্দ্রিয়ানুভূতি, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়গুলো নিশ্চল হয়ে আসবে। এই দশাপ্রাপ্তিটিকে বলা হয় চিত্তনিরোধ, মনটাকে পুরোপুরি

আটকে ফেলা, আয়ত্তে নিয়ে আসা, নিরুদ্ধ করে ফেলা। মাতৃযোগে এমন অভ্যাস হয়ে গেলে তখন আসনে বসে আনন্দময়ীর আনন্দরসকে আমরা অনুভব করতে পারব। এটা খুব একটা কঠিন কাজ নয়। শুধু নির্দিষ্ট সময় ধরে বেশ অনেকক্ষণ আসনে বসা আমাদের অভ্যাস করতে হবে। বহিরিন্দ্রিয় আর অন্তরিন্দ্রিয় - দুটোই যখন পুরোপুরি নিরোধ হল, কব্জাতে চলে এল তখনই মাতৃযোগে ব্রহ্মময়ী মায়ের প্রতি আমাদের সমর্পণ বেড়ে গেল।

মাতৃযোগ অভ্যাস করতে বসলেই বুঝতে পারব ব্রহ্মময়ী মা আমাদের ভিতর দিকে খালি যেন টানছেন। আসনে বসে তখন মনে হবে চোখ আছে কিন্তু দেখতে পাচ্ছি না, কান আছে কিন্তু কোনও বাইরের আওয়াজ আর পাচ্ছি না, বাক কথা বলার শক্তি নেই— অর্ধচৈতন্য একটা দশাতে আছি মাতৃযোগে বসে। এর ভিতর তখন আনন্দময়ী মায়ের প্রতি সমর্পণ ক্রমশ যেন বেড়ে চলছে রোজ। গতকাল মাতৃযোগে আধঘণ্টা ছিলাম, আজ পঞ্চাশ - পঞ্চান্ন মিনিট পেরিয়ে যাওয়ার পর যেন বাহ্যচৈতন্যের প্রকাশ দেখতে পেলাম। মাতৃযোগ অভ্যাস করতে বসে এমন ধারা হলে বুঝতে হবে মনকে আমরা বুদ্ধিতে পরিণত করে ফেলেছি এখন। চোখ, কান আমাদের বহিরিন্দ্রিয় আর অন্তরিন্দ্রিয় মন যখন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণাধীন হল মাতৃযোগে তখন স্থূল থেকে সূক্ষ্মে চলছি আমরা। মন সরে বুদ্ধির প্রকাশ ঘটছে। এত সময় ধরে মাতৃযোগ করতে বসে মনকে শাসন করছিলাম আমরা, এবার মায়ের সঙ্গে সংযোগ করতে বসে বুদ্ধিকে আলোকপ্রাপ্ত করে নেব। বুদ্ধির ভিতর মায়ের আলোর প্রকাশ দেখতে হবে আসনে বসে বসে। দেখতে দেখতে মায়ের বীজমন্ত্রকে এইবার কাজে লাগাতে হবে আমাদের। না হলে মাতৃযোগ সম্পন্ন করতে পারব না। আর যোগ থেকে মায়ের সঙ্গে একাত্মতা আসবে না। নির্জনে, একান্তে মাতৃযোগের অভ্যাস যত বাড়াতে পারব ততই মায়ের সঙ্গে সময় কাটাতে পারব বেশি। দম, শমের সাধন অভ্যাস করে

একটা স্থিতি পাওয়া গেল শরীরের, একে বৈদান্তিকরা বলছেন ব্রাহ্মীস্থিতি, আমরা বলব অনাহত চক্র বা হৃদয় চক্রে মায়ের প্রতিষ্ঠা। রোজ এভাবে মাতৃযোগে সবার আগে ইন্দ্রিয়গুলোকে গুটিয়ে ফেলে মাকে প্রতিষ্ঠা দিতে হবে। আর প্রতিষ্ঠার মন্ত্রই হল বীজ।

মায়ের বীজ জপ করতে হবে শ্বাস প্রশ্বাসে। শ্বাসের সঙ্গে বীজমন্ত্রকে মেলাতেই হবে। ভাবতে হবে বীজমন্ত্র শুধু কতকগুলো অক্ষর নয়, বীজের ভিতর রয়েছে শক্তি। গুরুদেব অক্ষরে শক্তি সঞ্চার করেই আমাকে বীজমন্ত্র দিয়েছেন। বিরামশূন্য শ্বাসে শ্বাসে মায়ের বীজ যখন মাতৃযোগে বসে জপ করতে পারাটা আমাদের অভ্যাস হয়ে দাঁড়াবে তখনই শক্তির সঞ্চারটি ধরতে পারব। মাতৃযোগে বসে মায়ের বীজ দিয়ে এবার আমরা হৃদয়গ্রন্থি বা চক্রভেদটি সম্পন্ন করব। শরীরে রয়েছে আমাদের পাঁচটি কোষ আর পাঁচটি চক্র। চক্র ভেদ হলে সহস্রার। ওটাই মায়ের স্থিতি। বৈদান্তিকদের ব্রাহ্মীস্থিতির জায়গাও এটা। পাঁচ কোষ আর পাঁচটি চক্রে স্থিত আমাদের শরীরে রয়েছে তমঃ রজঃ সত্ত্বের বহিঃপ্রকাশ। অন্নময় কোষ যেটি, আদতে ওটিই মূলাধার। মাতৃযোগে অন্নময় কোষ ভেদ হলে, মূলাধারে মন গেলে পার্থিব অনাসক্তি আসবে। প্রাণময় কোষ অর্থাৎ মণিপুর চক্রে মায়ের বীজকে নিতে পারলে ইন্দ্রিয়গুলোকে সমতা দিতে পারব। ইন্দ্রিয়গুলো তো আর নষ্ট করে ফেলা সহজ কথা নয়। মাতৃযোগে বহিরিন্দ্রিয়গুলোকে কব্জা করে অন্তরিন্দ্রিয় মনকে প্রথমে তো শান্ত করে নিয়েছি। শান্ত মন নিয়ে মণিপুর চক্র বা প্রাণময় কোষে গিয়ে ইন্দ্রিয় থেকে সরেও গেলাম। এরপর মনোময় কোষ বা অনাহত বা হৃদয় চক্রে মায়ের বীজমন্ত্র শ্বাস প্রশ্বাসে ছন্দময় স্পন্দনে ফেলে দেব আমরা। আর যখনই এটা হবে নিজেকে কিছুই আর করতে হবে না। সবটাই হয়ে যাবে ভিতরে। অর্ধচৈতন্য দশার ভেতর বিজ্ঞানময় কোষ, বিশুদ্ধ চক্রে বা কন্ঠ চক্রে গিয়ে পৌঁছে গেছে তখন মায়ের বীজ। ওখানে জপ

থেকে একটা স্থিরতা পেতে শুরু করে দিয়েছে শরীর। বুঝতে পারছি বীজমন্ত্র উচ্চারণ হচ্ছে এখন মাতৃযোগে আপনা থেকেই। নিজেকে আর বলতে হচ্ছে না কিছুই। এমন দশার ভিতর আনন্দময় কোষ, আজ্ঞা চক্রে স্ফূর্তি আসতে বাধ্য। মায়ের বীজ জপ করতে করতে চিত্ত যখন উদ্বেলিত মন তখন বুদ্ধিকে ধরে ফেলল। মনের বিলয় হয়ে গেল। বুদ্ধির ওপরই মাতৃস্থান। ওটিই সহস্রার। বৈদান্তিকদের আত্মদর্শনের চরম স্থান এখানেই। তখন মন বুদ্ধি কিছু নেই। জেগে গেছে আত্মা। আত্মাই সাক্ষী হচ্ছে মাতৃদর্শনের। বীজেই মায়ের প্রকাশ। সহস্রারেই মায়ের পুজো করতে হবে এইবার। দেহটা তখন আর তেমন করে নেই, মন নিষ্ক্রিয়, বুদ্ধি তলিয়ে গেছে কখনোই! দ্রষ্টার ভূমিকাতে বসে আছি কেবল আসনে। কোনও কিছু আর করছি না। বীজ আপনে থেকে শ্বাসে প্রশ্বাসে জড়িয়ে গিয়ে একসময় স্পন্দন তোলাটাও বন্ধ করে দিয়েছে। এখন মাতৃযজ্ঞ করতে হবে আমাদের। ইন্দ্রিয়কে আহুতি দিয়ে দিয়েছি মাতৃযোগে বসে। তারপর মনকেও সমর্পণ করেছি মায়ের পায়ে। বুদ্ধিকেও সরিয়ে ফেলেছি। এমন দশা এলে মনে হবে শরীর যেন হঠাৎ হঠাৎ আছে আবার নেইও! কিছুই তখন আর নেই। সব আহুতি দিয়ে দিয়েছি। মাতৃযজ্ঞ এখানেই আমাদের সম্পন্ন। এমনি ভাবে যদি রোজ মায়ের পুজো করা যায় আচ্ছন্ন দশার ভেতর, মাতৃযোগে মাতৃদর্শন খুব একটা দূরের ব্যাপার নয়। সেদিকেই আমাদেরকে এগোতে হবে গুরুর সহায়তায়।

দশযন্ত্র

সাধনার প্রধান উদ্দেশ্য হল দর্শন আর শ্রবণ। মায়ের দেখা যেমন পেতে হবে তেমনই মায়ের কথাও শুনতে পাওয়ার ক্ষমতা তৈরি করতে হবে। ক্ষমতা হল সাধন থাক। সাধনা করে করে একটা উচ্চ জায়গায় যেতে হবে আমাদের। তবেই মাকে দেখা ও মায়ের কথা শোনার জায়গাতে গিয়ে পৌঁছনো যাবে। চোখ দিয়ে দেখি আর কান দিয়ে শুনতে পাই বলে আমরা

চোখ আর কানকে সাধনার মুখ্য প্রজ্ঞাপক হিসেবে দেখা হয়। তাঁকে দেখেছি আর তাঁর কথা শুনতে পেয়েছি— দর্শন আর শ্রবণ বিদ্যা রপ্ত করতে হবে প্রথমে। চক্ষু আর শ্রোত্র— চোখ আর কান সাধনার প্রজ্ঞাপক। চক্ষু আর শ্রোত্র দিয়ে মাকে আপ্যায়ন করতে হবে। তাঁকে বলতে হবে প্রার্থনায়, দূর কর তুমি অন্ধকার, চোখ দুটো ভরিয়ে দেও আলোয়।

চোখের ভিতর থাকে অগ্নিজ্যোতি। আর বাইরে সূর্যজ্যোতি। সূর্যজ্যোতি দিয়ে আমরা স্থূল পার্থিব জগতকে দেখে থাকি। মাকে দেখতে হলে অপার্থিব অনুভূতির ভিতর যেতে গেলে অগ্নিজ্যোতির ব্যবহার আমাদের শিখতে হবে। অন্তর্মুখী হলে অগ্নিজ্যোতির সন্ধান একটু একটু করে পেতে পারব আমরা, আর যত বহির্মুখী হবে আমাদের মন ততই সূর্যজ্যোতির ভিতর ঢুকতে থাকব আমরা।

সূর্যজ্যোতি দিয়ে মাকে কখনো দেখা যাবে না। দর্শনের পরই শ্রবণ। আগে চক্ষু তারপর শ্রোত্র। চোখ দিয়ে রোজ আমরা সূর্যকে দেখি— আদিত্য দেবতাকে দেখাটা এখন শিখতে হবে ভিতরের চোখ দিয়ে। অন্তরে যখন সূর্যোদয় ঘটবে, অগ্নিজ্যোতির আলো ফুটতে থাকবে ক্রমশ। আত্মচৈতন্যের বিস্ফোরণ অনুভব করতে শিখব আমরা।

মাকে অনুভব করতে করতেই একসময় হবে মাতৃদর্শন। বাইরের সূর্যজ্যোতিতে মাকে দেখা যাবে না, অর্থাৎ স্থূল চোখ দিয়ে মায়ের আলো আসবে না অন্তরে। বাইরের সূর্য— আদিত্য দেবতাকে আত্মচৈতন্যের বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ভেতরে আনতে হবে, তবে অন্তরে সূর্যোদয় হবে। আদিত্য সূর্যকে আগে বাইরে দেখেছিলাম, এখন ভেতরে দেখব। বৈদান্তিকেরা বলছেন একে, সোহমরশ্মি। আমরা বলব মায়ের আলো।

মায়ের মূর্তিখানিকে এতকাল দেখেছিলাম বাইরে— মন্দিরে, মঠে, দেবীপীঠে, এবার মূর্তি নয় স্বয়ংপ্রকাশ দেখব মায়ের নিজের অন্তরে। অন্তরে

আসবে চিন্ময় প্রত্যক্ষতা। দেখার জন্য ইন্দ্রিয়কে আপ্যায়ন করতে হবে আগে। চোখ তৈরি করতে হবে। তারপর শ্রোত্র— মায়ের কথা শুনতে পাওয়ার কৌশলীবিদ্যা শিখতে হবে গুরুর কাছে।

গুরু প্রথমে শেখাবেন অগ্নিজ্যোতির ভেতর মাকে কীভাবে দেখতে হবে সেই সাধনপ্রণালী। তারপর শ্রুতবিদ্যা। প্রথমে রূপ— মাকে দর্শন করতে হবে। রূপের পেছনে আছে নাম। কোন রূপ আমি দেখব সেই রূপকে বীজমন্ত্রে রূপান্তরিত করে নিতে হবে। নাম বা বীজমন্ত্রের আশ্রয়ে রূপের প্রকাশ ঘটাতে হবে অগ্নিজ্যোতির ভিতর। বীজমন্ত্র থেকে অক্ষরের ক্ষরণ হবে। অক্ষর গিয়ে শব্দ তুলবে। শব্দ হল বাক। বৈদান্তিকেরা বলেন, সূক্ষ্ম শ্রুতি।

বাক হল তন্ত্রের বীজমন্ত্র। বীজমন্ত্র উচ্চারণ করার প্রক্রিয়া গুরু শিখিয়ে দেন। সেইমতো মায়ের বীজ উচ্চারণ করা শেখা থাকলে বীজ থেকে অক্ষরের ক্ষরণ হতে হতে বীজরূপী মায়ের স্বরূপশক্তির প্রকাশ ঘটতে থাকবে অন্তরে। যখন প্রকাশটি অনুভব করতে পারব, বুঝে যাব অগ্নিজ্যোতির ব্যবহার আমরা শিখে গেছি। অগ্নিজ্যোতির ভিতর দিয়ে তখন বীজমন্ত্রের উচ্চারণ চলবে অন্তরে।

মায়ের বীজের ধ্বনি মনের আকাশে ছড়াবে প্রথমে, তারপর উজিয়ে ওপরে উঠবে কুণ্ডলিনী শক্তির সঙ্গে সঙ্গে। বীজ উজিয়ে ওপরে উঠে মন্ত্র থেকে উচ্চারিত ধ্বনি এইবার ফিরে আসতে থাকবে আমাদের কানে। যখন বীজমন্ত্রের ধ্বনি আমরা শুনতে পাব, বুঝতে হবে শ্রোত্র— শোনার প্রক্রিয়া রপ্ত হতে শুরু হয়ে গেছে। মায়ের বীজমন্ত্র শুনতে শুনতে একসময় মায়ের কথাও আমরা স্পষ্ট শুনতে পাব। এটাই সাধনা।

সাধনাতে দরকার দেহ আর মন। মাকে আপ্যায়ন করতে হবে প্রথমে দেহ দিয়ে। দেহের মধ্যে আছে আমাদের দশযন্ত্র। পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় আর

পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়। বাক, প্রাণ, চক্ষু, শ্রোত্র— এই চারটি ইন্দ্রিয় দিয়ে প্রথম প্রথম মায়ের সাধনা করতে হবে। ইন্দ্রিয়ের শুদ্ধি হলে প্রাণ থেকে আমরা মনের ভিতর ঢুকতে থাকব।

আমাদের ইন্দ্রিয়ের দুটো বর্গ থাকে। প্রথম বর্গে পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়। এগুলো সব স্থূল কাজ করতে করতে সূক্ষ্ম কাজের মধ্যে যখন যেতে থাকবে, জ্ঞানেন্দ্রিয়— ইন্দ্রিয়ের দ্বিতীয় বর্গ সজাগ হতে থাকবে। জ্ঞানের ভেতর প্রজ্ঞা থাকে। প্রজ্ঞাপক যখন চক্ষু আর শ্রোত্র, মায়ের সাধনা অনেকখানি এগিয়ে গেল।

বীজধ্বনি ওঠে মনে প্রজ্ঞাপক জায়গাতে পৌঁছতে পারলে। তান্ত্রিকেরা একেই বলেন, বৈখরী বাক। বীজ কথা বলছে। উজিয়ে উঠছে দেহের ওপরে। মনের ভেতর পরমব্যোমের ছন্দঃস্পন্দ তখন টের পাচ্ছি আমরা। বীজমন্ত্র দিয়ে মাকে আপ্যায়ন করছি খালি। আর কোনও কাজ নেই আমাদের। মন্ত্র থেকে তখন মাতৃকাশক্তির স্ফুরণ ঘটছে। বেশ বুঝতে পারছি সেটা। এমন দশা যখন দেহের, রূপের প্রকাশখানা আসছে ভাবস্পন্দ দিয়ে মনে।

মনই হল মায়ের সাধনার শেষ পর্যায়। মন দিয়ে মায়ের রূপ যেমন আমরা পাব, কথাও শুনতে পাব মায়ের। রূপ ফুটতে থাকবে বীজ দিয়ে। এ দশা যখন অন্দরের— অন্তরের, বুঝতে হবে মন্ত্রবীর্য ঘটে গেছে সাধন দেহটার মধ্যে। মন্ত্রবীর্য থেকে বলবীর্য আসবে। যত বীজের ধ্বনি উজিয়ে আসবে ওপর থেকে, শক্তি সঞ্চারের সামর্থ্য অর্জন করব আমরা। একে বলে বলবীর্য। বলকে এবার আপ্যায়ন করতে থাকব। যত শক্তির প্রয়োগ করতে পারব অন্তরে, মায়ের রূপ ফুটতে থাকবে। রূপ থেকে ভাব, ভাব থেকে স্তব্ধবৃত্তি। হঠাৎ করে মনের ভিতর সমস্ত কিছু থেমে যাবে। প্রচণ্ড একটা

স্থিতি। বহির্গতি, অন্তর্গতি আর কিছু নেই। স্থিতির ভিতর তখন আবারও বৈখরী বাক। মায়ের কথা শুনতে পাব আমরা।

মিথুনতত্ত্ব

মায়ের বীজ হল গিয়ে উদগীথ। মাতৃসাধনা উদগাতার, অর্থাৎ বীজমন্ত্রকে ঝংকৃত করতে হবে প্রথমে হৃদয় চক্রে। হৃদয় থেকে কণ্ঠ চক্রে যখন বীজের একটানা একটা স্বর উদগীথ হতে থাকবে, সুরের আওয়াজ শুনতে পাব আমরা। স্বর আর সুরে আশ্চর্য মিথুন হয়। দুটোর মিলন হলে পর দ্বিদল পদ্মে মায়ের বীজ এরপর ধীরে ধীরে প্রভাব ফেলতে থাকে।

স্বাভাবিক একটা প্রাণবৃত্তি আছে আমাদের। মনের দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকতে পারলে প্রাণের দেখা পাওয়া যায়। সাধনার শুরুতে মনকে ভাল করে পড়তে হবে। মন থেকে কথা ওঠে। মনই সংবেগ। মনই উড়ে চলে পাখির মতন। মনের নেপথ্যে থাকে প্রাণ। মন সরে গেলে অন্ধকার সরে যাবে ভিতরকার, তখন প্রোজ্জ্বল দিনের মহিমা নিয়ে জেগে উঠবে আমাদের প্রাণ।

মন দিয়ে সাধনা করে সব আমরা জানতেও পারব না। মন কেবল জাগ্রত জগৎকে জানে। জগতের নানান টুকরো টাকরা জ্ঞান কেবল মনের চারপাশে ছড়িয়ে থাকে। সেগুলোকে এক জায়গায় জড়ো করতে পারলে মনের ভিতর জাগ্রত একটা সুষুপ্তির দেখা পেতে পারি আমরা। তখন মন ঘুমিয়ে পড়বে আর জেগে উঠবে প্রাণ।

প্রাণের ভিতর রয়েছেন ব্রহ্মময়ী। প্রাণের ভেতর জ্বালাতে হবে অভীপ্সার আগুন। প্রাণের ভিতর থাকে অন্তর্দৃষ্টি আর মনে ছিল বহির্দৃষ্টি। মন দিয়ে আমরা আগে সবকিছু ওপর ওপর দেখেছি। দেখেছি বীজমন্ত্রে যখন নাভি চক্রের অগ্নি গিয়ে লাগল, মন চক্ষু শ্রোত্র সতর্ক হয়ে চক্ষুময় শ্রোত্রময় বাঙ্ময় হয়ে উঠল কিছুটা। মনের চোখ দেখতে পেল বীজমন্ত্রের অক্ষরগুলোকে—অক্ষর উদগীথ হল।

বীজের অক্ষরে অক্ষরে ঘষা লেগে ধ্বনি বা সুর ক্ষরিত হতে থাকল নাভি চক্রের আগুনে। একে বলা হচ্ছে অগ্নিমন্থন। শ্বাসের ক্রিয়া দিয়ে নাভি চক্রে অগ্নিমন্থন করা যেভাবে শিখিয়ে দিয়েছেন গুরু, করতে পারলে বীজের সাজুয্য দিয়ে মন চক্ষু শ্রোত্র সচেতন হয়ে পড়বে। মনে জপ করা বীজ চোখে ভেসে উঠবে আর বীজের ধ্বনি শ্রোত্র বা কানে একটু একটু করে লাগতে থাকবে।

মায়ের বীজের যখন আওয়াজ হচ্ছে, বাঙ্ময় হচ্ছে বীজ তখন প্রাণবৃত্তির ছোঁয়া পাচ্ছে আমাদের গোটা দেহ। মায়ের বীজে যখন আহুতি দেওয়া হচ্ছে মনোময় চক্ষুর্ময় শ্রোত্রময় বাঙ্ময় জায়গায় তখন প্রাণময় হিরন্ময় অমৃত উদগাতার দিকে ক্রমশ ক্রমশ এগিয়ে যেতে থাকে, অর্থাৎ বীজ থেকে ধ্বনি বের হতে থাকে আর প্রাণ খুলে যায় বলে ওখানে মায়ের স্বরূপশক্তির প্রকাশ ঘটতে থাকে। বাইরের চেতনার সঙ্গে এভাবে জুড়ে যায় আত্মচৈতন্য।

মন থেকে সরে প্রাণে গেলে আত্মচৈতন্যর ভিতর বীজধ্বনির আওয়াজ পাওয়া যায়। ধ্বনি উদগীথ হয়। ধ্বনিই রসঘন, আনন্দঘন, ধ্বনি অমৃতময়ী। ধ্বনিকে আস্বাদন করতে পারার প্রণালী শিখতে পারলে সুরের আবেদন হৃদয় চক্রে অনুভব করা যাবে। অগ্নিমন্থনে এভাবে হয় বাক বা বীজের স্ফুরণ।

বাক বা বীজ অনুধাবন করতে হয় প্রথমে মন দিয়ে তারপর চক্ষু ও শোত্রে গিয়ে আওয়াজ ওঠে, বৈখরী বাক হয়ে ওঠে বীজ। মনে স্পন্দময় যখন বীজ, সেটা পরা। বীজ বা বাককে যখন দেখতে পাচ্ছি আমার মনে, সেটা পশ্যন্তী। একে বলা হচ্ছে বীজরূপে চিন্ময়ীর দর্শন। দেখতে পারলে শুনতেও পাওয়া যাবে বীজ বা বাক। তখন সেটা মধ্যমা। শোনা ও দেখা এক হয়ে যখন বীজের আওয়াজ আসছে মন থেকে প্রাণে তখন বৈখরী বাক বা মায়ের বীজ জেগে উঠবার দশা। বীজের উজান তখন, ওপরে উঠছে কেবল বীজ।

শব্দ নেই, আওয়াজ নেই আর মায়ের বীজের। শব্দব্রহ্ম একাকার হয়ে গেছে। অক্ষরের ক্ষরণ হতে হতে প্রাণব্রহ্মে গিয়ে ঠেকেছে। প্রাণে আর কোনও বীজের আওয়াজ নেই। অশব্দের শব্দায়ন তখন, বীজ বা বাক মায়ের চেতনার সঙ্গে জুড়ে গেছে। আত্মরূপায়ণের ভিতর মায়ের স্বরূপশক্তি জেগে উঠেছে। প্রাণ প্রজ্ঞায় গিয়ে মিশেছে। এই হচ্ছে গিয়ে তন্ত্রের মিথুনতত্ত্ব।

ষোড়শকলার একটা ভাবনা আছে ভারতীয় অধ্যাত্মবাদে। অত্যন্ত প্রাচীন ভাবনা। আদি ভাবনাও বলা চলে একে। বলা হচ্ছে সেখানে, ষোড়শকল পুরুষ। ব্রহ্মও ষোড়শকল। ঋকসংহিতার ভিতর এর উল্লেখ আছে। ষোড়শকল সোম দিয়ে সেখানে চন্দ্রমার অমৃততত্ত্বকে বোঝানো হয়েছে। বলা হয়েছে ষোড়শকল পুরুষ অর্থাৎ কিনা সাধক নিজে অমৃতময় পুরুষ।

চাঁদের ষোড়শাক্ষর ব্রহ্মবাচক। ব্রহ্মও ষোড়শকল। আমার ভিতর ব্রহ্মের অধিষ্ঠান। আমি অমৃতময় ষোড়শকল পুরুষ যদি হয়ে উঠি, ব্রহ্মও স্বভাবত তাই। চাঁদের পনেরো কলা বাড়া আর কমা করতে করতে যখন ষোলো কলাতে চলে যায়, সেটা অশরীর। দেহেও তেমন পনেরো কলা থাকে। ষোলো কলা যখন প্রকাশিত হয়, তা অশরীর। দেহ বলে আর কিছু নেই। ব্রহ্মময়ী, ষোড়শী জেগে আছেন!

নাদ কোটি সহস্রাণি

দৃকশক্তি

নিষ্ক্রিয় আত্মারই একমাত্র দৃকশক্তি থাকে। আত্মা যখন প্রকাশমান হয়, দেহ বিশ্রাম করে। আত্মার প্রকাশ ঘটলে দেহের ত্রিবিধ ক্রিয়াশক্তি বন্ধ হয়ে যায়। থাকে কেবল দৃকশক্তি। দৃকশক্তি কেবল চক্ষুর শক্তি নয়। চোখ থেকে যেটুকু যা আমরা দেখি, স্থূল বোধের গণ্ডির ভিতর রয়ে যায়। দেহ আর পার্থিব জীবনের সমস্ত কিছু চোখ দিয়ে দেখা যায়। চোখ ছাড়াও আরও একটি দেখার জায়গা আছে, জ্ঞানচক্ষুর উন্মোচনে। এই চোখ জাগে নিষ্ক্রিয় আত্মার ক্রিয়াতে এসে। অনেকেই বলেন একে, থার্ড আই, তৃতীয় নয়ন।

আমরা যখন চোখেমুখে জলের ঝাপটা দিই, দুই ভুরুর ঠিক ওপরে তৃতীয় নয়নের জায়গাতেও সমান ভাবে জলের ঝাপটা দিয়ে থাকেন যোগীরা। তাঁরা বলেন এতে জ্ঞানচক্ষু পরিষ্কার হয়ে ওঠে, চর্মচক্ষুর পাশাপাশি। জ্ঞানচক্ষু খুলতে গেলে সবার আগে দরকারি হল দৃষ্টি সাধন। দৃকশক্তি জাগতে পারে দৃষ্টি সাধন দিয়ে। তবে দৃষ্টি সাধন খুবই প্রাথমিক স্তরের। জ্ঞানচক্ষু উন্মীলনের জন্য আরও নিগূঢ়ী বিদ্যাদি আছে। সেগুলো করতে হলে সবার আগে দৃষ্টি সাধন করে নেওয়া দরকার। দৃষ্টি সাধনে আরও অগ্রসর হতে পারলে বহু প্রকার দর্শনাদি হয়ে থাকে। এটা হল গিয়ে দৃকশক্তির ফলাফল। দৃকশক্তি বাড়াতে দৃষ্টি সাধন দরকারি। একে বলা হয় ত্রাটক ক্রিয়া।

ত্রাটকের পাঁচটি অঙ্গ আছে। দেহের পাঁচটি প্রত্যঙ্গ স্থির রেখে ত্রাটক ক্রিয়া বা দৃষ্টি সাধন করতে হয়। এর প্রথম ধাপ হল চক্ষু স্থির। দিনের কোনও একটি নির্দিষ্ট সময় বেছে নিয়ে গুরুর ছবি, ইষ্ট কিংবা নিরাকর মতে আলোক জ্যোতির অভ্যুদয়ের ছবির ভিতর চোখকে স্থির করে নিয়ে বীজমন্ত্র

জপ করতে হবে। যাতে চোখের পলক একেবারে না পড়ে। এটা খেয়াল করতে হবে। এভাবে চেয়ে চেয়ে লক্ষ্য স্থির জপে এক সময় চোখ থেকে জল গড়িয়ে নামবে। তখন চোখ মুছে পুনরায় লক্ষ্য স্থাপন করতে হবে। এর সময় অন্তত আধ ঘণ্টা। একদিনে হবে না এটা। রোজ একটু একটু অভ্যাস করে সময়সীমা বাড়াতে হবে। এক মাস এটা করতে পারলে দৃকশক্তি বাড়ানো সম্ভবপর হবে।

বীজমন্ত্র জপের অভ্যাস দৃষ্টি সাধন করার পর করতে হবে রোজ কিছু সময় ধরে শ্বাসে প্রশ্বাসে। শ্বাসে প্রশ্বাসে জপ করতে থাকলে সুষুম্না পথ পরিস্কার হয়ে যায়। ধীরে ধীরে দৃকশক্তি বা দৃষ্টি সাধনে অর্জিত শুদ্ধ বোধাদির ঊর্ধ্বমুখীন দশাপ্রাপ্তি টের পাওয়া যায়। শ্বাস নিতে নিতে এক সময় বাইরের শ্বাসকে বন্ধ করে দিতে হয়। তখন দৃকশক্তি চলে আসে বলে এটা ধরা যায় —নাভির নীচ দিক দিয়ে একটা স্রোত সমানে আসছে। বাইরের শ্বাস যখন গ্রহণ করছি আর ছাড়ছি ওটা ছিল দেহাদির শ্বাস। শ্বাসপ্রশ্বাসে বীজমন্ত্র জপ করতে করতে এক সময় ওর ভিতর বীজধ্বনি জড়িয়ে গিয়ে উলটা গতি হয়ে যাবে দেহের। দৃকশক্তি এলে এটা ধরা পড়বে। উলটা শ্বাস তখন নাভির দিকে স্পন্দন তুলতে থাকে। শ্বাসে তখন বীজমন্ত্র জড়িয়ে গেলে বাইরের শ্বাস আপনে বন্ধ হয়ে গিয়ে নাভির শ্বাস প্রখর হয়ে গোটা দেহতে সাড়া দিতে থাকে। এই অবস্থায় অনেকক্ষণ আসনে বসে থাকলে একটু ঘুম বা তদ্রা আসতে পারে। একে বলে যোগনিদ্রা। এটা সমাধির প্রথম আভাস। এই আভাস পেতে হলে আগে দৃকশক্তিকে প্রকাশমান হতে হবে।

দৃকশক্তি প্রকাশমান হলে দেহ বিশ্রাম করে। তখন দেহের মধ্যেকার ত্রিবিধ ক্রিয়াশক্তি— ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া, প্রাণের ক্রিয়া, মনের ক্রিয়া সব বন্ধ হয়ে যায়। প্রাণের ক্রিয়া আমাদের স্বভাবসিদ্ধ। নিজের শ্বাস প্রশ্বাসে খেয়াল দিতে শুরু করলে প্রাণের ক্রিয়া আপনে থেকে হতে থাকে। প্রাণের ভিতর

তখন বীজমন্ত্রকে জড়িয়ে দিতে হয়। এটা হল জপের কৌশল। এভাবে জপ করতে করতে প্রাণের ক্রিয়াতে একসময় প্রাণ নিশ্চল হয়ে শ্বাস থেমে গিয়ে মন জেগে উঠে। এ হল গিয়ে নিরালম্ব মন। অব্যক্ত দশা। এ দশাতে জপও থেমে যাবে।

প্রাণ ক্রিয়া, মন ক্রিয়া থামলে ইন্দ্রিয়ের আর কোনও ক্রিয়া তো থাকে না। তিনটিই যখন নিষ্ক্রিয়, দৃকশক্তি জেগে ওঠে। যখন বীজমন্ত্রের জপ চলে, দেহে শক্তিতত্ত্বের উদয় হয়। শক্তি হল শব্দময়, ভাবময়, জ্ঞানময় আর অবশ্যই ক্রিয়াময়। যখন শক্তি নিষ্ক্রিয় আত্মার সঙ্গে জড়িয়ে গেল জপ থামল, দেহ থামল। জাগল কেবল দৃকশক্তি। এই শক্তি হল শিবতত্ত্ব। জপের অতীত হলে শক্তির ভিতর শিব জাগে। শক্তি ছাড়া শিব আর শিব ছাড়া শক্তি থাকতে পারে না। জপ ও অজপার ভেতর দুটো ধরা পড়ে দৃকশক্তির ভিতর। বীজমন্ত্রের জপ হল শক্তিতত্ত্ব। শক্তিতত্ত্ব নিত্য জপময়। শক্তিকে সবসময় জপ করা চলে। যখন জপ থেমে যায়, শ্বাসে জড়িয়ে নাভির স্রোতে গিয়ে লাগে, শক্তি উঠতে থাকে ওপরে। একসময় জপের অতীত শিবতত্ত্বে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে শক্তি। তখন ইড়া পিঙ্গলা নাড়ির রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। সুষুম্না পথ খুলে যায়। সব হয় দৃকশক্তির সাহায্য নিয়ে। সেজন্য সবার আগে দৃষ্টি সাধন অতীব দরকারি।

স্ব - স্বরূপ

ভক্তির সঙ্গে জড়িয়ে নেওয়া দরকার নিজের স্বরূপের অনুসন্ধান। আচার্য শঙ্কর নিজের স্বরূপ অনুসন্ধানকে ভক্তি নামে অভিহিত করেছেন, স্ব-স্বরূপ-অনুসন্ধানং ভক্তি-ইতি-অভিধীয়তে। ঈশ্বরের প্রতি প্রেম বা ভক্তি কিংবা আধ্যাত্মিককতার পথে এই যে আমাদের অনুসন্ধিৎসা সব আসলে নিজেকে জানা। নিজেকে না জানলে ঈশ্বরকে জানা কখনও সম্ভব নয়।

ভক্তিশাস্ত্রের দুই দিকপাল হলেন আচার্য নারদ ও শাণ্ডিল্য। দু'জনই ভক্তিসূত্র লিখেছেন। নারদীয় ভক্তিসূত্রে দেবর্ষি নারদ বলছেন, ঈশ্বরের প্রতি পরম যে প্রেম আমাদের, সেটা হল ভক্তি, সা তু অস্মিনপরমপ্রেমরূপা। অর্থাৎ নিঃস্বার্থ আত্মনিবেদনের কথাখানা ঘুরিয়ে বলা হচ্ছে। নিজের প্রতি যদি নিজের খোঁজ না থাকে, স্ব - স্বরূপকে আমরা যদি ধরতে না পারি তাহলে ভক্তির অনুসন্ধান করব কী করে, অর্থাৎ ভক্তি হৃদয়ে জাগ্রত হবে কী করে? ভক্তি তো ইহজাগতিক সম্পত্তি নয়, ভক্তি হল অন্তরের অন্তস্থলে সুপ্ত হয়ে থাকা সৎস্বরূপের জাগ্রতি।

নিজের স্বরূপ যদি একবার জেগে যায়, পরমাত্মা বা ঈশ্বরের খোঁজ সহজ হয়ে ওঠে। খোঁজার যে ঐকান্তিক অনুরাগ আর নিষ্ঠা সেগুলোও ভক্তি। খুঁজতে খুঁজতে আমি তাঁর দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। এই রকম অনুরাগকে ভক্তি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন ভক্তিশাস্ত্রের আরেক আচার্য মহর্ষি শাণ্ডিল্য। তিনি বলছেন, ঈশ্বরে যে পরম অনুরাগ আসছে আমাদের, সেটা হল গিয়ে ভক্তি, সা পরানুরক্তিঃ-ঈশ্বরে।

ভক্তির সঙ্গে জড়িয়ে আছে হৃদয়বৃত্তি। মনটাকে সেজন্য সবার আগে জাগাতে হবে। মন জাগলে স্বরূপ অনুসন্ধানের দিকে এগিয়ে যেতে পারব আমরা। তখন মার্গীয় গুরু, শাস্ত্রীয় পণ্ডিত, আধ্যাত্মিক ভাবচর্চার অনুসারীদের সঙ্গে আমাদের ওঠাবসা শুরু হবে। একে বলা হচ্ছে সাধুসঙ্গ। সাধুসঙ্গ না হলে আধ্যাত্মিক জাগরণ হবে না। সাধুর কাছে গেলে তিনি স্বরূপ অনুসন্ধানের পথখানা বলে দেবেন আমাদের। স্ব - স্বরূপ বা নিজেকে নিজের খুঁজে পাওয়ার ভিতর দিয়ে শুরু হবে তখন আমাদের আধ্যাত্মিক পরিক্রমা। তার জন্য সাধুসঙ্গ, গুরুসঙ্গ দরকার। গুরু না হলে আধ্যাত্মিক পরিক্রমা শুরু হবে না।

যিনি মন্ত্রদাতা তিনি হলেন গুরু। মন্ত্রটি হল পরমগুরু। গুরুর দেওয়া বীজমন্ত্র যদি আমরা জাগাতে শিখি তবে জ্যোতি নাদরূপিণী জাগ্রতা কুণ্ডলিনীর শক্তিদশা টের পেতে শুরু করব। কুণ্ডলিনীকে সেজন্য সাধুগুরুরা পরাপরগুরু হিসেবে দেখেন। কুণ্ডলিনীর শক্তিদশা যখন শান্ত, চুপ, অতীন্দ্রিয় বোধে গিয়ে দাঁড়িয়ে যায় শেষমেষ, সেটা হল গিয়ে শিব, শিববৎ শূন্যতা। তার মাঝে ঈশ্বর বা পরমাত্মার প্রকাশ। এজন্য সাধুগুরুরা বলে থাকেন, শিব হলেন পরমেষ্টিগুরু।

স্ব - স্বরূপে আসা মানে মন্ত্র জেগে গেছে। মন্ত্র জপ করতে করতে নাদ জ্যোতিরূপে আত্মা অন্তরে প্রকাশিত হয়ে ওঠে। আত্মা জাগলে আত্মদর্শন আসে। গুরু যদি কৃপা করে মন্ত্র দেন আর জপ করার কৌশলগুলো দেখিয়ে দেন তখন মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে মন্ত্রের প্রথম শরীর জেগে ওঠে। মন্ত্রের শরীর হল গিয়ে স্ব-স্বরূপ। নিজের ভিতর বীজমন্ত্র জেগে উঠলে জ্যোতিনাদ আসে। সেটা হল দ্বিতীয় দেহ। আধ্যাত্মিক রাজ্যে যেতে গেলে এই দেহটি সবার আগে দরকার। গুরু যখন মন্ত্র দেন তখন শিষ্যর দেহটি গুরুর হয়ে যায়। নিজের বলে তখন আর কিছু থাকে না। গুরুর দেহ, গুরুর মন্ত্র এমন ভাবনা এলে গুরুর স্বরূপ নিজের ভিতর হঠাৎ করে জেগে উঠে জগৎ গুরুময় হয়ে পড়ে। তখন শুরু হয় আধ্যাত্মিক পরিক্রমা।

পরিক্রমার জন্য অতীব দরকারি হল গিয়ে মন। অস্থির মন নিয়ে পরিক্রমা করা যায় না। দরকার স্থির মন। মন স্থির হবে একমাত্র তখন দেহে যখন সত্ত্বগুণ বেড়ে চলে। সত্ত্বগুণ বাড়তে পারে সাধুসঙ্গে, গুরুসঙ্গে। এই হল গিয়ে সবচেয়ে সহজ উপায় স্ব- স্বরূপকে খুঁজে পাওয়ার।

গুরু যে মন্ত্রটি দিয়েছেন তা হল শব্দব্রহ্ম। মুখ দিয়ে প্রথমে আমরা যে জপ করি, বাচিক জপ— তা হল বৈখরী। শব্দব্রহ্মের চার অবস্থা থাকে আমাদের দেহে। দেহ যখন গুরুর হয়ে যায়, শিষ্যর দেহের সমস্ত কলকবজা

যখন গুরুগত তখন গুরুর ছোঁয়া পেয়ে দেহের মূলাধারে পরা শব্দ জাগে। মুখে যে শব্দ, গুরুর দেওয়া জপমন্ত্র তা হল বৈখরী। বৈখরীতে জপ করতে করতে হৃদয়ে আসতে হবে। এখানে স্থিতির ভিতর মধ্যমা বাকবা গুরুমন্ত্র জেগে উঠবে কীরকমভাবে জপের কৌশলে তা গুরুদেব দেখিয়ে দেন। হৃদয় থেকে জপমন্ত্র যখন নাভিতে সঞ্চারিত হবে তখন পশ্যন্তী বাকজেগে উঠবে। নাভি থেকে জপমন্ত্রের স্থিতি আসবে মূলাধারে। এখানে রয়েছে পরা বাক শব্দব্রহ্মের চার অবস্থা দিয়ে জপ করা প্রথমে শিখতে হবে।

বৈখরীতে জপ করতে করতে হৃদয়ে, মধ্যমাতে ডুব দিতে হবে। সাধুগুরুরা বলেন, হৃদয়ে আছে অনন্ত শব্দ। তখন আর জপ করতে হয় না, আপনা আপনি বীজমন্ত্র মধ্যমা থেকে স্বতঃ উঠতে থাকে। সাধুগুরুরা একে বলেন নাদব্রহ্ম। জপের ভিতর নাদ শুনতে পাওয়ার কৌশলগুলো আছে দেহতে সুপ্ত। গুরু যখন শিষ্যর দেহ জাগিয়ে দেন তখন বৈখরীতে জপ করতে বসে শিষ্য নাদের আওয়াজ টের পেতে থাকে, নাদ কোটি সহস্রাণি।

কোটি সহস্র নাদের আওয়াজ আছে। শিষ্য কোন আওয়াজ পাবে সেটা গুরুমন্ত্রের ওপর নির্ভর করে। মন্ত্র যখন মধ্যমা পেরিয়ে নাভিতে, পশ্যন্তীতে গিয়ে পৌঁছয়, জ্যোতি চলে আসে। একসময় সুষুম্নার মুখ খুলে গিয়ে শেষমেষ মন্ত্রের লয় হয়ে যায়, মন্ত্র তখন আর জপ করতে হয় না। দেহ নাদময় হয়ে ওঠে। পরায় গিয়ে এরপর একেবারে স্থিতি। শিষ্য তখন সাধক দশাতে চলে যান।

বীজমন্ত্র জপ করা হল গিয়ে মন্ত্রযোগ। বীজ জপ করতে করতে বায়ু যখন জমাট বেঁধে যায় তখন আলো জ্বলে ওঠে অর্থাৎ হঠাৎ করে জ্যোতি আসে। এটা হঠযোগ। স্ব - স্বরূপে না গেলে জ্যোতির অনুধাবন আসবে না। জ্যোতি যখন বিন্দুনাদ হয়ে গিয়ে নেচে নেচে সাধকের গোটা দেহে খেলে বেড়ায় তখন লয়ের দশাপ্রাপ্তি আসে। এটা হল গিয়ে লয়যোগ। আর যখন দেহবোধ

একেবারে নিষ্পন্দ, কোনও আওয়াজ নেই নাদের সেটা রাজযোগ। নাদব্রহ্মের চূড়ান্ত দশা। জগতে তখন সমস্ত চঞ্চল একমাত্র আমার দেহ স্থির।

স্থির দেহ আমার স্বরূপ। স্ব-স্বরূপে জেগে উঠেছেন ভগবান। গুরু, মন্ত্র, ইষ্ট তখন সব একাকার। এক দেখা অভ্যাস করতে শিখতে হবে। তোমার গুরু আমার গুরু, তোমার পরম্পরা আমার পরম্পরা, তোমার শ্যামা আমার শ্যাম এই বোধগুলো যখন চলে গিয়ে সব এক হয়ে ওঠে তখন স্ব- স্বরূপ আসে। জ্যোতি আর নাদের আওয়াজ— অনাহত ধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়। এই ধ্বনি যাঁরা একবার শুনেছেন তাঁদের আর কোনও ভেদ থাকে না। কে শাক্ত কে বৈষ্ণব, কে শ্রীকৃষ্ণ কে মহামায়া সমস্ত তখন অনাহতের সাড়া। এমন মানুষজনের সন্ধান পেলে তাঁদের কাছে গিয়ে সঙ্গ করতে করতে একসময় স্ব - স্বরূপে চলে আসা যায়।

স্ব-স্বরূপে গেলে ভ্রূমধ্যে চোখ বুজে ধ্যান করতে করতে নাদ শোনা যায়। জপ করা যায়। ভ্রূমধ্যে তখন সমস্ত আশ্রয়। একে বলা হয় মৃত্যুঞ্জয়ী ক্রিয়া। এই ক্রিয়া জপপ্রণালীর সবচেয়ে ফলদায়ক অধ্যায়। এখানে যেতে পারলে আত্মদর্শন, আত্মজ্ঞান, আত্মদৃষ্টি আর সমদৃষ্টি।

সমদর্শন এলে যখন মন্ত্রযোগ চলছে তখন একবার বিগ্রহে লক্ষ্য থাকে। তারপর মূর্তি সরে যায়। তখন জ্যোতি— ধ্যেয় জ্যোতি, হঠযোগ। যখন জ্যোতির লয় তখন নাদ ও বিন্দু সব একাকার। শান্তকামী হয়ে কেবল স্ব - স্বরূপে লক্ষ্য থাকে। নাদ যখন শেষ জায়গায় গিয়ে দাঁড়ায় তখন সেটা মেঘনাদ।

নাদের আওয়াজ প্রথমে ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাকের মতন আসে। তারপর বাঁশি, ঘণ্টা ইত্যাদি। নাদের বহু রকম আওয়াজ আসে, নাদ কোটি সহস্রাণি।

সাধুগুরুরা সব নব নাদের কথা বলেন। নাদের শেষ হয় মহানাদে। বৈদিক সাধনক্রমে মহানাদ। উপনিষদাদিতে এর উল্লেখ আছে। শিবপুরাণ আবার

শেষ নাদ হিসেবে চিহ্নিত করছে ওঙ্কারকে। শিবপুরাণে শেষ নাদ ওঙ্কার নাদ। পাতঞ্জল যোগদর্শনেও মেঘনাদ হল গিয়ে শেষ নাদ।

নাদ শুনতে শুনতে নানান অলৌকিক শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ চলে আসে। বাইরের সাড়াগুলো যখন সরে তখন ভিতরের সাড়া মেলে। এখানে দ্রষ্টাভাব আসে সাধকের। দর্শনের আকাঙ্ক্ষা জেগে ওঠে। পশ্যন্তীতে গিয়ে দর্শনাদি হয়। তারপর শেষ অবস্থা পরায় গিয়ে সব একাকার হয়ে যাবে। যখন আত্মজ্ঞান, পূর্ণজ্ঞান আসবে, চোখ খুললেও জ্যোতি, বন্ধ করলেও জ্যোতি। লাল জ্যোতি, নীল জ্যোতি। রজঃগুণের জ্যোতি হল লাল। নীল জ্যোতি তমঃগুণের আর শেষ জ্যোতি শ্বেত জ্যোতি হল সত্ত্বগুণের। এখানে স্ব-স্বরূপ। নিজেকে খুঁজে পাওয়া যায়। এখান থেকে শুরু হবে আমাদের সাধনা।

অনুশাসন

ঘুমের নানান অধ্যায় আছে। ঘুম যখন খুব গভীর হয় তখন চোখদুটো স্থির থাকে আমাদের, নড়ে না। ঘুমের সময় চোখদুটো নড়ে যায় একমাত্র তখন আমরা যখন স্বপ্ন দেখি। ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখার সময় বন্ধ থাকা চোখদুটো ক্রমাগত নড়তে থাকে। চোখের স্বাভাবিক কাজ স্বপ্নের ভেতরও চলতে থাকে। গভীর ঘুমে চোখ একমাত্র বিশ্রামে যায়। স্বপ্ন আমাদেরকে যা দেয় তা হল গিয়ে ভ্রান্তিমূলক স্থিতি। জাগ্রত অবস্থার ভেতরও যদি আমরা স্বপ্ন নিয়ে কেবল নাড়াচাড়া করতে থাকি, মনের স্থিতিকে খালি নষ্ট করতে থাকব। স্বপ্নের সঙ্গে আধ্যাত্মিককতার কোনও সম্বন্ধ নেই। স্বপ্নের দর্শন, স্বপ্নে পাওয়া মন্ত্রাদির সেজন্য আধ্যাত্মিক দুনিয়াতে কোনও মূল্য নেই। আধ্যাত্মিকতা মানে হল গিয়ে বর্তমানে থাকা। বর্তমানকে নষ্ট করে ফেলে যখন আমরা সুদূর অতীত কিংবা ভবিষ্যত নিয়ে ভাবতে থাকি সেই দশাও অনেকটা ঘুমের ভিতর স্বপ্ন দেখার মতোই। চোখের বিশ্রাম হয় না এতেও। স্থিতির ভিতর

বসে বসে যখন আমরা স্মৃতি রোমন্থন করি তখন অতীতে ডুবে যাই। আবার যখন কোনও পরিকল্পনা, সুন্দর, সুখকর কিছু চাওয়া-পাওয়ার ছবি নিয়ে ভাবতে থাকি তখন ভবিষ্যতের স্বপ্নকে দেখতে থাকি। এভাবেই আমরা জেগে, ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখি। অতীত-আর ভবিষ্যতের ভেতর ঢুকে থাকি। বর্তমান নিয়ে আমাদের আধ্যাত্মিকতা। আধ্যাত্মিকতা আমাদেরকে শেখায় স্বপ্ন-মুক্ত স্থিতির ভিতর থাকবার সঠিক পদ্ধতি। এটা না শিখতে না পারলে আধ্যাত্মিক উন্নতির দিকে যাওয়ার আর কোনও সম্ভাবনা তৈরি হয়ে উঠবে না।

মনকে মানতে হবে নেশাবস্তু বলে। মনের প্রধান কাজ হল আমাদের বর্তমান থেকে দূরে সরিয়ে রেখে স্থিতিকে আড়াল করে দেওয়া। অতীত আর ভবিষ্যতের যতসব ভালো-মন্দ, সুখ-দুঃখ, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি নিয়ে মন আমাদের জাগতিক আচরণগুলো করতে থাকে। মনের কারসাজিতে আমরা ডুবে থাকি। নেশাগ্রস্থ হয়ে পড়ি। মন আমাদের বর্তমানকে দূরে, আড়ালে সরিয়ে দিয়ে ভবিষ্যতের সম্ভাবনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে খালি ভাবতে শেখায়। আবার অতীতের সুখস্মৃতি, প্রকাণ্ড ক্ষত এসব দূরে সরে যাওয়া অভিঘাতকেও ছাড়ে না মন। বর্তমানকে বুঝে উঠতে দেয় না। মনের কোনও বর্তমান নেই। আছে কেবল অতীত আর ভবিষ্যৎ। দুটোই মনকে মুক্ত হতে দেয় না। মনকে বুঁদ করে রাখে। সেজন্যই আমাদের মন ফাঁকা হয় না, শূন্য থাকে না। মন বর্তমানকে বোঝার জন্য প্রস্তুত হতে চায় না। আধ্যাত্মিকতা আমাদেরকে বর্তমানের দিকে নিয়ে যায়। নানান দুর্ভোগ, দীর্ঘায়িত হতাশা যখন মনের ভিতর তৈরি হয় তখন আধ্যাত্মিক রাজ্য খুলতে থাকে। নেশাসম আশা থেকে তখন আমরা দূরে সরতে থাকি। যখন আমাদের আর কোনও আশা থাকে না, ভবিষ্যৎ বলেও কিছু অবশিষ্ট নেই, খুবই কঠিন এক পরিস্থিতির ভিতর আমরা চলে যাই তখনই আধ্যাত্মিক দরজা খুলে যায়। সকলের জীবনে গুরু

জীবনের এমন দশার ভিতর গেলে তবেই নিজে এসে উপস্থিত হন। একমাত্র যাঁদের জীবনে গুরু আসেন, গুরুর কাছে গিয়ে দাঁড়াতে হয় না তাঁদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে আধ্যাত্মিক দরজা চট করে খুলে গেছে। কোনওরকমভাবে কোনও কিছু খোঁজার দরকার নেই তাই। দরকার শুধু অতীতের দিকে কোনওরকমভাবে আকর্ষিত না হওয়া। যে ঘটনাগুলো ঘটে গেছে আমাদের জীবনে সেগুলো নিয়ে ভেবে আর কোনও লাভ নেই। অতীতে আকর্ষিত না হয়ে, ভবিষ্যতের দিকে ধাবিত না হয়ে একমাত্র কাজ হল বর্তমান নিয়ে থাকা, বাস্তবের মুখোমুখি হওয়া। বাস্তব যখন সামনে আসে, ক্ষত-বিক্ষত করে আমাদের তখন বর্তমানের অভিব্যক্তিগুলো ধরা পড়ে যায় চট করে। নিজেকে আর চারপাশকে আমরা কেবল বর্তমানে দাঁড়িয়ে ভাল করে চিনতে শিখি।

আধ্যাত্মিকতা আমাদের নিজেকে চিনতে শেখায়। বর্তমানের প্রকৃত সত্তা আধ্যাত্মিককতা আমাদের খুলে দেয়। তখনই মন নেশা ছেড়ে দেয়। আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে আস্তিক এবং নাস্তিক হয়ে ওঠার কোনও সম্বন্ধ নেই। কেননা আস্তিক ও নাস্তিক দুটোই আদতে বিশ্বাস। এখানে দাঁড়িয়ে পড়লে নিজের অস্তিত্ব থেমে যাবে। আধ্যাত্মিকতা আমাদেরকে এগোতে বলে। উপলব্ধি আর অভিজ্ঞতা না এলে আস্তিক হয়ে ওঠা কোনও কাজের কথা নয়। এর থেকে বরং নাস্তিক হওয়া ভাল। আধ্যাত্মিকতা হল আমিত্বের মৃত্যু। আমির বিলয় ঘটিয়ে, নিজেকে নষ্ট করে নতুন হয়ে ওঠা গুরুর কথামতো। আধ্যাত্মিকতা একটা অনুশাসন। মেনে চলতে হবে, অভ্যাস করতে হবে। তবেই ফলাফল আসবে। আমাদের ভিতরঘর বিশৃঙ্খলিত হয়ে আছে। গুরুর দেওয়া আধ্যাত্মিক অনুশাসন আমাদের শৃঙ্খলিত করে তুলবে। আধ্যাত্মিকতাই শেখাবে আমাদের নিজের কেন্দ্রীকরণ। আমার অস্তিত্ব অতীতে নেই, ভবিষ্যতেও থাকবে না, উপনীত সত্যের ভিতর দাঁড়াতে

পারলে আমি কেবল নিজেকে খুঁজে পাব। নিজের ভেতর রয়েছে আত্মা। পূর্ণ নীরবতার ভেতর না গেলে আত্মার বোধ আসবে না কখনো। নীরব তখন আমরা হতে শিখব যখন মনকে থামিয়ে দিতে শিখব। আমার ভিতরে যখন সমস্ত কোলাহল, ভিড় নিশ্চিহ্ন হয়ে পড়বে তখনই আত্মার দেখা আমি পাব। ভিড়ের কোনও আত্মা থাকে না। ভিড়ের কোনও কেন্দ্রও থাকে না। যখন মনের ভিতর অতীত আর ভবিষ্যতের কলকলানি তখন কীভাবে স্থিতি আসবে? মনকে বর্তমানে এনে দাঁড় করাতে পারলে স্থিতি আসবে। স্থিতির ভিতর রয়েছে সুসংগতি। গুরুর বলা যাবতীয় অনুশাসন কাজ করতে পারে স্থিতি এলে। শরীরকে এতটুকু না নড়িয়ে স্থির হয়ে আস্তে আস্তে নীরব হয়ে বসে থাকার সময়সীমা রোজ একটু একটু করে বাড়াতে হবে। এভাবে অভ্যাস করতে থাকলে মন স্থির ও অবিচল হয়ে পড়বে। একসময় মন নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে জেগে উঠবে আত্মা। মনের সমস্ত বৃত্তি— অতীতের আর ভবিষ্যতের— থেমে গিয়ে তখন শূন্য স্থিতির বর্তমান কেবল থাকবে। এমনভাবে হয় মনের সমাপ্তি। ঋষি পতঞ্জলি একেই বলছেন, চিত্তবৃত্তির নিরোধ। এটা করতে না শিখলে আধ্যাত্মিক সাক্ষাৎকারে কোনও সম্ভাবনা নেই। সারাজীবন স্বপ্নে পাওয়া মন্ত্র আর দর্শনাদি নিয়ে মজে থাকতে হবে। আধ্যাত্মিকতা কোনও বিশ্বাস নয়, আধ্যাত্মিককতা হল প্রয়োগ পদ্ধতি আর ফল পাওয়া। যার জন্য গুরুর দেওয়া অনুশাসন। পতঞ্জলি ঋষি বলেছেন সেকথা অতীব সুন্দর করে, অথ যোগানুশাসনম

ব্রহ্মধ্যান

দেহের ভিতর ব্রহ্ম রয়েছেন। যতক্ষণ তাঁর দেহের ভিতর অধিষ্ঠান, তিনি মায়ার সঙ্গে যুক্ত হয়ে রয়েছেন। তিনি নির্গুণ ছিলেন, ব্যক্তিসত্তায় মিশে শেষমেষ উপাধি নিলেন। দেহের মায়াতে জড়িয়ে গেলেন ব্রহ্ম। তখন তিনি মায়া-চৈতন্য। এই মায়া-চৈতন্য রয়েছে আমাদের সবার ভিতরে। মায়াকে

সরিয়ে অর্থাৎ ব্যক্তিসত্তার আভরণ খসিয়ে চৈতন্যর কাছে আমাদেরকে পৌঁছতে হবে। চৈতন্য হল নির্গুণ। নিরাকারও বটে। আর যখন চৈতন্য নির্গুণ, নিরাকার তখন সত্তাটা নিরুপাধিকও বটে। তাঁর কোনওরকম কোনও উপাধি নেই, মায়া নেই। নির্গুণ ব্রহ্ম মায়ার সঙ্গে যুক্ত নন। তিনি দেহাতীত। মায়া জড়িয়ে আছে দেহে। মায়া-চৈতন্য ভরা স্থূল দেহে, ব্যক্তিসত্তায় তিনি উপাধি নিয়ে আছেন। সর্বব্যাপী ব্রহ্ম দেহে ধরা দিচ্ছেন, মায়া-চৈতন্য ভরা দেহে তিনি উপাধি নিয়ে রয়েছেন। তিনি যখন দেহে অধিষ্ঠিত, ব্যক্তিসত্তায় যাচ্ছেন তখন নির্গুণ, নিষ্ক্রিয় থাকবেন বা কী করে? তিনি ব্যক্তিসত্তায় মিশে সৃষ্টি করছেন, পালন করছেন, আবার ধ্বংসও করছেন। দেহের ভিতর সৃষ্টি হচ্ছে মায়া, ইন্দ্রিয়ানুভূতি। এগুলোকে আমরা পালন করছি যখন দেহকে ভোগ করছি, জাগতিক সুখের ভিতর রয়েছি। মায়া, ইন্দ্রিয়ানুভূতি থেকে সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দ, হাসি-কান্না নানান সব বৈপরীত্যের দেখা মিলছে দেহে। আবার যখন দেহ থেকে বেরিয়ে পড়ে অখণ্ড চৈতন্যসত্তার ভাবনায় আসছি আমরা তখন নির্গুণ ব্রহ্মের ভিতর যেতে চলেছি। এভাবে ব্রহ্ম থেকে ব্রহ্মাতে আমাদের দেহগত গতায়াত চলেছে। দেহে ব্রহ্ম উপাধি নিয়ে আছেন, ব্রহ্মা হয়ে রয়েছেন, ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্যান্তা মৃষামাত্রা উপাধয়ঃ। ব্রহ্মা থেকে আরম্ভ করে তৃণ পর্যন্ত সমস্ত কিছু উপাধি। বেদান্ত বলছে এগুলো সব মিথ্যা। যখন মায়া-চৈতন্য ভরা দেহ ভাঙছে, তখন মস্ত বড় একটা ঢেউ উঠছে। ভবসমুদ্রের সবচেয়ে বড় ঢেউ এটা। ভবসমুদ্র মানে যা হয়েছে, যা রয়েছে, আমার অস্তিত্বের সবচেয়ে বড়সড় ঢেউ এটা। এই ঢেউ এলে ছোট ছোট মায়ার প্রকাশ সব ভেসে চলে যাবে। তখন ব্রহ্মসমুদ্রে আমি অবগাহন করতে পারব। ব্যবহারিক জগতের বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়ে যাব। স্বরূপত আমিই তখন ব্রহ্ম হয়ে যাব। দেহ সরে যাবে। দেখব তখন নিজের সৎ সত্তাকে। এর ভিতর তিনি তখন রয়েছেন। সৎ হল ব্রহ্মসত্তা। যখন সেই ব্রহ্মসত্তার ভিতর

গিয়ে দাঁড়াব, তখন সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাকেও আমি বলে বোধ আসতে থাকবে। আবার পালনকারী বিষুও তখন আমার ভিতরে আর প্রলয়কারী মহেশ্বর শিব সেও তো আমি তখন, এমনকি স্বর্গাধিপতি ইন্দ্রও আমি। বেদান্ত বলতে চাইছে, ব্রহ্মা-বিষু- শিব-ইন্দ্র এই যে সব বিরাট পুরুষদের সত্তা, এগুলোও তো ব্যক্তিসত্তা। এগুলোও উপাধি। আত্মস্বরূপের ভিতর থাকবে না কোনওরকম কোনও উপাধি। আত্মস্বরূপ মানে আমি ছাড়া আর কিছু নেই। সৎস্বরূপ আত্মা হয়ে আমি বিরাজ করছি সর্বভূতে। বিশ্বচরাচর জুড়ে আমি কেবল আছি। আমি ছাড়া অন্য কিছু আর নেই, স্বয়ং ব্রহ্মা স্বয়ং বিষু স্বয়মিন্দ্রঃ স্বয়ং শিবঃ। স্বয়ং বিশ্বমিদং সর্বং স্বস্মাদন্যন্ন কিঞ্চন।।

অন্তর্জগৎ পূর্ণ করে তিনি স্বয়ং রয়েছেন আমার ভিতরে। সেজন্য আমার মন, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি সব কাজ করে চলেছে। সৃষ্টি হচ্ছে দেহগত নানান অভিব্যক্তি। অভিব্যক্তির বাইরে বেরোলে তিনি যে সর্বব্যাপী এটা আবার আমরা ধরতে পারব। তিনি বাইরে আছেন, ভিতরে আছেন, সামনে আছেন, পেছনে আছেন। সবখানে তিনিই আছেন। তিনি ছাড়া কিছুই নেই। তিনিই সৎ। সর্বভূতের অন্তরাত্মা রয়েছে আমার ভিতরে। মায়ার জাল জড়িয়ে রয়েছে আত্মায়। সেজন্য তাঁকে দেখতে পাচ্ছি না। বেদান্ত বলছে, মায়ামদিরয়া। মায়ায় নেশাগ্রস্ত হয়ে আছি আমরা। মায়াতে মুগ্ধ হয়ে আমি তুমি করে যাচ্ছি। পৃথকত্ব ভাবনা উঠছে খালি। এই ভাবনা তখন সরবে যখন সর্বত্র, সবখানে আমিই আছি এটা ভাবতে শিখে ফেলব আমরা। এটাই বেদান্তের শিক্ষা। অসীম, স্পন্দনহীন নড়াচড়া, বিকারহীন অস্তিত্ব যখন আমার ভিতর বেদান্তের শিক্ষা পেয়ে ফুটতে শুরু করে দেবে তখন স্বয়ং ব্রহ্মভাবনা জীবনে আরও বলবৎ হয়ে দেখা দিতে থাকবে। বহির্মুখী মন যখন ভিতরে ঢুকে যাবে তখন আমার হৃদয়গুহাতে ব্রহ্মের প্রকাশ ঘটবে। ব্রহ্মধ্যানের ভিতর চোখ তখন আর বাইরেটা দেখবে না, কান আর শুনবে না জাগতিক

কোলাহল। তখন নিজের ভিতরে ঘটে চলেছে কতরকম কাণ্ডকারখানা। সেগুলোতেই আমি মশগুল হয়ে আছি। বাইরে নিয়ে আর কোনও ভাবনা নেই আমার। ব্রহ্মের সঙ্গে এক হয়ে পড়ে আমি চুপ করে বসে আছি, বুঁদ হয়ে আছি। চৈতন্যস্বরূপ আত্মার সঙ্গে তখন সাক্ষাৎকার ঘটছে রোজ। নিজের ভিতর তখন নিজেই রয়েছি। ওখানে আর কোনও মায়া ঘেরা প্রিয়জনের জায়গা নেই। আমি আত্মস্থ, আত্মক্রীড়— নিজের সঙ্গে নিজেই খেলে চলেছি। খেলতে খেলতে এক সময় আমি ক্রীড়াহীন। আমার আত্মার ভেতর কখন না জানি ব্রহ্ম ঢুকে বসে আছেন!

অমৃতময় আত্মা

ক্রিয়মান বিরাট এক ইচ্ছাশক্তি। নামিয়ে আনতে হবে তাকে। বিশ্বসংসারে পরিব্যাপ্ত আছে ইচ্ছাশক্তি। বিশ্বসংসারকে অদ্বৈত বেদান্ত দেখছে মহাপ্রকৃতি হিসেবে। মহাপ্রকৃতির ভিতর ক্রিয়মান বিরাট ইচ্ছাশক্তি নিহিত রয়েছে। তান্ত্রিকেরা একে বলছেন, মহাশক্তি। মহাশক্তি যেমন প্রকৃতির ভিতর রয়েছে তেমন মানুষ ও সকল প্রাণীদের মধ্যেও সুপ্তভাবে রয়েছে এই শক্তি। মানুষ ইচ্ছাশক্তিকে সক্রিয় করতে পারঙ্গম বলে মহাশক্তিকে নিজের ভিতর সবচেয়ে ভালোভাবে ব্যবহার করতে পারে। বিরাট প্রকৃতি মহাশক্তির অবিচ্ছেদ্য অংশ। নিজের সুপ্ত ইচ্ছার ভিতর কী করে একে জাগ্রত করব আমরা সেটা শেখা হল আধ্যাত্মিকতা। আধ্যাত্মিক শক্তি নিহিত রয়েছে বিশ্বশক্তির ভিতর আর মহাশক্তি সুপ্ত রয়েছে আমাদের রহস্যময়ী ইচ্ছার ভিতর। সেজন্য ইচ্ছাশক্তির সঠিক ব্যবহার শিখতে পারলে মহাশক্তির অবিচ্ছেদ্য স্রোত নিজেদের ভিতর আমরা অবশ্যই উপলব্ধি করতে পারব। নিজের ভিতর রয়েছে অমৃতময় আত্মা। ইচ্ছার শক্তিরূপে সেই আত্মাকে প্রকট করতে হবে। শক্তির মতো সুপ্ত হয়ে রয়েছে আত্মা। আত্মা ঘুমিয়ে আছে আমাদের দেহের ভিতর। ইচ্ছার প্রেরণা এলে আত্মার সক্রিয়তা আমরা ধরতে পারব। ইচ্ছার

শক্তির ভিতর রয়েছেন আমাদের আরাধ্য। বেদান্ত একে বলছে সগুণ ব্রহ্ম। ব্রহ্ম কাজ করছে আমার ভিতর। আত্মার ভিতর যখন ব্রহ্ম স্পন্দমান আমরা তখন মহাশক্তির অবিচ্ছেদ্য অংশকে ব্যবহার করতে শিখে ফেলেছি, এটা বুঝতে হবে। তন্ত্র একে ব্রহ্মময়ী মায়ের শক্তি হিসেবে দেখছে। মহাশক্তির সঙ্গে নিজের সুপ্ত ইচ্ছাশক্তির অভেদ সম্পর্কের অনুভূতি যখন আমরা নিজের মধ্যে টের পেতে শুরু করব তখন বুঝব বিশ্বচরাচরের সকল প্রাণী ও সকল কিছু পরমচৈতন্য ব্রহ্ম, সর্বং খল্মিদং ব্রহ্ম। বেদান্তের এই বক্তব্যকে অনুমোদন করতে শিখব আমরা তখন নিজের মধ্যে। বিশ্বাত্মা তখন ফুটে উঠবে নিজের আত্মার ভিতরে। বেদান্ত এই বোধ এনে দেয় আমাদের আধ্যাত্মিক তৎপরতার ভিতর। পরমাত্মার সঙ্গে অভেদ সম্পর্ক তৈরি করে দেয় বেদান্ত, realization of the oneneesso of Spirit.

নিজের ইচ্ছাশক্তির সঙ্গে মহাশক্তির অভেদ সম্পর্ক তখন তৈরি হতে পারে যখন আমরা অন্তঃকরণের বৃত্তিগুলোকে ব্যবহার করতে শিখব। আমাদের ভিতর রয়েছে চার-চারটে বৃত্তি। এক্ষেত্রে বৃত্তি হল গিয়ে কাজ। মনের ভিতর চারটে বৃত্তি অতি সক্রিয় হয়ে আছে আমাদের। সেগুলোকে বলা হচ্ছে অন্তঃকরণের কার্য। সব সময় কাজ করে চলেছে আমাদের দেহ ঘিরে মন, বুদ্ধি, চিত্ত আর অহংকার। সবসময় আমরা কেবল ভেবে চলেছি আমি আর আমার নিয়ে। এই হল গিয়ে আমাদের স্থূল মনের ভাব। মনের ভেতর জমা আছে প্রকাণ্ড অহংকার। অহংকার তো আর বাইরে থেকে দেখা যায় না। অভিব্যক্তি প্রকাশ পায় কেবল অহংকারের। আমাদের আমি আর আমার ভাবগুলো সব অহংকারের বৃত্তি। অন্তঃকরণের বৃত্তি অহংকার। এটা আমাদের অন্তরিন্দ্রিয়র প্রকাশ। অন্তরিন্দ্রিয়ে বা অন্তঃকরণে অহং বা অহংকারের প্রকাশ যেমন ঘটছে তেমন সেখানে রয়েছে মনের সুতীক্ষ্ন প্রকাশ। মনে আমাদের রয়েছে Negative G Positive বৃত্তি। মন সবসময়

বলে চলছে আমাদের, এটা করো, এটা কোরো না। হ্যাঁ ও না-সূচক মনোবৃত্তি নিয়ে মন সবসময় কাজ করে যাচ্ছে আমাদের। মনের এই কাজ অন্তঃকরণের, অন্তরিন্দ্রিয়ের। বাইরে থেকে দেখে বোঝা যাবে না মনের সুচারু কার্যাবলি। মন আবার বুদ্ধির বিচার করেটরে নির্দেশ পর্যন্ত করছে আমাদের কোনটা ঠিক আর কোনটা বেঠিক। বুদ্ধিবৃত্তিকে স্থির করছে মন। মনে বুদ্ধির ছায়া পড়ছে, reflection আসছে। মন তখন সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। মন যখন স্থির হয়ে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে নানান কিছুর তখন অন্তঃকরণ বদলে মন হচ্ছে চিত্ত। চিত্ত স্থির করতে হবে।

চিত্তে যখন স্থিরভাব চলে এল তখন দেহে ঢুকে পড়ল সত্ত্বগুণাবলী। মনে আত্ম-প্রসন্নতা এলে মন চিত্ত বলে পরিগণিত হল। মন চঞ্চল আর চিত্ত হল তরঙ্গচঞ্চলহীন স্থৈর্য। অন্তঃকরণের প্রথম বৃত্তি মন হল রজঃচাঞ্চল্য বা রজঃগুণের দশা। তমঃগুণের দশাপ্রবৃত্তি অহংকার। মন যখন বুদ্ধিবৃত্তির স্তর পেরিয়ে চিত্তদশাতে চলে গেল ওটা সত্ত্বগুণের state. tranquil state. আত্ম - প্রসন্নতা। চিত্ত। চিত্ততে পরমচৈতন্যস্বরূপ আত্মার ছায়া পড়ে। চিত্ততে চেতন ও অচেতন দুই অভিব্যক্তি ধরা পড়ে আমাদের। চেতন আর অচেতন দুই অভিব্যক্তির ভেতর এক চৈতন্য রয়েছে। চেতনে রয়েছে ব্যক্ত বোধ— manifested আর অবচেতন অব্যক্ত— unmanifested. চেতনে আত্মার ছায়াঘন অভিব্যক্তি ছড়িয়ে পড়ে। চৈতন্য থেকে মহাচৈতন্য আসছে। চেতনে রয়েছে আত্মা। মহাচৈতন্যে রয়েছেন ব্রহ্ম। ব্যক্ত ও অব্যক্ত স্তর নিয়ে আমাদের আধ্যাত্মিকতা। চৈতন্য বা ব্যক্ত স্তরে আত্মার উপলব্ধি। গীতায় রয়েছে ঈশ্বর চেতন ও অচেতন সকল বস্তুতে রয়েছেন। তবে ঈশ্বরের স্পষ্ট প্রকাশ একমাত্র হৃদয়ে আছে, ঈশ্বরঃ সর্বভূতানামহৃদ্দেশের্জুন তিষ্ঠাতি। উপনিষদও সেই এক কথা বলেছে। বলছে পরমচৈতন্যরূপ আত্মার ধ্যান করতে হবে একমাত্র হৃদয়ে। হৃদয়পুণ্ডরীকে আত্মার ধ্যান করবার কথা

বলছে উপনিষদ। হৃদয়কে পদ্ম হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে। তন্ত্রের ভিতরও রয়েছে চক্রপদ্মের কথা। হৃদয় পুণ্ডরীক বা হৃদয় চক্রপদ্মে মনকে স্থির করতে হবে। মন স্থির হয়ে এলে আত্মার স্বরূপ বুঝে যাব আমরা। আত্মার স্বরূপ জানলে ব্রহ্মভাব ফুটে উঠতে থাকবে। ব্রহ্মভাব ফুটবে হৃদয়ে— হৃদয়পুণ্ডরীকে। ব্রহ্ম বিরাট বিস্তৃত মহাচৈতন্য। আমাদের চৈতন্য সর্বত্র ও সর্বক্ষণ বিস্তৃত রয়েছে। এর বিস্তার বিশ্বচরাচরের সত্তায়। দুটো সত্তাকে কাছাকাছি এনে বা একীভূত করে আমাদের এগোতে হবে আধ্যাত্মিককতার ভিতর।

অধ্যাত্মবিদ্যার মূল হল আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান। আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞানের ভিতর যেতে গেলে দু'ধরনের বিদ্যাশিক্ষা আমাদের দরকারি। প্রথম বিদ্যা পড়াশোনা, শাস্ত্রীয় অনুশীলন। এগুলো হল অবিদ্যার বিদ্যা। দ্বিতীয় বিদ্যা বিদ্যার বিদ্যা। এটা এলে আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান চলে আসবে আপনে হতে। ভগবানকে বলা হয় সর্বজ্ঞানস্বরূপ। ভগবান বা ঈশ্বর কিংবা পরমাত্মাকে জানতে গেলে সেজন্য সবকিছু জানতে হবে আমাদের। জানতে গেলে পড়াশোনা দরকার। আধ্যাত্মিক উপলব্ধির নানান শাস্ত্রীয় গ্রন্থাদি পড়তে হবে আমাদের। পড়াশোনা অবিদ্যার বিদ্যা। অবিদ্যার বিদ্যা নিয়ে গুরু বা আচার্যের কাছে গিয়ে বসতে হবে। তিনি আমাদেরকে বললেন আত্ম-অনুভূতির কথা। শিখিয়ে দেবেন এরপর সেখানে পৌঁছনোর করণকৌশল। এগুলো হল গিয়ে বিদ্যার বিদ্যা। দু'ধরনের বিদ্যাশিক্ষা করে আমাদের পৌঁছতে হবে সর্বজ্ঞানের আধার ভগবান, ঈশ্বর বা পরমাত্মার কাছে। তিনি সর্বজ্ঞানস্বরূপ ও সর্বান্তরাত্মা, আকাশবৎ, সর্ব-ভূতান্তরাত্মা। বৃহৎ ও সর্ববিস্তারী একাকার অখণ্ড চৈতন্য তাঁর। তিনি ব্রহ্ম। মহাচৈতন্যে বিস্তৃত হয়ে আছেন। বিশ্বচরাচরের সত্তার সঙ্গে একীভূত হয়ে আমরা অর্থাৎ আমাদের চৈতন্য রয়েছে, তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি। উপনিষদের ভাবনাতে

সর্ববিস্তারী ব্রহ্মভাবনা হল ব্যোমবৎ, আকাশবৎ। আকাশের মতো ব্যাপক ও বিরাট চৈতন্য সর্বগত ও সর্ববিস্তারী। একে মহাচৈতন্য, ব্রহ্মচৈতন্য বলা হচ্ছে। এর ধ্যান হৃদয়পদ্ম বা হৃদয়পুণ্ডরীকে করবার কথা গীতা ও উপনিষদে বলা রয়েছে।

ধ্যান করবার আগে এক আধারের জ্ঞান করে নেওয়া অতীব দরকারি। এক আধারের জ্ঞান এলে বিশ্বচরাচরের সকল কিছু সম্পর্কে জ্ঞান হয়ে যায়, একস্মিনবিজ্ঞাতে সর্ববিজ্ঞাতং ভবতি। ব্রহ্মজ্ঞান এলে তখন সব যে চৈতন্য, চৈতন্য সমুদ্রে সমস্ত একাকার এটা ধরতে পারব আমরা। ব্রহ্মজ্ঞানের অনুভূতির স্বাদ রয়েছে প্রস্থানত্রয়ে। গীতা, উপনিষদ, ব্রহ্মসূত্র আমাদেরকে পড়তে হবে। না পড়লে কিছু হবে না। আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য পড়াশোনা খুব দরকারি জিনিস। পড়তে পড়তে একটা জ্ঞান আসবে। অবিদ্যার জ্ঞান শুদ্ধ বিদ্যা লাভ করবে তখন গুরুমুখে পড়াগুলো যখন তত্ত্বকথা থেকে সহজাত উপলব্ধির কথা হয়ে উঠবে। গুরু নিজস্ব অনুভূতি দিয়ে শাস্ত্রতত্ত্বের বিচারকে সাধনকৌশলে মিশিয়ে দিতে সক্ষম। তিনি শেখাবেন মূলাধার থেকে কুণ্ডলিনী মহাশক্তিকে জাগ্রত করে নিয়ে কীভাবে সহস্রারে গিয়ে শক্তি ও ব্রহ্মের মিলনে সমাধিস্থ হয়ে থাকা যায়। বেদান্তের শিক্ষা হল জীব ও ব্রহ্মের শিক্ষা। এ পথে আমাদেরকে এগোতে হবে আত্মসমাহিত চিত্তে গভীর অনুশীলনের মাধ্যমে। না হলে কোনও কিছু অনুভব করা সম্ভবপর নয়।

সত্তার বিভিন্ন প্রকাশ

অখণ্ডজ্ঞান

ধ্যান করতে হলে বিশ্বব্যাপক বা সর্বব্যাপক চৈতন্যর ধারণা থাকা সবার আগে দরকার। ধারণা না থাকলে ধ্যানও হবে না। ধ্যানের আগে অনেকে বীজমন্ত্র জপ করে থাকেন। বীজমন্ত্রে ইষ্টদেবতার অধিষ্ঠান রয়েছে। নাম ও নামির অভেদচিন্তা করে বীজমন্ত্র, ইষ্টমন্ত্র জপ করার কথা বলে থাকেন আচার্য-গুরুরা।

অভেদচিন্তা খুব জরুরি। অভেদচিন্তা এলে অভিন্নসত্তার ধারণা চট করে চলে আসে। ধ্যানে মন বা চিত্ত পরিশুদ্ধ বা স্থির হয়ে ওঠে। মন যখন চৈতন্যময় ইষ্টদেবতার কেন্দ্রে তখন একেবারে স্থির। ধ্যান হল meeting place —মিলনস্থান।সেজন্য ধ্যানে বসবার সবচেয়ে উপযুক্ত সময় সন্ধিক্ষণ।

রাতের যখন শেষ হয়, শুরু হচ্ছে দিন আর দিনের যখন অবসান হয়, ঘনিয়ে আসছে সন্ধ্যা তখন ধ্যান আরম্ভ করতে হয়। সন্ধিক্ষণে বাহ্যপ্রকৃতি বা বাইরের জগৎ স্থির, ধীর, ও শান্ত থাকে। জাগতিক উত্তাপের পরিমাণ কম থাকে বলে এই সময় দুটোতে নিয়ম মেনে ধ্যানে বসলে মনের ভাব প্রসন্ন ও স্থির হয়ে আসে। এই সময়ে ধ্যানে বসতে পারলে বাহ্যপ্রকৃতির সঙ্গে আন্তরপ্রকৃতির মিলন হয়ে যায় খুব তাড়াতাড়ি। এইজন্য দিন ও রাত দুই তিথির মিলনক্ষণকে সন্ধি বলা হচ্ছে। সন্ধিক্ষণের ধ্যান সবচেয়ে বেশি ফলদায়কও বটে।

আমরা ঈশ্বরের পিতৃত্ব আর মাতৃত্বের কথা বলে থাকি। বৈদিক ধারণা শুধুমাত্র পিতৃত্বের কথা বলে না। বলে মহাশক্তিশালিনী প্রকৃতি হল এই বিশ্বচরাচরের সৃষ্টির কারণ। মহাশক্তির নামে সেজন্য আমরা সন্ধিপুজো করে

থাকি। অষ্টমী তিথির অবসানে ও নবমী তিথির প্রারম্ভে দুর্গাপুজোর সময়ে আমাদের সন্ধিপুজো হয়। দেবী দুর্গা হলেন শান্তময়ী ও আনন্দরূপিণী। ওই সন্ধিক্ষণে মনে শান্তি ও আনন্দ সৃষ্টি হয়। শাস্ত্র বলছে যে, সন্ধিপুজোর সময় দেবীর প্রত্যক্ষ আবির্ভাব হয়। সেজন্য ধ্যানে আমাদের মহাশক্তিশালিনীর ধ্যান - ধারণা করতে হলে দিনের ও রাতের সন্ধিক্ষণকে নির্বাচন করতে হবে। ওই সময় বসতে পারলে শান্ত মন আপনে হতে ইষ্টমূর্তিতে সহজে স্থির ও একীভূত হয়ে যাবে।

দিন ও রাতের সন্ধিক্ষণ ছাড়া বাদবাকি সময়গুলোতে খালি প্রাকৃতিক অবস্থার পরিবর্তন হতে থাকে অতি দ্রুত। সেজন্য মন তখন চঞ্চল ও অস্থির থাকে বলে আমাদের ধ্যান হয় না। ওই সময় পর্বে ধারণা অভ্যাস করতে হবে। চঞ্চল মনকে এদিকে - ওদিকে ছুটে বেড়াতে না দিয়ে একখানে অর্থাৎ কিনা একটি নির্দিষ্ট কেন্দ্রে আটকে রাখা আগে শিখতে হবে। এটাই হল গিয়ে ধারণা।

ধ্যানের আগে ধারণা দরকার। ধারণার অভ্যাস থাকলে ধ্যান সার্থক ও সিদ্ধ হয়ে ওঠে। ধ্যানের পর আসে সমাধি। ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই হল গিয়ে সাধনার পর্যায়। এগুলো খুব অন্তরঙ্গসাধন পর্যায়। এখানে আসতে গেলে ঈশ্বরের সাকার বা সগুণ ভাবকে গ্রহণ করা আগে শিখতে হবে। বিশ্বস্রষ্টা ঈশ্বরের পুজো, উপাসনা বা সাধনাকে আগে ভাল করে উপলব্ধিতে আনতে হবে। সর্বগুণসম্পন্ন ও সর্বশক্তিবিশিষ্ট বিশ্বনিয়ন্তা ঈশ্বরের সঙ্গে মধুর ও নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন করার প্রণালীগুলো আগে শিখতে হবে। এটা শিখে নিতে পারলে ঈশ্বরের যথার্থ স্বরূপের উপলব্ধি চলে আসবে মনে।

উপলব্ধি এলে জ্ঞান ও আনন্দঘন আত্মা বা মহাপ্রাণস্বরূপ ব্রহ্মকে একমাত্র সত্য ও নিত্য বলে আমরা বুঝতে পারা শিখে ফেলব। এটা হল অদ্বৈতভূমি।

এখানে আসতে পারলে দ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈত নামে বেদান্তের আরও দুটো যে ভূমি আছে সেগুলো বোধগম্য হবে।

জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বাড়াতে হবে আমাদের। আমার সঙ্গে অনেক মানুষ ব্যক্তিগত যোগাযোগ গড়ে তুলতে চান কেবলমাত্র ছেঁদো একখানি প্রশ্ন করবেন বলে তা হল গুরুর সন্ধান। সকলকে আমি বলে থাকি গুরু আপনাকে খুঁজতে হবে না, আপনি স্থিতপ্রাজ্ঞ একজন জ্ঞানীকে খুঁজে বের করুন। তাঁর সাহায্য নিন। এই সাহায্য পেলে অনেকখানি পথ এগিয়ে চলতে পারবেন। গুরু এর অনেক পরের ব্যাপার। লক্ষ লক্ষ মানুষ গুরু করেছেন কিন্তু গুরু করে নিজেকে খুঁজে পেয়েছেন কী? এক গুরু রেখে আরেক গুরু খুঁজে যাচ্ছেন। সারাজীবন ধরে তাঁরা খুঁজতে থাকবেন কিন্তু ধারণা - ধ্যান না করে এগোতে গেলে কিছু পাওয়া সম্ভব নয়।

একজন তত্ত্বজ্ঞানী মানুষ খুঁজে তাঁর কথাকে আগে বিশ্বাস করা শিখতে হবে। ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস তারপর আসবে। আগে তত্ত্বজ্ঞানীকে বিশ্বাস করুন, তাঁকে ভালবাসুন। তত্ত্বজ্ঞানীরা আপনাকে সময় দেবেন কেন? আপনাকে এঁরা পাত্তা দেবেন না। কেননা এঁরা গুরুগিরি করেন না। দীক্ষা দিয়ে রোজগার করা এঁদের কাজ নয়। এজন্য এঁদের কাছে যেতে গেলে নিজেকে আগে প্রস্তুত করুন।

পড়াশোনা আপনাকে করতে হবে। মূর্খের ধর্ম হয় না। যে সব মহাত্মাদের বর্ণজ্ঞান নেই তাঁদের আবার মূর্খ ভাববেন না। পড়াশোনার অর্থ হল ব্রহ্মমননশীল হওয়া। সেজন্য ব্রহ্মমননশীল মানুষকে আগে নির্বাচন করে এগোন। তাঁরাই আপনাকে সাহায্য করতে পারেন একমাত্র অধ্যাত্মবিদ্যা লাভের জন্য।

সর্বাবভাসক অখণ্ডজ্ঞান। সেই জ্ঞানকে কীভাবে রপ্ত করে নেব আমরা সেটা শিখিয়ে দেবেন তত্ত্বজ্ঞানীরা। আর শিখতে হবে আপনাকে অবশ্যই শাস্ত্র

পড়ে। আমাদের সনাতন ধারার যে মূল শাস্ত্র বেদ তা নিষ্পন্ন হয়েছে বিদধাতু থেকে। যার অর্থ হল জানা বা জ্ঞান। সেজন্য জানতে আপনাকে হবে। জানতে গেলে পড়াশোনা করতে হবে। ভালো গুরু পেতে নিজেকে আগে ভালো করে তৈরি করতে হবে। কেননা ভালো গুরুর কাজ আপনাকে দীক্ষা দিয়ে ছেড়ে দেওয়া নয়। সারাজীবন নিজের সঙ্গে জড়িয়ে রাখা। সেজন্য তত্ত্বজ্ঞানী, স্থিতপ্রাজ্ঞদের পেতে হলে নিজেকে আগে তৈরি করতে হবে আমাদের।

একং সদবিপ্রা বহুধা বদন্তি— চরম সত্য এক। এটা সবার আগে বুঝতে হবে। কালী-দুর্গা-শিব-কৃষ্ণ-শাক্ত-বৈষ্ণব এই ভেদচিন্তার যাঁরা তাঁদের দিয়ে আর যাই হোক আধ্যাত্মিকতা হবে না। এমন চিন্তকদের মূলাধার খোলা তো দূর অস্তকুণ্ডলিনী রয়েছে হাঁটুর নীচে। সেজন্য আগে পড়ে শুনে তৈরি হয়ে বুঝে জেনে প্রস্তুত থাকতে হয়। বাকি সব হয়ে যায়।

পথ, মত, সাধনপদ্ধতি পৃথক হতে পারে, সাধনার ধারা ও বিশ্বাসও আলাদা হয় কিন্তু লক্ষ্য এক ও অভিন্ন। সকল ধর্মের মূল দুঃখনিবৃত্তি আর শান্তিলাভ। বিবাদ-বিসম্বাদ করে আধ্যাত্মিক অনুভূতি আসে না।

একমসদ্বিধা বহুধা বদন্তি— একই সত্য, কিন্তু তাঁর নাম ও রূপ ভিন্ন ভিন্ন। এটা যদি আপনি বুঝে যান গুরু ছাড়া অনেকখানি এগিয়ে যেতে পারবেন। বৌদ্ধধর্ম, ক্রিশ্চানধর্ম, মুসলমানধর্ম, জৈনধর্ম, হিন্দুধর্ম সব ওই একই সত্যকে ভিন্ন ভিন্ন নামে ও রূপে প্রচারিত করছে। সেজন্য উপ অর্থাৎ নিকটে যেতে হবে আমাদের তবেই নি, যদ অর্থাৎ পরিবেশন হবে সবটাই। অর্থাৎ জ্ঞানশাস্ত্রের সংস্পর্শে এলে চরমজ্ঞান, আত্মজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হবে। একে তারপর আপনি ঈশ্বরের পিতৃত্ব বা মাতৃত্ব— কোন বোধে দেখবেন সেটা আপনার সাধনধারা ও অর্জিত দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপার।

অন্তরাকর্ষণ

দৃষ্টির বহুবিধ দিক আছে। যে কোনও একভাবে দেখে আমাদের এগোতে হবে। পরম অনুভূতির কোনওরকম কোনও দৃষ্টিনাম থাকে না। এগোনোর পথে এটা বুঝে নিয়ে আমাদের এগোতে হবে। দেবদেবীদের ভিতর চিন্ময় নিত্যস্বরূপ বর্তমান। অদ্বৈত পরমচৈতন্যর ভিতর আমরা যখন প্রবেশ করতে পারব তখন একটি রূপকেই কেবল দেখব। দৃষ্টির যে কোনও একটি দিক দিয়ে এগোতে এগোতে আমরা শেষমেষ বুঝতে পারব যে যিনি অরূপ তিনি নিত্যই অনন্তরূপ ধারণ করে আছেন। রূপের পার্থক্য কেবলমাত্র রয়েছে আমাদের ভাবে। ভাব অনুসারে রূপারূপ গড়ে ওঠে। ইষ্টরূপ গড়ে নিতে পারে আমাদের মন। মনেই দেবদেবীর ছায়া পড়ে। মনই মূর্তি গড়ে। মনকে আশ্রয় করলে বস্তুত তাঁকেই আশ্রয় করা হয়। তখনই দর্শন মেলে আবার মেলেও না। অধ্যাত্মবাদে ভাবদর্শন আর মূর্তিদর্শন বলে দুটো কথা চালু আছে। দৃষ্টির দিক থেকেই এই পার্থক্যগুলো চলে আসে। পরম অনুভূতি যখন আমাদের ভিতরে আত্মপ্রকাশ করে তখন জীবস্বরূপে ভগবদভিন্ন দেহ অভিন্নসত্তার মধ্যে গিয়ে এক হয়ে যায়। দৃষ্টিতে কোনওরকম কোনও পার্থক্যই তখন আর ধরা পড়ে না। এটাই হল আত্মরূপী শিবের পুজো। খুব গভীর অবস্থা। ইন্দ্রিয়ের অতীত। এই পর্যন্ত যদি প্রগতি আসে আমাদের বুঝতে হবে ওটাই সিদ্ধদশা। রুদ্রদশা থেকে ভৈরবদশার উদয় হয়েছে দেহে। ভৈরবদশার ভিতর মহাকালভৈরবের এবার আবির্ভাব হবে। মহাকালভৈরবের শক্তি হলেন মহাকালী। তন্ত্রশাস্ত্র এমনই বর্ণনা রেখেছে। দেহের সমস্ত চক্রগুলোতে যখন মহাশক্তির পরশ আসতে থাকে তখনই মহাকালী নিজস্বরূপে স্থিত হতে থাকেন দেহের মধ্যেই। সাধনা করলে এটা বেশ বুঝতে পারা যাবে। আত্মরূপী শিবের পুজো করতে করতে একসময় কালসংকর্ষিণী মহাকালীর পরম অনুভূতি লাভ করা যাবে। তখন আর মায়ের কোনও রূপারূপ থাকবে না। দৃষ্টির সাধনা সরে যাবে। শিবাদ্বৈত, শাক্তাদ্বৈত

কৌলসিদ্ধান্তের এই যে বিভাগ এ নিয়ে তখন আর মাথাব্যথা থাকবে না। শাক্ত অদ্বৈত দৃষ্টির ভিতর দিয়ে এগোতে হলে অকুল বোধসমুদ্র হৃদয়ে সবসময়ই অনুভব করতে হবে।

আমার গুরুদেব বলেন, সাধন শুরুর আগে পশুদেহ থাকে সকলের। ওই দেহতে যখন তুমি অকুল বোধসমুদ্রের তরঙ্গ তুলতে সক্ষম, বুঝতে পারবে পশুজীবন পরিবর্তনের মূলসূত্র জেনে গেছ।

গুরুই আমাকে দেহ চিনিয়েছেন। দেহের যে স্বাভাবিক আবরণ তাকে বলে নিমীলন। দেহ থাকে নিমীলন অবস্থাতে। এটা আমি গুরুর কৃপাতে বেশ ধরতে পেরেছি। নিমীলন অবস্থা জীবের বা পশুজীবনের। সেখান থেকে যেতে হবে আমাদের উন্মীলন অবস্থাতে। গুরুকৃপা না হলে এই অবস্থায় যাওয়া চলে না।

গুরুদেবই আমাকে বলেছিলেন প্রথম, অখণ্ড সত্তার তুমি যে অধীন। কালরূপে তোমার ভিতরও অখণ্ড সত্তা আছে। সবার মধ্যে তা থাকে। কালের অধীন জীব। কালের প্রভাবে মায়া আর মহামায়ার খেলা। দেহে যখন তোমার অকুল বোধসমুদ্রের তরঙ্গ উঠতে থাকল তখনই তুমি কালকে, অখণ্ডকে চট করে বুঝে নিতে পারবে।

এটাই উন্মীলন। এই শক্তির অনুভূতি গুরুকৃপাসাপেক্ষ। এটাও আমি ধরে নিতে পেরেছিলাম তখন। দেহাত্মভাবের ভিতর অন্তরাকর্ষণ আরম্ভ না হলে সাধনা শুরু হবে না। দেহাত্মভাব যখন কাটতে থাকে তখনই একমাত্র বোঝা যায় যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বাইরের কোনও ব্যাপার নয়, তা দেহের মধ্যেই। দেহকে বুঝতে পারলে আত্মার উন্মীলন চট করে ধরে নেওয়া যায়। দেহাত্মবোধে থাকে বাহ্য জগৎ বা বাইরের জগতের আওয়াজ। দেহে যখন অন্তরাকর্ষণ শুরু হল, আত্মার উপলব্ধি আসতে লাগল। আত্মার প্রকাশ ঘটলে দেহের ভিতর চিৎশক্তির প্রকাশ বোঝা যায়। চিৎশক্তিই কুণ্ডলিনী। দেহাত্মবোধের

মধ্যেই ঘুমিয়ে থাকে কুণ্ডলিনী। যতদিন কুণ্ডলিনী ঘুমিয়ে থাকবে ততদিন অন্তরাকর্ষণ টের পাওয়া যাবে না। অন্তরাকর্ষণ আসতে থাকলেই মনে যে সব বাহ্য আকর্ষণগুলো ছিল এতদিন সব ভিতরে ঢুকতে থাকবে। বহির্মুখ মন অন্তর্মুখ হয়ে পড়বে। অন্তরাকর্ষণেই আত্মার সমাহিতদশার ভিতর রোজ একটু একটু করে কুণ্ডলিনীশক্তি রস্বরূপ খুলতে থাকে। দেহাত্মভাব শিথিল হয়ে পড়ে। দেহাত্মভাব শিথিল হলেই ইন্দ্রিয়ানুভূতিও বদলাতে থাকে।

আমার গুরুদেব বলতেন, ভোগ তোমাকে ছাড়তে হবে না। ভোগ করো। দেহ যখন বদলাতে থাকবে তখন ভোগও বদলাতে থাকবে। কিছুই তোমাকে করতে হবে না। সব হয়ে যাবে। তুমি কেবল অন্তরাকর্ষণ করতে থাকো রোজ। অকুল বোধসমুদ্রের ভিতর তরঙ্গ তোলো। নিমীলনদশার আবরণ উন্মোচন করো। পশুভাব, জীবভাব কাটাও। ইন্দ্রিয়ের ভোগসুখ ত্যাগ করতে হবে না। ভোগের বাহ্যিক প্রকাশ কমতে থাকবে আপনে কুণ্ডলিনীশক্তির প্রকাশ পেতে থাকলেই দেহে। আত্মার ভেতরে সমানীত হলেই ভোগের মুখ ঘুরতে থাকে।

সত্যি সেটাই হয়েছিল। গুরুকৃপাতে আমার ইন্দ্রিয়শক্তি কমতে শুরু করল তখন। ইন্দ্রিয়ের ভিতর জেগে গেল সংবিৎশক্তি। ইন্দ্রিয়ের কাজ হল ভোগ করা। আমার লোভ, আকাঙ্ক্ষা, মোহগুলো তখন দেখলাম চিৎশক্তির প্রভাবে আত্মার সমানীত অবস্থায় কেমন যেন এক অতৃপ্তি দিতে থাকল। বাইরের সমস্ত আকর্ষণ কমতে থাকল। অন্তরের ভিতর তখন অন্য ভোগ। অন্য তৃপ্তি ইন্দ্রিয়শক্তি বদলে দিতে থাকল। তখন থেকেই স্থূল বিষয় ভোগের ক্রিয়াগুলো আর পছন্দই হল না আমার।

অবস্থার কথা জানাতেই গুরুদেব মৃদু হেসে বললেন, পশুভাবসম্পন্ন দেহ সরে যাচ্ছে যে!

গুরুদেব আমাকে শিখিয়েছিলেন আনন্দ ভোগ করতে। বিষয় ভোগের আনন্দ থেকে সরে আসলেই আনন্দের ক্রিয়া টের পাওয়া যায়। প্রকৃত আনন্দ অন্তরাকর্ষণেই পাওয়া যায়। ইন্দ্রিয় দিয়ে শ্রীভগবানের পুজো করতে হয়।

একই বক্তব্য কাশ্মীরীয় আচার্য উৎপলের লেখার ভেতর পড়েছিলাম। তিনি বলছেন, প্রত্যেক ইন্দ্রিয় দিয়ে পুজোরসায়ন রূপ যে আসব অর্থাৎ কিনা দেবীমদ তা ভাবরূপ চষক অর্থাৎ পাত্রে পূর্ণরূপে তুমি যদি ভরতে পারো তবেই নেশা আসবে, তোমার ভিতর গাঢ় তন্ময়তা সৃষ্টি হবে। চোখ দিয়ে যে রূপ তুমি দেখছ দেবীমূর্তির সেই রূপে ভাবের চষকে বা পাত্রে পুজোর রসকে তুমি পান করো আর তন্ময় হয়ে যাও। এভাবেই তুমি দেবীর পুজো করো, তত্তদিন্দ্রিয়মুখেন সন্ততং যুষ্মদর্চনরসায়নাসবম সর্বভাবচষকেষু পূরিতেষু আপিবন্নপি ভবেয়মুনামদঃ।।

আমার গুরুদেব বলেন, সাধনা দুর্বলের কাজ না। বীরভাবে সাধনা করতে হয়। জাগ্রত, স্বপ্ন আর সুষুপ্তি এই তিন দেহবোধ থাকলেই সাধনা হবে, ত্রিতয়ভোক্তা বীরেশঃ। তিনদশাকেই ভোগ করতে হবে। এজন্য ভোগ থেকে সরার কোনও দরকার নেই। ভোগ করো কিন্তু ভোগের দৃষ্টিভঙ্গি বলতে দেও। জাগ্রত কুণ্ডলিনী কিংবা উন্মেষপ্রাপ্ত চিৎশক্তি তোমার মধ্যে এলে ভোগের প্রক্রিয়া বদলে যাবে। এ নিয়ে অত ভাবতে হবে না তোমাকে। শুধু অধ্যাত্মমার্গকে জাগ্রত করো আমার কথায় আর পড়াশোনায়। তবেই আলো আসবে।

ভাবি, শঙ্করাচার্য তো একই পথ দেখিয়েছিলেন আমাদের, বিশ্বং দর্পণদশ্যমননগরী তুল্যং নিজান্তর্গত মায়য়া বহিরিব উদ্ভূতম।

অব্যক্ত হতে ব্যক্ত

দেবদেবীরা সব একই সত্তার বিভিন্ন প্রকাশ, একং সৎ বিপ্রাঃ বহুদা বদন্তি। ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ দেবতাদের উদ্দেশে স্তব করেছেন, স্তুতি রচনা

করেছেন বৈদিক যুগের আচার্য ঋষিরা। সংহিতা সাহিত্যের ভিতর স্তবস্তুতি রয়েছে। সেগুলো ভালো করে অনুধ্যান করতে পারলে এটাই পরিশেষে স্পষ্ট হবে যে, সমস্ত দেবতারাই একই সত্তার বিভিন্ন প্রকাশ। পণ্ডিত আচার্য ঋষিদের এই ভাবনা নিয়ে আধ্যাত্মিকতা পথে এগোলে জ্ঞান-মুখর পথ ধরে যে ভক্তি-প্রবণ সাধনার উদ্ভব হয়েছিল ভারতীয় সনাতন সংস্কৃতির ভেতর সেটা বোধগম্য হয়ে উঠবে। সংহিতা সাহিত্যগুলো আমাদের বোঝাল যে, যতই দেবদেবীদের উদ্দেশ্য করে স্তবস্তুতি রচনা করা হোক না কেন, আলাদা বীজমন্ত্র, পৃথকভঙ্গির ধ্যানমন্ত্র পরিস্ফূট হোক না কেন মূলসত্তা অপরিবর্তিত। সেই সত্তার সন্ধানী প্রথম থেকেই ছিলেন আচার্য ঋষিরা। সংহিতা সাহিত্যের ভিতর দেবতাদের একই সত্তার বিভিন্ন প্রকাশের ধারণা রেখে এরপর তাঁরা কর্মকাণ্ড বা আচার অনুষ্ঠানের দিকে এগোতে থাকলেন। যাগযজ্ঞ করলেন। বৈদিক ক্রিয়ার ভিতর দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকলেন নিজেদের সাধনাকে। মানুষকে অনন্ত সুখ, অনন্ত জীবন, অনন্ত শান্তির পথে রাখার জন্যই ছিল এইসব যাগযজ্ঞরূপ ক্রিয়া বা বৈদিক কর্মযজ্ঞের অনুষ্ঠানাদি। এগুলোকে এক জায়গায় এনে আচার্য ঋষিদের গ্রন্থনা করলেন ব্রাহ্মণ সাহিত্যের। বেদের কর্মকাণ্ড হিসেবে দেখা হতে থাকল আচার্য ঋষিদের রচিত এইসব ব্রাহ্মণ সাহিত্যগুলোকে। একই সত্তার বিভিন্ন প্রকাশ নিয়ে বৈদিক অভেদ জ্ঞান তৈরি হল আবার অভেদ চিন্তার ভিতর দিয়ে আরও একটা ভাবনা এল, কী করে ভালো থাকা যায় এই জীবনে! ভালো থাকার ভাবনাদি নিয়ে দেবতাদের সম্মুখে যাগযজ্ঞরূপ ক্রিয়াদির উদ্ভব হল কিন্তু এইসব রীতি - পদ্ধতি পালন করতে করতে একশ্রেণির আচার্য ঋষিরা এবার অনুধাবন করলেন যে, যাগযজ্ঞ, পুজো-অর্চনা, উপোস-বিধি, আলাদা আলাদা দেবদেবীদের স্তবস্তুতি করেও জীবনে অনন্ত সুখ, অনন্ত শান্তি কখনো আসতে পারে না। কেননা জীবনই তো অনন্ত নয়। তাহলে অনন্ত সুখ, অনন্ত

শান্তি চেয়ে দেবদেবীদের উদ্দেশ্য করে বৃথাই এইসব স্তবস্তুতি। এইসব যাগযজ্ঞ, স্তবস্তুতি মানুষকে কখনোই ধারাবাহিকভাবে সুখ, শান্তি কিছু দিতে পারে না। সুখের পর দুঃখ, শান্তির পর অশান্তি— এই বৈপরীত্য নিয়ে জীবন চলবেই। আর চলতে চলতে একসময় থেমে পড়বে। কোনও স্তব, কোনও স্তুতি, কোনও যাগ, কোনও যজ্ঞ মানুষকে মৃত্যুর হাত থেকে অব্যাহতি দিতে পারে না। জন্ম যখন হয়েছে, মৃত্যু হবেই। পরিসীমা রয়েছে জীবনের। তার বাইরে তো যাওয়া যাবে না। জীবনের ভিতর থেকে এরপর জীবনকে বোঝা শুরু করলেন আচার্য ঋষিরা। তাঁরা উপলব্ধি করলেন দেহের জন্ম ও মৃত্যু আছে, জীবনের সীমা-পরিসীমাও আছে কিন্তু দেহের ভিতরই রয়েছেন আত্মা, যিনি অনন্ত, যাকে কখনও সীমিত বস্তু— সুখ, দুঃখ, ভোগ, কামনা ইত্যাদি দিয়ে লাভ করা যাবে না, যাগযজ্ঞ, স্তবস্তুতি দিয়েও আত্মার সন্ধান পাওয়া যাবে না। জীবন থামবে, সুখ-শান্তি, কামনা- ভোগের একটা সীমাও থাকবে। তারা আত্মার মতন অনন্ত নয়। তাহলে আত্মাকে খোঁজাটাই এখন হবে সব থেকে বড় কাজ। আত্মাকে পেলেই অনন্ত স্ফুরণের দিকে এগোনো যাবে। এই ভাবনা থেকেই আচার্য-ঋষিরা এরপর জ্ঞানমার্গের অনুশীলন করতে বসলেন। আত্মা বা ব্রহ্মকে খুঁজতে গিয়ে তাঁরা নিজেদের ভিতর ডুবে গেলেন। অনুধাবন করলেন এরপর আত্মমগ্ন হয়ে, ভোগ আর ঐশ্বর্যের একটা সীমা আছে। ভোগৈশ্বর্যের শেষ আছে— তারা অনন্ত নয়। ঋষি আচার্য বললেন, জানাম্যহং শেবধিরিত্যনিত্যং ন হ্যধ্রুবৈঃ প্রাপ্যতে হি ধ্রুবং তৎ, আমি জানি যে, ভোগৈশ্বর্যের একটা সীমা আছে— তারা অনন্ত নয়। আত্মা যিনি অনন্ত, তাঁকে কখনো সীমিত বস্তুর দ্বারা, যাগযজ্ঞের দ্বারা লাভ করা যায় না। এই ভাবে ভাবিত হয়ে ঋষিরা এবার আত্মজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞানের দিকে ঝুঁকে গেলেন। সাধনায় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল দেবদেবী নয়, দেহ। কেননা দেহ দিয়ে আত্মা বা দেবদেবীদের অতীন্দ্রিয় ভূমির অনুধাবন

আসবে। দেহ না থাকলে কীভাবে সাধনা হবে আর কীভাবে বা আমরা ঈশ্বরের পথে যেতে পারব! দেহ ঘিরেই ভক্তি। অদ্বৈত তত্ত্ব— ব্রহ্মজ্ঞান দেহের ভিতর রয়েছে। দেহের ভিতর আত্মার অনন্ত ব্যাপ্তি নির্গুণ ব্রহ্ম হয়ে যেমন ধরা পড়ল আচার্য ঋষিদের কাছে তেমনই এই তত্ত্ব অনেকের আবার হৃদয়ঙ্গম করতে একটু অসুবিধা হল। যাঁরা অত বিচারশীল নয়, যাঁদের বিদ্যা ও শিক্ষা কিছুটা কম তাঁদের ভাবনা ভেবেই এরপর মুনি ঋষিরা সাকার ঈশ্বরের কথামালা বুনতে থাকলেন। অনন্ত শক্তিশালী, অনন্ত গুণময়, অনন্ত করুণাসম্পন্ন ভগবানের উপর নির্ভর করার জন্য এভাবেই তৈরি হয়ে উঠল ভক্তিমার্গ।

ভগবান হলেন স্বপ্রকাশ আনন্দের রসময় মূর্তি। সমস্ত দেবদেবীর মূর্তির প্রকাশ ঘটেছে সাধকদের ভিতরের উপলব্ধি থেকে। আর স্বপ্রকাশ আনন্দের রসঘন বিগ্রহ হয়ে ভগবানের বিগ্রহ বা মূর্তির প্রকাশ ঘটেছে। ভগবৎ উপাসনা রস-স্বরূপ। রসই ব্রহ্ম আবার ব্রহ্মই রস-স্বরূপ। রস-স্বরূপ ব্রহ্মকে লাভ করতে পারলে জীবন আনন্দময় হয়ে উঠবে একথা উপনিষদের ঋষিরা বলে গেলেন, রসো বৈ সঃ রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি। পুরাণগুলোর ভিতর সেই আনন্দস্বরূপ ভগবানের প্রকাশমূর্তিগুলোই পরিলক্ষিত হয়। অদ্বৈতবাদী মধুসূদন সরস্বতী যখন গীতার ভাষ্য লিখতে বসলেন তখন ব্রহ্মবৎ শ্রীকৃষ্ণের এমনই রূপ আঁকলেন যা ভক্তিমার্গের সাধকদের চোখেও ভাব তন্ময়তা নিয়ে আসতে বাধ্য। মধুসূদন বললেন, যাঁর গায়ের রং নতুন মেঘের মতো নীল, যাঁর হাতে বাঁশি শোভা পাচ্ছে, যিনি পীতবস্ত্র— হলুদ রঙের কাপড় পরে আছেন যাঁর নীচের ঠোঁটটা পাকা বিম্বফল অর্থাৎ তেলাকুচো ফলের মতো লাল হয়ে আছে, যাঁর মুখ পূর্ণচন্দ্র— পূর্ণিমার চাঁদের মতো সুন্দর, যাঁর চোখ পদ্মের সৌন্দর্যের মতোই মনকে মজিয়ে ফ্যালে সেই শ্রীকৃষ্ণ থেকে শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব আর কিছু আছে বলে আমি জানি না,

কৃষ্ণাৎ পরং কিমপি তত্ত্বমহং ন জানে। মধুসূদন সরস্বতী শ্রীকৃষ্ণকে সাকার ঈশ্বররূপ প্রকাশ করে শেষমেষ কিন্তু নির্গুণ, নিরাকার অদ্বয় ব্রহ্মবৎ চেহারাটাই দিলেন সাধনের মার্গ গুণে। বললেন শেষে, শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্ব। তত্ত্বমূলক শ্রীকৃষ্ণ ভাগবতে গিয়ে রসময় হয়ে উঠল। সেই ভগবৎ-রস পান করার কথাই শ্রীমদ্ভাগবতের ভিতর বলা হয়েছে, হে ভক্তবৃন্দ, সর্বদা এই ভগবৎ-রস পান করো, পিবত ভাগবতং রসমালয়ম।

সৃষ্টির মূলে যা আছে তা হল গিয়ে অব্যক্ত। অব্যক্ত হতে প্রথম যে ধারাটি নেমে আসে তা হল ব্যক্ত। সেটাই আমাদের সত্তার ধারা। সত্তার ধারা দিয়েই স্বপ্রকাশ আত্মার অনন্ত দশাকে অনুধাবন করা যায়। অনুধাবন করতে করতেই তাঁর স্বাদ পাওয়া যাবে। ব্রহ্মসত্তার ভিতর দিয়ে ব্রহ্মকেই আস্বাদন করা চলে। সত্তা যখন আমার ব্রহ্মময় তখন আমিই ব্রহ্মস্বরূপ। নিজেই নিজেকে আস্বাদ করছি। ভগবান এভাবেই রস আর তিনি অব্যক্ত থেকে ব্যক্ত যখন হলেন তখন আস্বাদয়িতা হয়ে উঠলেন। অর্থাৎ আমার সাধকভাবে যখন দ্রষ্টাভাব জাগবে তখনই আমি ব্রহ্মের প্রকাশ ধরতে শিখব। দেবদেবীদের রূপকে দেখতে পাব। অর্থাৎ সেই একরসকেই আস্বাদন করতে পারব। শক্তির ক্রিয়ারূপে তিনিই আমার ভেতর মাতৃকারূপে অবতীর্ণা হবেন। আমি তখন রূপের দ্রষ্টা মাত্র। রূপই অরূপ আবার অরূপই রূপ। এই তত্ত্ব যাঁরা বুঝলেন তাঁদের কাছে কালী - কৃষ্ণ - দুর্গা - শিবে কোনও ভেদ থাকতে পারে না। তিনি তো জেনেই গেছেন, দেবদেবীরা একই সত্তার বিভিন্ন প্রকাশ। এই জানার অধ্যায়গুলো যদি কেউ সম্পন্ন করতে পারেন শাস্ত্রপাঠে, তিনি অনেকখানি এগিয়ে যেতে পারেন আধ্যাত্মিক পথে। প্রথম পথ হল জীবনে অনন্ত শান্তি, অনন্ত সুখ বলে কিছু নেই এটা জেনে আধ্যাত্মিক পথে আসা। দেবদেবীদের পুজো, হোম অনন্ত সুখ, শান্তি দেবে না কখনোই। অনন্ত আত্মার ভিতরে কেবল তাঁদের প্রকাশ ঘটতে পারে। গুরু

মহাজনদের আত্মার ভিতরে এভাবেই দেবদেবীদের প্রকাশ ঘটেই শাস্ত্রীয় গ্রন্থাদি লেখা হয়েছিল আমাদের আধ্যাত্মিক পথকে সচেতন করার জন্যই। সমস্ত শাস্ত্রগ্রন্থের সূত্রপাত হয়েছে দুঃখের ঘটনা থেকেই। দুঃখের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেই আধ্যাত্মিক মহাজনেরা কলম ধরেছেন। ক্রৌঞ্চ-মিথুন— কোঁচবকের একটাকে বধ করার জন্য বাল্মীকির মনে দুঃখ হয়েছিল, সেই দুঃখের ফলাফল থেকে বা দুঃখকে অনুধাবন করে অজান্তে তাঁর মুখ থেকে সুললিত ছন্দে ব্যাধের প্রতি অভিশাপ-বাণী নির্গত হয়ে রামায়ণের কাহিনি আরম্ভ হল। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবদের দেখে দুঃখ হল অর্জুনের মনে। তিনি ভাবলেন, এদেরকে হত্যা করে সিংহাসন আমাকে পেতে হবে! আমি যুদ্ধই করব না। অর্জুনের এই দুঃখ-বিষাদ থেকে গীতার সূচনা হল। রাজা সুরথকে রাজ্যচ্যুত করে তাঁর মন্ত্রীরাই তাড়িয়ে দিল। ব্যবসাদার সমাধি বৈদ্য বউ-ছেলেদের সম্পত্তি হাতানোর কারসাজিতে অতিষ্ঠ হয়ে বনে চলে এলেন। সুরথ এবং সমাধি বনে এসে মেধস মুনির আশ্রমে গিয়ে উঠলেন। এভাবেই চণ্ডীর আখ্যানমালা শুরু হল। সমস্ত দুঃখ-হতাশার নিবৃত্তি নিয়েই শাস্ত্র শুরু আর তার শেষে রয়েছে সেই আত্মা। যার প্রকাশ হবে একমাত্র নিজের ভেতর। তিনিই ব্রহ্ম, ভগবান, দেবদেবী সাধন মার্গ আর দৃষ্টির পার্থক্যে। আর ভেদ সরিয়ে নিলে সব একই সত্তা, একং সৎ বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি।

ক্রিয়মান উপলব্ধি

চারটি সত্তা নিয়ে গড়ে উঠেছে আমাদের মন। মনকে বুঝতে হলে সত্তাগুলোর গভীরে যেতে হবে আমাদের। মনের এক সত্তাতে রয়েছে যুক্তিবাদের পরত। এই সত্তা দিয়ে মনে আসে বিচারবোধ। আধ্যাত্মিকতা কেবল বিশ্বাসের জায়গা নয়। আধ্যাত্মিকতার ভিতর যুক্তি থাকতেই হবে। কেন করছি পুজো, কেনই বা জপধ্যান— এর পেছনের কার্যকারণ না

জানলে তা শুধুমাত্র একটা কর্ম বা অভ্যাসে পরিণত হবে। কর্ম করতে হবে যেমন বিশ্বাস থেকে তেমনই কর্মের ভিতর যুক্তি থাকতে হবে। যুক্তিহীন বিশ্বাসী কর্ম দিয়ে আধ্যাত্মিকতা চলে না। আধ্যাত্মিকতার প্রথম শর্ত মনের ভিতর একখানি যুক্তিবাদী সত্তা তৈরি করা। মনকে যুক্তিবাদী করতে গেলে সবার আগে দরকার জ্ঞান বা পড়াশোনা। সেটা না থাকলে মন কেবল বিশ্বাসে ভর করে চলবে। যুক্তিবাদী মনকে যাঁরা ঈশ্বরমুখী বা ব্রহ্মমুখী করতে চান এমন মানুষের জন্য জ্ঞানযোগ বিশেষ কার্যকরী হতে পারে। জ্ঞানের দুটো ধারা আছে আবার। অপরোক্ষ জ্ঞান আর পরোক্ষ জ্ঞান। পরোক্ষ জ্ঞান আসে পড়াশোনা ও মনের ভিতর নিহিত যুক্তিবাদের সত্তা থেকে। পরোক্ষ জ্ঞান আসে গুরুসঙ্গে আর শাস্ত্রীয় গ্রন্থাদির অনুশীলনের ভিতর দিয়ে। আধ্যাত্মিক গ্রন্থাদি পড়তে পড়তে মনে একটা প্রেমিক সত্তা জেগে ওঠে। ভগবানের প্রতি প্রেম, ব্রহ্মবৎ হওয়ার প্রচেষ্টা থেকে, ধ্যানাদির অভ্যাস থেকেও প্রেম আসে। একে বলা চলে আত্মমগ্ন দশা। মনে নিহিত প্রেমিক সত্তার প্রকাশ চট করে ঘটে ভক্তিযোগে। প্রেমিক সত্তা বা ভাবতন্ময় মনখানি আমাদের তাড়াতাড়ি ঈশ্বরমুখী বা ব্রহ্মবৎ হতে পারে। এমন দশাতেই হয় ভক্তিযোগের শুরুয়াত। পরোক্ষ জ্ঞানের পথ দিয়েই আসে ভক্তি। আর অপরোক্ষ জ্ঞান— যখন একেবারেই ব্রহ্মসত্তার উপলব্ধি বুঝতে পারছি আমরা, ঈশ্বরের জন্য একাগ্র একটা অতীন্দ্রিয় ভূমির ভিতর অনেকক্ষণ পর্যন্ত ঢুকে থাকতে পারছি ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ্যানাসনে তখন বুঝতে হবে যে অপরোক্ষ জ্ঞানের যোগ তৈরি হয়েছে। এটা হলে ভক্তি পাকা হয়ে ওঠে। তখন আর ভক্তি পুজো-উপোস-আচারে আটকে থাকে না। সাধনা অনেক উপরে চলে যায়। তখন মনে চলতে থাকে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কর্ম। মন তখনই দেহ থেকে আলগা হতে থাকে। দেহের কর্মাদি কমে বিদেহী কুণ্ডলিনী কাজ শুরু করে। চক্রস্থ শক্তিগুলো বলবৎ হয়। এমন ধারার ভিতর দিয়ে যাওয়াটা

হল কর্মযোগ। মন তখন দেহ ও বিদেহকে সংযোগ করতে পারে, ধরতে পারে। এই মনের ভেতর তৈরি হয় আমাদের যৌগিক সত্তা। সাধনায় এই সত্তাটি শেষমেষ অতীব জরুরি। যৌগিক সত্তা, যোগ সত্তার ভিতর দিয়েই ঈশ্বর বা ব্রহ্মের সঙ্গে আমাদের সংযোগ আসে। এটা হল আমাদের অন্তরাত্মার ক্রিয়মান উপলব্ধি। জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি ও যোগের পথ ধরেই আমাদের এগোতে হবে। মালাতে একটা ফুলের সঙ্গে যেমন তার আগের ফুলের যোগ থাকে তেমনই আধ্যাত্মিককতায় মনের চারটি সত্তার ভিতর দিয়ে চারখানা যোগ নিষ্পন্ন হয়ে যায় জ্ঞানত বা অজ্ঞানত।

যোগের পথে এসে চৈতন্যময় আত্মা ক্রিয়াহীন হয়। তার আর কোনও কাজ থাকে না। সে তখন প্রকাশ করে ব্রহ্ম বা ঈশ্বরকে। অবাঙ্মনসগোচম—বাক্য-মনের অতীত। মন তখন কিছু দেখতে পায় না। মন যা আমাদের আসলে দ্যাখে তা জড় ও পরিবর্তনশীল জিনিসপত্র। মন দ্যাখে আদতে জড় বস্তু। মন দেখছে সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দ, শান্তি-অশান্তি। এগুলো সব পরিবর্তনশীল। স্থায়ী কিছু জিনিস নয়। আর এগুলোকে বেদান্ত জড় বলছে এই কারণেই, চঞ্চল মনের ভিতর এগুলোর অনুভূতি রয়েছে আমাদের। হাঁড়ির ভিতর জল ফুটছে নীচে আগুন রয়েছে বলে। আগুন সরিয়ে নিলে জল আর ফুটবে না। তেমনই স্থূল দেহের ভিতরই রয়েছে এইসব মনের কারবার। দেহ যখন যোগে গেল তখনই সে চৈতন্যময়। জড় ও পরিবর্তনশীল মন তখন আর নেই। তখন আত্মার প্রকাশ। ক্রিয়া নেই। বেদান্ত এই চেতন দৃক-পদার্থকে বলছে, পুরুষ, আত্মা, অক্ষর, কুটস্থ- ব্রহ্ম। অনির্ব্বচনীয় এই সত্তাই ভক্তিযোগে ঈশ্বরের মূর্তিকে প্রকাশ করছে। স্থূলদেহে ঈশ্বরের চেতনা কাজ করতে পারে না। দেহকে জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম আর যোগে জাগাতে পারলেই ঈশ্বরের প্রকাশ ঘটতে পারে ভক্তিযোগে।

সমস্ত যোগেই দরকার সর্বপ্রথম মনঃসংযম। মনকে শান্ত করতেই হবে আধ্যাত্মিককতার ভিতর যেতে গেলে। মন শান্ত হলেই শমযুক্ত হল। শমের পরই দম অর্থাৎ কিনা ইন্দ্রিয়ের সংযম। একে বলা হচ্ছে দান্তঃ। এরপর ইন্দ্রিয়ের বিষয় থেকে ইন্দ্রিয়কে নিবৃত্ত করতে হবে বা ইন্দ্রিয়গুলোকে সরিয়ে নিতে হবে। একে বলা হচ্ছে উপরত। উপনিষদ বলছে এভাবেই আমাদেরকে এগোতে হবে, শান্তো দান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বাত্মন্যেবাত্মানং পশ্যন্তি।

সবুর করো সবুর করো

যন্ত্র যন্ত্রী

জ্ঞানী আমার আত্মা, আমার স্বরূপ। গীতার ভিতরে রয়েছে কথাখানি। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম অর্থাৎ কিনা জ্ঞান না জাগলে কোনও আত্মিক ও আধ্যাত্মিক বাতাবরণই তৈরি হবে না তোমার ভিতরবাড়িতে। জ্ঞানের সাড়া আসবে তোমার মনেই। মনের ভিতরই তো তোমার যাবতীয় বোধ ও বিপত্তি। মনের ভিতরই প্রেম, দুঃখ, হতাশা, ঈর্ষা, কামনা, লোভ ও সুখ। যাবতীয় ভাল ও খারাপ দশাগুলো যা আমাদের জীবন ঘিরে চক্রাকারে আবর্তিত হচ্ছে তার উৎস ওই মনভূমি। মনের মাঝেই ব্যাকুলতা। মনেই বিচারবোধ। পারমার্থিক বোধের সঙ্গে সংযোগ যদি ক্রমশই সদর্থক দিকে চলে যায় তোমার, তাহলে ধীরে ধীরে সমস্তটাই হয়ে উঠবে, হরি সে লাগী রহে রে মন তেরী বনৎ বনৎ বনি যাই। বনৎ বনৎ মানে ধীরে ধীরে। ধীরে ধীরে তৈরি করতে হবে শত চাওয়া-পাওয়ার জাগতিক মনখানিকে শক্তিময়ীর ব্যাকুল স্পর্শ দিয়ে, তবেই তুমি সাড়া পাবে তোমার নিজস্ব শক্তির। দেখতে পাবে মনের ভিতর রয়েছে এক এমনই স্নিগ্ধ, উজ্জ্বল অমৃতের ভাণ্ড, যে ভাণ্ডে ভরপুর হয়ে আছে আনন্দময় দিব্য বোধ। এই বোধকে তুমি তো আগে চিনতে না। জানতে না একটুও। কিন্তু তোমার ভিতরই অজান্তেই তৈরি হয়ে আছে সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান এক বোধ। যা কাজে লাগিয়ে তুমি অনেক কিছুই করতে পারো। এই হল তোমার মনের শক্তি। যা তুমি এতদিন চিনতে পারোনি, ধরতে পারোনি, বুঝতেও তো পারোনি। এখন তোমার জ্ঞান হয়েছে একটু, বিচার বোধ এসেছে মনে তাই তুমি ধরতে পারছ যে তোমার মনই যাবতীয় শক্তির উৎস। ওখানেই আদতে রয়েছে তান্ত্রিকের মায়ের

বাড়ি। মাতৃসাধক রামপ্রসাদ খুব নির্জনে বসে বসে তাই গাইতেন, জাগো মা কুলকুণ্ডলিনী, তুমি নিত্যানন্দ স্বরূপিণী।

কোথায় জাগবে কুণ্ডলিনীর শক্তি? আর জাগলে তুমি তা কীভাবেই বা চট করে ধরতে পারবে? মনের জমিতে যখন দেখবে ব্যাকুলতার থকথকে কাদা আঠার মতো চটচট করছে খালি, তখনই বুঝবে কুণ্ডলিনীর সাড়া একটু হলেও আসতে চলেছে। গঙ্গাস্নান, পূজা-অর্চনা, উপোস, মন্ত্র বলা, রুদ্রাক্ষমালা-মহাশঙ্খের মালা ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে লক্ষ জপ— এসব যদি ব্যাকুল সাড়া এনে তোমার মনে করতে না পারো তাহলে ওসব করা না করাতেই সামিল। তন্ত্রের প্রথম কাজ মনখানিকে তৈরি করা। মন তৈরি না হলে মনের ভিতর মূর্তির বোধ জাগবে কী করে তোমার? মূর্তির পুজো যখন তুমি করছ তখন যদি আধ্যাত্মিক তত্ত্ব বিচার করতে না পারো তাহলে বুঝবে তোমার মনখানিই তো তৈরি হয়ে ওঠেনি। ওখানে শক্তিময়ীর দাপট তবে তুমি বুঝবে কীভাবে? মায়ের শক্তির ছোঁয়া যদি তুমি কখনো পাও বা কুণ্ডলিনীর ক্রিয়াটি যদি ন্যূনধিক হলেও তুমি একটু ধরতে পারো প্রথমে, এই ছোঁয়া পাওয়া ও ধরার উপলব্ধিখানি সর্বপ্রথম আসবে তোমার মনে। মন থেকেই শক্তির উপলব্ধি তন্ত্রোক্ত চক্রগুলোর ভিতর ছড়াবে। তন্ত্রের চক্রস্থ ক্রিয়া বুঝতে স্বভাবতই সবার আগে তৈরি করতে হবে তোমার মনখানিকে। মনের শক্তি না বাড়লে কুণ্ডলিনীর শক্তিখানি তুমি টেরই পাবে না। মনের শক্তি বাড়াতে তাই খুব দরকারি Metaphysical questions - এর। অনেকেই বলবেন, তাঁর কৃপা পেলে সব হয়। আর দরকার গুরুর কৃপা। মা ও গুরুর কৃপা আসলে আর কিছু দরকার নেই। ওসব বিচার বোধ, পড়াশোনা - শাস্ত্রজ্ঞান দরকার নেই। বই পড়ে বিচার বোধ দিয়ে তন্ত্র শেখা যায় না। তন্ত্রবিদ্যা গুরুমুখী। এই কথাগুলো সর্ব অর্থেই কিন্তু সঠিক। কিন্তু কৃপা কী এমনি এমনি মিলবে? কৃপা শব্দটির ভেতরমানে হল, কৃ— তুমি কিছু করো আগে। পা— তবেই

পাবে। এই হল গিয়ে কৃপা। তোমাকে নিজে থেকে আগে কিছু তো করতে হবে। তবেই তুমি গুরুর কৃপাটি পাবে। তারপর তো মায়ের কৃপা অনেক দূরের বস্তু।

এখন কথা হল, মনের শক্তি বাড়বে কীভাবে? সাধকেরা বলে থাকেন, তোমার সংশয় হল গিয়ে সহস্রফণা সাপ। এই আমি পারব না, আমার দ্বারা কিছু হবে না, আমার ভাগ্য ভালো না— এইসব না সূচক যত কিছু সবই হল গিয়ে তোমার ওই সংশয়। নেগেটিভ ধারণা মন থেকে যত সরবে ততই পজেটিভ বোধ জাগ্রত হবে। বেড়ে উঠতে থাকবে তোমারই মনের জোর। ছিদ্যন্তে সর্ব সংশয়াঃ— এটি মুণ্ডক উপনিষদের কথা। সমস্ত সংশয় ছিন্ন করতে হবে তোমাকেই। না সূচক সমস্ত বোধ— পারব না, হবে না এগুলো সরিয়ে ফেললেই দেখবে সব তুমি পারছ। পারতেই হবে তোমাকে। তোমার শুভ বোধ শুভ চিন্তা দিয়ে যা কিছু, যত কিছু তোমার বাধা বিপত্তি সব তোমাকে তাড়াতে হবে। তবেই মনের ক্রমবিকাশ, Evolution সম্পন্ন হবে। মনের জোর বাড়ানোটিই সবচেয়ে বড়সড় এক সাধনা। এই সাধনা সম্পন্ন করতে না পারলে, মনের শক্তির Evolution না হলে কখনওই highest good, পরম পুরুষার্থ তুমি পাবে না।

জ্ঞান লাভের জন্য চাই একজন জ্ঞানীগুরু। যিনি জ্ঞানপথের নির্দেশটি দেবেন। যিনি বলে দেবেন মায়ের পুজোতে বসে মৃন্ময়ীতে চিন্ময়ী রূপের কীভাবে তুমি চিন্তাটি আনবে। মাটি, পাথর ডিঙিয়ে কীভাবে তোমার মনের শক্তি দিয়ে তুমি তাঁকে উপলব্ধি করবে। আরোপ চিন্তা হল তন্ত্রের পুজোর প্রধান এক বিষয়। উপনিষদে সুন্দর একটি কথা আছে, গহ্বরেষ্ঠং বরেণ্যম তোমার মনের গহ্বরকে বিচার করতে হবে বুদ্ধি দিয়ে। মনের গুহাতে রয়েছে অন্তরাত্মা। তাকেই জাগাতে হবে আগে। উপনিষদের ঋষিরা একেই বলছেন, ব্রহ্ম পুরুষ।

ঋকবেদে সূর্যের শক্তিকে চৈতন্যে আরোপ করার বিদ্যাটি শেখানো রয়েছে। সূর্য হল প্রাণবান চৈতন্যময় পুরুষ। জড় ভাবনা থেকে চৈতন্যে যাওয়ার পথটি দেখিয়ে দিয়েছে অদ্বৈত বেদান্ত। হে অগ্নি, তুমি আমাদের সুপথে নিয়ে চলো— অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান। মনের জোর বাড়ানো বা চৈতন্য জাগানোটি হল গিয়ে আন্তর পুজোর বিষয়। উপনিষদের যুগে বাহ্য পুজোর সঙ্গে সঙ্গে আন্তর পুজোর প্রবর্তন হয়েছিল। সূর্যের উপাসনা চলছে। যজ্ঞাগ্নিতে হোম করছেন ঋত্বিক। বাহ্য এই পুজোর সঙ্গেই মনের আগুনটি তো জ্বালাতে হবে। না হলে আন্তর পাঠ কোনওদিন হবে না। শুধু ওই ফুল, চন্দন নিয়ে ভক্তির সজ্জাটি থাকবে মায়ের মন্দিরে। ভক্তির ভিতর শক্তি কখনোই জাগবে না। বাইরে একটা আকাশ আছে। যা আমরা চট করে দেখতে পাচ্ছি। এ হল ভৌতিক আকাশ। মনের ভিতরও অমন এক আকাশ আছে, যেখানে সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র সবই তো আছে। দেহের ভিতর থাকা আকাশকে জাগাতে হবে তোমার ওই মনের শক্তি দিয়ে। দিগন্তবিস্তারী আকাশ হল গিয়ে ব্রহ্মরূপ। এই রূপটি ধরা পড়বে তোমার মনে। তাকে ধরবার জন্যই তন্ত্রের পুজো।

বেদের ওঙ্কার সকল মন্ত্রের, বর্ণের ও শব্দের কারণ বা উৎস। তন্ত্রে ওঙ্কার গিয়ে পরিণতি পেয়েছে মাতৃকায়। হ্রীং এখানে আদি মন্ত্র। কালীর গলায় মুণ্ডমালা তন্ত্রের মাতৃকাবর্ণ। ওঙ্কারের অনুসরণ করেই তন্ত্রের হ্রীং ক্রীং বীজমন্ত্রগুলো সব সাজানো। বেদে ওঙ্কারেই সকল দেবতার প্রকাশ। তন্ত্রে মাতৃকাবর্ণের ভেতরে মায়ের প্রকাশ। তন্ত্র এভাবেই বেদের পরিপূরক। শক্তি উপাসনার বীজ বেদেতেই আছে। ঈশ্বরকে আকাশবৎ মনে করে ধ্যান করা এটা বৈদিক ধারণা। নির্গুণের ধ্যান কী হয় কখনো? নাম রূপ না থাকলে কার ধ্যান-ধারণা আমরা করব? তখনই মায়ের প্রকাশ।

মনের জোর বাড়াতে গেলে ধ্যান করতেই হবে। হৃদয়ে ধ্যান করার কথাটি বলছে তন্ত্র। ধ্যান হতে পারে আজ্ঞা চক্রে, তোমার ওই দুই ভুরু জোড়ার মাঝখানে। তন্ত্র বলছে ওখানে পরমগুরুর স্থান। এজন্যই আজ্ঞা চক্রকে বলা হচ্ছে জ্ঞান চক্র। আজ্ঞা চক্রে মন স্থির করে সহস্রারে পরমশিবকে কল্পনা করতে হয় তন্ত্রবিদ্যায়। তন্ত্রে কুণ্ডলিনী হল গিয়ে অব্যক্তা শক্তি, Coiling energy তান্ত্রিকেরা কুণ্ডলিনীকেই কামকলা বলছেন। তন্ত্রে কাম কথার অর্থ হল কামেশ্বর শিব। তিনি প্রকাশরূপী। যার প্রকাশ ঘটবে সবার আগে তোমার মনেই। মনেই অগ্নি। সাধনায় মনের আগুন আগে জ্বালাতে হবে। কলা হল গিয়ে মনেরই বিমর্শশক্তি। বিমর্শ কথাটির অর্থ হল বিশেষভাবে বিচার বিবেচনা। তন্ত্রের সাধনা, সমস্ত সাধনা করতে গেলেই বিমর্শশক্তিটি প্রয়োজন। বিচার না উঠলে মনে কিছুই তুমি ধরতে পারবে না। কামকলা - বিলাসতন্ত্রে স্পষ্ট করা রয়েছে এর প্রকাশ ভঙ্গিমাটি, কাম কমনীয় তথা কলা চ দহনেন্দুবিগ্রহৌ বিন্দুঃ। বিমর্শশক্তিকে তন্ত্রগুরুরা বলেন, অগ্নিযোমরূপিণীর একটি দশাপ্রাপ্তি। এখানে অগ্নি ও চন্দ্রের মিলিত রূপে একখানি বিন্দু আছে। অগ্নি ও সোম। কামেশ্বর শিবের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। শ্রীকুলের শ্রীবিদ্যার সমষ্টিরূপ এই কামকলাও। বিমর্শশক্তি কামেশ্বরী সেজন্যই যোড়শী দেবীও তো বটে, বিমর্শরূপিণী বিদ্যা যোড়শী যা প্রকীর্তিতা। শিব ও শক্তির মিলিত রূপখানি দিয়েই তো তন্ত্রবিদ্যাতে কুণ্ডলিনীর চিন্তাখানি এসেছে। এখানেই জ্ঞানবিদ্যাটি যে নিষ্পন্ন হচ্ছে সারদাতিলকতন্ত্র সেকথাটি বারবারই বলে বলে চলেছে। কুণ্ডলিনীর ভিতর রয়েছে ইচ্ছা, জ্ঞান ও অগ্নি-চন্দ্র-সূর্য। বিন্দুর যে কল্পনা তন্ত্রবিদ্যার ভিতর তা ওই শিবাত্মক ধারণা থেকেই এসেছে আর বীজগুলো হল শক্ত্যাত্মক ধারণা। এভাবেই তন্ত্রের শিবশক্তি।

বৈদিক ভাবনার ভিতর কুণ্ডলিনীর ধারণা নেই। ব্রহ্মের কারণাবস্থাগুলোকে বৈদিক ঋষিরা শব্দব্রহ্মের ভিতর দিয়ে নিয়ে গিয়ে চিহ্নিত করেছেন।

তন্ত্রবিদ্যার পুথিকারেরা এর নাম দিয়েছেন কুণ্ডলিনী। পতঞ্জলির যোগসূত্রে চক্র পদ্মের ব্যাপারগুলো কিন্তু একেবারেই নেই। মূলাধার থেকে শক্তির যে ঊর্ধ্বগতি সেটি তন্ত্রের মুখ্য বিষয়। পতঞ্জলি-পরবর্তী যোগশাস্ত্রের আলোচনার ভিতর এই কুণ্ডলিনীশক্তির ক্রিয়াগুলো আস্তে আস্তে স্পষ্ট হতে থেকেছে। স্বয়ম্ভূ শিবের কথাটি তন্ত্রবিদ্যারই কথা। স্বয়ম্ভূ কথার মানে কারও দ্বারাই এটি তৈরি হয়নি। এটি অনাদি বিষয়। স্বয়ম্ভূ লিঙ্গের মানেটাও তো তাই। অনাদি শিবলিঙ্গ। আত্মা অবিনশ্বর। জন্মমৃত্যুর সঙ্গে আত্মার কোনও সম্বন্ধ নেই। এই বৈদান্তিক চিন্তা নিয়েই শব্দব্রহ্মস্বরূপ শিব বা স্বয়ম্ভূ কথাটি বেদান্ত থেকেই আদতে এসেছে। তন্ত্রের কামকলাকেই কুণ্ডলিনী বলা হচ্ছে। বলা হচ্ছে এটিই পরমাশক্তি। কুণ্ডলিনীর কথা পতঞ্জলির যোগশাস্ত্র রাজযোগেও নেই। এই কল্পনাটি পরবর্তী যোগ ও তন্ত্রশাস্ত্রের ব্যাপার। তন্ত্রের কুণ্ডলিনী সমস্ত মন্ত্রেরই মূল, Root এটিই আদতে মন্ত্রের বীজ, Seed একে জাগাতে গেলে মনের শক্তিটি বড় প্রয়োজন। মন যদি জ্ঞানবিদ্যার ভিতর গিয়ে না জাগে, কুণ্ডলিনী কখনোই জাগতে পারে না। তাই তন্ত্রের বাহ্য পুজোর সঙ্গে সঙ্গেই কুণ্ডলিনীর সাধনাটি বড় দরকার। এটি শেখা সবচেয়ে আগে দরকার। এটি জেগে গেলে মৃন্ময়ী মূর্তি শক্তির বিকাশে তোমার ভিতরবাড়িতে আপনেই চিন্ময়ী। তখন আর কী বা ঘন্টা নাড়া! রামকৃষ্ণ ঠাকুর থেকে বামদেব, কেউই সেই অর্থে ঘণ্টা কিন্তু নাড়েননি। এটাই আমাদের বুঝে গুরু খুঁজে জাগাতে হবে কুণ্ডলিনী। কুণ্ডলিনীশক্তি না জাগলে তন্ত্রগুরুর মন্দিরের মা কখনোই জাগতে পারে না। কুণ্ডলিনীশক্তি জাগলে পরেই, মা, আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী। আমি ঘর তুমি ঘরণী। আমি রথ তুমি রথী। যেমন চালাও তেমনি চলি। যেমন করাও তেমনি করি। যেমন বলাও তেমনি বলি। এই শরণাগত বোধ তখনই একমাত্র সম্ভব। নচেৎ ও শুধু কথার কথা। বিচার ধারা এনে মনকে বোঝাতে

পারলে ও বোধ আপনেই উদয় হয়। সেজন্যই সমস্ত সাধনায় জ্ঞানবিদ্যার বড় প্রয়োজন।

যোগির খাতা

যা পেলে আমার সমস্তটাই পাওয়া হয়ে যাবে। কোনওকিছুই আর লাগবে না। এমন ভাবনা আমাদের মনে চট করে উঠে আসা সম্ভবপর নয়। শরীর ও মনের একটি দীর্ঘ প্রস্তুতি প্রয়োজন এসব ভাবনার ভিতর গিয়ে দাঁড়াতে। শ্রীমদ্ভাগবতগীতার ভিতর রয়েছে শ্লোকটি, যং লবধবা চাপরং লাভাং মন্যতে নাধিকং ততঃ। যা পেলে মনে হবে আমার সব পাওয়া হয়ে গেছে। আর কোনও চাওয়া-পাওয়াই নেই।

নির্বাসনা হওয়া চাট্টিখানি তো কথা নয়। মঠে-মন্দিরে-ঘরে আমরা বগবগিয়ে পড়ে যাই, নির্বাসনা ও নিষ্কামী হওয়ার শ্লোকগুলো। সাধুদের কোনও একটি থাক এসবের ঊর্ধ্বে উঠতে পেরেছেন। না হলে সব থাকেই চাওয়া-পাওয়া, কামনা-বাসনার কোনও না কোনও উপদ্রব আছে।

বাসনা ত্যাগ করতে হবে, কামনা সরিয়ে নিতে হবে, মনে কোনও চাওয়া-পাওয়া থাকবে না, অতৃপ্তি আসবে না, ছটফাটানি থাকবে না কোনো — দেহ ও ইন্দ্রিয় নিয়ে স্বরূপজ্ঞানী হওয়াটি তো ভীষণ শক্ত কাজ। ও কাজ আমরা চট করে পারবই বা কেন! যে পরিবেশ ও ভাবনার ভিতর আমরা সবাই বড় হয়ে উঠেছি সেখানে এমন ভাবনারাজির চল নেই। কিন্তু শাস্ত্রাদি তো বলেই খালাস। কোনও কিছুই চেও না, বাসনা সরিয়ে ফেলো মন থেকে, আকাঙ্ক্ষা কমাও। বললেই তো আর হল না!

ভাগবতীয় আসরে গেরুয়া পোশাকধারী যে সান্ধ্যকালীন পাঠে এত অবিদ্যা, অজ্ঞান, বাসনা নিয়ে কথাটথা বলে উঠলেন, তাঁরও কী দেহ ও মন থেকে এগুলোর সমস্তটাই সরে গেছে! একদমই নয়। আসর সেরে তিনি প্রণাম নিচ্ছেন, কুশল বিনিময়াদি সারছেন, নিজের মোবাইল নম্বরখানিও

কোনও ভক্তজনকে দিচ্ছেন— এসব তিনি করছেন ওইসব চাওয়া-পাওয়ার জাগতিক ইন্দ্রিয়ের দরজাতেই দাঁড়িয়ে। এত যে গীতা পড়ে উঠলেন গীতা হয়ে উঠতে পারলেন কই! ভক্তকে বলছেন, ওষুধাদি ফুরিয়ে গেছে, মোবাইলে ব্যালেন্স ভরার তারিখ সামনেই, আসছে শীতে গরম চাদরখানি এবার দরকার— গত ঠাণ্ডায় বড্ড কষ্ট হয়েছে, এবার দেশে গেলে তুমি একটু খাঁটি মধু এনে দিও, বাবা— খেলে একটু বোধহয় ভাল থাকব।

সাধুদের এসব ভাবনাও বলে দিচ্ছে যে তাঁরাও নির্বাসনা হতে পারেননি, শরীরবোধ তাঁদেরও টনটনে— শরীরের কষ্ট লাঘবের জন্য স্বভাবতই এত সদর্থক চেষ্টা— শিষ্যভক্তকে বলছেন এটা - ওটা শারীরিক ক্লেশগুলো নিষ্পত্তির জন্যই। এত গীতা পড়ে শোনাচ্ছেন তাঁরা , এই নিয়ম পালন, আচার বিচার— কোথায় ওর ফোঁকর গলে দেখুন, কী ভীষণ দেহগত চাওয়া-পাওয়া রয়েছে গেছে ওনাদের ওই গেরুয়ার আড়ালে! একটুও আসলে যায়নি। সাংসারিক আমাদের নিত্যকার চাওয়া - পাওয়াগুলোর খালি রং বদলেছে অনেকখানি, মার্গীয় পরিমণ্ডলে ঢুকে। সেখানে যে জাগতিক রোজকার আমাদের বেঁচে থাকার লড়াই নেই।

তাঁরা নিভৃতে থাকেন, ধ্যানজপ করেন, নিয়মনিষ্ঠা দিয়ে মনকে একটু উঁচু স্তরে নিয়ে গেছেন— এইসব ব্রহ্মচর্য বা সন্ন্যাস পালনের ব্রতাদির ভেতর দিয়ে। তাঁদের সঙ্গে আমাদের এইটুকুই মূলগত পার্থক্য। মনের সুন্দর-পবিত্র চিন্তা ও শুভবোধ দিয়ে তাঁরা তাঁদের সাধক জীবনকে রাঙিয়ে নিয়ে মনকে অনেকটাই জাগতিক দশার বাইরে বের করে এনে সত্যবস্তুর দিকে নিয়ে যেতে পেরেছেন। বস্তু তাঁরা সকলেই তো আর লাভ করেননি। আমাদের মতোই প্রচেষ্টায় আছেন। তাঁরা অনেকেই মঠে থেকেও ভগবান লাভ করেননি। করলে তাঁদেরও কিছুই চাওয়া-পাওয়া থাকত না। তাঁরা পাহাড়ের গোপন ডেরায় চলে যেতেন একেবারেই লোকচক্ষুর আড়ালে।

আড়ালে আজও তো অনেক অনেক মহাত্মার বাস। তাঁরা চুপিসাড়ে আছেন। বাহ্যিক জগতের বাইরে আছেন। এমন মহাত্মারাও আছেন সিদ্ধাসন, সুখাসন, বজ্রাসনে বসে জটা, দাড়ি কৌপিন নিয়ে— গুহার অল্পালোয় এঁদের মুখ দেখে ভারতীয় না তিব্বতি আন্দাজ করা শক্ত।

এক যোগি একবার আমাকে একখানি খাতা দেখালেন। মৎস্যাসন, শীর্ষাসন, ধনুরাসন, বক্রাসন, ময়ূরাসনের প্রাচীন এক লরলরে খাতা। বিবর্ণ মলিন সব চিত্র। খাতার ভেতর ছবিগুলোর পাশে পাশে প্রক্রিয়াগুলো সমস্তটাই লেখা। সেখানে কালিতে হালকা হওয়া অনুলোম-বিলোম, রেচক-পূরক -কুম্ভক যোগের পরিষ্কার কার্যকরণগুলো দেওয়া। যোগির আর ওটার দরকার নেই। তিনি দিয়ে দিলেন আমায়। আমি বুঝলাম তিনি সব পেয়ে গেছেন। আহার-বিহার নিয়ে চিন্তা নেই ওঁর। গুহা ছেড়ে কখনও বের হন না। শরীরগত যে বেগাদি— এই মলমূত্রদি ওঁর কিছু আর হয় না। বরফে যখন ঢেকে যায় গুহা, মিলিটারিরা বেশ অনেকখানি চানা ও মস্ত গাছের গুঁড়ি রেখে চলে যান গুহার ধারে। তিনি সেই গুঁড়ি জ্বালিয়ে নিয়ে গুহামুখটার বরফ কিছু সরিয়ে বসে থাকেন। আর কোনও কোনও বছর তাও বরফশুদ্ধ চাপাও পড়েন তিনি। গুঁড়ির সমিধ ফুরিয়ে যায়। কিন্তু তিনি তো ফুরোন না। আবার স্বাভাবিক দশায় ওঁর গুহাটি দেখা যায়। মানস সরোবর ছেড়ে আরও উত্তরে, কৈলাসনাথ থেকে বরফগলা জল যেখানে সরোবরের কাছে এসে ছোট ছোট পুকুর ও নালার রূপ ধরেছে সেখানে ওই সাধুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল সোমানন্দ অবধূতের। কথাগুলো তাঁকে ঘিরেই ছিল অবধূতের। তিনিই অবধূতকে এরপর গুহায় নিয়ে যান। খাতাটি দেন। সেই খাতার তাঁর যে আর দরকার নেই। যোগি তো তাঁকে পেয়েছেন। তাঁকে পেলে সব পাওয়া হয়ে যায়।

গীতার সত্য বাক্যটির গূঢ় সংকেত আবার সেদিন অনুভূত হল যেদিন যোগিবরের খাতাখানি অবধূত ঠাকুরের হাত হতে আমার জিম্বায় এসে পৌঁছলো। কাশীর সুমেরু মঠে তখন আর অবধূত থাকেন না। থাকেন বাংলায়, মল্লারপুর-বীরভূমের এক গহীন গাঁয়ের জঙ্গুলে হাতায়। ওঁর কুঠিয়ায় বসে যখন খাতাটি পেলাম, তুলে দিলেন তিনি যোগিবরের খাতা ও কিছু তন্ত্রপুঁথির সমাহার আমার গবেষণার কাজে ব্যবহার করার জন্য তখন বুঝলাম সব পেয়ে গেছেন ইনিও। কোনও কিছু আর তাই দরকার নেই অবধূত ঠাকুরের। তখনই শ্রীকৃষ্ণের মুখাবৃত শ্লোকটির সারসত্য আমি কিছুটা হলেও যেন ধরতে পারলাম, যং লবধবা চাপরং লাভাং মন্যতে নাধিকং ততঃ। যা পেলে মনে হবে আমার সব পাওয়া হয়ে গেছে! না হলে এসব ধরবার আমারই বা সাধ্য কী?

বসন্ত রাগ

দোলের দিন নবদ্বীপে মহাপ্রভুর মন্দিরে আরতি হয় বসন্ত রাগে। কস্তুরী, চন্দন, অগুরু মাখিয়ে নিবেদন করা হয় মস্ত গলার মালা। এদিন তাঁর জন্মানোর দিন। তাই নবদ্বীপে আজ আর তিনি দেবতা কিংবা কৃষ্ণের অবতার নন। আজ তিনি শচী মাতার কোল আলো করা সেই ছোট্ট নিমাই। সবে জন্মেছেন তো। তাই মহাপ্রভু নন, শিশু নিমাইয়ের হাতে আজ চুষিকাঠি ধরিয়ে দেন গোবিন্দ বাবাজি। এ মন্দিরে তিনি অনেকদিন আছেন। আগে থাকতেন সমাজবাড়ি। সমাজবাড়ির সঙ্গে বরাহনগর পাটবাড়ির মধুর যোগাযোগ। নবদ্বীপে সমাজবাড়ি প্রতিষ্ঠা করেন রাধারমণ দাস বাবাজি। রাধারমণ বাবাজির শিষ্য বৈষ্ণব পণ্ডিত রামদাস বাবাজি। তিনিই একসময় বরাহনগর পাটবাড়ির সংস্কার করিয়ে শ্রী ফিরিয়ে দেন। সমাজবাড়িতে আগে থেকেই মঞ্জরী ভাবের সাধনার চল ছিল। রামদাস বাবাজির সমসাময়িক ছিলেন সখী মা। তিনিই মঞ্জরী ভাবের সাধনা করতেন। এই সাধনা হত

নবদ্বীপের সমাজবাড়িতে। এর মূল বিষয় যেটি, শ্রীকৃষ্ণের ভজন সাধনে শরীরের মধ্যে নারীর গুণাবলী এনে তোলা। সখী মা আদতে ছিলেন পুরুষ। রাধারমণ বাবাজি তাঁকে এই নারীবেশের সাধন দেন। মহাপ্রভু মন্দিরের প্রবৃদ্ধ গোঁসাই হরিধন বাবাজি দেখেছিলেন সখী মাকে। রামদাস বাবাজি দেহ রাখেন পাটবাড়িতে। তার পর পরই সখী মাও চলে যান। হরিধন বাবাজির কাছেই শোনা, সমাজবাড়িতে তখন মঞ্জরী ভাবের সাধনা যোগ হয়েছে পুরোদমে। সখী মা মঞ্জরী ভাবের সাধিকা হিসেবে ললিতা দাসী নামেও পরিচিতা। নবদ্বীপে সমাজবাড়িতে ললিতা দাসীকে দেখেছিলেন অধ্যাপক ও অনুসন্ধানকারী বিশিষ্ট লেখক চিন্তাহরণ চক্রবর্তী। তিনি তখন কৃষ্ণনগর কলেজে পড়ান। সেখান থেকেই পুরুষ শরীরে নারীবেশের সাধনধারা নিয়ে থাকা ললিতা দাসীর নাম শুনে চিন্তাহরণ চক্রবর্তী ওঁর সঙ্গে দেখা করতে যান। ললিতা দাসী খুব শিক্ষিত মানুষ ছিলেন। নীলাচলের ঝাঁজপিঠা মঠে সমাজবাড়ির রাধারমণ বাবাজি তাঁকে নারীবেশী মঞ্জরী ভাবের সাধনা দেন। বরাহনগর পাটবাড়িতে একসময় রাধারমণ বাবাজির এই শিষ্যরই যাতায়াত ছিল। কেননা ওখানকার তৎকালীন মহান্ত রামদাস বাবাজির তিনি তো গুরুভাই। ললিতা সখী পুরুষবেশী নারী। বিশুদ্ধ তসরের শাড়ি পরতেন সকাল সকাল স্নান সেরে। তাঁর ছিল বিন্যস্ত লম্বা চুল। কপালে আঁকতেন চন্দনের টিপ। পায়ে দিতেন আলতা। ললিতা দাসী নূপুর পরতেন। হরিধন বাবাজি বলেছেন আমায়, ললিতা দাসী মহাপ্রভুর জন্মতিথিতে ভোর ভোর এসে শিশু নিমাইকে কোলে করে মাতৃবেশে হাতে চুষিকাঠি গুঁজে চুম্বন করতেন। শিশুর জামা বদলে নিতেন। দুধ খাওয়াতেন ঝিনুক বাটিতে করে। এই ছিল ওঁর সাধনা। সন্ধেবেলা যখন আরতি হত ললিতা দাসী বসন্ত রাগে গাইতেন, ভালি গোরাচাঁদের আরতি বাণী। তিনি যখন নেচে নেচে গাইতেন, জয় শচীনন্দন জয় গৌরহরি বিষ্ণুপ্রিয়া প্রাণনাথ নদিয়াবিহারী তখন তাঁর নূপুর

বোল তুলত ভীষণ। চিন্তাহরণ চক্রবর্তী দেখেছেন, ললিতা দাসী যখন মাথায় কাপড় টেনে নারীর ভূষণজনিত লজ্জায় ম্লান তখন তাঁর গালজোড়া পরিপাটি কামানো। পুরুষ থেকে নারী হতে লোকচক্ষুর আড়ালে সমাজবাড়ির সখী মা — ললিতা সখী— ললিতা দাসী দাড়ি গোঁফ কামিয়ে প্রস্তুতি নিতেন। তারপর সারাদিন ভগবানের সেবা। চললে বলনে পুরুষ থেকে নারী হয়ে ওঠা এই ধরনের সাধিকারা যে এখন আর নেই তাও তো নন। সমাজবাড়ির সেই সাধনা ছড়িয়ে গিয়েছে গোটা বাংলায়। আজও নিতাইরানি দরবেশ শাড়ি পরে গোবিন্দের ভজনা করেন। মুর্শিদাবাদের বাউলানি রাই খেপী নপুংসক অভিধা মুছে বাউল সাধনাতে রত। বীরনগর থেকে চূর্ণী পেরিয়ে সাধন আশ্রমে আছেন হিজড়া নারী পাপিলেশ্বরী। তিনি এলাকার মায়ের সম্মান পান এখন। যখন গবেষণার কাজে নবদ্বীপ যেতাম, পুরাণ পরিষদ ছেড়ে বেরিয়ে মহাপ্রভুর মন্দিরে আসতাম বাবাজির কাছে এই নারীবেশী পুরুষের সাধনকথা শুনব বলে। ললিতা দাসী ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। মিলনগড়ে আজও আছেন মহিয়সী মা। তিনি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের এম এ। পিএইচডি করেছেন সহজিয়া সাধন নিয়ে। করতে করতে সমাজবাড়িতে যাতায়াত। ললিতা দাসী দিয়েছেন তাঁকে মঞ্জরী ভাবের এই সাধনা। জানি না সমাজবাড়ির ধারায় মঞ্জরী ভাবের শেষ সাধিকা তিনি কিনা। পাটবাড়িতে এই সাধনধারা আর নেই। নবদ্বীপে সখী ভাবের সাধনা নেই। তবু আছেন মা মহিয়সী। আশি পেরোনো অশক্ত শরীরে তিনি দোলের দিন আসেন মহাপ্রভুর মন্দিরে। গলা সুরে খেলে না। তথাপি পায়ে নূপুর পরে তিনি বসন্ত রাগে শিশু নিমাইয়ের জয়গান করেন। দোলের পরদিন মহাপ্রভুর অন্নপ্রাশন। মন্দিরে সকালবেলা বেজে উঠবে বৃন্দাবনী সারাং। এমনই তিথিদিনে আমি সেবার গবেষণার কাজে নবদ্বীপে। মহাপ্রভু মন্দির থেকে বেরিয়ে যাব সমাজবাড়ি। সঙ্গে আমার পুরুষ থেকে নারী হয়ে ওঠা রাধারমণ

বাবাজির সাধনধারার সাধিকা মা মহিয়সী। বললাম যেতে যেতে, এই সাধনার মানেটা কী মা? বললেন, মঞ্জরী ভাব প্রচ্ছন্ন ভাব। গোপন ভাব। বিদ্যার অহং খসিয়ে পুরুষের পৌরুষ সরিয়ে নারী হয়ে আত্মবৎ সেবা। নিজেকে লুকিয়ে রাখতে হবে। নিজের স্বরূপ। অহংকার যেন না বেরোয়। জীবনেও এই সাধনা বড়। যেটুকু তুমি, যা তুমি, তোমার বিদ্যা শিক্ষা সব, গোপন করো। রংদোলের আবির গোটা নবদ্বীপে। তারই ভেতরে আমি কেবল দেখছি গোপনীয়তার রং। বিদ্যা শিক্ষার অহং সরিয়ে এক পুরুষ তাঁর শরীরে নারীর প্লাবন ধরে রেখেছেন এই একুশ শতকের চূড়ান্ত ভোগবাদের ভিতরে। আমরা তখন হাঁটছি সমাজবাড়ির পথে। হাওয়া দিচ্ছে বসন্তের। তারই ভিতর দূরে কোথা থেকে যেন ভেসে আসছে বসন্ত রাগের কীর্তন। দোলের নবদ্বীপের এটাও এক বৈশিষ্ট্য।

শ্রীপঞ্চমী

সরস্বতী পুজোর দিন শিলে বাটা কাঁচা হলুদ মেখে কুসুম কুসুম গরম জলে স্নান। আমার বড়মা বলতেন, আজ শ্রীপঞ্চমী। হলদি-স্নানে মানুষের শরীরে শ্রী ফেরে। গোটা শীতকাল জুড়ে শ্রী থাকে কাক-পক্ষীর শরীরে। চকচকে কালো রং নিয়ে কাক-পক্ষী আমাদের জামগাছে যখন এসে বসত, তখন বড়মার কথাগুলো সত্যি বলে মনে হত ছেলেবেলার মনে। শীতকালের খসখসে চামড়া শ্রীপঞ্চমীর হলদি-স্নানে উজ্জ্বল হবে। এ বিশ্বাস নিয়ে সেই হলদি-স্নানে বড়মার স্মৃতি ধরে রাখার রীতি বাড়িতে আজও তো আছে।

আমার ঠাকুমার কাল থেকেই বাড়িতে যে কোনও পুজোতেই পুরোহিত ঢোকে না। ঠাকুমা বলতেন, নিজের ঠাকুরকে নিজেকেই ডাকতে হয়। ছোটবেলায় শোনা কথাগুলো আজও মনেতে গেঁথে। সেই রীতি মেনেই আমাদের বাড়িতে সরস্বতী পুজো, লক্ষ্মী পুজোতে কখনোই কোনওদিন

পুরোহিত ঢোকেননি। আমাদের নিজেদের পুজো আমরা নিজেরাই করে এসেছি।

পুজোতে মায়ের ভোগ হয় গোবিন্দভোগ চালের খিচুড়ি দিয়ে। সঙ্গে ঘি-গরম মশলা দেওয়া আলুর দম। বেসন-জড়ানো বেগুনের পাতলা ফালি। খেজুর-কিসমিস-কাজু বাদাম দেওয়া চিনির রসে টমেটোর চাটনি। আর গোবিন্দভোগ চাল দিয়ে গুড়ের পায়েস। সমস্ত ভোগরান্না হয় চেখে। নুন-মশলা-ঝাল ঠিকঠাক হল কি না সবটাই চামচে তুলে দেখে নিই আমরা।

আমার বড়মা গল্প বলতেন শবরীর। রামচন্দ্রের প্রতীক্ষাতে বসে আছেন সাধিকা শবরী। সবুর করো, সবুর করো— শ্রীরামচন্দ্রের আসার অপেক্ষাতে রয়েছেন শবরী। তিনি নিষাদ রাজার মেয়ে। মহর্ষি মতঙ্গ মুনি রাজ্যকন্যাকে শিখিয়েছেন সাধনার নাম হল সবুর করা, অপেক্ষা করা। তাই নিষাদ রাজার মেয়ে অপেক্ষা করে আছেন ঈশ্বরপ্রতীম রামচন্দ্রের জন্য। অপেক্ষা করতে - করতে তিনি বৃদ্ধা হয়ে গেলেন। গুরু মতঙ্গ দেহ রাখলেন ওঁর তপবনের ভার শবরীর হাতে তুলে দিয়ে। শবরী সরোবর থেকে জল তুলে বনের পথ ধুয়ে রাখেন রোজ। বনফল তুলে একটু মুখে দিয়ে দেখেন সে ফলটা মিষ্টি কি না। মিষ্টি ফল হলে তিনি আর খান না। তুলে রাখেন ঈশ্বরের জন্য। এই গল্প বলে বড়মা আমাদের বলতেন, ভগবানকে সর্বশ্রেষ্ঠ জিনিসটা দিতে হয়। ভগবানের জন্য তাই রান্নাভোগ তুমি চেখে না দেখলে বুঝবে কী করে সেটা ভালো হল কি না? নুনে - পোরা, ঝালে - মোড়া কোনও জিনিস তো তুমি তোমার প্রিয়জনকে খাওয়াতে পারো না। ভগবান হলেন প্রিয়জন।ওনাকে খাওয়াতে গেলে খেতে দেবার আগে দেখে নেওয়া দরকার সেটা ভালো হল কি না। এই যুক্তি মেনেই আমাদের বাড়িতে রান্নাভোগ চেখে দেখার রীতি।

সরস্বতী পুজোর পরের দিন গোটাসেদ্ধ খাওয়ার একটা রীতি আছে আবার। ওই দিন শেতল ষষ্ঠী। গোটা ডাল, গোটা-গোটা সব সবজি মস্ত

লোহার কড়াইতে জ্বাল দিয়ে নামিয়ে রাখা হয় পুজোর দিনই। আস্ত নধর লাউ, পেঁপে, চালকুমড়ো, মিষ্টিকুমড়ো, বেগুন, রাঙা আলু, টমেটো, কাঁচাকলা, আলু, গাজর-বিট, গোটা মরিচ সব বিউলি, কলাই, মুগ, মটর, ছোলার পাঁচমেশালি ডালে সেদ্ধ হতে থাকে। এই রান্নাতে মশলা-তেল-হলুদ কিছু পড়বে না। কেবল নুন আর মিষ্টি। সর-পড়া সেই গোটাসেদ্ধ খাওয়া হবে শেতল ষষ্ঠীর সকালে। হাতা দিয়ে নরম সবজি সব কেটে-কেটে বাড়ি -বাড়ি দেওয়া চলবে গোটাসেদ্ধর বাটি। এ রীতির চল আছে আজও।

গোটা হলুদ, গোটা সেদ্ধ, একটা গোটা ছেলেবেলা ভরা আমার সরস্বতী পুজোর স্মৃতি, আজও একই ভাবেই ফিরে-ফিরে আসছে!

সাধুর প্রসাদ

উত্তরায়ণ সংক্রান্তিতে আখড়ায় আখড়ায় রান্নাসেবা চলে জগাখিচুড়িতে। পদ্মপাতার ওপর গরম গরম খিচুড়ি প্রসাদ বেড়ে দিচ্ছিলেন সাগরে আচার্য মামেশ্বর গিরি, নাগাদের জুনা আখড়ার প্রতিনিধি। মামেশ্বর নদিয়ার মানুষ। গেদে বর্ডার ঘেঁষে বাড়ি ছিল। তিনি জানেন না ওখানে এখনও তাঁর জ্যাঠাদের পরিবার থাকেন কি না। মামেশ্বর ঘর ছাড়েন আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে। আমার সঙ্গে প্রথম দেখা হয় গুপ্তকাশীর কালীমঠে।

কেদারেশ্বরের কাছে কালীমঠ অঘোরী সাধুদের প্রধান আখড়া। এখানে খেয়েছিলাম মায়ের ভোগে গমের পিঠা। খোসা ছাড়ানো গম দানাগুলো সেদ্ধ বসিয়ে দিলেন মুনিরাম অঘোরী, কাঠমাণ্ডুর অঘোর কুঠির প্রতিনিধি তিনি। অঘোরী সাধকদের এই কুঠি বহু পুরোনো আখড়া। অঘোরী বাবা সিং শাবক ছিলেন এই কুঠির প্রতিষ্ঠা। ওখানে দেখা হয়েছিল স্বয়ংসিদ্ধা মাতাজির সঙ্গে। তিনি অঘোরী পথে এলেও আগে ছিলেন বামাচারী গুরুর কাছে। তারাপীঠের সাধক শংকর বাবা তাঁকে রক্তাম্বর দিয়েছিলেন বলে তিনি অঘোরী পন্থাতে এসে আর ভেক বদল করেননি।

কালীমঠ, চিত্রকূটের দত্তাত্রেয় মন্দিরে ত্রিনাথ দর্শনে যেসব অঘোরীদের দেখেছিলাম সকলে কালো পোশাক পরেন। তন্ত্রের লাল বামাচারী, বীরাচারিদের। স্বয়ংসিদ্ধা মাঈ কাশীতে ছিলেন বেশ কিছুদিন। তিনি এক আশ্চর্য তথ্য দিয়েছিলেন আমায়। কাশীর অখণ্ড কাপালিক ধুনি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন কিনারাম বাবা। অঘোরীরা বলেন, ক্রীং ধ্বনি। ধুনির কাছটিতে নিয়ে গেলেন মাতাজি আমায়। বললেন, কিনারাম বাবা কা চরণ মে মাথা ঠেকাও।

প্রথম অঘোর গুরু কিনারাম বাবা। বাবার এক কল্পিত ছবি দিয়েছিলেন কাঠমাণ্ডুর অঘোর কুঠির মুনিরাম বাবা। সে ছবি এখনও আমার ঘরে আছে। কাশীতে কিনারাম বাবার সাধন আসনটি লোহার শিকল দিয়ে বাঁধা। মুনিরাম অঘোরী বলেছিলেন, আমার গুরুজি বলতেন মাটি ছেড়ে শূন্যে উঠে পড়ে কিনারাম বাবার আসন। সিদ্ধাই আসন ওপরে উঠতে পারে।

আসন দেখে ফেরার পথে মাতাজি বললেন, কৌল তান্ত্রিকেরা আগে শ্বেত বস্ত্র পরতেন। মায়ের প্রধান পূজকের বেশ ছিল লাল পাড় সাদা কাপড়। সহকারীরা রক্তাম্বর পরতেন প্রাচীন পূজায়। গুহ্য তন্ত্রের ক্রিয়াদি যাঁরা করেন তাঁরা নীল হলুদে রঞ্জিত বস্ত্র পরেন। কৌল তান্ত্রিকদের বর্তমান যে রক্তাম্বরের প্রচলন তার কোনও বিধান তন্ত্রশাস্ত্রে নেই রে বাবা। কোনও সাধক বোধহয় মায়ের রাঙা চরণের ভাবনা ভেবে নিয়ে পূজার সময় রক্তাম্বর পরে নিয়েছিলেন। সেই ধারা লোকপ্রিয় হয়ে গুরু পরম্পরা ধরে নেয়। এভাবে বামাচারীদের রক্তাম্বর। মাতাজি নিজেও রক্তাম্বরে রয়েছেন। হাতে ত্রিশূল।

মুনিরাম অঘোরী সিদ্ধ গমদানাগুলো গুড়ে জড়িয়ে দিলেন। আঠালো হয়ে উঠলে ওর মধ্যে দিলেন এক চিমটি কপ্পুর। তারপর কাঠের একটা পাত্রে

ঢেলে নিয়ে মণ্ড করলেন বেশ কিছু। তৈরি হয়ে উঠল গমের পিঠা। মায়ের ভোগে গমের পিঠার কড়া মিষ্টি স্বাদ এখনও যেন আমার মুখে লেগে!

উত্তরায়ণ সংক্রান্তিতে সূর্য মকররাশিতে সংক্রমিত করে। মামেশ্বর বললেন আমায়, এটা দেবযানের পথ বেটা। স্নান সেরে নেও। সাগরে ডুব দিয়ে আখড়ায় বসে পড়লাম সাধুদের সঙ্গে খেতে। জগাখিচুড়িতে ভেসে উঠছে ডুমো ডুমো কাটা কুমড়ো, অর্ধেক করা আলু, সবুজ মটরের দানা, চিউলি করা নারকেল। খিচুড়ি খাচ্ছি আর আমার মনে পড়ছে শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যা গৌরী মাঈয়ের কথা। মামেশ্বরও বলতে থাকলেন জগাখিচুড়ি দিয়ে গিয়ে পাতায় পাগল জগার কথা। তিনি কী মন পড়তে পারেন? না হলে কীভাবে ধরতে পারলেন আমি ভাবছি গৌরী মাঈয়ের করা সেই জগাখিচুড়ির রন্ধন প্রণালী!

হিমালয় থেকে ফিরেছেন গৌরী মাঈ। শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী শিষ্যদের সঙ্গে দেখা করবেন বলে তিনি গেলেন বরাহনগর মঠবাড়িতে। ভাড়া মঠ। ছেলেরা সাধনভজন করে। মাঈ মঠে না উঠে গঙ্গার ধারে বসে আছেন। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ঠাকুরের ভোগের সরঞ্জাম নিয়ে এলেন গঙ্গার ধারে। সেখানে বসে গৌরী মাঈ ভোগ রান্না করছেন। স্বামী বিবেকানন্দ দাঁড়িয়ে আছেন পাশে। ব্রহ্মানন্দ কড়াতে চাপিয়েছেন জগাখিচুড়ি। মাঈ বলছেন স্বামীজিকে, জগা নামে এক পাগলা ছিল। কালীঘাট মন্দিরের ধারে থাকত। সারাদিন পাগলামি করত আর রাত ছিল তার ভজন সাধনের। দিনের শেষে মাধুকরীতে যা পেত তা দিয়ে বানাত খিচুড়ি।

গৌরী মাঈ চাল, ডাল, তরকারি, ঘি, তেল, লবণ, লংকা সবই একসঙ্গে সিদ্ধ করে নামিয়ে নিলেন খিচুড়ি। বললেন বিবেকানন্দকে, নিবেদন করে আয়। নিবেদনের পর প্রসাদ পেতে বসেছেন শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যরা। মাঈ পরিবেশন করতে করতে বলছেন জগার কথা।

একদিন পাগলা জগা সৈনিকের ভেক নিল। গলায় টিন বেঁধে চিৎকার করতে থাকল, যম জিন্তে যায় রে জগা, যম জিন্তে যায়। সেই দিন মায়ের সম্মুখে সে নশ্বর দেহ ত্যাগ করে।

জগা পাগলা ছদ্মবেশে সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। কালীঘাটের পুরোনো মানুষেরা তাঁকে জানতেন। তাঁর বানানো রান্না ছিল লোকমুখে জগাখিচুড়ি।

মামেশ্বর জগাখিচুড়ির পাতে দিলেন টমেটোর চাটনি। সাধুরা সেবা নিচ্ছেন আর আমি ভাবছি দেবযানের পথ নিবৃত্তির পথ, গিরি মহারাজ বলেছেন তো! আমার প্রবৃত্তিপথ, যা কিনা পিতৃযানের। ও পথে ঘুরে ঘুরে রসদ সংগ্রহ করি, লেখার। আমি পুণ্যলোভাতুর মুক্তিকামী নই। সাধুর প্রসাদ পেতে ভালোবাসি।

মূলা প্রকৃতি

শ্মশান ডেরায় বসে মণিদ্বীপস্থ দেবীলোকের গল্প করছেন স্বয়ংসিদ্ধা ভৈরবী। মায়ের ভোগে আজ হয়েছে মুলো, শিম দেওয়া অহড়র ডাল আর চালের গুঁড়ি, মরিচ কুচানি দেওয়া ঝিরি ঝিরি করে কাটা মুলোর বড়া। প্রসাদ যেন অমৃত।

মাঘে মুলো খাওয়া চলে না। গতকাল গেছে মূলা নক্ষত্রযুক্তা পৌষী অমাবস্যা। মায়ের হোম হয়েছে শ্মশানে। ভৈরবী বলেন, ঊষর পৌষ মাসটা মায়ের মাস। পৌষে মা জাগ্রতা থাকেন গোটা মাস জুড়ে। অমাবস্যা আর সংক্রান্তির দিনে মা কালী আরও বিশেষভাবে জাগ্রতা হন।

শ্মশানকালী রণমত্তা। জন্ম, মৃত্যুর যুদ্ধ চলে সব সময় আমাদের ভিতরে। মায়ের আরতিতে যুদ্ধের ঢাক, ভেরী, কাঁসর, দুন্দুভি বাজাতে হয়। এগুলো সব রণবাদ্য।

রণবাদ্য বাজিয়ে আরতির পর ভৈরবী ভক্তের দেওয়া মূলো নিবেদন করলেন মাকে। জিজ্ঞেস করলাম, গোটা পৌষ জুড়ে মাকে মূলো দেওয়া হয়

কেন?

ভৈরবী তাঁর জটায় মানুষ পোড়া ছাই দিচ্ছেন তখন। ছাইয়ের তিলক কেটে দিলেন তিনি ভক্তদের কপালে। আমাকে বললেন, স্থূল দেহটার মৃত্যু না হলে সূক্ষ্ম দেহটা জাগে না। শ্মশানে আসতে আসতে মৃত্যুবোধ তৈরি হয়। মায়ের বীজ শ্মশানে এসে জপ করলে বেশ তাড়াতাড়ি উদ্দীপন ধরা দেয়। স্থূল দেহবোধটা কাটে। কৈবল্যদায়িনী কালিকা। মৃত্যুর কালিমা দিয়ে জীবনখানা সবার ঘেরা। মৃত্যুমাখা ছাই নিয়ে ঘরে রাখ কিছুটা। জপের আগে কপালে দিবি। মনটাকে শ্মশান করে জপে বসতে হয়। কালিকা হলেন জগৎ সংসারের মূল। মা স্বয়ং মূলা প্রকৃতি। মূলা নক্ষত্রের ঊর্ধ্বমুখীন দশাপ্রাপ্তি ঘটে সাধকের দেহে , যখন কুণ্ডলিনীর মূল জাগে। মূল আধার কালী। দেহ চক্রে মূলাধার দিয়ে কুণ্ডলিনী কালীতত্ত্বের শুরুয়াত। ঊর্ধ্বমুখীন দশাপ্রাপ্তি হলে দেবীলোকের আধার পাওয়া যায় রে বাবা। দেবীলোকে পুরুষ দেবতা নাই। দেবী সর্বত্তোম। ভালো করে দেবীভাগবত পড় গিয়ে। মূলা প্রকৃতির দশাপ্রান্তির কথা ওর ভেতর লেখা আছে। পৌষে মূলাযুক্তা নক্ষত্র জাগ্রত থাকে। মূলাধার যখন জাগে, মূর্তিমান হয়ে ওঠে নির্ঋতি।

জিজ্ঞেস করলাম, তিনি কে মা? স্বয়ংসিদ্ধা ভৈরবী বললেন, তিনি হলেন মূলা নক্ষত্রের মূর্তি। একেক নক্ষত্রে একেক মূর্তি জেগে ওঠে। তবে মূল মূর্তি মূলা জাগে পৌষে। মূলের চারপাশে ছড়ানো থাকে শাখা। মূলাধার হল তন্ত্রের ফলস্বরূপ। সে না জাগলে অপর কোনও চক্রাদির জাগার আর কোনও সম্ভাবনা নাই। মূলকে জাগাতে মাকে মূলো নিবেদন করতে হয়। এটা প্রতীকী বিদ্যার রূপারূপ রে। মূলা নক্ষত্রে মা জাগছেন। মা জেগে মূলাধারে শক্তির হুল ফোটাচ্ছেন। স্বাধিষ্ঠানে গিয়ে সাড়া মিলছে তখন। মূলা নক্ষত্র বসে আছে বৃশ্চিক রাশির ওপর। মায়ের মূর্তিকল্পে বিছের কল্পনা আছে। প্রাচীনা কালীমূর্তির দুই পা বেয়ে দুটি বিছে ওঠার কল্পনা আছে আমাদের গুরুকুলে।

জিজ্ঞেস করলাম, কোন কূল আপনাদের? ভৈরবী বললেন, গিরি পরম্পরার সাধক আমরা। ব্রহ্মানন্দ গিরি, পূর্ণানন্দ গিরি। নবদ্বীপের কালী সাধক ছিলেন পূর্ণানন্দজির শিষ্য। এটাই আমাদের গুরু পরম্পরা। আমার গুরুদেব আগমবাগীশ কালীর মূর্তিকল্পে দেবীর পুজো করতেন। আগমবাগীশ মায়ের দুই পা থেকে বিছে ওঠার কল্পনা রেখে মূর্তিতত্ত্ব লিখেছিলেন। মূলা নক্ষত্র ভয়প্রদা নির্ঋতির। নৈর্ঋত কোণে প্রেত, আত্মা সব জাগ্রত থাকে। শ্মশানে চিতা আসনে বসে এই কোণে নির্ঋতি দেবীর ভোগ দেওয়া হয় সংক্রান্তির দিন। মুলোভোগ হয় মায়ের। মূলকে রক্ষা করেন মা। নৈর্ঋত কোণের অতৃপ্ত আত্মারা সব পিতৃলোকের, আমাদের পূর্বপুরুষদের। মা রক্ষা করেন মূল, মূলাধার আর জাগতিক সম্পর্কের কূল। মৃত্যুরূপা শ্মশানকালী হলেন মূল। সাধনার মূলও মূলাধার। পৌষ জুড়ে মূলা নক্ষত্র বৃশ্চিকরাশিতে দাঁড়িয়ে থাকে। বিছের হুলটি হল মূলাধারের শক্তি। বিছে উঠছে কুণ্ডলিনী সাধনে। পৌষের মূলা নক্ষত্রে বিছে উঠতে থাকে হু হু করে। পৌষের সাধনা মূলা প্রকৃতির সাধনা।

ভৈরবী মা প্রসাদ বিতরণ করছেন সন্ধ্যারতির, মুলোভাজা। কাল সংক্রান্তিতে মায়ের মৃত্যুরূপা আধারের সমাপন হবে। দেহের মৃত্যু ঘটিয়ে সাধক তান্ত্রিকেরা সব বসবেন বিদেহ ভাবনায়।

বৌদ্ধ তান্ত্রিক পুথি কড়চা

আমার থিকাও দুঃখী
যমুনার নদীর কিনার।
আমার তো গ্যাছে এক,
কত কোটি লক্ষ গ্যাছে তার।।

দীনেশচন্দ্র সেনের "The History of Bengali Language and Literature" বইটিতে বাংলা সাহিত্যের আদিপর্বে বৌদ্ধ প্রভাবের বাতাবরণটি এসেছিল মৃদু স্বরে। লৌকিক উপাদান ধরতে দীনেশবাবুকে ওঁর আলোচনা তখন গোপীচন্দ্রের গান, ডাক-খনার বচনগুলার উপর নির্ভর করতে হয়েছিল। কেননা তখনও তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের কড়চা-পুঁথিগুলো হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মশায়ের হস্তগত হয় নাই। নেপাল ও তিব্বতে রক্ষিত বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থের পুথি-কড়চার দিকে সর্বপ্রথম অবশ্য চোখ পড়ে ব্রিটিশ গবেষকের। Brian Hodgson প্রথম নেপাল গিয়ে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের কিছু পুঁথি-কড়চা খুঁজে পান। তার পর বিস্তৃতভাবে এ বিষয়ে কাজ শুরু করেন সেই ইংরেজ গবেষকরা। Eugene Burnouf, Daniel Wright G Cecil Bendall-দের কাজের সঙ্গে সঙ্গে রাজেন্দ্রলাল মিত্রও তখন বৌদ্ধ তান্ত্রিক পুঁথি-কড়চার খোঁজে নেপাল যান। তিনি সংস্কৃত ভাষায় লেখা একটি পুথির তালিকাও তখন পেশ করেন। ওঁর মৃত্যুর পর বাংলা-বিহার-অসম-ওড়িশার পুঁথি সন্ধানের দায়িত্ব গিয়ে পড়ে সরকারিভাবে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মশায়ের ঘাড়ে। তিনি রাজেন্দ্রলালের তালিকা পর্যবেক্ষণ করে তিন তিনবার নেপাল দৌড়ান। সেখানকার রাজকীয়

গ্রন্থভাণ্ডার থেকেই উদ্ধার করেন 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়', 'সরহপাদের দোহা', 'আচার্যপাদের মেখলা'। এই তিন পুঁথিকে তাঁর প্রাচীন বাংলা ভাষা বলেই মনে হয়। তিনখানি পুঁথির সঙ্গে ডাকার্ণবের পুঁথি ঢুকিয়ে তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গলা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোঁহা' প্রকাশ করেন ১৯১৬ সালে। সেই নিদর্শিত চর্যাগানের এবার জাগরণ ঘটল আবার ঠিক একশো বছরের মাথায়।

২০১৬ সালে ঢাকার ভাবনগর আখড়া ভুলে যাওয়া সেই চর্যাগানেরই ৫০ টি পদকে সমকালীন বাংলা রূপান্তর ঘটিয়ে সংগীতাকারে পরিবেশনাতে নামে। সাদা পোশাক পরে অর্ধ বৃত্তাকারে বসে হাতে একতারা তবলার পেলাম করে, দোতারা, খঞ্জনি, হারমোনিয়ম বাজিয়ে বাংলাদেশের নওগাঁর পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহারে প্রদীপ জ্বালিয়ে চারধার আলোকিত করে ভাবনগর পরিবেশনা করে। পরবর্তীতে ঢাকা, চট্টগ্রামেও ভাবনগর আখড়ার চর্যাগানের পরিবেশনাটি ছড়িয়ে পড়ে। ভাবতে ভালো লাগে, অষ্টম শতকে এই সোমপুর বিহারেই সিদ্ধাচার্য হিসেবে বসবাস করতেন চর্যাগানের প্রাচীন সব সাধক কবিরা। কাহ্ন পা, ভুসুকু পা, শবর পা, বীণ পা-দের সেই সব তত্ত্বগানই তো পরিবেশিত হচ্ছে তাঁদেরই সাধন বিহারে। লুই পাদের কাঅ তরুবর গানখানি ভাবনগর আখড়ার মরমিয়া গাহকরা সব পরিবেশন করছেন সম্মিলিত কণ্ঠে ভাওয়াইয়া ঢঙে। একুশে পদকপ্রাপ্ত লালনপন্থী সাধক কবি বাউলশিল্পী খোদাবক্স শাহ ফকিরের নাতনি বাউল সাধিকা সৃজনী তানিয়ার হাতে একতারা। দোতারার বোল অনন্ত সরকারের হাতে। তবলার পেলাম ধরেছেন শাহ আলম দেওয়ান। খঞ্জনি বাজাচ্ছেন সরকার হীরক রাজা। হারমোনিয়ামে রবিউল হক। প্রদীপ জ্বালছেন নাদিরা ইসলাম। সকলেই গাইছেন একের পর এক চর্যা— শরীর গাছে পাঁচখানি ডাল, এ ভব নদী গম্ভীর বেগে, মোহ কেটে যেই লাগাই তিনটি পাট। আখড়ার একপাশে শান্ত নিমগ্ন দৃষ্টি নিয়ে

তখন বসে সৃজনী তানিয়ার সাধনসঙ্গী, লোকগবেষক, চর্যাগানগুলার অনুবাদক ও সুরকার সাইমন জাকারিয়া। তানিয়া গাইছেন— কাঅ তরুবর পঞ্চবি ডাল। চঞ্চল চীএ পইঠো কাল।

... ...

বৈষ্ণব-সহজিয়া-বাউল সাধনায় দিনাজপুরের একটি ইতিহাস রয়েছে। এখানেই বিস্তার কায়াবাদী হীনযান বৌদ্ধদের। হিন্দু ও মুসলমান জনসংখ্যার চাপে দিনাজপুরে ক্রমে ক্রমে তারা অত্যন্ত স্বপ্ল ও হীনবল হয়ে পড়ে। শেষপর্যন্ত এরাই বোধহয় এখানকার নেড়ানেড়ি। যাদের যুগল সাধনায় ইন্দ্রিয়-রিপু তথা কাম জয়ের কৌশল বৈষ্ণব-সহজিয়া-বাউল সাধনার সাধুগুরুদের পর্যন্ত আলোড়িত করেছিল। রাজশাহী-খেতুরির জমিদার কৃষ্ণানন্দ মজুমদারের সর্বত্যাগী পুত্র বৈষ্ণব সন্ন্যাসী নরোত্তম ঠাকুরের উদ্যোগেই তখন খেতুরি জমজমাট। বিরাট বৈষ্ণব সম্মেলন। সেখানে উপস্থিত নিত্যানন্দ প্রভুর দ্বিতীয় পত্নী জাহ্নবা দেবী, প্রথম পত্নী বসুধার ছেলে বীরভদ্র সহ গোটা দেশের উজ্জ্বল বৈষ্ণবাচার্য ও বৈষ্ণব মণ্ডলী। বৃন্দাবনের প্রতিনিধিরাও আছেন। দিনাজপুর রাজশাহী সংলগ্ন এলাকা। এই বৈষ্ণব সম্মেলনের প্রভাব এখানকার হেজেমজে বৌদ্ধ হীনযান সোঁতার নেড়ানেড়িদেরও ওপর পড়ে নিত্যানন্দের পুত্রের বৈষ্ণবদের দলভারীর লক্ষ্যমাত্রায়। তিনিই খেতুরির বৈষ্ণব মহাসম্মেলনে উপস্থিত হয়ে নেড়ানেড়িদের বৈষ্ণব সমাজের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। কায়াবাদী দেহসাধনা, সহজিয়া বাউল সাধনা বৈষ্ণব সমাজে মিশে গিয়ে পরবর্তীতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবতায় কেলেঙ্কারি পাকায়। গৌড়ীয় মহাজনেরা এদের সহুজে, পাষণ্ড, ভ্রষ্ট, কদাচারী, আখড়ায় সেবাদাসী নিয়ে থাকা ব্যভিচারী মানুষ বলে দেগে দিয়ে নিজেদেরকে এদের থেকে আলাদা করতে থাকেন। সেই প্রয়াস আজও

তো জারি। অবিভক্ত দিনাজপুরেও এরপর স্বাধীনতা আসে। স্বাধীনোত্তর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের পশ্চিম দিনাজপুর অধুনা দক্ষিণ দিনাজপুরও তো হয়ে ওঠে। এসবের ভিতরই কিন্তু দেহসাধনার মুখ্য যাজন চলতেই থাকে। বৌদ্ধ হীনযানের পরকীয়া আর রাজা ধর্মপালের রাজত্বকালের মখাসুখবাদ কায়াকর্মও প্রবর্তিত সহজিয়া - বাউল সাধনে লেপ্টে গিয়ে শেষমেষ চৈতন্যদেবের ধর্মে মহিমান্বিত হয়ে পড়ে সহজিয়া বৈষ্ণববতার অভিমুখগুলো গড়ে ওঠার সহায়ক দিকে তরতরিয়ে এগোতে থাকে।

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট ব্লকেই আছে বাউল গ্রাম। এই পুরোনো জায়গায় স্বভাবতই যাতায়াতের জনশ্রুতি লেগে আছে প্রসিদ্ধ সাধক মহাজনদেরও। যাঁদের অন্যতম লালন ফকির সাঁই, খ্যাপাচাঁদ আউল, কাঙাল হরিনাথ। দিনাজপুরের বাউল গ্রামের সঙ্গে তো আবার নাথপন্থার চুরা সিদ্ধ সাধকদের অন্যতম নাঢ় পণ্ডিত ও তাঁর সাধনসঙ্গিনীর ইতিহাস জড়িত। গ্রামের জোলা - তাঁতিরা নাথধর্মে আসেন। ইসলামপন্থার সঙ্গে নাথদের সাধনা জড়িয়ে যায়।

বাউল গ্রামের গা-ঘেঁষা জগন্নাথবাটি গ্রামে এখনও জোলা - নাথদের সেই উত্তরপুরুষদের বসবাস রয়েছে। তবে নাথদের কায়াবাদী সাধনধারা এঁদের ভেতরে আর নেই। বাউল গ্রামের আশেপাশের গ্রাম হল রামকৃষ্ণপুর, খরাইল, মল্লিকপুর, বোল্লা, বদলপুর। সব গ্রামগুলোতেই এখনও বৈষ্ণব - সহজিয়া, বাউল কায়াবাদী মহাজনদের যাতায়াত।

দিনাজপুরের গায়ে গা লাগানো মালদহের রামকেলি। এখানেও তো চৈতন্যধূলির কমতি নেই। রামকেলির প্রসিদ্ধ জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তি তিথির মেলা এলেই এখানে আগত বাউল - ফকির - দরবেশের দল আসা-যাওয়ার পথে আজও বাউল গ্রাম ও তার আশেপাশের সাধুগুরুদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করতেই থাকেন।

সেবার রামকেলি হয়েই বাউল গ্রাম গিয়েছিলাম। কাছেপিঠেই তো তপন থানার অদূরবর্তী গাঁ নাগরাকুড়ি। নাগরাকুড়ির আলাদা একটা ইতিহাস আছে। আর ওখানেই আমার উৎসাহ। নাগরাকুড়ির ইতিহাস ধরেই পরবর্তীতে দিনাজপুরের এই সহজিয়া-বৈষ্ণব-বাউল এলাকাগুলোতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবতার প্রবেশ। এসব এলাকায় বরাবরই নাথপন্থা, বাউল, সহজিয়া ধর্মের প্রভাব। পরে যোগ হয় ইসলামীয় সুফি তরিকা। সমাজপতিদের রোষ দেহসাধকদের প্রতি। বাড়-বাড়ন্ততে সমাজচ্যুত, একঘরে হওয়ার অহরহ বৃত্তান্ত।

এর ভিতরই নবদ্বীপের টোলে শিক্ষাপ্রাপ্ত হরিদাস বাবাজি নাগরাকুড়িতে ভিটেবাড়ি করে ফেলেন। অদ্বৈত ঠাকুরের বড় ছেলে অচ্যুতানন্দের বংশধর হলেন বাবাজির পিতৃপুরুষ। হরিদাসের সঙ্গেই বিয়ে হয় পাশাপাশি গ্রাম মল্লিকপুরের বৈষ্ণব সাধক সাতকড়ি মোহান্ত মহারাজের একমাত্র মেয়ের। এটা স্বভাবতই গৌড়ীয় বৈষ্ণবতার প্রসার আড়ে-বহরে বাড়াবার এ এক করণকৌশল। এরপর গৌড়ীয় দর্শনের প্রভাব বাউল ভজনাতে পড়তে শুরু করে।

আমি তখন যেতাম বোল্লা গ্রামের যতীন দাস বাউলের কাছে। এলাকায় তিনি যতীন সাধু হিসেবে পরিচিত। বছর পাঁচ বোধহয় হয়েও গেল যতীনের চলে যাওয়ার। এখন বাউল গ্রাম বোল্লা জুড়ে রয়েছে যতীন সাধুর বায়েতরা। গোপেন দাস বাউল, হেমেন দাস, হরেন বর্মন, বিদেশি উরাও— এঁরা সব যতীনকে মুর্শেদ মেনেই বাউল সাধনা চালিয়ে যাচ্ছেন।

যতীন সাধুর মুখেই প্রথম শুনি বলহরি দাসের কথা। তিনি ছিলেন দেশত্যাগী বাউল। রাজশাহীর মানুষ। লালন ঘরানার সাধক। তাই তো সাদা পোশাক ওঁর। কুষ্টিয়া-পাবনা-রাজশাহীতে বাউলখেদা শুরু হলে বলহরি

উদ্বাস্তু হন, এদিকে চলে আসেন। দিনাজপুরেও তাঁর অনেক শিষ্য-বায়েত। গোটা উত্তরবঙ্গে বলহরি আসলে বাউল সম্রাট।

যতীন সাধু বলেছিলেন, দ্যাখো নাই তো তেনার নাচ, যাত্তার দলে মেয়ে সাজতে। কথায় চলনে বলনে সেই ছাপ এসে গেছিল। ডান হাতে একতারা নিয়ে, বাঁ হাতে কোমর ধরে যাত্তার রানিদের মতো নাচতেন তো তিনি।

বললাম, ওঁর সাধনসঙ্গিনী ছিল না?

বললেন, কী করে থাকবে! মেয়ে সেজে থাকতেন তো। গান গাইতেন ওই নারীবেশেই দেশভাগের আগে। ওঁর নারীসত্তা দেখেই বোধহয় গুরু কুতুব আলি আর কায়াসাধন দেননি। মেয়ে সেজে গাইতে গাইতেই তো যাত্তার দলে ডাক।

বললাম, আপনার জীবনে ওঁর প্রভাব কী?

বললেন, এদিকে পাল্লাগানে দখল না থাকলে বাউল হওয়া যায় না।

জিজ্ঞেস করলাম, বলহরি দাস পাল্লা গাইতেন শাড়ি পরে?

যতীন সাধু বললেন, না গো, নারীঢঙ্গে বেটেখাটো মানুষটিকে আমি কিন্তু শাড়ি পরে গাইতে দেখিনি। লালন ঘরের সাদা পোশাকই পরতেন। গুরু-শিষ্য, ভক্ত-ভগবানের পাল্লাদারি গান আমি ওঁর ধারেই শিখেছি।

বললাম, সাধনা সম্পর্কে কী বলতেন তিনি?

বলতেন, সাধনায় অধিকারী ভেদ দরকার। গুরু এটা ধরতে পারেন। আমার আছে ফল্গুধারা মেয়ে মানুষের। মুর্শেদ বলতেন ওকে গৌরপদে মতি রাখতে।

বললাম, কীরকম?

বললেন, তিনি বলতেন তত্ত্বজ্ঞানের দীক্ষাশিক্ষাটাই আসল। ওই তো শরীর চেনায়। তত্ত্ব থেকেই ভাব। ভাব এলেই দেহবোধ। দেহবোধেই চৈতন্য রাধারানি। সখীর সাজ তো পরেননি। তবে...

বললাম, তাই বোধহয় যাত্রা দলে প্রয়োজন ফুরোলে তিনি সাজ খুলে ফেলেন।

যতীন সাধু বললেন, সাজ তো আসলে রিপুজয় ইন্দ্রিয়ের। ভাব বা করণে সেই অমৃত্বের সন্ধানটাই আসল জানেন। তিনি পেরেছিলেন। করণ গাইতেন খুব। দাঁড়ান আপনেরে শোনাই।

একতারা তুলে নিলেন যতীন সাধু। গাইতে থাকলেন,

ভাবের ভিতর পশবি যখন

দেশকে যাবি চলে

বোল্লা, বাউল গ্রাম, বদলপুর, পার্বতীপুর, বড়া, রামপুর এখন আর নয় জঙ্গলাকীর্ণ। খুব কম সাধকদের ভজনকুঠি। তবু তো সাধনা আছে। আছে উত্তরবঙ্গে বাউলের আলাদা বেশ ও প্রণালী — চৈতন্যদেবে ভক্তি, প্রেম, প্রাপ্তি ও ইতিহাসেরই কথালাপ,

হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ

যাদবায় মাধবায় গোবিন্দায় নমঃ

... ...

গৌরগঙ্গার দেশ নবদ্বীপ। রাস পূর্ণিমার পেতলের জামবাটির মতন সাইজের চাঁদ মাথার উপরে নিয়ে ওই ঐশীভূমিতে হাঁটতে হাঁটতে ভাবি, নবদ্বীপের রাসে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের প্রবল অস্বস্তির কথা। তিনিও এসেছিলেন গৌরভূমির রাসমেলা দেখতেই। মেলায় ঘুরছেন। আখড়ার ভিতরে ঢুকেই তো তাঁর সেই পৌরুষত্বে মেশা অস্বস্তির সূত্রপাত। সুনীতিবাবু দেখলেন বলিষ্ঠ লোমশ এক পুরুষ শাড়ি - ব্লাউজ, কপালে টিপ, পায়ে আলতা, সিঁথিতে চওড়া সিঁদুর, সারা গায়ে গয়না চড়িয়ে ঘোমটা টেনে সবল দু'হাত তুলে রাধাভাবে নাচছেন। সুনীতিবাবু বলছেন, তাঁর জুগুপ্সা হচ্ছে এই

অশ্লীলতায়। বুঝতে পারি আমি সুনীতিবাবুর ঔপনিবেশিক পৌরুষত্ব সেই অশ্লীলতায় বৈষ্ণব সাধনার পচনে ধাক্কাই খাচ্ছে। একই অবস্থা বিনয় ঘোষের। তিনি আবার ঘোষিত অতিবামপন্থী কায়দার মানুষ। তাই নবদ্বীপের রাস নিয়ে বেশ রসিয়ে রসিয়ে লিখেছেন তিনি। আর আশ্চর্য এক যুক্তিও পেশ করেছেন বিনয়বাবু। ওঁর যুক্তি, বাংলার সমাজ মোটের ওপর শাক্ত পৌরুষত্ব থেকে বৈষ্ণবীয় বিনয়ভাব ধারণ করার জন্যই ধসে গিয়েছে। বিদেশিরা বাংলাকে পদানত করতে পেরেছে। নবদ্বীপবাসী চৈতন্যদেবকে এখনও তো বলে থাকেন, ধামেশ্বর। নবদ্বীপে কোনও গোস্বামী বাড়ির দোল ঠাকুরের রাসমঞ্চে তাই হয়ও না। আগে ধামেশ্বর গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে দোলানো হত বলে প্রবীণ গোঁসাইদের মুখে শুনেছি। এখন আর সেটাও হয় না। নবদ্বীপে এখনও তো গোস্বামীভেদ আছে। চৈতন্য মহাপ্রভুর দ্বিতীয় শ্বশুরবাড়ি বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর ভাই মাধবাচার্যের বংশধরেরা হলেন বৈদিক ব্রাহ্মণ। বৈদিকতার ভিতর আবার শাক্ত - ছোঁয়া লেগেছে। এখনও এই বংশ শাক্তমন্ত্রের উপাসক। এঁরাই গোটা নবদ্বীপে তো মহাপ্রভুর সেবাইত বলেই পরিচিত। চৈতন্যদেবের বাবা জগন্নাথ মিশ্র দাক্ষিণাত্যের বৈদিক ব্রাহ্মণ। অদ্বৈতাচার্যের বংশধরেরা বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ। যে কারণে শান্তিপুরের গোঁসাইদের সঙ্গে নবদ্বীপের গোঁসাইদের আজও বৈবাহিক সম্পর্ক হয় না। নিত্যানন্দ আবার রাঢ়ী শ্রেণির ব্রাহ্মণ। তাহলে দাঁড়ালো আচণ্ডালে প্রেম বিলোনো তিন গুরুঠাকুরই আদতে ব্রাহ্মণ দলভুক্ত— বৈদিক, বারেন্দ্র, রাঢ়ী। আর এখান থেকেই বাংলার বৈষ্ণবতায় ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব আর শূদ্র বৈষ্ণবদের আগমন। ভেদাভেদ। অধিকারী, আচার্য, ভারতী, দাস, দেবাধিকারী, দেবগোস্বামী, মহান্ত, পুরী, আচারি, পণ্ডা, সাধু, ঠাকুর, ব্রজবাসী, উপাধ্যায় — এই পদবিগুলো সব হল বর্ণাশ্রমী উচ্চবর্ণের বৈষ্ণব গুরুদের। জাত বৈষ্ণবরা আবার শূদ্র বৈষ্ণবদের নিচের থাকে। বৈষ্ণব হরিভক্তদের এই ভেদজ্ঞান

নদিয়ার তিন পাগল অদ্বে, নিতে, চৈতেও ঘুচিয়ে যেতে পারেননি। তাঁরা যেটা পেরেছিলেন প্রেমধর্মে ভাবাবেগটা দিতে। বাংলার সাধনা সেই ভাবাবেগ নিয়েই দাঁড়িয়ে আছে। শ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রা সেই ভাবাবেগেরই ব্যাপার।

বর্ধমান জেলার পাঁচলখিতে থাকেন যাদুবিন্দুর বংশ। সে গাঁয়ে গোঁসাইয়ের দৌহিত্র বংশের নাতি এখন যাদুবিন্দুর সমাধি আগলান। তিনি বললেন, দেহভাণ্ডেই তিন রাস। গোঁসাই এটাই বলে গেছেন।

বললাম, কোথায়?

গেয়ে উঠলেন এবার হরেন্দ্র গোঁসাই,

আগে গুপ্তিপাড়া ছাড়ো রে মন
তবে শান্তিপুর যাবি সদা আনন্দে রবি।
আছে শান্তিপুর নদে কথা নয় সিধে
তেঘরি নদিয়ার মাঝে বিষম গোল বাধে
তোমায় করি বারণ তেঘরি যেয়ো না মন
মজা দেখাবে সে রাজার শমন
শেষকালে কোবলাতে ভ্যাবলা হবি।
সেই গুপ্তিপাড়া গোপন বৃন্দাবন
চন্দ্র যেমন করে রয় গোপন আসন
সাধকের কাছে রে তার সন্ধি পাবি।

শেষে বললেন গোঁসাই, কী বুঝলেন? বলেন এবার।

বললাম, আপনার ব্যাখ্যা শুনি।

বললেন, শরীরটাই রাস। ওখানেই সহস্রার চক্রে নিত্যরাস। অনাহত ভক্তিরাসের জায়গা। মূলাধার ভাঙারাসের জমি। যার জন্য শেষমেষ শান্তিপুর ছোটাছুটি। আমি একবারও যাইনি বুঝলেন।

বললাম, ইচ্ছে করেনি ভাঙারাস দেখতে? খুব তো জাঁক হয়। নবদ্বীপের রাসে ছেলেরা মেয়ে সেজে নাচে।

গোঁসাই বললেন, রাস মানে রস। সহস্রারে পৌঁছালে বৃন্দাবনধাম, নবদ্বীপ অনাহতে, মূলাধারে শান্তিপুব— শান্তিপুর নীচের ব্যাপার, নবদ্বীপ সাধন পর্বের— অনাহত নাদধ্বনি শোনার জন্য। সেজন্যই সাধকেরা নারী সাজেন। এটা জ্ঞানচর্চা তো নয়। ভাবচর্চা। পণ্ডিতেরা ধরতে পারবেন না।

চমকে গেলাম আমি এবার গোঁসাইয়ের কথায়। সুনীতিবাবু, বিনয়বাবু এই ভাবটাই ধরতে পারেননি। পুরুষের এই নারী হয়ে ওঠার ভাব।

পুরুষের বুকে তো স্তনবৃত্ত থাকে, তার কী খুব প্রয়োজন? তা থাকার দরকার ছিল না। ভাবচর্চায় পুরুষের ওই স্তনবৃত্তেরই কেবল মানে আছে। বাংলার গৌণধর্মের গুরু - গোঁসাইরা এই মানেটা বুঝেছে। বিবর্তনের ইতিহাস সূত্রে ব্যবহার - অব্যবহার্য মেনে পুরুষের বুকে নারী আদলের ওই স্তনবৃত্ত থাকার দরকার কী? তার তো একটা মানে থাকবে!

সেই মানেটা কিন্তু আমরা ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্তরা যাকে গৌণধর্মের মহাজন বলছি তাঁরা অনেকদিন আগেই বুঝে নিয়েছেন। পুরুষের বুকে স্তনবৃত্ত রয়েছে তার মানেটা করেছে বাংলার ভাবধর্ম।

নবদ্বীপের রাসে আখড়ায় বলিষ্ঠ পুরুষ আঁচল দিয়ে আগলাচ্ছেন তাঁর বুক, স্তনভার— এর ভাবার্থ শুধু জ্ঞানচর্চা দিয়ে বোঝা তো কোনওভাবেই সম্ভব নয়। সুনীতিবাবুরা আজও তো আছেন। কবে বুঝবেন!

... ...

গোপীশ্বর শিবের গাজন কেবল বৈষ্ণবভূমি বাঘনাপাড়া তো নয়, এখন গোটা রাঢ়েই প্রসিদ্ধ। এই গাজনে মূলত নাথ যোগিদের অংশগ্রহণ বা পৌরহিত্য। বৈষ্ণব গোঁসাইয়ের দেবমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত শিব আর তার বার্ষিক

উৎসবে দেবপ্রণামীর অধিকারী নাথ যুগি। যোগ সাধনায় অতীন্দ্রিয়বাদ থেকে নাথ যোগিদের টেনে নামিয়ে বাংলার মহাজন আর উচ্চকোটির সংস্কৃতির কারবারিরা ওদের নিম্নবর্গীয় যুগি করেছেন সে তো কবেই। যুগিরা এখন পিছিয়ে পড়া। গরিব মানুষ। সম্ভ্রান্ত গোস্বামীদের বাঘনাপাড়া বসতি তাদের খেদিয়ে ছেড়েছে। জায়গা হয়েছে গরিব যুগিদের বৈষ্ণবপাড়ার পশ্চিম দিকে রাধানগর বলে এক টুকরো জায়গায়। এখানে তারা তো এখন ধর্মশিলার পুজো করে। ডিমের আকারের অর্ধেক এক পাথর নাথ যুগিদের ধর্মরাজ। ওদের শিব বাঘনাপাড়ার গোস্বামী মহাজনেরা দখল করে নিয়েছেন। গাজনের দিনই কেবল যুগিদের শিবপুজোর ছাড়পত্র মেলে। আদতে নাথ যোগিরাই তো বাঘনাপাড়া এলাকায় প্রতিষ্ঠিত সম্ভ্রান্ত এই শিবের দাবিদার। বৈষ্ণবপাড়ায় শ্রীপাটের রমরমায় গোস্বামীরা একদিন নাথ যোগিদের যুগিতে পরিণত করে শৈবাচারকেও নিজেদের এক্তিয়ারভুক্ত করে নিলেন বৈষ্ণব শাস্ত্রেরই বোল বলে। ইতিহাস বলে, নাথেরা এককালে সম্পন্ন ছিলেন। তাঁদের এই শিব ঠাকুর সেন রাজাদের কুলদেবতা। নাথ যোগিরা পরে এর অর্চনা শুরু করেন। বাঘনাপাড়া বাংলার বৈষ্ণবতার একটি প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠলে পুরোনো শিবের মন্দির অবস্থাপন্ন গোস্বামীদের হেফাজতে চলে যায়। পড়তি অবস্থায় নাথেরা বিতাড়িত হয়ে যোগি থেকে তখন পিছিয়ে পড়া যুগি। এই যুগিরাই এখন বাঘনাপাড়ায় শিব বন্দনার সুযোগ পায় বাৎসরিক গাজন উৎসবে। বাদবাকি তিনশো চৌষট্টি দিন গোপীশ্বর শিব পুজো নেন গোস্বামীদের নিয়োগ করা ব্রাহ্মণ ঠাকুরদের হাত থেকে।

শিব হারিয়ে যুগি নাথেরা শুরু করে ধর্মঠাকুরের পুজো। বাঘনাপাড়ায় বল্লুকা নদীর ধারে তখন ধর্মরাজের আখড়া। এ আখড়াও ছিনিয়ে নিতে উঠে পড়ে লাগলেন গোস্বামী মহাজনেরা। বৈষ্ণব শ্রীপাটের প্রতিষ্ঠাতা রামাই পণ্ডিতকেই ধর্মপূজার প্রবর্তক ও পূজারি বানিয়ে তাঁর নামেই লিখে ফেললেন

পুথি ''ধর্মপূজাবিধান''। রামাই ঠাকুর হলেন যুগি নাথদেরও ধর্মপূজার আদি প্রবক্তা। তাঁর নামে তাই ''ধর্মপুরাণ'', ''ধর্মমঙ্গলের'' অন্তর্ভুক্ত ''শূন্যপূরাণ'' পুঁথিটিও মেলে। দুটো বই - ই এখনও সহজলভ্য। ''ধর্মপূজাবিধান'' ননীগোপাল গোস্বামী সম্পাদনা করেছেন। এবার ''শূন্যপূরাণ'' বের করেছেন বিবেকানন্দ বুক সেন্টার। নাথদের বল্লুকা এখন মরা সোঁতা। বল্লুকার বাঁওর আছে। রাধানগরে আছে যুগি নাথদের ধর্মমন্দিরের থান।

একমুখলিঙ্গ গোপীশ্বর শিব। এই মূর্তি পাল যুগের শেষ, সেন যুগের শুরুয়াতের সময়কার। এর তাই এখন প্রত্নতাত্ত্বিক একটি গুরুত্বও আছে। মূর্তির রুদ্রভাগে পদ্মাসনে একটি দশভুজের প্রতিকৃতি। দশবাহুর দেখা মিলছে বলেই দুর্গা-গৌরী হিসেবে তিনি পূজিতা। তবে এমন দুর্লভ মূর্তি কিন্তু এদেশের কোনওখানেই নেই। বাঘনাপাড়ার গোস্বামীরা যুগিদের সরিয়ে এর অর্চনা করে আসছিলেন মানে এটা তো ধরে নিতেই হয় গোস্বামীদের শিবপূজা, তন্ত্রাচারে সায় আছে।

বৈষ্ণবতায় তন্ত্রাচার প্রাচীন একটি পরম্পরা। বৈষ্ণবীয় তন্ত্র বলতে যে ''রাধাতন্ত্র'', ''গৌতমতন্ত্র'' এগুলো সব বাংলার ব্যাপার। এমনকি সহজিয়া বৈষ্ণবমতের সঙ্গেও ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের সাজুয্যে গড়ে ওঠা বৃহত্তর বৈষ্ণব সংস্কৃতির মিলও নেই। এগুলো পুরোপুরি বাংলার ব্যাপার। ''রাধাতন্ত্র'', ''গৌতমতন্ত্র'' আঞ্চলিক বৈষ্ণবদের সংস্কৃতি। গোটা ভারত জুড়ে বৈষ্ণবতন্ত্রের পুথি বলতে পাঞ্চরাত্র আগমগুলোকেই বোঝায়। দক্ষিণাত্যের বৈষ্ণবরা— প্রধানত রামানুজের অসুসারীরাই আগমোক্ত মত অনুসরণ করে থাকেন। মন্দির নির্মাণ থেকে শুরু করে উৎসব অনুষ্ঠান সমস্তটাই তাঁরা আগমমতেই করে থাকেন।

বৈষ্ণবাগমের তিনটি শাখা। পাঞ্চরাত্র, বৈখানস ও স্মার্ত। পাঞ্চরাত্রই সর্বাধিক মান্য। সমস্ত আগমগুলোর মধ্যে সবিশেষভাবেই উল্লেখ্য। পাঞ্চরাত্র

আগমগুলোকে চার ভাগে ভাগ করা চলে। আগম সংহিতা, মন্ত্র সংহিতা, তন্ত্র সংহিতা ও তন্ত্রান্তর সংহিতা। এদের মধ্যে আগম সংহিতাগুলো সবচেয়ে বেশি প্রচলিত। শ্রীরঙ্গম, কাঞ্চী, মহীশূরের বৈষ্ণবধারাতে আগম সংহতিগুলোই অনুসরণ করা হয়ে থাকে। আগমের পরম্পরার মধ্যেই চক্রাব্জ মণ্ডল অর্চনার প্রাবল্য সর্বাধিক। এগুলোই আদতে বৈষ্ণবতন্ত্রের চিহ্ন। শ্রীকুল শ্রীযন্ত্র অর্চনার। তন্ত্র সংহিতাকে প্রাধান্য দেওয়া কিছু কিছু পরম্পরা পরবর্তীকালে শাক্তোপাসনার কুলে গিয়ে গিয়ে শেষমেষ মিশে গেছে। লক্ষ্মীতন্ত্রোক্ত পরম্পরা ও সাধনা কালীকুলের কিছু কিছু পরম্পরাও শ্রীকুলের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে।

বৈখানস আগম মূলত বৈদিক পরম্পরারই। এখানে বেদমন্ত্রই ব্যবহার করা হয় বিভিন্ন আচারাদিতে। জন্মসূত্রে বৈখানস ব্রাহ্মণরাই এর উত্তরাধিকারী। বাইরের কেউ এই পরম্পরার সঙ্গে যুক্ত হতে পারেন না। তিরুপতি, চেন্নাই পার্থসারথি মন্দিরে বৈখানস অর্চনপদ্ধতি বহুযুগ ধরে চলে আসছে।

স্মার্ত বৈষ্ণবাগমও বহুল প্রচলিত। গোটা ভারত জুড়েই এর দাপট আছে। উত্তরে বদ্রীনাথ, দক্ষিণে অনন্ত পদ্মনাভ স্বামী, পূর্বে পুরী, পশ্চিমে দ্বারকা সব জায়গাতেই স্মাত বৈষ্ণবাগম প্রচলিত। এই পরম্পরাতে অনেক সিদ্ধ সাধকও বর্তমান। অহোরিল মঠের বর্তমান জীয়র স্বামী, শ্রীবৎসবরদা গুরুর বংশধর ভি. এস করুণাকর স্বামী সহ বেশ কয়েকজন দিকপাল পণ্ডিত আজও এই পরম্পরার ভেতর রয়েছেন।

শ্রীকুল তৃতীয় মহাবিদ্যা ত্রিপুরসুন্দরীর শাক্ত পরম্পরারই কুল। এখানে বৈষ্ণবাগমের কোনও প্রচলন নেই। স্মার্তদের ভেতর বৈষ্ণবাগমের প্রচলন একটা অবশ্য আছে। সেটা পুরীর অর্চকদের ভিতরই সীমাবদ্ধ। এঁরা কিন্তু কোনওভাবেই শ্রীকুলের সঙ্গে যুক্ত নন।

তন্ত্র ও তন্ত্রান্তর সংহিতাগুলো গুহ্যভাবেই আজও অসুসরণ করা হয় বংশ পরম্পরায় পাঞ্চরাত্রিক আগমাচার্যদের গণ্ডির মধ্যেই। কর্ণাটকের মেলকোটে তন্ত্র সংহিতার অবিমিশ্র পরম্পরা জায়মান। অন্ধ্রের শ্রীকূর্মমেও তন্ত্রান্তর পরম্পরার ধারা আছে। তবে এঁদের আচার খুবই গোপনীয়। শ্মশান প্রয়োগের মতো গুহ্য বিষয়াদিগুলো আগমাচার্যদের ভিতরই খালি সীমাবদ্ধ। পাঞ্চরাত্রিক তন্ত্র সংহিতার পরম্পরা বাংলার কালীকুলের কিছু গুরু পরম্পরার ভিতর আজও ধিক ধিক করে ঠিক আছে। জীবিত বয়ঃবৃদ্ধ গুটিকয়েক আচার্যরা রয়েছেন।

শ্রীকুল তো একেবারেই বৈষ্ণবাগমের কুল নয়। শাক্তোপাসনার পরম্পরায় পঞ্চদেবতার উপাসনা আছে কেবল। ওটুকুতেই খালি সীমাবদ্ধ। পাঞ্চরাত্রের কিছু শাখাতে প্রচ্ছন্ন বামাচারও আছে। দক্ষিণভারতের সাধকরাই এর উত্তরাধিকার বহন করছেন অত্যন্ত গোপনে। বাংলায় শুধু পাঞ্চরাত্রের পরম্পরাটি আছে কালীকুলের মধ্যে। তবে বিশুদ্ধ পাঞ্চরাত্রের পরম্পরা বলতে যেটি বোঝায় সেটি দাক্ষিণাত্যের। বাংলার বৈষ্ণবরা— গৌড়ীয়রা এর অন্তর্ভুক্ত নয় কোনওভাবেই। "পদ্মপুরাণের" মধ্যে যে চারটি বৈষ্ণব পরম্পরার উল্লেখ আছে এঁরা কেউই তাঁর মধ্যে কিন্তু পড়েনই না। খালি জোর করেই ঢুকে যেতে চান। Lyengar-রা মূলত পাঞ্চরাত্রিক। মধ্ব সন্ন্যাসীদের ভিতর পাঞ্চরাত্রের পরম্পরা আছে, তাঁরা চক্রাব্জ মণ্ডল অর্চনা করেন। অহোবিলের জীয়র শ্রী রঙ্গনাথ যতীন্দ্র মহাদেশিক মহীশূরের রাজগুরু ব্রহ্মতন্ত্র স্বতন্ত্র পরকাল জীয়র, নাদাদুর অম্মল গদির ভি. এস করুণাকর স্বামীরা হলেন দক্ষিণের বর্তমান পাঞ্চরাত্রিক অর্চকদের মধ্যে উল্লেখ্য।

বাংলার গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা ব্রহ্ম সংহিতাকে মান্যতা দেন। এটি বৃহত্তর পাঞ্চরাত্রের একটি অংশ মাত্র। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের আলাদা করে কোনও ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যই তো নেই। রাজস্থানের গলতাতে এক বৈষ্ণব সভাতে

গৌড়ীয় পণ্ডিত বলদেব বিদ্যাভূষণকে শ্রী সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব পণ্ডিতরা চেপে ধরেছিলেন। তাঁদের দাবিটা একেবারেই যুক্তিসংহতই ছিল। তাঁরা বলেছিলেন, গৌড়ীয়রা যদি চতুঃ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হন তাহলে তাঁদের লেখা ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যখানি কোথায়? বলদেব বিদ্যাভূষণ বললেন, গোবিন্দভাষ্য গৌড়ীয় পণ্ডিতদের ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য। শ্রী সম্প্রদায়ের আচার্য বললেন, আপনারা তাহলে মধ্বপন্থী। বেশ। মানা গেল। তাহলে আপনারা মধ্ব সন্ন্যাসীদের মতো বিষ্ণুদেবকে কেন পুজো করেন না? মধ্বপন্থীদের দ্বৈতভাষ্য বর্তমান। আলাদা করে গোবিন্দভাষ্যর দরকারটা কী শুনি? এভাবেই গৌড়ীয় পণ্ডিত বলদেব বিদ্যাভূষণ গলতার বৈষ্ণব সভাতে পড়েছিলেন মহা ফাঁপরে।

ঈশ্বর পুরী অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী ছিলেন। এটা তো জলের মতন স্পষ্ট। তাঁর শিষ্য শ্রীচৈতন্য তাহলে কেমন করে মধ্ব সন্ন্যাসীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন? গৌড়ীয় গোস্বামীরা এসব প্রচার করেটরে আদতে ভারতীয় বৈষ্ণবদের মূল পরম্পরার ভেতর জায়গা নিতে চান। এছাড়া আর কিছুই নয়। ঠিক তেমনই বাংলায় জারি থাকা কিছু সহজিয়া কায়াবাদী পুঁথিকে ভারত জুড়ে থাকা বৈষ্ণব পরম্পরার ভিতর অনেকেই কায়দা করে ঢুকিয়ে দিতে চান। সেগুলো কখনোই বৈষ্ণবতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেই না। এগুলো আঞ্চলিক দেহসাধনার পুঁথি। এর স্থানিক একটা গুরুত্ব অবশ্যই আছে। প্রাতিষ্ঠানিক ব্রাহ্মণ্যবাদের বিপক্ষে গিয়ে সহজিয়া গোঁসাইরা এগুলো লিখে গেছেন এক বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে নিজেদের ভেতর অন্তর্ভুক্ত করে নিয়ে। সেজন্যই এর গুরুত্ব কম নয়।

বাংলার বৈষ্ণবতায় তন্ত্রাচার প্রাচীন একটি পরম্পরা। ভুলে গেলে চলবে না খড়দহ শ্রীপাটে নিত্যানন্দ প্রভু ত্রিপুরসুন্দরী দেবীর পুজো করেছিলেন। ওখানে দেবীর যন্ত্রও প্রতিষ্ঠিত আছে। শ্রীপাটে ঘটা করে দুর্গাপুজো হত

নিত্যানন্দের তত্ত্বাবধানেই। তাঁর ছেলে এই বাঘনাপাড়ায় বৈষ্ণবদের দলবল বেড়ে গেলে সেখানকার গোঁসাইদের বেগ দিতে বারোশ'' নেড়া পাঠিয়ে শ্রীপাটের মোহন্ত রামচন্দ্র ঠাকুরকে ঘাবড়ে দিতে চাইলেন। বরানগর পাটবাড়ি প্রকাশিত রামচন্দ্র— রামাই ঠাকুরের ভাইয়ের ছেলে ও শিষ্য রাজবল্লভের লেখা ''মুরলীবিলাস'' পুথিতে রয়েছে বীরভদ্র প্রেরিত সেই নেড়াদের রামচন্দ্র ঠাকুরকে হেনস্থারই বিবরণ। নেড়ারা এলেন মাঘের রাত্রে বাঘনাপাড়ায়। অতিথি আপ্যায়নে ব্যস্ত রামচন্দ্র। বীরভদ্রের আশ্রিত এঁরা। স্বভাবত তাঁরও আপনজন। খড়দহ শ্রীপাটে নিত্যানন্দের স্ত্রী জাহ্নবা দেবী রামচন্দ্রকে পুত্রবৎ স্নেহের দেখভাল করতেন। ভ্রাতৃপ্রতীম বীরভদ্র সৎ মা জাহ্নবা দেবীরই যে তিনি মন্ত্রশিষ্য। রামচন্দ্র যত্নআত্তি শুরু করলেন বিশাল দলবলের সেই নেড়াদের। দেবভোগে পরিতুষ্টি নেই নেড়াদের। বীরভদ্রের শেখানো বুলিতে তাঁরা খেতে চাইছেন ইলিশ মাছ! রাজবল্লভ গোস্বামী লিখছেন, নেড়ারা তাঁর গুরুদেব রামাই ঠাকুরকে বলছেন, ইলসা মৎস্য আম্র করাহ ভোজন। সাধক রামচন্দ্র তখন তাঁর গুরুমা জাহ্নবা দেবীর স্মরণ নেন। মা - গুরুর কৃপায় অলৌকিক শক্তিবলে যমুনা পুকুর থেকে ইলিশ ও বকুল অরণ্য থেকে আমও চলে এল। নেড়াদের পরম আদরে খাওয়ালেন সাধক গোঁসাই। নেড়ারা বুঝতে পারল কত বড় সাধক রামাই পণ্ডিত। তারা তাদের অপরাধ স্বীকার করে খড়দহ ফিরে গুরুদেব বীরভদ্রকে সমস্ত খুলে বলল। তিনি বুঝলেন বাঘনাপাড়ায় জাঁকিয়ে বসেছেন রামচন্দ্র। রাজবল্লভ যতই গুরু মাহাত্ম্যর গল্প ফাঁদুন, বাঘনাপাড়ার শ্রীবৃদ্ধি ও প্রসারতায় যে নিত্যানন্দ পুত্র নিজের মোহান্ত আসন হারাবার ভয় পাচ্ছিলেন ''মুরলীবিলাসে'' এটাই স্পষ্ট। রাজবল্লভ লিখছেন, বীরভদ্র বাঘনাপাড়া এলেন। রামচন্দ্রের দেবসেবাবিধি দেখে আনন্দ পেলেন। তাঁর সঙ্গে শাস্ত্রালোচনা করে খুশি হলেন। রাজবল্লভ যতই কৃপা ভক্তি সেবা ভ্রাতৃত্বের সহজ সমাধান দেন না কেন ''মুরলীবিলাসে'' আসলে

ফুটে উঠেছিল বাংলার বৈষ্ণবতার প্রসারে শ্রীপাটে শ্রীপাটে বিতণ্ডা। শেষমেষ দুই মোহান্তের বুদ্ধিমত্তার সমঝোতা।

বাঘনাপাড়া প্রাচীন জনপদ। গোপীশ্বর হিসেবে শিব ঠাকুর এখানে পাট শ্রীবৃদ্ধির আগেই রাজ বদান্যতায় প্রতিষ্ঠিত। যুগিরা এখন তো প্রধান দাবিদার। বাঘনাপাড়ার বুদ্ধিমান গোঁসাইরা তাই নাথদের ধর্মাচারকে গৌড়ীয় চিহ্ন দেওয়ার জন্য লেগেই পড়লেন। সেনরাজাদের রাজধানী ছিল এক সময় ধাত্রীগ্রাম। প্রত্নশাসনে যা ধার্য্যগ্রামঃ বলে উল্লেখিত। সেই ধাইগাঁয়ের রাজাদের কুলদেবতা সদাশিব রাজত্ব বিলোপে তৎকালীন সম্পন্ন বসতির নাথ যোগিদের কবজায় এল। আবারও কালের বিলয়ে নাথদের সম্পন্নতা নষ্ট হল। বাঘনাপাড়ার সম্পন্ন গোঁসাইরা নাথদের গোপীশ্বর নিজেদের গৌড়ীয় ধাঁচায় এনে তুললেন।

বৃন্দাবনের সংযোগ আছে বাঘনাপাড়ার সঙ্গে। রামচন্দ্রের গুরুমা জাহ্নবা দেবীর সঙ্গে বৃন্দাবনে দীর্ঘদিন কাটানোর কথা রাজবল্লভই লিখেছেন, একাক্রমে পঞ্চবর্ষ তথায় রহিলা। বৃন্দাবন থেকেই রামচন্দ্র গৌড় হয়ে কাটোয়া পেরিয়ে অম্বিকা কালনার কাছে বাঘনাপাড়ায় এলেন বৈষ্ণব আধিপত্য গড়ার কাজে। বাঘনাপাড়ার যুগলমূর্তি যেখানে বৃন্দাবনের, সেখানে এখানকার শিব মাহাত্ম্যে সেখানকার ছোঁয়া থাকাটাই বাস্তবিক। চৈতন্য পরবর্তী সময়ে বৃন্দাবনই গোটা বাংলায় বৈষ্ণবতা প্রচারের হেড কোয়ার্টার। ষড় গোস্বামীদের শাস্ত্রবিধির চৈতন্য সম্প্রদায়ের বৃন্দাবনী সংযোগকে বাংলার বৈষ্ণবতায় জুড়ে গৌড়ীয় চিহ্ন বজায় রাখার একটি মান্য তৎপরতা নিত্যানন্দ চলে যাওয়ার পর থেকেই ভালোরকমভাবে শুরু হয়। কেননা নিত্যানন্দ দেহ রাখার পরই বাংলার বৈষ্ণবতায় ব্রাহ্মণ্যবাদের ছায়া যখন ঢুকতে শুরু করল তখনই বর্ণাশ্রমীদের আওতার বাইরে আনতে থাকলেন জাতাজাতিহীন পন্থা অবলম্বন করে কিছু নিম্নবর্গীয় গুরু - গোঁসাই। এঁরাই বাংলার সদগোপ,

শুঁড়ি, যুগি, কলু, মালো, মাঝি, কাহার, বাড়ুই— এককথায় নমঃশূদ্রদের নিয়ে একজোট হয়ে ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থ জাতীয় উচ্চবর্ণের মানুষদের থেকে নিজেদেরকে আলাদা করে নিয়ে লৌকিক ভেদহীন ধর্ম সম্প্রদায়ের কথা বলতে শুরু করলেন। যেটা চৈতন্যধর্মের মূল ধরতাই ছিল। আর এখান থেকেই দ্বন্দ্ব শুরু হল। নৈষ্ঠিক গৌড়ীয় ভেদ নিয়ে সহজিয়া জাতবৈষ্ণবদের সঙ্গে সে ঝগড়া আজও চলছে।

বৃন্দাবনের গোপীশ্বর লিঙ্গমূর্তির একটি বিশেষত্ব আছে। শিব ঠাকুর সেখানে সখীভাবে আবিষ্টা। ব্রজগোপী তিনি। পুরুষ হয়েও নারীসত্তাতে বিলীন। তাই তাঁর শরীরে ওড়না ও গোপীর বস্ত্র। নারীবেশের শৃঙ্গার। পুরুষ শরীরে নারীসত্তায় বিলীন বৃন্দাবনের গোপীশ্বর শিব। বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র অধীশ্বর পুরুষ— দেবতত্ত্ব মেনে ভগবান শিবেরও সেখানে বৈষ্ণবীয় কাননে নারীবেশ। সেখানকার শিবও আদতে নিম্নবর্গীয় জনতার। অনেক আগে ব্রাহ্মণ পুরোহিত গোপীশ্বরের পুজো সারলেও বর্তমানে তা নিম্নবিত্ত যোগিদেররই অধিকারে। বাঘনাপাড়া বৃন্দাবনের তত্ত্ব - মহিমা ধার করেটরেও পুরুষের নারীবেশের সাধনধারাটি নিয়ে প্রবল অস্বস্তি প্রকাশ করেছে একেবারে প্রথম দিকে। পরে একে অবশ্য গ্রহণ করে পার্শবর্তী শ্রীখণ্ডকেই বেগ দিতে চেয়েছে। তবে গোপীশ্বরের আর তো বদল হয়নি। তিনি পুরুষ শরীরে নারীবেশী গোপিকা নন। বৃন্দাবনের অভিধায় গোপীশ্বর মহাদেব শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলাতে এসেছিলেন গোপীবেশে। শরীরে সেই ব্রজগোপীদের চিহ্ন পেয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে গোপীশ্বর বেশেই শ্রীবৃন্দাবনে প্রতিষ্ঠা দিলেন। তাই তাঁর নারীর বেশ। ওড়না পরেন তিনি। বস্ত্রসজ্জা তাঁর মেয়েদের মতন। আর তাঁর তত্ত্বাবধানে বাঘনাপাড়ার সেই সম্বলহীন যুগিদের মতোই বৃন্দাবনের অব্রাহ্মণ গোপেরা। বাঘনাপাড়া এই ঐতিহ্য গ্রহণ করতে পারেনি। যুগি শিব ঠাকুরকে গোঁসাইরা তাই গৌড়ীয় তিলক পরিয়েছেন। নারীবেশ তাঁর নয়।

আজও তাঁর লিঙ্গমূর্তি থেকে পুরুষের চিহ্ন বস্তু বের হয়। লোকালয় বাংলার দেহসাধনায় বস্তু তো আসলে সাধক শরীরের বীর্যরূপ। বাঘনাপাড়া পরে সেই ভাবসাধনে মিশেছে। আর মিশতে গিয়েই গোপীশ্বর শিবের শরীর থেকে বস্তু বেরোনোর ফিকির। আজও অমসৃণ লিঙ্গমূর্তি থেকে পূজারিরা বস্তু খুঁটে তুলে ভক্তদের হাতে ধরিয়ে দেন। ভারতভূমির কোথাও আর এই রীতি নেই। বাঘনাপাড়ার গোপীশ্বর শিব শিবলিঙ্গ নয়— লিঙ্গমূর্তি। এর তিনটি আলাদা খণ্ডই তো আছে— পীঠভাগ, গৌরীপট্ট, রুদ্রভাগ। পীঠভাগে রয়েছে অষ্টমদলের পদ্ম। যা গুহ্য তন্ত্রেরই প্রতীক। এই প্রতীকে তো মান্যতা দিয়েছে পরবর্তী বাঘনাপাড়া বৈষ্ণব অনুসারীরা। তাঁদের সাধনধারায় শৈব গুহ্যাচার ও তন্ত্রযানের চিহ্ন তো বেশ ছড়িয়েছিটিয়ে।

বৃন্দাবনকে বাংলার বৈষ্ণবতা অস্বীকার করতে পারেনি। মহাজনদের গদি হারানোর ভয় ছিল। বাঘনাপাড়ায় তাই নামসাদৃশ্যের শিব। শ্যামানন্দ সুবর্ণরেখা নদীর ধারে তাঁর শ্রীপাটে একই নামের শিব প্রতিষ্ঠা করে বৃন্দাবনের ধারা বজায় রেখে গেছেন। গোপীজনবল্লভ দাস শ্যামানন্দ আশ্রিত বলে "রসিকমঙ্গল" পুঁথিতে এই গোপীশ্বরের জয়গান গেয়েছেন। কুলীনগ্রামে মালাধর বসুর ছেলেও গোপীশ্বর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেছেন। তবে সেগুলো বৃন্দাবন ও বাঘনাপাড়ার মতো লিঙ্গমূর্তি শিব নয়। সবগুলোই শিবলিঙ্গের বঙ্গীয় ধারা। নামকরণেই কেবল বৃন্দাবনের পোঁ। বাঘনাপাড়ায় গোস্বামীদের সেবিত গোপীশ্বর ছাড়াও পারিবারিক পুরনো আটটি কৃষ্ণপাথরের শিব আছে। যার মধ্যে সাতটিই শিবলিঙ্গ। বড়াল ঘাটের নাথযোগীদের শিবটি সাদা পাথরের লিঙ্গমূর্তি। বাঘনাপাড়ার শিবার্চনায় যুগলভজনা গৌরীদান রামচন্দ্রের সময় হতেই বোধহয় চালু। তাঁর ভাই শচীনন্দন সহগৌরিক শিবের ধ্যানমন্ত্রেরও প্রচলন করেন। এর থেকেই স্পষ্ট অনুমেয়, বাঘনাপাড়ায় পাটসূত্রপাতেই গোস্বামী ধারায় শৈবাচার, তন্ত্রাচার প্রখর। এর প্রধান কারণ,

স্থানীয় নিম্নবর্গীয় মানুষদের ধর্মাচারকে গৌড়ীয় তিলক পরিয়ে মাতব্বরি বজায় রাখার স্পৃহা। বাঘনাপাড়ায় বৈষ্ণবতন্ত্রের শুরুর ইতিহাসে তাই নিম্নবর্গীয় যুগি নাথদের একটা অবদান আছে। তাঁদের শৈবাচারের দখল নিতে গিয়েই বাঘনাপাড়ায় বৈষ্ণবতন্ত্রের সূত্রপাত— এতে কোনওরকম কোনও সন্দেহ নেই।

সেনরাজাদের সদাশিবই বাঘনাপাড়ার রূপান্তরকামী সদাশিব অদ্বৈত হয়ে গেলেন গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের দৃষ্টিভঙ্গির অভিধায়। কবিরাজ গোস্বামী মশায় তো অদ্বৈত ঠাকুরকে শিবাবতারই ঠাওরেছিলেন 'স্বরূপ দামোদরের কড়চা' ঘেঁটে। 'চৈতন্যচরিতামৃতের' আদিলীলার প্রথম পরিচ্ছেদে দ্বাদশ শ্লোক হিসেবে সেই কড়চার অদ্বৈত বিশ্লেষণই পরিস্ফুট— মহাবিষ্ণুজগৎকর্তা মায়য়া যঃ সৃজত্যদঃ। তস্যাবতার এবায়মদ্বৈতাচার্য্য ঈশ্বরঃ। ''বংশীশিক্ষার'' রচয়িতা বাঘনাপাড়ার গোপীশ্বর গৌড়ীয়দের সেই অদ্বৈতাচার্য সদাশিব বিশেষণটির কার্যকরী রূপটি দিয়ে বসেছেন। আদতে প্রেমদাস তো নন, শচীনন্দনের সময় হতেই রূপটি চিহ্নিত। ষোলো শতকের তখন শেষ হতে চলেছে।

....

সহায়িকা :

* সাধক ও সাধনা - ক্ষিতিমোহন সেন, পুনশ্চ। * ধর্ম প্রবেশিকা - শ্রীমৎ অদ্বৈত পুরী, শ্রীশ্রীঅদ্বৈতানন্দ ঋষিমঠ ও মিশন, বাঁশখালী, চট্টগ্রাম। * বিষ্ণুপ্রিয়া নেড়ানেড়ি বৈষ্ণবতন্ত্র - সোমব্রত সরকার, ঋতবাক, কলকাতা।

শব সাধনা

তান্ত্রিক অঘোরীরা বলেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড শ্মশানভূমি। কুণ্ডলিনীর সাহায্য নিয়ে দেহের মৃত্যু ঘটানোর পর শববৎ ব্রহ্মাণ্ডের ওপর বসে চক্রে চক্রে নিঃসাড় অস্তিত্বের সাধনা শব সাধনা। দেহের ভিতরকার সমস্ত ইন্দ্রিয়াদির মৃত্যু ঘটলে শববৎ শরীরে চক্রে চক্রে কুণ্ডলিনী জেগে ওঠে। তখন দেহাতীত অভিজ্ঞতা লাভ হয়। কুণ্ডলিনী সাধনায় স্থূলদেহের মৃত্যু ঘটিয়ে তার শবের ওপর বসে সূক্ষ্মদেহের সাধনা করতে হয়। শব সাধনার এই হল আন্তর সাধনা। এর বাহ্যিক রূপে ইন্দ্রিয়ানুভূতির অনেকটা ওপরে ওঠার ফলস্বরূপ শবদেহের কোনও ব্যবস্থা নেই। মৃত্যুর পরও জীবনে বিশ্বাস রাখেন তান্ত্রিক সাধুরা। তাঁরা বলেন, মৃত্যুর পর জীবন আছে। সে অতি সূক্ষ্ম জীবন। সাময়িক মৃত্যুর পর স্থূল কোনও অস্তিত্ব না থাকলেও স্থূলদেহে ফিরে এসে অনেক মহাত্মারা সূক্ষ্ম জগতের খবরাদি সংগ্রহ করতে থাকেন। সেই সংবাদ পাঠ করে যোগীরা দেহের বোলচাল বদলে ধরেন। তাঁরা বলেন, সাধু মহাত্মাদের মৃত্যু হয় না, আবির্ভাব হয়। দেহের মৃত্যু হল তিরোধান। যা একটা রূপান্তরের চিহ্ন মাত্র। স্থূল অস্তিত্বের ভাবনা ভরার জন্য সাধুগুরুরা বলেন, সাধনায় যখন স্থূলদেহের রূপরেখা নিয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু করে মন তখন তার একটা সূক্ষ্ম জগতও তৈরি হয়ে ওঠে। স্থূলদেহের ঘনীভূত রূপ নিয়ে সূক্ষ্মদেহ—সাধুসন্তদের সাধনদেহ গড়ে ওঠে। এই হল গিয়ে রূপক অর্থে কিংবা আন্তর তন্ত্রের শববৎ নিঃসাড় শ্মশান। যার ওপর বসে পড়ে তান্ত্রিক সাধকদের শব সাধনা করতে হয়। তন্ত্রের শব সাধনায় স্থূল ইন্দ্রিয়ের অভিজ্ঞতা নিয়ে বসলে শব সম্পর্কে সংশয় দেখা দেবে। তন্ত্রের শব হল স্থূললোকের বিষয়াদি ছেড়ে সূক্ষ্ম অমৃত বা স্বর্গানুভূতির মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রাখা। দেহের স্বাভাবিক

ব্যবহার একেবারে বন্ধ করে দেওয়া। দেহের একটা সীমাবদ্ধতা আছে। দেহকে নিষ্ক্রিয় শব করতে হলে সবার আগে ইন্দ্রিয়ের দুয়ারগুলো বন্ধ করতে হবে। ইন্দ্রিয়ের দরজাগুলো বন্ধ হলে দেহ নিষ্ক্রিয় হয়ে আন্তর শবের জায়গাতে চলে যাবে। বাউলেরা এরকম ভাবনা থেকে ''জিন্দা দেহে মুর্দার বসন''— কথকতা পরিয়েছেন। দেহ মরলে, শব হলে আপাতদৃষ্টিতে তা গতিহীন হবে। কোথাও আর যাবে না তখন। অগ্নি শক্তির আরাধনার দিকে এগিয়ে যাবে দেহ। আগুন হল দেহের ক্ষিতির স্থান। মণিপুরের আগুনে শববৎ দেহখানা যখন পুড়তে থাকবে, অপ বা জলের সাধনা শুরু করবেন তান্ত্রিক। জল দিয়ে গোটা দেহ তৈরি। দেহের ভিতর অপের কলকলানি থাকে বলে এটাতে অস্থিরতা থাকে না। না হলে ভিতরের বায়ু দেহকে অস্থির ও ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। তখন দেহের জগতে চঞ্চল বায়ু ছড়িয়ে যায়। একে বলে ব্যোম। উপনিষদ আকাশের সত্তাকে সাধকের ব্রহ্মময় চিৎসত্তা বলছে। ধ্যানে বসে অনেক সাধুগুরুরা আকাশচিন্তার কথা বলে থাকেন। স্থির দশার সাধনার জন্য আকাশের চিন্তা মাথাতে আনা ভালো। আকাশে সূর্য-চাঁদ, আকাশে দিন-রাত, ঝড়-বৃষ্টি ফুটে ওঠে কিন্তু আকাশ এইসব সাময়িক দশাপ্রাপ্তির ভিতরও নির্লিপ্ত হয়ে আছে। দেহকে অমন সর্বব্যাপী চৈতন্য করে আনতে হলে সবার আগে নিষ্ক্রিয় শববৎ করতে হবে। দেহের পঞ্চভূতকে শুদ্ধ করতে পারলে সাধকের শববৎ উন্নতি আসতে বাধ্য। তখন দেহবোধ সম্পূর্ণরূপে হারাতে পারে। নচেৎ তা সম্ভব নয়। আন্তর তন্ত্রে দেহের সাধনা হল শব সাধনা। শিববৎ, শববৎ দেহে কুণ্ডলিনী জাগতে পারে। কুণ্ডলিনী যখন দেহের বায়ুকে নিয়ন্ত্রণ করার কায়দাবাজিগুলো শিখে যাবে, শ্বাস-প্রশ্বাসকে সমান্তরাল করে এনে ফুসফুসে আটকে দিতে হবে। একে সাধকেরা বলছেন, কুম্ভকযোগ। দেহে বায়ুর ক্রিয়া একেবারে বন্ধ হলে শিববৎ, শববৎ দেহে পরমজ্ঞান জেগে ওঠে। শ্বাস হল

হং আর প্রশ্বাসের নাম স। তান্ত্রিক-যোগি-সাধুসন্তদের দেহে এই ক্রিয়াদি হতে থাকে প্রবল সচেতনতায়। সাধকেরা বলেন, হংসযোগী। অর্থাৎ যাঁরা দক্ষতার সঙ্গে শ্বাসাদি ধরে পরমজ্ঞান লাভ করেছেন। আন্তর তন্ত্রে শববৎ দেহে ঘটতে পারে পরমহংস দশা।

কুষ্টিয়ার লালনপন্থী ফকিরদের আখড়ায় ভেক-খিলাফত বলে একখানা অনুষ্ঠান হয়। ছেঁউড়িয়া, কুষ্টিয়ার সাঁইনগর আখড়ার ফকির শামসুল ব্যাপারটা বোঝালেন আমায়। তিনি বললেন, ফকিরের ভেক হইল গিয়া জিন্দা দেহে মরার বসন। হ্যার লেগাই সাদা পোশাক সাঁইজির ঘরে। ফকির জ্যান্ত থাকতেই মইরা যায়। তার দেহ মরে, কাম মরে— ইহলোকের যাবতীয় কাম-কামনাদি মারতে চায় ফকিরে। আর পরলোকে তো তার বিশ্বাস নাই। দেহান্ত হইলে কাফনে সাদা পোশাক পরতে হয়। ফকিরে জিয়ন্তে মরা। সাঁইজির কালেমায় বাতুন দেহতত্ত্ব সেই মইরা থাকার জাহের করে। বাতুন লোকে টের পায়। বাতুনে ফকিরে তাই সাদা পোশাক পরে। শামসুল ফকিরের কথা শুনে বুঝলাম সাদা পোশাক পরে কুষ্টিয়ার লালন ঘরের সাধুগুরুদের খিলকা নেওয়ার বাহ্যিক অর্থ হচ্ছে আত্মিকভাবে শরীরকে মেরে ফেলা। তান্ত্রিকদের শব সাধনার আন্তর সম্পর্কে এ কথাটাই বলবৎ। দেহকে শ্মশান ও শব করে নিয়ে কুণ্ডলিনী ক্রিয়াদির ভিতর দিয়ে যাওয়া আন্তর তন্ত্রের শব সাধনা।

কুণ্ডলিনী শব সাধনায় বায়ু, মরুৎ প্রধান শক্তি। দেহের বায়ুতে বাইরের বায়ুর সাযুজ্য দিয়ে কুণ্ডলিনী শক্তি জাগরণ করতে হয়। বায়ু অস্থির। তাকে বশে আনতে সময় লাগে। অস্থির বাতাস সব সময় দেহে বইছে। তাকে স্থির করে নিয়ে আসনে বসতে পারলে দেহ শববৎ, শিববৎ হয়ে উঠতে পারে। কুণ্ডলিনী শব সাধনার আর এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান অগ্নি। মণিপুর, নাভির আগুন জ্বালিয়ে তুলতে পারলে কুণ্ডলিনী শক্তি তেতে উঠতে থাকে।

আগুনের নীচে আছে জল। স্বাধিষ্ঠান চক্রে অপ জল আছে। আন্তর দেহের এই স্থানও অতীব চঞ্চল। এখানে যৌনশক্তির দাপাদাপি চলে। স্থূল আগুনকে সাধুরা খুব গুরুত্ব দিয়ে থাকেন কুণ্ডলিনী অগ্নির সমতায়। ধুনি জ্বালান সাধুরা। নাগা সাধুরা দেহের সমস্ত পাশ ছেড়েছেন তথাপি ধুনির আগুন কিন্তু ত্যাগ করতে পারেননি। সাধুরা বলেন, ধুনির আগুন দেহের অগ্নিদ্যোতক প্রাণশক্তি। সাধনায় প্রাণকে জাগানো প্রধান কাজ। স্থূল মন সরলে প্রাণ জাগে। প্রাণ দেহের বাইরের বায়ু টেনে ভিতরের বায়ুর সমতায় যোগবায়ু তৈরি করে যখন তরঙ্গ তুলতে থাকে মণিপুর চক্রে তখন কুণ্ডলিনী উঠতে - উঠতে শেষমেষ আজ্ঞা চক্র, মস্তিষ্কের স্নায়ুতে কম্পন ধরাতে থাকে। মানসচক্ষু প্রকট হয়ে যায়। কুণ্ডলিনী শক্তি জ্যোতিতে ধরা পড়ে। বৌদ্ধরা বলেন, ওঁ মণিপদ্মে হূং। মণি হল বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের বজ্র বা দেহের শূন্যতার প্রতীক। সৃষ্টির উৎস হল শূন্যতা। পদ্ম কল্পনায় বিন্দুর ভিতরে কুণ্ডলিনী শক্তিকে স্থির করে বৌদ্ধ লামারাও মণিপুর শূন্যতার ধ্যান করে থাকেন। উচ্চারণ করেন, ওঁ মণিপদ্মে হূং। হিন্দু তন্ত্রে মণিপুরে অগ্নি, বৌদ্ধ তন্ত্রে বজ্রযানে মণিপুর শূন্যতার সৃষ্টি করে বিন্দুরূপে পুটিত হয়। আজ্ঞা চক্রে যে জ্যোতির্বিন্দু আর মণিপুরে যে শূন্যতার প্রতীক বিন্দুর কল্পনা— দুই ভাবের ভিতর রয়েছে সিদ্ধ আগুন। কুণ্ডলিনী আগুনের নির্বাণ দশা। তন্ত্র বলছে, কোটি চন্দ্র সুশীতলম দেহের শববৎ যে জ্যোতি, আত্মজ্যোতি তা চন্দ্রসদৃশ ঠান্ডা হয়ে আসে মণিপুর থেকে আজ্ঞা অবধি যেতে - যেতে। তন্ত্রে সূর্য ও চাঁদ দুটো মান্যতা পায়। বাউলেরা আত্মজ্যোতির আলোকে চন্দ্রসদৃশ ধরে বলেন, চাঁদের গায়ে চাঁদ লেগেছে।

তন্ত্রের করণক্রিয়ার সঙ্গে হোমের সম্বন্ধ আছে। তান্ত্রিক গুরুরা হোমের কুণ্ড তৈরি করেন যন্ত্র এঁকে নিয়ে। যন্ত্রের ভাষা রহস্যময়। যন্ত্র আঁকা হয় কতকগুলো রেখাচিত্র দিয়ে যা ভাব তৈরি করতে সক্ষম। তন্ত্রক্রিয়ার মন্ত্রাদি

যেমন কুণ্ডলিনী চক্রে ইচ্ছার স্পন্দন তুলতে সক্ষম তেমনি তন্ত্রের যন্ত্র কুণ্ডলিনীর সক্রিয় দশাতে মনের ভিতর ভাব সৃষ্টি করতে সক্ষম। ভাব আর ইচ্ছার স্পন্দন এমন সব তান্ত্রিকের হোমক্রিয়াদিতে আসতে পারে যাঁদের কুণ্ডলিনী অন্ততঃ মণিপুর অবধি পৌঁছতে পেরেছে। সাধনা শুরু হয় মণিপুর, নাভি চক্র থেকে। নাভিতে রয়েছে ঊর্ধ্বমুখ আর নিম্নমুখ। নিম্নমুখের যোগ মূলাধার পদ্মচক্রের সঙ্গে, ঊর্ধ্বমুখের যোগ রয়েছে সরাসরি আজ্ঞায়। তন্ত্রক্রিয়ার হোমকুণ্ডে যে যন্ত্র আঁকেন তান্ত্রিক গুরুরা তার ভিতর মূলতঃ থাকে দু'খানা ত্রিভুজ। যন্ত্রে যে ত্রিভুজের মুখ নীচের দিকে থাকে, তা প্রকৃতির প্রতীক। ঊর্ধ্বমুখী ত্রিভুজখানা পুরুষের চিহ্ন। পুরুষ এবং প্রকৃতি যন্ত্রে পরস্পরকে ছেদ করছে। তান্ত্রিকেরা বলেন, শিব ও শক্তি। তন্ত্রের আন্তর যে শব সাধনা সেখানে শিববৎ দশাপ্রাপ্তি হল শববৎ স্থিতি। দেহ শব বা শিব না হলে শক্তি জাগবে না সেখানে। কুণ্ডলিনী ধ্যানে কিংবা ক্রিয়ায় সবার আগে শরীরকে শব করে নিতে হয়। শবে শক্তিকে আকর্ষণ করা হয়। মূলাধারে ঘুমন্ত কুণ্ডলিনীর শববৎ দশাতে যখন শ্বাস বায়ুর ঘর্ষণ লাগতে শুরু করে তখন তাপ বা আগুনের উৎপত্তি হতে থাকে দেহে। একে বলা হচ্ছে, শবে অগ্নির প্রজ্জ্বলন। স্থূলচিতাহোমের আন্তর ক্রিয়াদি সূক্ষ্মদেহাদির মাধ্যমেও করে থাকেন তান্ত্রিকগুরুরা। তন্ত্রক্রিয়ার বাহ্যিক হোম প্রজ্জ্বলিত করে নিতে হবে দেহের ভিতরে। দেহের শবে আগুন ধরাতে হবে। দেহের অগ্নিকে বলা হয়, ভূতাগ্নি। সূক্ষ্মদেহের আগুন হল ভূতাগ্নি। তন্ত্রের হোমযজ্ঞের বাহ্যিক ক্রিয়াদির মধ্য দিয়ে সেই আন্তর ভূতাগ্নিকে প্রাণবন্ত করে নেওয়ার প্রক্রিয়াদি আদতে করা হয়। মণিপুর জাগানো সাধক যদি হোমক্রিয়াদি করেন মানুষের মঙ্গলের উদ্দেশ্য অনুযায়ী যন্ত্র এঁকে নিয়ে, তবে কুণ্ডলিনী জাগা তান্ত্রিকের চেতনার শক্তি যজ্ঞস্থলে খানিক ছড়িয়ে পড়বে আর সেই শক্তির চৈতন্য তাঁরাই কেবল পেতে পারেন যাঁদের মূলাধার চক্র খানিকটা আলগা হয়ে

গেছে, যাঁরা তন্ত্রের মুদ্রাযোগকে রপ্ত করে নেওয়ার ভিতরে রয়েছেন। তন্ত্রের যন্ত্র, হোম, মন্ত্র— যতরকমের বাহ্যিক ক্রিয়াদি আছে সেগুলোর আন্তর প্রকাশ ঘটতে পারে মূলাধার আলগা হওয়া দেহের। এ কারণে বাহ্যিক তন্ত্রাদির ক্রিয়া বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কোনও ফলাফল এনে দেয় না। অহেতুক ক্রিয়াদি করতে টাকা নষ্ট হয়। বাহ্যিক তন্ত্রের ক্রিয়াদি একমাত্র সফল করতে পারেন মণিপুর পর্যন্ত কুণ্ডলিনী জাগিয়ে তোলা তন্ত্র সাধক আর এর কিছুটা সুফল তাঁরা পেতে পারবেন যাঁদের অন্তত মূলাধার চক্র আলগা হয়েছে তন্ত্রের মুদ্রাযোগে ও গুরুর কৃপাতে। তাবিজ, মাদুলি সম্পর্কেও এক ফল। অন্তত মণিপুর জাগানো সাধক তাবিজ - মাদুলিতে বাহ্যিক তন্ত্রের ক্রিয়াদি করে ধারণ করতে দিলে তা কাজ করতে পারে মূলাধার আলগা হওয়া দেহে। বাকি ক্ষেত্রে সমস্ত প্রক্রিয়াদি নিষ্ফল। তান্ত্রিকেরা হোমাদির প্রজ্জ্বলিত অগ্নি টেনে নিয়ে দেহের ভূতাগ্নিকে প্রাণবন্ত করতে চান। তান্ত্রিকের হোমযজ্ঞের মূল উদ্দেশ্য এটা। চোখ, নাক, কান, যে কোনও প্রত্যঙ্গকে প্রাণাগ্নি দিয়ে দীপ্ত করে নিয়ে সেই প্রত্যঙ্গাদিকে অতীন্দ্রিয় শক্তির অধিকারী করে নেওয়ার কারণে তন্ত্রের বাহ্যিক হোমাদি করা হয়। কোনও কোনও তান্ত্রিক সাধু অনেক দূর পর্যন্ত দেখতে পারেন— কোনও মানুষের ভূত-ভবিষ্যত ফটফটিয়ে বলে দিতে পারেন, কেউ বা আবার দূর থেকে আসা ভালো গন্ধ, খারাপ অনুভূতির ক্রিয়াদি টেনে এনে ভালো বা খারাপ ঘটা সম্পর্কে আগেভাগে সচেতন করে দিতে পারেন, অনেক তান্ত্রিক গুরু দূরের শব্দবিদ্যা কাজে লাগিয়ে কোনও দেহকে সুস্থ করে তুলতে পারেন। এগুলো সম্ভব হয় একমাত্র তাঁদের দ্বারা যাঁদের কুণ্ডলিনী শক্তি প্রবল রূপে জাগ্রত থাকে আর মণিপুরের আগুন সব সময় দেহের ভিতর জ্বলতে থাকে। অনেক সাধকদের দেহ সর্বক্ষণ গরম থাকে। হাত দেওয়ার সৌভাগ্য হলে সেই তান্ত্রিকগুরুর শ্রীদেহে, প্রচণ্ড তাপ বের হওয়া টের পাওয়া যায়। এরকম

দেহাদির যাঁরা অধিকারী তাঁদের মণিপুর দেহ জেগে থাকার সময়ে খোলা থাকে। তাঁরা যদি কারও উপকার করতে চান তবে নিমেষে করতে পারেন। কিন্তু এসব তাঁদের কাজ নয়। তাঁরা চক্রে চক্রে নিজস্ব কর্মফলকে পুড়িয়ে ফেলে ভূতদেহে শক্তি অর্জন করতে থাকেন। বাইরের আগুনের দরকার পড়ে না। বাহ্যিক তন্ত্রাদির হোমক্রিয়ার প্রয়োজন হয় না। তান্ত্রিক স্বীয় স্থূলদেহে শব সাধনা করতে - করতে সূক্ষ্মদেহের সংযোগে চিতা প্রজ্জ্বলন বা অগ্নিসংযোগ ঘটিয়ে আন্তর তন্ত্রাদির শব সাধনা, চিতা সাধনা ইত্যাদি বীরভাবের সাধনাদি করে থাকেন।

দেহের ভিতর তিনখানা ভাব বর্তমান থাকে। সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক। তন্ত্র এদেরই দিব্য, বীর আর পশুভাব নামে অভিহিত করেছে। তান্ত্রিকেরা বলেন ভাব হল গিয়ে মানস ক্রিয়া। আন্তর তন্ত্রের প্রক্রিয়াদির সঙ্গে ভাবের সাযুজ্য আছে। মনের দ্বারাই সাধন অভ্যাস তৈরি করতে হয়। মনেই ভাবের প্রকাশ ঘটে। ভাবে উপলব্ধিজাত জ্ঞানাদির প্রকাশ ঘটে। ভাব তাই মানস ধর্ম। ''বামকেশ্বরতন্ত্রে'' ভাবকে মানস ধর্ম বলে অভিহিত করা হয়েছে। ''ভাবচূড়ামণিতে'' বলা হচ্ছে, মনের ধর্মটাই তো ভাব। শব্দ দিয়ে কীভাবে ভাবের প্রকাশ ঘটবে? আখের গুড় খেলে যেমন এর স্বাদ পাওয়া যাবে তেমনই মনখানা দিয়ে ভাববিভাব ধরতে হবে, ভাবস্তু মানসো ধর্মঃ শাব্দঃ স হি কথং ভবেৎ। তস্মাদ্ভাবো ন বক্তব্যো দিগ্মত্রং সমুদাহৃতম। যথেক্ষুগুড়মাধুর্যমশনৈর্জায়তে প্রভো। তথা ভাববিভাবস্তু মনসা পরিভাব্যতে।। ভাব না থাকলে জপতপ, তন্ত্রের কষ্টসাধ্য করণ, যন্ত্রমন্ত্র কিছুই হবে না। ভাব দিয়েই তন্ত্রাদির এইসব বাহ্যিক ক্রিয়াদি করবার কথা বলা হয়েছে ''কৌলাবলীনির্ণয়তন্ত্রে''। আবার ''রুদ্রযামল'' যে আন্তর তন্ত্রাদির ক্রিয়া বলছে, ন্যাস, ভূতশুদ্ধি, মানসপুজো তাও বলছে যে ভাব না থাকলে সমস্তটাই ব্যর্থ হয়ে যাবে। তন্ত্রের ভাব ত্রিবিধ। দিব্য, বীর ও পশুভাব। এই তিন ভাব

অনুসারে গুরু, মন্ত্র, দেবতাদিও তিন রকমের হয়, এটা ''কৌলাবলীনির্ণয়তন্ত্রের'' কথা, ভাবস্তু ত্রিবিধঃ প্রোক্তো দিব্যবীরপশুক্রমাৎ। গুরুশ্চ ত্রিবিধশ্চৈব তথৈব মন্ত্রদেবতা। সেখানে বলা হচ্ছে ত্রিবিধ ভাবের ভেতর পশুভাব নিকৃষ্ট, বিশ্বনিন্দিত। ''তন্ত্রান্তরে'' পশুভাবকে অধম, অবর বলা হচ্ছে। ''পিচ্ছিলাতন্ত্রও'' পশুভাবকে অধম বলছে। ''রুদ্রযামল'' বলছে যে পশুভাব অধম, অবর হতে পারে কিন্তু তা কখনো নিন্দাজনক নয়। দেহের মধ্যে গুণত্রয় সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ যেমন বর্তমান তেমনই ত্রিবিধ ভাব পশু, বীর ও দিব্য থাকে। দেহ পশুভাবেই থাকে সাধনা শুরুর আগে। সমস্ত মানুষের দেহ পশুভাবের। তাহলে পশুভাব বিশ্বনিন্দিত হলে গোটা পৃথিবীর মানুষদের নিন্দা করতে হয়! ভাবকে সাধনার বা দেহের ক্রম অনুসারে সাজিয়ে নিয়েছে ''রুদ্রযামল''। বলছে পশুভাব দেহের আদিভাব। এর ভিতর বীরভাব জাগাতে হবে। মধ্যভাব হল বীর। অন্তে দিব্যভাব। দেহ যেমন স্থূল সূক্ষ্ম কারণ হয় তেমনি স্থূলদেহে থাকে পশুভাব, সূক্ষ্মদেহে বীরভাব আর কারণদেহে দিব্যভাব বর্তমান। ''রুদ্রযামল'' তাই বলছে, প্রথমে পশুভাব ধরে বীরভাবে যেতে হবে তারপর দিব্যভাব আপনে থেকে ফুটে উঠবে দেহে। তন্ত্রের দীক্ষাদি হল পশুভাব হতে মুক্ত হওয়ার ব্যবস্থা। পশুভাবে আচার, নিষ্ঠা, ব্রহ্মচর্য এসব পালনীয়। বীরভাবের সঙ্গে পুরোপুরি আন্তর তন্ত্রের সম্বন্ধ। সেখানে মুদ্রাযোগে পুরুষ প্রকৃতির দ্বন্দ্বাদি মিটে যায়। যুগল ভজনা এই ভাবের। পুরুষ প্রকৃতি যখন মিলিত হল সূক্ষ্মদেহাদির ভিতর তখন দিব্যভাবের প্রকাশপন্থা পথ নিতে থাকল। তন্ত্রের দীক্ষা নেওয়ার পর গুরু নির্দেশিত নিত্য নৈমিত্তিক কর্মগুলো পশুভাবের। এগুলো সব কাম্যকর্ম। করতেই হবে। না হলে ফলাফল আসবে না দেহে। বীরভাবের ভিতরও কাম্যকর্মাদি থাকে। ভৈরবী সাধনা, যোগিনী সাধনা, চিতা সাধনা, শব সাধনা সবই বীরভাবের কর্ম। কৃষ্ণপক্ষ ও শুক্লপক্ষের অষ্টমী ও চতুর্দশী তিথিতে

বীরসাধন করা হয়। কৃষ্ণপক্ষ বেশি প্রশস্ত সময়। ''বীরতন্ত্রে'' এর উল্লেখ রয়েছে, অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দশ্যাং পক্ষয়োরুভয়োরপি। কৃষ্ণপক্ষে বিশেষণ সাধয়েদ্বীরসাধনম। রাতের সার্ধপ্রহর চলে যাওয়ার পর শ্মশানে গিয়ে আগে থেকে ঠিক করে রাখা নির্দিষ্ট চিতার ওপর বসে মন্ত্র ও গুহ্য ধ্যানের ক্রিয়াদির মাধ্যমে বীরসাধন শুরু করতে হয়। বীরসাধনে সামিষান্নে ভোগ দেওয়া হয়। আমিষ ভোগের দু'ধরনের পদ্ধতি আছে। রান্না করে ভোগ দেওয়া হল সামিষান্ন। যে সকল সাধকেরা উগ্রতন্ত্রমতে বীরসাধন করেন, মায়ের রহস্য পুজো করে পঞ্চমকার যোগে বিশেষ বলি প্রদান করেন সেখানে কাঁচা আমিষের বলি দেওয়া হয়। তান্ত্রিকেরা বলেন রহস্য বলি হয় কাঁচা মাছ, কাঁচা মাংস, মদিরা-মদ, কাঁচা পেঁয়াজ, ছোলা ভাজা, কিসমিস, চাল ভাজা দিয়ে। তবে সাধারণত ভোগের ক্ষেত্রে যেখানে বলি, সেখানে রান্না করা পাঁঠার মাংস দেওয়া হয়। মাছের মধ্যে রুই, শোল, বোয়াল দেওয়া হয়। সমস্তটাই তন্ত্রমতে শোধন পূর্বক। কাঁচা আমিষের বলির বিষয়টা অতি গুহ্য বিষয়, গুরুমুখী বিদ্যা এবং অবশ্যই বিশেষ তন্ত্র ক্ষেত্রে প্রশস্ত, তা সকলের সামনে প্রকাশ একেবারে নিষিদ্ধ। আমিষ ভোগের সঙ্গে কারণ দেওয়া হয় ঠিকই কিন্তু এমন কোনও বিষয় কিন্তু নেই যে দিতেই হবে। বলির ক্ষেত্রে বিষয় অন্য। তন্ত্রমতের সাধারণ পুজো আর রহস্য পুজোর বলি সম্পূর্ণ আলাদা। একটার সঙ্গে আর একটার কোনও যোগ নেই। যে পশুকে দেবীর সামনে বলি দেওয়া হয় তার রুধির মাংস দেবীকে নিবেদন করা হয়। তবে রহস্য পুজোর মাংস আলাদা ভাবে সংগ্রহ করতে হয়। দেবীর সম্মুখে বলিষ্ঠ পশুর মাংস পরে রান্না করে ভোগ হিসেবে দেওয়া যদি হয় তখন শোধন করে নিবেদনের কোনও ব্যাপার থাকে না। তবে তন্ত্রে সকল রকম পশুর মাংস যেগুলো কাঁচা আরও অনেক বিষয় আছে, অতীব গুপ্ত অনুষ্ঠান এগুলো প্রকাশ্যে সাধকেরা বলবেন না। এগুলো গুরু পরম্পরাবিদ্যা। তন্ত্রের

বিশেষ ক্রিয়া পুজোর ক্ষেত্রে মৃত মানুষের মাংসও শ্মশানকালী, বামাকালী, দক্ষিণাকালীর পুজোতে প্রয়োগ করা হয়। তন্ত্রের কাঁচা আমিষের ভোগ হল যেটা রান্না করা নয় বা ঝলসানো নয়। একদম সদ্য কাটা হয়েছে এমন মাংস বা মাছ। অনভিষিক্তের কারণ প্রদান নিষিদ্ধ, গুরু নিজে যদি অভিষিক্ত না হন তবে তিনি কি করে অন্যকে সে অধিকার দেবেন? মকারের অধিকার কেবলমাত্র অভিষিক্তের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। মকার শোধনের অধিকার অনভিষিক্তের নেই। যে সমস্ত সাধকদের আনন্দ ভৈরব আনন্দ ভৈরবী মন্ত্রের উপদেশ নেই তাঁরা মদ শোধন করবেন কী রূপে? বীরসাধনে চিতার সামনে সামিষান্ন, গুড়, ছাগ, সুরা, পায়েস-পিঠা, নানারকম ফলমূল, নৈবেদ্য, সাধকের ইষ্টদেবীর পুজোবিহিত দ্রব্য বীরসাধনে বসার আগে শ্মশানে এনে মনকে একেবারে ভয়শূন্য করে কিছু সমগোত্রীয় সাধুবৃত্ত তৈরি করে সাধন শুরু করতে হবে। বীরসাধনে মানুষ পোড়ানো ছাই-অস্থি লাগা চিতাই ব্যবহার করতে হবে। তান্ত্রিকেরা বলেন অসংস্কৃতা চিতা। জলে ধুয়ে পরিস্কার করা চিতা শ্মশান ও চিতা সাধনে উপযোগী নয়। অনেক তান্ত্রিকগুরু চণ্ডাল পোড়ানো চিতার খোঁজ করেন। এতে নাকি আরও শীঘ্র ফললাভ হয়। চিতাতে অর্ঘ্য স্থাপন করে সংকল্প মন্ত্র পাঠ করতে হয়। তারপর মূল মন্ত্রে চিতাস্থানকে প্রোক্ষণ করতে হয়। এরপর গুরুর পাদপদ্ম ধ্যান করে গণেশ, বটুক, যোগিনী ও মাতৃকাদের পুজো করে অঞ্জলি প্রদান। শেষে শ্মশানাধিপতির পুজো ও বলি প্রদান। চিতার চারপাশে শ্বেত আকন্দ ও শ্বেত বেড়লার তুলো দিয়ে বানানো প্রদীপ জ্বেলে রাখতে হয়। আর অস্ত্রপুজো করে সাজিয়ে রাখতে হয় শ্মশান অস্ত্রাদি। প্রদীপগুলো যদি নিভতে শুরু করে তবে বিঘ্ন আসতে পারে। সাধক ভয়ে কাতর হতে পারেন, তখন সাধুবৃত্ত তাঁকে সাহায্য করবেন। ভয় বেশি আসতে থাকলে তখন চোখ ও কান বেঁধে নিতে হয়। যাতে কোনও অপদেবতা, প্রেত, নিশির ছায়া ও আওয়াজ

কোনওভাবে আর না আসে চোখ ও কানের কাছে। পুজোর পর জপ। সাধকেরা গুরুর দেওয়া বীজমন্ত্র যদি একাক্ষরী হয় তবে দশ হাজার জপ, দ্বি অক্ষরী বীজ হলে আট হাজার আর তিন অক্ষরী বীজ পাঁচ হাজার বার জপ করেন। চতুরক্ষরী বা ততোধিক অক্ষরী বীজ অষ্টোত্তর সহস্র সংখ্যায় জপ করতে হয়। নিশির শুরু থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত জপ করতে হয়। অর্ধেক রাত জপে কেটে যাওয়ার পরও যদি কিছু দেখতে পাওয়া না যায় তখন দুর্গাবীজের স্মরণাপন্ন হতে হবে সাধককে। জপ করতে-করতেই ইষ্টের অনুভূতি বা দর্শনাদি ঘটতে থাকে। তখন বুঝতে হবে শ্মশান সাধন, চিতা সাধন সিদ্ধির পর্যায়ে পৌঁছে গেছে।

বীর শব্দের বী আর রজঃ শব্দের র নিয়ে বীর শব্দটা নিষ্পন্ন হয়েছে। তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের ভিতর বীর অর্থ বীরভাবাশ্রিত সাধক। অনেকে বীর সাধক সম্বোধন করেন বটে। তবে এক্ষেত্রে বীর হলেন অবিদ্যার মোহান্ধকার থেকে বেরিয়ে অদ্বৈতজ্ঞান সম্পন্ন যোগমার্গীরা। তন্ত্রে বীরভাবের সাধনার মধ্যে চিতা সাধনা, শব সাধনা উল্লেখ্য। অত্যন্ত বলশালী তান্ত্রিক সাধকেরাই এই সাধনা করে থাকেন। এমন সাধকেরাই তন্ত্রের বীর সাধক। রাগ, ক্লেশ, মদ, মোহ, রিপু ও ইন্দ্রিয় বিদূরিত সাধকেরাই বীর। এমনকী রজঃ ও তমোগুণের দশা সরে গেছে যে দেহগুলোর সেগুলো বীরভাবাপন্ন বলা হয়েছে "কুলার্ণবতন্ত্রে", বীতরাগমদক্লেশকোপমাৎসর্যমোহতঃ। রজস্তমোবিদূরিত্বাদ্বীর ইত্যভিধীয়তে।। অদ্বৈতভাবের সাধকদেরও বীর বলা হচ্ছে। মন যাঁদের স্বাত্মানন্দে, ব্রহ্মানন্দে তাঁরাই বীর। "নির্বাণতন্ত্র" বলছে অবধূত সাধকেরাই বীর হওয়ার উপযুক্ত। সন্ন্যাসী বলতে যা বোঝায় অবধূতরা কিন্তু তা নন, অবধূত কোনও সন্ন্যাসী নন। যাঁরা ঘর সংসার ত্যাগ করে আসেন তাঁদের সন্ন্যাসী বলে। তাঁদের সম্প্রদায় থাকে। এই যেমন তীর্থ, সরস্বতী, গিরি, পুরী, ভারতী। শঙ্করাচার্যের দশনামীরা আলাদা আলাদা

সম্প্রদায়। অবধূতেরা আশ্রমত্যাগী। এঁরা মুক্ত। কোনও আশ্রম-টাশ্রম করেন না। সর্ববন্ধন মুক্ত হলেই অবধূত হওয়া যায়। এই কারণেই ''নির্বাণতন্ত্র'' বলছে অবধূতরাই বীর। শিব বলছেন পার্বতী দেবীকে, যাঁর লম্বা চুল জটাজূট হয়ে গেছে ঠিকমতো যত্ন না নেওয়ার কারণে, যিনি হাড়ের মালা-রুদ্রাক্ষ ধারণ করে আছেন, কৌপীনধারী-দিগম্বর, গায়ে যাঁর ভস্ম-রক্তচন্দন, যিনি ক্ষমাশীল, দান-ধ্যান-তপস্যাতে কেবল মগ্ন, যাঁর প্রবল বালভাব— নিজেকে শিববৎ, শববৎ অবস্থায় রাখতে স্বচ্ছন্দ বোধ করছেন তিনি যে বর্ণ বা সম্প্রদায়ের হন না কেন অবধূত ও বীর সাধক। বীরের দুটো ভাবের কথাও বলা হয়েছে। পশুভাবের ভিতরও দুই ভাগ রয়েছে। সভাব আর বিভাব পশু। সভাব পশু হল স্বীয় স্বভাবে যখন জ্ঞানের কণাদি আসতে থাকছে সেই অবস্থান্তর আর জ্ঞান যখন একটু পেকে পরিপোক্ত হচ্ছে তখন সেটা বিভাব পশুর অবস্থা। সভাব বীর হচ্ছে যে দেহে সত্ত্বগুণ জেগে উঠেছে একেবারে প্রবলরূপে আর রজঃগুণের দেহধারীরা হলেন বিভাব বীর। ''শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে'' পাঁচটা চক্র চিহ্নিত করে বীরভাবকে নিষ্পন্ন করা হয়েছে। জীব চক্রে রয়েছে ভাবযোগ, পুষ্প চক্রে ক্রিয়াযোগ, শ্রী চক্রে জ্ঞান, ঊর্মিলা চক্রে লয় এবং চূড়া চক্রে রয়েছে রাজযোগ। জীব চক্র হল মূলাধার, পুষ্প চক্র মণিপুর , শ্রী চক্র অনাহত, ঊর্মিলা চক্র আজ্ঞা, চূড়া চক্র সহস্রার। দেহচক্রের ভেদ বোঝানো হয়েছে এভাবেও বীরভাবের প্রকারভেদে। তন্ত্রে বীর সাধকের বিবিধ সাধনা নির্দিষ্ট। কালী, তারা, ছিন্নমস্তার সাধনাও বীরভাবে করলে রাত্রির এক যামেই সিদ্ধিলাভ করা সম্ভব বলেই উল্লেখ রয়েছে ''শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে'', কালী তারা ছিন্নমস্তা বীরসাধনমার্গতঃ। যামমাত্রেণ সিধ্যন্তি নাত্র কার্যা বিচারণাঃ।। বীর সাধনে যন্ত্র, মন্ত্র, পুজো এগুলো সব গুরু পরম্পরা অনুযায়ী অবগত হওয়ার বিষয়। একেক পরম্পরাতে ক্রম সংকেত, পুজো সংকেত, মন্ত্র সংকেত, যন্ত্র সংকেত ও লিখন সংকেত সম্পূর্ণ আলাদা-আলাদা হয়। বীরের পরই

দিব্যভাব। জগৎ যখন স্ত্রীময় আর সাধক নিজে হয়ে ওঠেন শিববৎ তখনই সেটা দিব্যভাবে গান্তর হয়। দিব্যভাবের ভিতরই দেহের সঙ্গে শ্মশান সম্বন্ধ, চিতা সম্বন্ধ আর শব সম্বন্ধ প্রকট হয়ে ওঠে। তখন আর বাহ্যিক তন্ত্রের ক্রিয়াদি— শ্মশানে শবের ওপর বসে, চিতার ওপর বসে হোম, ক্রিয়াদি, পুজোর প্রয়োজন হয় না। শব সাধনা হয়ে ওঠে আন্তর তন্ত্রের ক্রিয়া।

শব সাধনার নির্দিষ্ট স্থান ও কালের উল্লেখ রয়েছে শাস্ত্রাদিতে। ইচ্ছামতো সময়ে শব সাধনা করা যায় না। খালি ঘর, ফাঁকা নদীর ধার, পাহাড়ি উপত্যকা, প্রাচীন বেলতলা, শ্মশান ও তার কাছেপিঠের ঝোপ জঙ্গল ভরা বনপ্রদেশ শব সাধনের পক্ষে উপযুক্ত। সেই সঙ্গে কৃষ্ণপক্ষ ও শুক্লপক্ষের অষ্টমী তিথি, চতুর্দশী তিথির সঙ্গে যদি মঙ্গলবার পড়ে তাহলে সাধনায় উৎকৃষ্ট সিদ্ধি আসে। ''ভাবচূড়ামণির'' ভিতর তেমনই উল্লেখ রয়েছে, শূন্যাগারে নদীতীরে পর্বতে নির্জনেপি বা। বিল্বমূলে শ্মশানে বা তৎসমীপে বনস্থলে। অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দশ্যাং পক্ষয়োরুভয়োরপি। ভৌমবারে তমিস্রায়াং সাধয়েৎ সিদ্ধিমুত্তমাম সমস্ত তন্ত্র সাধকেরা শব সাধনার অধিকারী নন। মোহ স্নেহ আসক্তিহীন বীরভাবের সাধকদের জন্যই তন্ত্রের শব সাধনা। যে কোনও শবদেহের ওপর বসে সাধনাও চলে না। অপঘাতে মরা দেহের ওপর বসে সাধন উপযুক্ত। তবে সেই দেহটা যদি স্ত্রী সংসর্গে আসক্তিতে ভরা থাকে তবে বর্জন করাই শ্রেয়। বয়স্ক শবও উপযুক্ত নয়। বাসি গলিত শবও সাধনাতে পরিত্যক্ত। শবের বাহুমূল থেকে কটি পর্যন্ত চতুরস্র ভাবনা করে তার ভেতর চতুর্দ্ধার অষ্টদল পদ্ম ভাবনা করতে হয়। বীর সাধক উত্তর সাধক শবের ওপর বসে সাধনাদিতে সক্রিয় হবেন। স্থূল সাধন বিধির পাশাপাশি সূক্ষ্ম সাধনাদিই শব সাধনে গুরুত্বপূর্ণ। সাধকের প্রাণ-হৃদয়, যোগ-হৃদয় আর জ্ঞান-হৃদয় এই ত্রি-হৃদয় যদি শ্মশানসম হয়ে ওঠে তবে দেহের ভূমিত্রয় মহাশ্মশানে পরিণত হয়ে যায়। তান্ত্রিক সাধক তখন অনায়াসে গেয়ে

উঠতে পারেন, শ্মশান ভালোবাসিস বলে, শ্মশান করেছি হৃদি। শ্মশানবাসিনী শ্যামা, নাচবি বলে নিরবধি।। আর কিছু নাই মা চিতে, চিতার আগুন জ্বলছে চিতে। চিতাভস্ম চারিভিতে একবার এসে দেখিস যদি। হৃদয় যখন শ্মশান হয় তখন মায়া মোহের বন্ধনাদি ছিঁড়ে যায়, সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দ সব এক বোধে সামিল হয়ে যায়, স্থূলদেহের ইন্দ্রিয়াদিতেও সেভাবে আর সাড়া আসে না, তখন কুণ্ডলিনী শবে মন যায়। মূলাধারে যতক্ষণ শক্তি ঘুমিয়ে থাকে বস্তুদেহ শব হয়ে থাকে। যখন ঊর্ধমুখী স্রোতে শব জেগে গিয়ে শববৎ শক্তি চলতে থাকে তখন বস্তুর আবরণ খসে পড়ে। মূলাধারে স্থিরপ্রায় কুণ্ডলিনী হল গিয়ে শব। কুণ্ডলিনী শব জেগে গেলে স্থূলদেহের তখন মৃত্যু ঘটে। কুণ্ডলিনী শব জেগে যাওয়ার পর যখন মূলাধারে শক্তি থাকে তখন হঠাৎ করে স্নায়ুর উত্তেজনা বেড়ে যায়। কুণ্ডলিনী শক্তি স্বাধিষ্ঠানে গিয়ে চাপ মারার সময় যৌন উন্মাদনাও বাড়তে পারে আবার মণিপুরে কুণ্ডলিনীর স্রোত যখন প্রবলভাবে বইতে থাকে তখন খাই-খাই ভাব জেগে ওঠে দেহের। কুণ্ডলিনী জাগলে দেহের উজ্জ্বলতা বেড়ে যাবে। হঠাৎ করে কুণ্ডলিনী জেগে গেলে উত্তেজনা, রিপুর সমস্যা দেখা দেয় অনেক দেহে। কুণ্ডলিনী যখন গুরু নিয়ন্ত্রিত পথে জাগে আস্তে ধীরে এইসব সমস্যাদির ভিতর আবার পড়তে হয় না। কুণ্ডলিনী হল বিদ্যুৎ লতা। প্রচণ্ড বায়ুর আঘাত যদি কোনও দেহে হঠাৎ লাগে তাতেও কুণ্ডলিনী জাগে আবার খুব সৃজনচিন্তার অধিকারী পণ্ডিত মানুষজনের কুণ্ডলিনী গুরু ছাড়াও জেগে যায়। তবে এইভাবে জাগরণ স্থায়ী দশা দিতে পারে না কখনো। দেহ আবার শববৎ হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। তখন গুরুর দেখানো পথে চক্র সক্রিয় করে ফের কুণ্ডলিনী শক্তি জাগাতে হয়। হঠাৎ জাগা কুণ্ডলিনী শক্তিধারীরা অভিচার ক্রিয়াদির ভিতর ঢুকে যান। তাঁরাই শুক্ল ও কৃষ্ণ জাদুগুলো তখন করতে থাকেন। যে জাদুগুলোর প্রয়োগ করে মানুষের খারাপ করা চলে সেগুলো হল কৃষ্ণ জাদু। এগুলো সব তান্ত্রিক

ষটকর্ম। বশ্য বা বশীকরণ, স্তম্ভন, বিদ্বেষণ, উচাটন, মারণ — এগুলো তান্ত্রিক ষটকর্মের ভিতর পড়ে। তান্ত্রিকী শান্তি কর্ম বলে এক প্রকার ক্রিয়া আছে যা শুক্ল জাদু বলা চলে, তা দিয়ে মানুষের কিছু ভাল হতে পারে। দীর্ঘদিন ধরে কোনও মানুষ ভুগছেন, সারবার আশা নেই। ষটকর্মের তান্ত্রিক শান্তি কাজ দিয়ে তাঁকে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে নেওয়া যায়। এই কর্মকে বলে শান্তি স্বস্ত্যয়ন। গ্রহদোষ কাটানোর জন্যও অনেকে বাড়িতে শান্তি স্বস্ত্যয়ন করেন। তবে স্বস্ত্যয়নের কৃত্য বা অভিচার ক্রিয়াটি তো আবার সাংঘাতিক। কৃত্য বা অভিচার ক্রিয়া হল তান্ত্রিক ডেকে নিজের ভাল আর অপরের খারাপ করা। বেদে পর্যন্ত এই তান্ত্রিক অভিচার ক্রিয়ার প্রয়োগ রয়েছে। সেখানে শত্রু নিপাত করা হচ্ছে, বেদের ভাষায়, কৃত্যা, ওই কৃষ্ণজাদু দিয়েই। যে কাজের মাধ্যমে সমস্ত লোককে নিজের আজ্ঞাবাহী করে তোলা যায় তাই হল গিয়ে তান্ত্রিক বশীকরণ। যে কাজের দ্বারা মানুষের সমস্ত প্রবৃত্তিকে আটকে দেওয়া যায় তাই হল গিয়ে তন্ত্রের স্তম্ভন ক্রিয়া। সাধক নিজের ক্রোধ, লোভ, কামের রিপুগুলোকে স্তম্ভন ক্রিয়া করেই হেফাজতে আনতে পারেন। তবে শক্তির অপব্যবহার করতে করতে শক্তি নষ্টও হয়। বেশিদিন এগুলো থাকেও না। এজন্য অভিচার ক্রিয়াকারী তান্ত্রিকেরা বেশিদিন টেকেন না। এঁদের পতন ঘটে তাড়াতাড়ি। তবে আজকের তান্ত্রিক ভেকধারী জ্যোতিষীরা যে অভিচার ক্রিয়াদির বিজ্ঞাপন করেন সেগুলো আদতে কোনওভাবেই সম্ভবপর নয়। এগুলো করতে গেলে মণিপুর চক্র অবধি পৌঁছতে হবে। আর মণিপুর জাগা সাধক এগুলো কখনও করতে বসবেন না। তাই আজকের যুগে অনেকেই বলেন যে আমার উপর অভিচার ক্রিয়াদি হয়েছে, আমি খুব খারাপ অবস্থার ভিতর আছি। এগুলো সব হয় স্থূল মন প্রচণ্ড দুর্বলতার স্বীকার হলেই। অশিক্ষিত, অল্পশিক্ষিত থেকে খুব উচ্চশিক্ষিতরা পর্যন্ত এর স্বীকার হন। আমার কাছে এমন মানুষেরা আসেন

যাঁরা অতীব উচ্চশিক্ষিত ও সমাজে প্রভূত ক্ষমতার ভিতর আছেন তাঁদের যখন দীর্ঘ রোগভোগাদি হয়, ব্যর্থতা আসে, জীবনে ঘনিয়ে আসে অসাফল্য তখন তাঁরা ভাবেন কেউ তাঁদের ওপর অভিচার ক্রিয়াদি করেছে। অনেকেই তখন ভেকধারী তান্ত্রিকদের কাছে গিয়ে অর্থ নষ্ট করে প্রতারিত হন। তথাপিও এগুলো থেকে বিশ্বাস তুলতে পারেন না। এমন অভিজ্ঞতা আমার প্রায়ই হয়ে থাকে। তাঁরা তন্ত্রের মূল উদ্দেশ্য, সাধন ও সিদ্ধি বোঝেন না। এসব বিষয়ে কোনওরকম অভিজ্ঞতা বা পড়াশোনা পর্যন্ত নেই। আছে কেবল অভিচার ক্রিয়াদিতে বিশ্বাস। এমন উচ্চশিক্ষিতদের হাতে পড়ে তন্ত্রের অপবিদ্যাগুলো যেন আরও প্রাণ পেতে থাকে। আমি উচ্চশিক্ষিতদের এহেন আচরণ দেখে তাজ্জব হয়ে যাই। তাঁদের যদি বলি, কুণ্ডলিনী ক্রিয়াদি শিখুন। এর মাধ্যমে আপনার সমস্যা আপনিই সারিয়ে নিতে পারবেন। তাঁরা তখন তন্ত্রের দীক্ষা নিয়ম-যাগ ও আচরণে আস্থাবান হন না। শিখতে চান না। তাঁদের আস্থা খালি তন্ত্রের খারাপ বিদ্যায় আর সমস্যা সমাধানের রাস্তায়। তন্ত্র তো সমস্যার সমাধান করে না কখনওই। তন্ত্র অতীন্দ্রিয় বোধ এনে দেয়। সেই বোধের সঙ্গে আধ্যাত্মিক জগতের সংযোগ আছে কেবল। সংসারের কাম কামনা থেকে সব সময়ই দূরে থাকতে চায় তন্ত্র। কামকামীরাই একে তার ভিতর টেনে আনে আর তন্ত্রশাস্ত্রের বদনাম ঘটে।

কুণ্ডলিনী ঘুমিয়ে আছে মানেই দেহে অহং ভরা ব্যক্তিসত্তার বিলয় ঘটেনি। দেহের স্থূলচিন্তাদির মৃত্যু ঘটেনি। দেহে রয়েছে তিন গুণ— সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। এই গুণত্রয় মনকে প্রভাবিত করে চলছে সর্বক্ষণ। মন ব্যস্ত এদের কারসাজিতে। এরাই মনকে শান্ত করে, অস্থির-চঞ্চল করে দিয়ে ইন্দ্রিয়াদির ইশারার ভেতর নিয়ে তোলে। মনের পর প্রাণ। প্রাণসত্তায় পৌঁছাতে গেলে আগে স্থূলদেহের কাছে বসতে হবে। দেহের রাসায়নিক অবস্থা আছে। ছটি স্বাদে ভরা দেহ মন ও ইন্দ্রিয়কে প্রভাবিত করতে পারে। মিষ্টি, টক,

নোনতা, ঝাল, তেতো ও কটু অভিব্যক্তি জিভে এনে দিয়ে তেমনই রোজকার জীবনে নানান মুহূর্তমালায় এই রাসায়নিক অবস্থাগুলো ছড়িয়ে যায়। মানুষের মিষ্টি কথা আর ভাল ব্যবহারের স্বাদ গ্রহণ করে দেহ। হাসি ইয়ার্কির মৃদুমন্দ টক বাতাস জীবনের চলার পথে বয়ে-বয়ে যায়। ঘামে ভেজা ক্লান্ত নোনতা শরীরে পরিশ্রমের ছায়া ধরা পরে। অন্যের দুর্ব্যবহারের তেতো স্বাদ অস্থির করে তোলে আমাদের। ঝগড়া বিবাদের তীব্র ঝাল এসে লাগে দেহবাড়ির অন্দরে আর মানুষের খারাপ কটু কথার রেশ জীবনে কলতান তুলতে থাকে, আমরা ভুলতে চেষ্টা করি কিন্তু সব যেন ফিরে চলে আসে। এভাবে বাহ্যিক ও আন্তর ছটি স্বাদ দেহের রাসায়নিক অবস্থা ঠিক করে। মন ও দেহকে আলগা করে দেয় এই ছটি স্বাদ। এর সঙ্গে পঞ্চভূত বা দেহের পাঁচটা উপাদান— ক্ষিতি-অপ-তেজ-মরুৎ-ব্যোমের ছায়াপাত পড়তে থাকে দেহে। নানান সমস্যা ও বাঁধার ভেতর দেহের ক্ষিতি নড়ে যায়। ঠাণ্ডা অপদেহকে শ্রান্তি দেয় তেমনই পরিবেশের গরম বায়ু তাতিয়ে তোলে দেহের বায়ু। জীবনে তাপ লাগতে থাকে অনেক ওঠা-পড়ার। আর একখানা মনোমতো আশ্রয়ের জায়গা, আকাশ পেলে জীবনটা অনেক বেশি সুন্দর হয়ে ওঠে। স্থূল পঞ্চভূত এভাবে ক্রিয়া করে। আর সূক্ষ্ম পঞ্চ উপাদানকে দেহসাধকেরা ব্যবহার করতে জানেন। এ সকলের ব্যবহারিক বিষয়াদি না হলে বাহ্যিক স্তরটা দিয়ে দেহঘড়ি সময় দিতে থাকে। আন্তর প্রক্রিয়াগুলো গুরুর কাছে শিখে নিয়ে ব্যবহারিক করে তোলেন সাধক। এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে দশটা ইন্দ্রিয়। পাঁচটা জ্ঞানেন্দ্রিয় ও আরও পাঁচটা কর্মেন্দ্রিয় সারাক্ষণ জড়িয়ে থাকে দেহের সঙ্গে। সর্বমোট এই চব্বিশ আবরণে ঢাকা দেহের ভিতর রয়েছে কুণ্ডলিনী শক্তি। তান্ত্রিকেরা বলেন দেহের আবরণ মহামায়ার। মায়ার পর্দা সরানোটাই সবচেয়ে বড় কাজ। মায়ার ভিতর অহং। অহং সরলে শিববৎ, শববৎ মহাশূন্যতার দেখা মিলতে পারে আমাদের।

তখনই দেহচক্রের সন্ধান মেলে। ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে আটকে থাকে কুণ্ডলিনীর গিঁট। তাকে আগে খোলার কায়দা জানতে হবে। এটাই অধ্যাত্ম সাধনার মূল বিষয়বস্তু। দেহ শব হয়ে থাকে, ঘুমিয়ে থাকে মূলাধার পদ্মচক্রে। কুণ্ডলিনী শক্তি যখন আজ্ঞা চক্রে উঠে আসে তখন শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়াদি প্রায় স্তব্ধ হয়ে যায়। চক্রস্থ অঞ্চল শূন্যতার সৃষ্টি করে। দেহবোধের মৃত্যু ঘটে।

শ্মশান বৃত্তিনাশের জায়গা। শ্মশান সাধনায় শরীর শব হয়ে যায়। শরীর শব হওয়া মানে রিপু ও ইন্দ্রিয়ের ঊর্ধ্বে ওঠা। শবের ওপর বসে ধ্যানযোগ করেন তান্ত্রিকেরা। এর প্রধান কারণ হল মনের ওপর হতে নীচ অবধি একেবারে সর্বস্তরের কামনাকে আগাছার মতো টেনে তোলা। তুলতে পারলেই ঈশ্বরের প্রতি সমর্পণ আসবে। তখন কোথায় আর ব্যক্তিসত্তার অহং? কিছুই নেই। সবই শ্মশান। সাধনযোগে সাময়িক মৃত্যুর পর যখন আবার স্থূলদেহে ফিরে আসেন সাধকেরা তখন সূক্ষ্ম অস্তিত্বের খবরকে উপলব্ধি করতে পারেন। এই উপলব্ধি জানিয়ে দেয় মৃত্যু ঘটলে স্থূল অস্তিত্ব না থাকলেও একটা সূক্ষ্ম অস্তিত্ব সবসময় থাকে। কুণ্ডলিনী শবে দেহবোধের অস্তিত্ব সরে গেলে সাধক দেহের রূপান্তর ঘটে যায়। দেহের দুটো রূপ হয়। প্রথম রূপ খর। দ্বিতীয় অস্তিত্ব নর। যখন ষটচক্র ভেদ হয় তখন দেহ নর হয়ে ওঠে। খর হল গাধা। অর্থাৎ নিজের অজান্তে এই রূপে দেহ চলছে তিনটে নিম্নস্থ চক্রের প্রভাবে। কিন্তু চক্রগুলোর সঠিক ব্যবহার দেহ তখন জানে না। নর দেহরূপে আরও তিনটে চক্রের প্রবল প্রভাব কাজ করে। এই ষটচক্রভেদের প্রভাব ধরতে হলে কামনা বাসনা মুক্ত হয়ে শ্মশানসম হতে হবে তখন কুণ্ডলিনী মহাশক্তির রহস্য ঠিকমতো বোঝা যাবে। শ্মশান ছাড়া মহাশক্তির স্বরূপ কখনও ধরা যাবে না। তান্ত্রিকের সাধনপন্থা যখন সূক্ষ্মে চলে আসে তখন দেহটাই শ্মশান। দেহে যখন অন্ধকারের বিলয় হয় তখন শিবের বৈনাশিক রূপভাবনা উঠে আসে। মোক্ষলাভ সমস্ত সাধনার উদ্দেশ্য।

জীবন মৃত্যুর চক্র পেরোনাটাই সাধনা। দেহচক্র পার হওয়ার জায়গা হল শ্মশান। শরীরকে শ্মশান করে স্থূল শ্মশানে বসে অঘোরী সাধুরা শব সাধনা করেন। মৃতদেহ থেকে হাড় ছাড়িয়ে অঘোরীরা সঙ্গে রাখেন, গাঁজা মদ খান, নরকপাল, মানুষের মাথার খুলিতে খাদ্যাখাদ্য গ্রহণ করেন। চিতাভস্ম মাখেন। চিতাভস্ম শিবরূপের সামিল। শ্মশানে মরার খুলি সহজে মেলে বলে অঘোরীরা ওটাকেই পানপাত্র হিসেবে ব্যবহার করে থাকেন। পানপাত্র নরকপাল খাদ্য খাওয়ার জায়গা। অঘোরী সাধুরা পচা নোংরা খাবার খান অনেক সময়। এটা ইন্দ্রিয়জয়ের একখানা দিক, আর এক দিকে উঠে আসে নগ্ন থাকা। শ্মশানবাসী সাধকেরা জীবনকে যথেষ্ট কম উপাদান দিয়ে সাজাতে চান আর কী। শিব বা শব কখনও নিঃশক্তিক নয়। সেজন্য সে জেগে ওঠে। শব সাধনার উপাচারে শ্মশানে উঠে বসে মরা। দেহ যখন সমাধিস্থ হয়ে যায় তখনও কিন্তু তার একটা শক্তি কাজ করে। একে বলে, ধৃতিশক্তি। দেহের মধ্যে শক্তির নিমেষ - উন্মেষ হয়। শক্তি কখনও লোপ পায় না। তান্ত্রিকেরা শোণিত বিন্দু আর সাদা বিন্দুস্পন্দের কথা বলেন কুণ্ডলিনী যোগে। শোণিত বিন্দুটা শক্তির আর শ্বেতবিন্দু শিবের। দুটোর মধ্যে কোনও ভেদ নেই। সাধকেরা বলেন একে, প্রপঞ্চোপশম। ত্রিগুণাত্মিকা শক্তি খেলছে দেহের ভিতর। শিবের শক্তি থেকে ত্রিগুণ তিনটে রেখা বের হচ্ছে। সত্ত্বগুণের শক্তি দিয়ে সাধকেরা ঊর্ধ্বস্রোতা হচ্ছেন। কুণ্ডলিনী ওপরে উঠতে থাকছে খালি। তার বিপরীতে রয়েছে অধঃস্রোতা তমোগুণ। যা নিম্নস্থ মূলাধারের নীচে আটকে রাখছে দেহ ও মনকে। সাধনায় দুটোই ঊর্ধ্বস্রোতা হবে। কুণ্ডলিনী ওপরে উঠছে আবার নীচেও তো নেমে আসছে, একে বলা হচ্ছে, শক্তিপাত। নীচে নামছে বলেই কুণ্ডলিনী ঊর্ধ্বমুখী হচ্ছে ফের। জড় দেহে, শববৎ সত্তার ভিতর এভাবে কুণ্ডলিনী ধ্যান সাধনায় প্রাণ-চেতনা জেগে উঠছে। এ হল দেহের মধ্যকার কুণ্ডলিনী ক্রিয়াদিতে শক্তিপাতের ফলাফল। দুইয়ের মাঝে

বইছে আবার রজোগুণের তরঙ্গ। নিমেষ উন্মেষ। শববৎ শিব এ কারণেই দেহের মধ্যে কখনও নিঃশক্তিক নন, তিনি জাগেন। শব সাধনায় সাধকের নিষ্পন্দ অবস্থাকে তিনিই তো ধরে রাখেন।

চাক্ষুষী বিদ্যা ও সম্মোহন

সে বড় বিষম ঠাঁই,
গুরু-শিষ্যে ভেদ নাই।

১৯১২ সালে দেহ রাখেন তারাপীঠের শ্মশান সাধক বামদেব বাবা। ওঁর কাছে যখন অধ্যাত্ম জিজ্ঞাসু, চিত্রকর প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় গিয়ে পৌঁছান, বামদেব বাবার প্রবৃদ্ধ শরীর। কুঠিয়ায় বসে থাকেন। শ্মশান ধারে চলাফেরা করার মতন শক্তি ওঁর নেই। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে সাধন করে পাওয়া ওঁর ভিতর অর্জিত অভূতপূর্ব শক্তির ছটা তখনও তো বর্তমান। তারই হঠাৎ ছোঁয়া পেলেন তরুণ জিজ্ঞাসু প্রমোদকুমার। তিনি দেখলেন এক দীর্ঘকালীন রোগে ভোগা কিশোরের মৃত শরীর নিয়ে এসেছেন ওর বাবা মা। সেই শরীর বামদেব বাবার নির্দেশে শ্মশানে রেখে আসার পরপর চোখ খুলে উঠে দাঁড়িয়েছে সে!

বিশ শতকের প্রথম দিকের শ্মশান। ভয়াবহ। ঘুটঘুটে। এখনকার তারাপীঠ শ্মশানের সঙ্গে পূর্বেকার ওই শ্মশানকে তো গুলিয়ে ফেললে চলবে না। তারা মায়ের রথঘরের পাশ দিয়ে গেলেই তখন শ্মশান। ঢুকেই সব খড়ের চালের মাটির ঘর। বিরাট নিমের এক গাছ বামদেব বাবার চালা ধরে এগোলে উত্তর ধারে। ওখানেই রয়েছে বাবার গুরুদেব মোক্ষদানন্দ বাবার সমাধি। সে সমাধি আজও বর্তমান।

বামদেবের আবির্ভাব উনিশ শতকের প্রথমার্ধে। ১৮৩৭ সালে। তাঁর মহাশ্মশানে সাধনার বহু আগেই তারাপীঠ শ্মশানে সাধনা করে গিয়েছেন বিশে খ্যাপা। তিনি ছিলেন তৎকালীন সময়ের প্রসিদ্ধ কৌলাচার্য। বিশে খ্যাপা আঠারো শতকের প্রথম দিকের মানুষ ছিলেন। তিনি আঠারো শতকের শেষ

দিকে দেহ রাখেন তারাপীঠেই। কিন্তু তাঁর সমাধির চিহ্ন আজ আর খুঁজে পাওয়া যায় না। তাঁর সম্পর্কে তেমন কিছু জানাও যায় না। তারাপীঠের পুরনো সাধক পরম্পরার ভিতর ওঁর নাম কেবল পাওয়া যায়। শোনা যায় তিনিও অলৌকিক সিদ্ধির অধিকারী ছিলেন।

বিশে খ্যাপার পর আর-এক কৌলাচার্য তারাপীঠ মহাশ্মশানে সাধনা করতে আসেন আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময়েই। তাঁর নাম ছিল আনন্দনাথ। নাটোরের রাজা রামকৃষ্ণ রায় যখন তারাপীঠ আসা-যাওয়া করতে করতে মহাপীঠকে তাঁর জমিদারীর ভিতর এনে তুলছেন, শ্মশানে সাধনা করছেন আনন্দনাথ ভৈরব। তাঁর কাছেই দীক্ষা হয় রাজার। মাতৃভক্ত সাধক রাজা বেশ কয়েকটা মায়ের গানও পরবর্তী সময়ে রচনা করেন। যার মধ্যে বিশেষ উল্লেখ্য,

মন যদি মোর ভুলে,
তবে বালির শয্যায় কালীর নাম দিও কর্ণমূলে।
এ দেহ আপনার নয় রিপু-সঙ্গে চলে,
আনরে ভোলা জপের মালা, ভাসি গঙ্গাজলে
ভয় পেয়ে রামকৃষ্ণ ভোলা প্রতি বলে—
আমার ইষ্ট প্রতি দৃষ্টি খাটো, কি আছে কপালে।।

প্রতি বছর আশ্বিনের শুক্লা চতুর্দশী থেকে যে বিশেষ তারাপূজা ও সাত দিন ধরে চলা উৎসব অনুষ্ঠিত হয় আজকের তারাপীঠে তার প্রবক্তা ছিলেন রাজা রামকৃষ্ণ রায়ের তন্ত্রগুরু আনন্দনাথ ভৈরব ঠাকুর। রামকৃষ্ণ রায় দেহ রাখেন ১৭৯৫ সালে। এর কিছু আগে মহাশ্মশানেই দেহ রাখেন আনন্দনাথ ভৈরব। কিন্তু তাঁরও সমাধি খুঁজে পাওয়া যায় না।

আনন্দনাথ ভৈরব দেহ রাখার পর ওঁর সাক্ষাৎ শিষ্য তারাপীঠ মহাশ্মশানে কৌলমতে সাধনা জারি রাখেন গুরুর নির্দেশিত পথেই। পরে তাঁর কাছেই

ছুটে আসেন প্রসিদ্ধ সাধক কবি কমলাকান্ত ভট্টাচার্য। উনিশ শতকের শুরুর সময়। কমলাকান্ত এসেছেন সস্ত্রীক আনন্দনাথ ভৈরব ঠাকুরের শিষ্যের কাছে। তিনি দ্বিতীয় আনন্দনাথ বাবা নামেই তখন পরিচিত। তিনিই কমলাকান্তকে বললেন, কৌল সাধনার জন্য স্ত্রী ত্যাগ তোমার দরকার নেই। তিনি তো শক্তি। আছেন যখন, খামোখা ত্যাগ করবেই বা কেন ? সস্ত্রীক সাধনা করো, সিদ্ধি অবধারিত। আনন্দনাথ দেহ রাখেন আঠারো শতকের শুরুর দ্বিতীয়ার্ধেই। তাঁরও সমাধি খুঁজে পাওয়া যায় না।

দ্বিতীয় আনন্দনাথের শিষ্য ছিলেন বিশ্বেশ্বর বাবা। তিনিও তন্ত্রসিদ্ধ ছিলেন গুরুর ঐশী শক্তিতেই। তারাপীঠ মহাশ্মশানে দেহ রাখেন তিনিও। কিন্তু তাঁরও সমাধি নিশ্চিহ্ন। বিশ্বেশ্বর বাবার শিষ্য ছিলেন বামদেব বাবার শিক্ষাগুরু মোক্ষদানন্দ বাবা। তারাপীঠের কাছে রাতনা গ্রামে ওঁর জন্ম। গৃহী সাধক ছিলেন প্রথম জীবনে। পূর্বতন নাম ছিল মানিকরাম মুখোপাধ্যায়। পরে বিশ্বেশ্বর বাবা ওঁর সন্ন্যাস দেন। নামকরণ করেন মোক্ষদানন্দ। তিনি গৃহী অবস্থাতে কাশীতে গিয়ে বৈদিক পণ্ডিতদের টোলে পড়াশোনা করেন। বৈদিক দীক্ষাও নেন। বামদেব যখন তরুণ সাধক, মহাশ্মশানে মোক্ষদানন্দ বাবা তাঁকে বেদ পড়ে শোনাতেন রোজ। মোক্ষদানন্দজির সমাধিতে নিজে হাতে মাটি দেন বামদেব। সেজন্যই বামদেবের গুরু পরম্পরাকে নাথপন্থার ভিতর ধরে থাকেন অনেকেই। কিন্তু আনন্দনাথজির গুরু পরম্পরার কোনও হদিশ সেইভাবে পাওয়া যায় না।

বামদেব বাবার আর এক গুরু কৈলাসপতি বাবা। তিনি বৃন্দাবন থেকে এসেছিলেন তারাপীঠ মহাশ্মশানে শ্যাম - শ্যামার অভেদ সাধনা করবেন বলে। বামদেবের তখন ছাব্বিশ বছর বয়স। তিনিই বামদেবকে সন্ন্যাসের পথে আনেন, তারপর মোক্ষদানন্দজির কাছে সঁপে দিয়ে বৃন্দাবন ফিরে যান।

তিনি তারাপীঠ এসেছিলেন সাধনসঙ্গিনীর সঙ্গেই। কৈলাসপতি বাবা যুগলভজনা করতেন।

প্রবৃদ্ধ বামদেব তখন তারাপীঠ মহাশ্মশানের কুঠিয়ায়। এসেছেন তরুণ জিজ্ঞাসু প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়। প্রবৃদ্ধ সাধন জিজ্ঞেস করছেন, তোমার কী কোনও কঠিন রোগটোগ হয়েছে নাকি সাংসারিক কোনও বিপদে পড়েছ তুমি? জিজ্ঞাসু বললেন, না তো! আমি এসেছি আপনাকে দেখতে, আপনার সঙ্গ করতে। তন্ত্রের সম্পর্কে জানতে। বামদেব বাবা অবাক হয়ে বলেছিলেন, মানুষ বিপদে না পড়লে তো আমার কাছে আসে না, বাবা!

বুঝুন, কতকাল আগে থেকেই এই নিয়ম জারি! বিপদগ্রস্থ মানুষ, সংসারে দাগা খাওয়া মানুষ যাচ্ছেন তান্ত্রিক সাধুর কাছে তাঁর পার্থিব সমস্যার সমাধানের জন্যই। এখনও এই গতায়াত জারি আছে। অনেকেই ভাবেন তান্ত্রিক মানেই সুরাহা মিলবে। তরুণ প্রেমিক ভাবেন আমার ছেড়ে যাওয়া প্রেমিকাকে ফিরিয়ে দেবেন তান্ত্রিক। তরুণী ভাবেন আমার স্বপ্নের রাজপুত্র পাইয়ে দেবেন শ্মশানচারী। চাকরি না পাওয়া হতাশ তরুণ ভাবেন আমার চাকরির সুরাহা হবে ওঁর কুঠিয়ায় গেলেই। টাকা, গাড়ি-বাড়ি, ভাগ্য ফেরানো সব তান্ত্রিক করে দেবেন। এঁরা সব মারণ-উচাটন -বশীকরণ বিদ্যা জানেন। তাই এঁরাই আমার ব্যর্থতাতে সাফল্যের আলো ধরে দেবেন। এর জন্য এখন অবশ্য অনেক ভেকধারী দোকান খুলে, চেম্বার সাজিয়ে লাল-কালো-নীল পোশাক পরে বসে গেছেন। হতাশ, বিভ্রান্ত মানুষ এঁদের কাছেই আদতে ছুটছেন। কেননা সিদ্ধ শ্মশান সাধক এসব করেন না। এসব তান্ত্রিকদের কাজও না। তাঁদের ঐশী শক্তি, অলৌকিক ক্ষমতা মাঝে মাঝে ফুটে ওঠে, কাজ হয় গৃহস্তের তা ওই তান্ত্রিকের কৃপা। অমন কৃপা আপনে আসে। চাইলে পাওয়া যায় না। তাই উদ্দেশ্য নিয়ে সাধকের কাছে গিয়ে কোনও

লাভ হয় না। কেননা সাধকেরা তাঁদের এতদিনকার কঠোর তপস্যার সিদ্ধি অচেনা আপনাকে দিতে যাবেনই বা কেন? আপনি কী আপনার ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স অচেনা কেউ হঠাৎ এসে চাইলেই দিয়ে দেবেন? কখনওই নয়। তেমনই তন্ত্রের সিদ্ধাই, সাধকের কৃপা হঠাৎ পাওয়া যায় না। সাধকের পারমার্থিক ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স এগুলো। তিনি কেনই বা অচেনা আপনাকে তা হঠাৎ দিতে যাবেন? তান্ত্রিক জ্যোতিষের চেম্বারে নির্ধারিত মূল্যে আপনার আশা মিলতে পারে। মিলতে পারে মারণ-উচাটন-বশীকরণ। কিন্তু ওতে টাকা নষ্ট ছাড়া কিছুই হবে না আপনার।

বেশি কিছু কষ্ট করে, পড়ে-শুনে জানতে আপনাকে হবে না, আপনি কেবল তারাপীঠ ভৈরব বামদেব বাবার সাক্ষাৎ শিষ্য নিগমানন্দ সরস্বতী ঠাকুরের তান্ত্রিকগুরু বইখানা একবার পড়ুন। ওটা পড়লেই বুঝতে পারবেন তন্ত্রের ক্রিয়া কত কঠিন কাজ। আর অপতন্ত্র মারণ-উচাটন-বশীকরণ করতে গেলেও কুণ্ডলিনী খুলতে হয় আগে সিদ্ধ গুরুর কাছে। দোকান বা চেম্বারের গুরুর অত শক্তি নেই। এগুলো এখন লুপ্তবিদ্যা। ভেকধারীদের পক্ষে সম্ভবই নয়। গুটিকয়েক সিদ্ধ তান্ত্রিকেরা পারেন এসব। তাঁরা ভার্চুয়াল দুনিয়ার নন কেউই। আর যাঁরা অত দূরেরও নন কেবল জ্ঞানমার্গের তাঁরাও বা আপনার পার্থিব চাহিদা মেটাতে যাবেন কোন দুঃখে!

সাধন বিনা যেমন সিদ্ধি আসে না তেমনই দুম করে অচেনা কাউকে জ্ঞানী তাঁর সিদ্ধাই দিয়ে দেন না, যোগীও নন, তান্ত্রিকেরাও নন। এসব লভ্য সস্তার জিনিস নয়। পয়সার বিনিময়ে মেলে না। সিদ্ধাই গুরুর দীক্ষাও তেমনই। ও নিতে পয়সা লাগে না। তাঁরা কেউ দোকানদার গুরু নন। তাঁদের কৃপা ও করুণা পেতে আপনাকে কষ্ট করতে হবে। পথ হাঁটতে হবে। খুঁজতে হবে অনেক। অপেক্ষা করতে হবে। এক ফোনে, এক ম্যাসেজে আপনি এসব

পেতে পারেন না। কোনওভাবেই না। পথ অত সহজ নয়। যথেষ্ট আঁকাবাঁকা ও কঠিন।

দেহের মধ্যে থাকে বোধশূন্য জড় আমি, আমার নাম, আমার কায়া, রূপ। এগুলো যখন দেহ থেকে সরে, অবোধশূন্য আবেশ আসে। আবেশ থেকে আরাধ্যের শব্দরূপ নাদ, জ্যোতির ছায়াপাত হয় কুণ্ডলিনীর শক্তিদশায়। শক্তি যখন রূপ নেয়, বোধাত্মক পূর্ণ প্রাণ-চৈতন্য সাড়া ফেলে, দেবদেবীর সাক্ষাৎ ঘটে। দেহের মধ্যে আছে চাঞ্চল্য, স্থিতি আর মহাস্থিতির ত্রিমাত্রিক স্তর। চাঞ্চল্য আর স্থিতি দেহের বিপরীত দশা। যখন দেহ চঞ্চল, স্থিরদশা না থাকার ফলে স্থিতির আধার খুঁজে পাওয়া যায় না। যখন স্থিতির আধার দেহের ভেতর প্রস্ফুটিত হয় সাধুসঙ্গে, দেবতার মন্দিরে, তীর্থস্নানে, তাকে রক্ষা করে আধার বাড়ানোর প্রক্রিয়াগুলো করতে হয়। স্থিতির আধার বাড়বে মনকে শান্ত করতে পারলে। আধ্যাত্মিক যাবতীয় কর্মাদি দিয়ে স্থিতিকে ভালভাবে রক্ষা করে বাড়িয়ে তোলা যায়। রোজকার অভ্যাসে এটা সম্ভব। দেহ যখন স্থির থাকে, সত্তার অব্যক্ত স্তর ভাল করে বোধগম্য হয়। সত্তার ব্যক্ত স্তর দিয়ে আধ্যাত্মিক দরজা খোলা যায় না। সত্তার অব্যক্ত স্তরে যত মগ্ন থাকা যাবে ততই নিজস্ব রিক্ততার দেখা পাওয়া যাবে। রিক্ততা হল ব্যক্ত, বোধগম্য স্তরের স্মৃতি। এর ভিতর অভিমান, অহংকার ভরা থাকে। তার মধ্যে রিক্ততা ফুটে বের হবে বা কীরূপে! রিক্ততার জন্য ব্যক্ত স্তরে নিগ্রহ দরকার। নিগ্রহ থেকে অনুগ্রহ। অব্যক্ত বিরাট একটা ভূমি। অনুগ্রহ সাপেক্ষে ভূমিতে কেবল যাওয়া চলে। গুরুর অনুগ্রহ সবচেয়ে আগে প্রয়োজন। তিনি সত্তার ভিতর রিক্ততার আধার দেখিয়ে দেবেন। আধার বড় হতে হতে একসময় নিজস্ব স্থিতি, স্থির এলাকা খুঁজে পাওয়া সম্ভবপর হবে। স্থিতিকে তারপর অতিক্রম করতে হবে। দেহের একটা স্থিতি আছে। দেহ স্থির হতে হতে জড়-চেতনার ভেদ লুপ্তপ্রায় হয়। প্রাণ-চেতনার তেজ তখন

ব্যক্ত স্তরগুলোকে পুরোপুরি বন্ধ করে দিয়ে অব্যক্ত স্তর খুলে দেয়। চৈতন্যপ্রধান ভূমির মুখোমুখি হই আমরা। যেখানে দেহ অপ্রধান, মনও অপ্রধান। বৃত্তাধীন মন দেহাধীন নয়। মনে আত্মার ছাপ পড়েছে। মন আত্মার অধীন হয়ে পড়েছে। মনের ভিতর প্রকৃতিগত বৈচিত্র্য ছায়া ফেলেছে না। দেহের স্থিতি কুণ্ডলিনীর স্থিতির সঙ্গে জড়িয়ে গিয়ে বহির্মুখ ভাবধারাকে সরিয়ে দিয়েছে। বাইরের ভাব সরলে নিজের প্রকৃতির ছায়াও সরতে থাকবে। সরতে সরতে একসময় অন্তঃপ্রকৃতি জেগে উঠবে। ভিতরের অভিমুখ যখন পুরোপুরি স্থিত হবে, দেহ থেকে তিনটে অবস্থাও চলে যাবে। প্রথম অবস্থা দেহাত্মবোধের অহংকার, আমি কর্তা— সমস্ত কাজ আমার দ্বারা হচ্ছে, সুখ-দুঃখ সব আমি কাজ করতে করতে ভোগ করছি। দ্বিতীয় অবস্থা দেহ থেকে আত্মা যখন আলাদা বোধ হচ্ছে, দেহের ভোগাভাসগুলো টের পাচ্ছি, দেহ ভুগছে রোগে, শোকে, প্রকৃতিতে— আমি দেহ নই বলে ভোগাভাস দেখতে পাচ্ছি, দ্রষ্টামাত্র হয়ে উঠছি, যখন দেখছি যে, আমার নিয়ন্ত্রণাধীন কিছু নেই, প্রকৃতির কারণবর্গে এতসব হয়ে যাচ্ছে, ক্রিয়াশক্তির কাছে মাথা নত করছি। দ্রষ্টা হতে হতে জ্ঞানশক্তির আশ্রয়ে চলে যাচ্ছি। স্থূলের নির্যাস আমাকে টানছে না। ব্যক্ত পর্যায় নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। যাবতীয় চিন্তাভাবনা অব্যক্ত পর্যায় নিয়ে। বাইরে অতি তীব্র ধাক্কা এসেছে সেজন্য ভিতরে সাড়া পড়ছে খালি। ভিতরের সাড়ার তীব্র আঘাত থেকে ওপরের সাড়ার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। চেষ্টা করতে করতে দেহের বোধশূন্য জড় সরিয়ে ফেলেছি, নাম, কায়া, রূপ নিয়ে ভাবছি না বলে অবোধশূন্য আবেশ ভরিয়ে ভরিয়ে তুলছে। সেখান থেকে দেবতার শব্দরূপময় নাদ, জ্যোতি বোধাত্মক পূর্ণ কুণ্ডলিনী চক্রকে প্রবল ভাবে সক্রিয় করে তুলছে। চাঞ্চল্য আর স্থিতির ভিতর দিয়ে এভাবে মহাস্থিতিতে ঊর্ধদৃষ্টি নিয়ে বসে আছি।

দেখতে পাওয়ার অভ্যাস করা অধ্যাত্মবাদের প্রধান সাধনা। ইন্দ্রিয়াদি যতক্ষণ আমার অধীন ততক্ষণ কিছু দেখতে পাব না। চক্ষুকে ইন্দ্রিয়াদির ওপরে তুলতে পারলে দেখার রাস্তা খুলতে থাকবে। চোখকে ইচ্ছার অধীনে আনতে হবে। আমি যেমন চাই চোখ তেমন দেখবে। চোখকে আমার বশ করতে হবে। মনকে শান্ত করে যেমন স্থিতদশা এনেছি তেমনি এবার চোখকে ইন্দ্রিয়াদির বাইরে দাঁড়িয়ে দেখার অভ্যাস করা শেখাতে হবে আমাকে। আমাকেই এই অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। ইচ্ছাযুক্ত একটা বায়ুর আধার তৈরি করতে হবে। ইচ্ছাযুক্ত দৃষ্টি পেলে আমার চিদাকাশ কম্পিত হবে, আস্তে ধীরে সেখানে অনন্ত চিন্ময় আলো ফুটতে থাকবে। আমি দেখতে পারব। দেখার ইচ্ছা তৈরি করতে হবে আগে। দেখার ইচ্ছা, দিদৃক্ষা যখন ফুটে উঠবে স্থির মনখানাতে, চোখ আমার বশীভূত হয়ে পড়বে। চোখকে বশীকরণ করতে হবে। আমি যা চাইব চোখ সেটাই কেবল দেখবে। ইন্দ্রাদির ভেতর যখন আমাদের দেখা থাকে, আমি কিছু জিনিস, কটু তিক্ত দৃশ্যাবলি, অস্থির পরিস্থিতি দেখতে না চাইলেও চোখকে আটকাতে পারি না বলে ঠিক দেখে ফেলি। এতকাল আমার দিদৃক্ষা গড়ে উঠেনি বলে এমনটা হয়েছে। এখন দিদৃক্ষা গড়ে উঠেছে, চোখকে ইচ্ছার অধীন করতে পেরেছি, যে কোনও দেখার ক্ষেত্রে চক্ষু আর কোনওভাবে প্রবল নেই। চোখের ওপর স্থিরমনের কাজ শুরু হয়েছে। চোখে মন লেগে অন্তর্দৃষ্টির স্বভাব গড়ে উঠেছে বলে আমার দ্রষ্টাভাব জেগে গেছে। সুখ - দুঃখের ভাব থেকে দূরে দাঁড়িয়ে আছে আমার দ্রষ্টাভাব। দেখছি সুখ - দুঃখ, ইন্দ্রিয়, স্থূল দেহাদির সঙ্গে আমি আর তেমন করে জড়িত নই! শান্ত আনন্দময় নির্লিপ্ত একটা ভাব তৈরি হয়েছে আমার মনে। একে বলা হয় আধ্যাত্মিক স্থিতি। স্বভাবের ভেতর গিয়ে যখন দাঁড়াচ্ছে আধ্যাত্মিক স্থিতি, অন্তর্দৃষ্টির সম্মুখে নীলবর্ণ মণ্ডলাকার আকাশ দেখতেও পাচ্ছি। মনের ভিতর প্রথমে আকাশ তৈরি করলাম আমি দিদৃক্ষার

সাহায্যে। অন্তর্দৃষ্টির সাহায্য নিয়ে মন এখন যে আকাশ দেখতে পাচ্ছে সেটা চিত্তাকাশ। মনের আকাশে এতকাল অন্ধকার চাপা পড়ে ছিল। তাই মন অন্তর্দৃষ্টির সাহায্য নিয়ে দেখতে পায়নি চিত্তাকাশ। মন আলো দেখার কোনও চেষ্টাই তো করেনি এতকাল! দেখার ইচ্ছা, দিদৃক্ষা ছিল না বলে মনের ভিতর ছিল কেবল অন্ধকারের রাজ্য। দেহ সবসময় অন্ধকার ভূতাকাশে অবস্থান করে। মনে থাকে অজ্ঞানের নানান স্তর। সেটা সরলেই ভূতাকাশে হৃদয়াকাশ জেগে ওঠে। মনে আলো পড়ে। দেখার চোখ তৈরি হয়ে ওঠে বলে মন থেকে অন্ধকারের পর্দা চট করে সরে যায়। হৃদয়াকাশে আলো ফুটে উঠে। আলো যখন আরও প্রসারণশীলতা লাভ করে, মনের ভিতর চিত্ত জেগে ওঠে। স্থিরীকৃত অন্তর্দৃষ্টির ছোঁয়া পাওয়া মনই চিত্ত। এখানকার আকাশ চিত্তাকাশ নামে অভিহিত। চিত্তাকাশের অনেকগুলো স্তর আছে। যে সমস্ত চিন্তা মনে সবসময় উঠে থাকে আমাদের তার কতকগুলো খুব নীচের স্তরের চিন্তা। এই চিন্তাগুলোকে দেখা যায়। আর কতকগুলো চিন্তা নীচের স্তর থেকে আসলেও অন্তর্দৃষ্টি পেয়েও আমরা কোনওভাবে দেখতে পারি না। চিত্তাকাশের নীচের স্তরগুলোর চিন্তাদি হাওয়াতে ঘোরাফেরা করে। যখন মন দ্রষ্টার ভূমিকা নেয়, সেগুলো চিত্তাকাশে ধরা পড়ে। যাবতীয় ভোগের সম্ভাবনাদি ইচ্ছাযুক্ত দৃষ্টি পাওয়ার ফলে এখানে ফুটে ওঠে। সেগুলো থেকে মন দৃষ্টি সরাতে চায়। এভাবে চিত্তাকাশের দ্রষ্টা হতে হতে নানান সব ইন্দ্রিয়াদির নিম্নাধিকারী চিন্তাগুলো উচ্চাধিকারী হয়ে উঠে রূপবদল করে নেয়। চিত্তাকাশের আলোময় পর্দাদি অপসৃত হতে হতে চিদাকাশ দেখা যায়। কিন্তু চিদাকাশ তো স্থির হয় না। সেখানে নানান প্রকারাদি অন্ধকারের দশা ফুটে উঠে তা ভূতাকাশে নেমে যায়। ভূতাকাশ সরে সেখানে আবার ইচ্ছাযুক্ত দিদৃক্ষার প্রভাবে হৃদয়াকাশ চিত্তাকাশে বদল হয়। চিত্তাকাশের রন্ধ্র দিয়ে চিদাকাশ ফুটতে থাকে। সমস্ত বোধাদি ইচ্ছাযুক্ত দৃষ্টি থেকে আসে।

ভূতাকাশের দৃষ্টি অধোনেত্রের। এর ওপরে চিত্তাকাশে মধ্যনেত্রের ছায়া। হৃদয়াকাশ, চিত্তাকাশে একই দৃষ্টি থাকে মধ্যনেত্রের। চোখ তখন কিছুটা অন্তর্দৃষ্টির লব্ধ শিক্ষা পেয়ে দেখার অভ্যাস তৈরি করতে পেরেছে। দেখতে দেখতে মধ্যনেত্র সরে ঊর্ধ্বনেত্র আসে। চিদাকাশের দেখা ঊর্ধ্বনেত্রের। চিদাকাশেই ব্রহ্মনির্বাণাদি আসে। চিদাকাশে অন্তর্দৃষ্টি পড়তে পড়তে ঊর্ধ্বনেত্রের অভ্যাসযোগ যখন তৈরি হয়ে ওঠে, ভূতাকাশ, চিত্তাকাশ এগুলোতে চোখ পড়ে না। ঊর্ধ্বদৃষ্টির বোধস্বরূপ আত্মা দিদৃক্ষার ভিতর দিয়ে প্রকট হতে থাকে। একে বলা হয় ব্রহ্মের স্বরূপে স্থিতিলাভের প্রচেষ্টাদি। ব্রহ্ম থেকে পরব্রহ্ম। দ্রষ্টার রূপে এলে পরব্রহ্ম। চিদাকাশে ভক্তিমার্গের সাধক যাঁরা তাঁদের সেখানে আরাধ্যা ভগবানের দর্শনাদি মেলে। যাঁরা যোগী, দ্রষ্টা ও দৃশ্যের মাঝে নিজেকে বসিয়ে রাখেন তাঁরা পূর্ণব্রহ্মে চিদাকাশের ভিতর অদ্বয়তত্ত্বের জ্ঞানশিক্ষাকে উপলব্ধি করতে পারেন। দেখতে পারেন দিব্য মিথুনাদি। যুগলরূপ। শিবশক্তি, রাধাকৃষ্ণের মূর্তির সূক্ষ্ম তত্ত্বাদি এখান থেকে উদ্ভূত। এভাবে দেখার চোখ, দিদৃক্ষার ভিতর দিয়ে যেতে যেতে একসময় দিব্যচক্ষু খুলে যায় সাধকের। চিত্তাকাশ গুরু চক্রের অন্তর্ভুক্ত। এখানে গুরুকে দেখা অভ্যাস করতে হয়। দেবদেবীর দর্শনাদির আগে গুরুদর্শন। চিত্তাকাশ আজ্ঞার স্থান বটে। আজ্ঞার ওপরে গুরু চক্র। গুরু চক্রের নীচে ললনা চক্রের অমৃতস্থালীর কথা কোনও কোনও সাধক বলে থাকেন। গুরু চক্রে গুরুবীজ জপ করতে করতে চিত্তাকাশের বায়ুমণ্ডল কম্পিত ও ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে কুণ্ডলিনীর শেষতম তীব্র ছোঁয়ায়। এখানে অনন্তকায়া ফুটে ওঠে। নানানরকম দৃশ্যাবলি দেখার অভ্যাস তৈরি হয়ে ওঠে। দৃশ্যব্রহ্ম চিদাকাশের। চিত্তাকাশ থেকে চিদাকাশে যাওয়ার সময় ব্রহ্ম নাড়ি জেগে যায়। যেতে যেতে এখানে চিত্তাকাশ অন্ধকারময় হয়ে ওঠে আর এর পর পরই দেবরূপ দেদীপ্যমান হয়। গুরুই দেবতাকে দেখিয়ে দেন। গুরু চক্র হল গুণক্ষেত্র।

এখানে দেবতার গুণ ফুটে ওঠে। সগুণ ব্রহ্মাদি। তারপর রূপ সরে নির্গুণ ব্রহ্ম জ্যোতিপাতে এসে ঠেকে। নব চক্রের তান্ত্রিকী সাধনা এভাবে চলতে থাকে। ষটচক্রের বাইরে ঊর্ধ্বনেত্র থেকে নব চক্রের জ্ঞাতব্য বিষয়াদি পাওয়া যায়। প্রাণতোষিণী তন্ত্রবচনে এর উল্লেখ্যাদি রয়েছে। মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ চক্র, আজ্ঞা চক্র, ললনা চক্র, গুরু চক্র, সহস্রার। শরীরের নটা চক্র, ষোড়শাধার, ত্রিলক্ষ্য ও পঞ্চব্যোমকে যে ব্যক্তি জানেনই না তিনি কখনও যোগীই হতে পারেন না। এ বক্তব্য যোগস্বরোদয়ের, নবচক্রং কলাধারং ত্রিলক্ষ্যং ব্যোমপঞ্চকম স্বদেহে যো ন জানাতি স যোগি নামধারকঃ।। শুধু জানলে তো আর হবে না, চক্রধ্যানে দেখার চোখ তৈরি করতে হবে। দেখতে না শিখলে আধ্যাত্মিকতার ভেতর উন্নীত হওয়ার কোনওরকম কোনও সম্ভাবনাদিও নেই।

চার রকমের চোখের কথা বলা হয় অধ্যাত্ম সাধনায়। তমোগুণসম্পন্ন শরীরীদশার ভিতর থাকে চর্মচক্ষু। চর্মচক্ষুর পরই থাকে জ্ঞানচক্ষু। চর্মচক্ষু আর জ্ঞানচক্ষুর পার্থক্য হল, চামড়ার চোখ বা স্থূল ইন্দ্রিয় খোলা ও বন্ধ করা যায় নিজের ইচ্ছানুযায়ী, কিন্তু জ্ঞানের চোখ সর্বক্ষণ খোলাই থাকে। গুরুদীক্ষার পর জ্ঞানচক্ষুর আধার আসে দেহাদির ভিতর। চামড়ার চোখ সরতে থাকে, অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকায়া। চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।। জগৎকে যতক্ষণ নিজের ভোগের বিষয়রূপে আমরা দেখতে থাকব, যতসময় কর্তৃত্বাভিমান থাকবে আমাদের ততক্ষণ পর্যন্ত মায়াবদ্ধ ভোক্তা জীব— চামড়ার চোখ, সেই চোখ দিয়ে কর্মের ফলভোগের ছবিগুলো, দশাগুলো, সুখ-দুঃখ, হতাশা-বেদনা-ব্যর্থতার কোলাহলগুলো খালি দেখে যাব। গুরুদীক্ষার পর দৃষ্টির সংস্কার হয়। অজ্ঞান দৃষ্টিতে দেখা এতকালের যাবতীয় প্রতিভাত দৃশ্যগুলোর ভিতরে আরেকটা প্রকাণ্ড জগতের ব্যাপ্তি থাকে, যে জগৎকে এতকাল চিনতাম না, জানতামই না।

গুরুদীক্ষায় জ্ঞানচক্ষুর উন্মীলন হল বলেই এখন সেই ভিতরের অখণ্ড ও ব্যাপকরূপে প্রত্যক্ষসত্তার জগৎকে আমি দেখতে শিখেছি। এই দৃষ্টিকে অধ্যাত্মবাদীরা বলছেন চিন্ময়ী দৃষ্টি। চর্মচক্ষু সরলে জ্ঞানচক্ষুর উদয় হলে চিন্ময়ী দৃষ্টি লাভ করা যায়। চিন্ময়ী দৃষ্টি যখন পেলাম, বুঝলাম যে, জগতী পরিবর্তন যেটা হচ্ছে, চর্মচক্ষুর ভিতর দিয়ে যে বদলানোগুলো দেখছি, সকল কিছুর ভিতরে রয়েছে ক্ষণ-পরিমাণ চঞ্চলদশা। এই সুখ বদলে দুঃখ আসছে, রোগ সরে আরোগ্য লাভ হচ্ছে, দেহের ও মনের আধার চঞ্চল— তার ভিতর আধেয় সুখ-দুঃখ, আরোগ্য -ব্যাধি সবই ক্ষণ-পরিণামী। আসছে যাচ্ছে দিন রাত্রির মতো। সেগুলো নিয়ে মেতে আছি। একে বলা হচ্ছে মায়িক প্রপঞ্চ। সমস্ত বৃত্তি— সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দের, আশা-নিরাশার ভোগ করেছি বলেই মায়াবদ্ধ ভক্তা জীব হয়ে উঠেছিলাম, এতকাল ভগবৎসত্তার সাক্ষাৎ স্ফুরণই হয়নি নিজের মধ্যে! এখন হয়েছে জ্ঞানচক্ষু খোলার পর, এখন চিন্ময়ী দৃষ্টি পেয়ে দেখছি যে, ত্যাগ আর ভোগের মধ্যে রয়েছে পরস্পরের বিরোধ। ত্যাগ না করেও তো ভোগ আসছে। যাবতীয় কর্মাদির ফলাফল জনিত যে ভোগ সেই ভোগ থেকে যা আসছে তা হল আসক্তি, মায়া। এগুলোকে বলা হচ্ছে বন্ধনের বীজ। এই সূত্র এখন ছিঁড়েছে বলে দেখছি, সবই আসছে আপনা আপনি। দৃষ্টি শুদ্ধ ছিল না বলে কর্মাদির ভিতর এতকাল ছিল কর্তৃত্ব আর ভোক্তৃত্বের অভিমান। জ্ঞানচক্ষু পাওয়ার পর বুঝলাম কর্ম ও ভোগের জায়গায় আত্মশুদ্ধি আসছে, দ্রষ্টা ও দৃশ্যের জায়গায় গিয়ে দাঁড়াতে পারছি, সেখান থেকে চৈতন্যময় স্বরূপে স্থিতিলাভ করতে পারছি। জ্ঞানচক্ষু সরে এখন দিব্যচক্ষু জাগছে। দিব্যচক্ষুর ভিতর গেলে কুণ্ডলিনী জাগরণ হয়। কুণ্ডলিনী যখন জাগে, কিছু অস্পষ্ট জ্যোতিপাতের ছবি দিব্যচক্ষে ধরা পড়ে। অনেক সময় কুয়াশার মতো পাতলা আলোর আস্তরণ ওঠে ঊর্ধ্বদৃষ্টির পর্দায়। কুয়াশা সরে যখন জ্যোতি দৃশ্যমান হয়, তা

দেবতারই নামান্তর। সাধকেরা বলেন দিব্যজ্যোতি। দিব্যজ্যোতি দেখার সময় মানসচক্ষুর ফের পরিবর্তন হয়ে যায়। দিব্যচক্ষু বদলে গিয়ে ব্রহ্মচক্ষুতে রূপান্তরিত হয়। যে দেবতাকে চিন্তা করা হয় কুণ্ডলিনী ধ্যানে তাঁকে দেখা যায়। ধ্যান ছাড়াও সাধক যদি ভক্তিসহ, মন্ত্র দ্বারা, একাগ্র হয়ে মূর্তিতে চিন্তা করেন কিছু সময়, ওই চিন্তার ফলে মূর্তি শুদ্ধ হয়, সংস্কৃত হয়— ওই মূর্তির সম্মুখে ধ্যানাদি চিন্তার জ্যোতি কিংবা পুজোর নিবিষ্ট দশার ভেতর মূর্তির জাগ্রত স্পন্দন ভেসে উঠতে থাকে। তবে সব মূর্তি এভাবে ভেসে ওঠে না। সব মূর্তিতে ভগবানের ছায়াপাত লক্ষ্য করা যায় না। মূর্তিতে যদি পূজকের দিব্যচক্ষুর প্রতিবিম্ব পড়তে থাকে অনেককাল ধরে তবে সেই মূর্তিতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়ে যায়। মূর্তি জাগ্রত হয়ে ওঠে। ভারতের নানান তীর্থাদির মূর্তিতে দিব্যচক্ষুর অধিকারী সাধকদের কুণ্ডলিনী ধ্যানের একাগ্রতা ও মনন বছরের পর বছর ধরে পড়েছে বলেই সেইসব মূর্তিতে দিব্যজ্যোতির, ব্রহ্মজ্যোতির প্রকাশ ঘটে গেছে। কিন্তু মূর্তির আলগা প্রতিবিম্ব সাধকের শুদ্ধ দৃষ্টির প্রতিবিম্বে তখনই মিলতে পারে, তাঁর যদি দিব্যচক্ষু এক জায়গায় নিশ্চল হয়ে দিব্যজ্যোতি গুটিয়ে গিয়ে তা ব্রহ্মজ্যোতিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। ব্রহ্মজ্যোতির যখন তিরোভাব ঘটে, সমাধি হয়ে যায় গোটা দেহটার। এমন দেহস্থ পুরুষ যদি চক্ষুপথে কলা বের করে শিষ্যের চক্ষুকলায় কিছু সময়ের জন্য স্থির করে রাখেন আর শিষ্যের যদি কলাশক্তি নেওয়ার ক্ষমতা তৈরি থাকে তবে এই চাক্ষুষী বিদ্যার প্রয়োগে পরবর্তী সময়ে শিষ্য যখন একাকী সাধন আসনে বসবেন জ্যোতির্ময় প্রকাশ হঠাৎ করে পেতে শুরু করে দেবেন। একে বলে চাক্ষুষী দীক্ষা। মস্তিক আর চক্ষু হল সাধনার শ্রেষ্ঠ পথ। এই দুই পথকে কাজে লাগিয়ে যোগী মহাত্মারা নানান দিব্যপ্রকাশ ঘটিয়ে থাকেন। দৃষ্টি সম্মোহনেরও সহায়ক হল চক্ষু। তবে দিব্যচক্ষু ছাড়া সম্মোহন বিদ্যাদির প্রয়োগ ঠিকভাবে হয় না। সম্মোহনের জন্য দরকার

একাগ্র নাদ। নাদ হল সত্তার ভিতরের শব্দ। মন বিক্ষিপ্ত হয়ে থাকলে নাদ পাওয়া যায় না। চিদাকাশ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারলে নাদ পাওয়া যায়। নাদ যখন ক্রমশ মনকে আকর্ষণ করতে থাকে, জ্যোতিতে প্রকাশিত হতে হতে একসময় বিন্দুতে স্থিতিলাভ করে, এই অবস্থায় মন চলে যায় না দেহ থেকে, মনের জগৎ তখন পুরোপুরি খুলে যায়, সাধক যদি এই খোলা মন নিয়ে দৃষ্টি সম্মোহনে বসেন তখন সম্মোহিত দেহটাতে তিনি চক্ষুপথে গিয়ে দেহের নিজস্ব চেতনশক্তিকে বন্ধ করে দিতে পারেন। সেখানে নিজ দেহের চেতন প্রতিফলিত করে সম্মোহিতদশার শরীরটাকে বশ করে নিতে পারেন। এ খুব শক্ত কাজ। সম্মোহন বিদ্যার প্রয়োগাদি অপতন্ত্র আদতে নয়। সম্মোহনের নামে অপতন্ত্রের গালগল্প দেওয়া হয় আর সম্মোহন বিদ্যার প্রয়োগে জাগতিক কর্মাদি, কাউকে বশীকরণ করার মতন ছেঁদো কথকতা চালু করে বদ মতলবি সাধু তান্ত্রিকেরা ক্ষুন্নিবৃত্তি নিবারণের পথ খোঁজেন। কিছু লোভী মানুষজন এঁদের পাল্লায় পড়ে অর্থ খোয়ান। সম্মোহন বিদ্যা দিয়ে কখনও কাউকে বশ করা যায় না। কারও পছন্দের মানুষকে বশ করে হস্তগত করা কিংবা সম্মোহনে এনে অর্থকড়ি হাতিয়ে নেওয়ার মতো যেসব কথামালার রটনা দিয়ে মতলবি তান্ত্রিকেরা গল্প ছড়ান সেগুলো বুজরুকি ছাড়া কিছু নয়। মানুষেরা প্রাপ্তির আশায় এঁদের পাল্লায় গিয়ে পড়ে। সম্মোহন হল দিব্যরূপে আবির্ভাব। সাধকেরা সম্মোহন বিদ্যার প্রয়োগ করে প্রিয় আধারে, শিষ্যের দেহে বিশুদ্ধ চৈতন্য প্রবাহের উদগম ঘটান। এতে শিষ্যের দেহাদিতে শুদ্ধ নাদধারার নির্মল চৈতন্যাদির প্রকাশ ঘটতে থাকে। চাক্ষুষী বিদ্যার প্রয়োগ করে যোগী মহাত্মারা একে অপরের সঙ্গে কথা বলেন, অনেক সময় ছোট সমাগমে, সকলের সম্মুখে প্রয়োজনীয় সাধন অর্জনগুলো নিজেদের ভিতর এভাবেও আদানপ্রদান করে নেন। সকলের পক্ষে এসব ধরা সম্ভবপর হয় না।

চাঁদপুরে থাকাকালীন সময়ে রোহিণীকুমার মজুমদারের বাসাতে এসে উঠলেন স্বীয় গুরু মহাত্মা রাম ঠাকুর। খবর পেয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলেন মা আনন্দময়ী। আনন্দময়ী মা বিকেলে এসেছেন রোহিণীবাবুর বাসাতে রাম ঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। খবর আশেপাশে ছড়িয়ে পড়লে মা ও ঠাকুরকে দেখতে রোহিণীবাবুর বাসাতে ভিড় জমে যায়। রাম ঠাকুর বসে রয়েছেন রোহিণীকুমার মজুমদারের খাটের ওপর। নীচেতে লোকের জমায়েত। তিল ধারণের জায়গা নেই। বহুলোক ঘরের বাইরে বাসার বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন আনন্দময়ী মায়ের অপেক্ষায়। বিকেল পাঁচটার সময় মা এলেন। রোহিণীবাবু লোকজনের ভিড় কাটিয়ে আনন্দময়ী মাকে গুরুদেবের খাটের ওপর তুলে দিলেন। কেউ কোনও কথাই বলছেন না। দু'জনের দৃষ্টি দু'জনের চোখে স্থিরকৃত হয়ে আছে। ঘরে ও বাইরে কোলাহল। আধঘণ্টা এমন অবস্থায় থাকার পর মা আনন্দময়ী বললেন, এইবার যাই। রাম ঠাকুর উত্তর করলেন, আচ্ছা। রোহিণীকুমার মজুমদার নিজের গুরুদেব রাম ঠাকুরের লীলার নানান অংশাদি গুরুসঙ্গে দীর্ঘদিন একত্রবাসে থাকবার ফলে অবগত হয়ে কিছু স্মৃতিচারণমূলক কথিকা লিপিবদ্ধ করে গেছেন শ্রীগুরু শ্রীশ্রীরাম ঠাকুর বইখানাতে। তিনি সেখানে ঠাকুর ও মায়ের সেই চাক্ষুষী আলাপন প্রসঙ্গে লিখেছেন, চক্ষের ভাষায় তাঁহারা পরস্পরের ভাব বিনিময় করিলেন, অনুমান করিলাম। অতি কষ্টে আবার ভিড় কাটাইয়া মাকে বাহিরে আনিলে ডাক্তারবাবু তাঁহাকে লইয়া চলিয়া গেলেন। আমার বাসায় আর একবার মা আনন্দময়ী ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কোনও কথোপকথন শুনি নাই। তাঁহাদের ভাষা পৃথক। সে ভাষা আমাদের মতো জীবের শুনিবার শক্তি কোথায়!

সাধনার মূলে রয়েছে অভ্যাসযোগ। সকাল সন্ধ্যায় নিবিড় ধ্যানের নিয়মিত অভ্যাস, সেই সঙ্গে একটু একটু করে জপের পরিধি বাড়িয়ে তুলতে তুলতে

নিজের ভিতর ধ্যান-চিত্ততা তৈরি হয়ে ওঠে। ধ্যানের ভিতর শূন্য ভাবনা খুব উপযোগী। শূন্যতার প্রতীক হিসেবে আকাশ ভাবনার কথা বারে বার বলছে উপনিষদ। ছান্দোগ্যোপনিষদে রয়েছে, বাইরের আকাশের সাযুজ্যে সবসময় মনের ভিতর আকাশ স্থির করে নেওয়া জরুরি। অন্তরাকাশ বা হৃদয়াকাশের নিবিড় সংযোগ পেলে সেখানে শেষ পর্যন্ত অনুভব স্পষ্ট হয়ে উঠবে। হৃদয়াকাশের ভিতর জপ করার অভ্যাস গড়ে তুলতে হয়। জপাদি হল মন্ত্রযোগের অন্তর্গত। মন্ত্র একটা শব্দ। শব্দ স্পন্দন তৈরি করতে পারে। ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য বলছেন, দুন্দুভি বাজালে তা থেকে যেরকম শব্দ বের হয় তেমনি প্রণবের শব্দ প্রশান্ত চিত্তে উঠতে থাকলে স্পন্দন তৈরি হবে। জপ, বীজ বা মন্ত্রের নিভৃত উচ্চারণাদি হৃদয়াকাশকে কাঁপিয়ে তোলে। ধ্বনিটা আশ্চর্য নিভৃতির বলে আমরা টের পেতে থাকি। এই হল গিয়ে নাদ। নাদ সাধনা মন্ত্রযোগের। বীজমন্ত্র হৃদয়াকাশে জপ করতে করতে সেখানে ইষ্টনামে স্ফুরিত ভাবের আবেশ হঠাৎ করে চলে আসতে থাকে। একটা সময় হৃদয়াকাশে যখন চিত্তাকাশ জেগে ওঠে, বীজমন্ত্র উচ্চারণের আর দরকার পড়ে না, স্বতঃস্ফুরণ হতে থাকে মন্ত্রের, জপের। একে বলে অনাহত ধ্বনি বা অনাহত নাদ। হৃদয় চক্রে জপ করলে ধ্বনি সহজে পাওয়া যায়। ধ্বনি থেকে এক সময় বিন্দু বিন্দু আলোর রেখা বের হতে থাকে। দ্রষ্টার ভূমিকাতে যখন চলে যান সাধক, সেই রশ্মিজাল দেখতে পান। একে বলা হয় নাদের রেখা। বিন্দু বিন্দু রশ্মিজালে এ সময় বিস্ফারিত হয়ে ওঠে চিত্তাকাশ। ফলস্বরূপ চিদাকাশ জেগে গিয়ে হৃদজ্যোতি বের হতে থাকে। নাদের উপাসনা জ্যোতিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। শব্দ বন্ধ হয়ে যায়। চিদাকাশে নাদের ধ্বনি ডুবে যায়। জ্যোতি ছড়িয়ে পড়তে থাকে সেখানে। জ্যোতি হল অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তত্ত্ব পেরোলে অতীন্দ্রিয় তত্ত্বের পাঠক্রম শুরু হয়। আত্মচৈতন্যের বিস্ফোরণ হল অতীন্দ্রিয় ভূমির তত্ত্বাদি। একে ব্রহ্ম বলা হচ্ছে। দেববাদ

এসেছে ব্রহ্মবাদ থেকে। যে চৈতন্য আমার মধ্যে আছে তা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে আছে। মরমিয়ারা বলছেন, যা আছে দেহভাণ্ডে তাই রয়েছে ব্রহ্মাণ্ডে। দুই সত্তার মিলিত প্রকাশ ব্রহ্ম। ব্রহ্মের বিভূতি হিসেবে দেবতাকে দেখা হচ্ছে। বিশ্বের মূলে চৈতন্য ও চিৎশক্তিকে স্বীকার করে নিয়ে ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের ধারাতে দেববাদের উৎপত্তি ঘটানো হয়েছে। দেবতাকে বলা হচ্ছে ব্রহ্মচৈতন্যের বিভূতি। আত্মচৈতন্যের বিভূতি, মনোবৃত্তি, প্রাণবৃত্তির ভিতর দিয়ে যেতে যেতে ব্রহ্মচৈতন্যের বিভূতির দেখা পেলে। দেখার চোখ তৈরি না হলে দেবতা বা ব্রহ্ম কোনওটার সারবত্তা পাওয়া যাবে না। দেহের উপরের স্তরে রয়েছে কাম। গভীরে রয়েছে জ্ঞান আর তারও গহীনে প্রেম। কামকে বা ইন্দ্রিয়গুলোকে নিষ্ক্রিয় না করতে পারলে দেহের ভিতরকার জ্ঞানবস্তুর দেখা পাওয়া সম্ভব নয়। মন্দিরের বাইরে, দেওয়ালে রয়েছে কামলীলার ছবি। দেহও মন্দির। দেহের বাইরের দশাতে খুব বেশি ইন্দ্রিয়েরা সজাগ। মন্দির ভাস্কর্যের কামলীলা দেখার পর যখন ভেতরে প্রবেশ করলাম আমরা, বেদিতে রয়েছেন একা দেবতা কিংবা দেবী আর নীচে শান্ত চুপ মেরে বসে আছি ভক্ত সেজে। গভীর গহীনে রিক্ততার ছবি। দেবতা বা দেবীর চরণে নিজেকে বিলিয়ে দিচ্ছি। দেহ শান্ত, ইন্দ্রিয়ানুভূতি শিথিল। জগতে যদি কাম থাকে আর গোটা জগৎটাই যদি ভগবানের মানি তাহলে দেবতার মন্দিরে প্রাচীন ভাস্কর্যাদিতে কামলীলার ছবিকে অশ্লীল বোধগম্য করব বা কেন? দেখার চোখ এখানেও বদলে দিতে হবে। বুঝতে হবে দেহতত্ত্ব ও আধ্যাত্মিক তত্ত্ব। দেবতার কাছে অশ্লীল বলে কিছু নেই। দেহের উপরিভাগে আমাদের ইন্দ্রিয়াদির প্রবল সাড়া। এটাও তো অশ্লীল। এর গভীরে রয়েছে জ্ঞান। জ্ঞান যখন হল, দৃষ্টি খুলল, প্রেম-রিক্ততা-সমর্পণ ইত্যাদি বেরিয়ে পড়ল। ত্রিমাত্রিক গুণ দিয়ে যেমন দেহ তৈরি তেমনই অনেক প্রাচীন মন্দিরাদি তৈরির সময় সেই ত্রিমাত্রিক বোধকেই আসলে

মান্যতা দেওয়া হয়েছে। এটা আমাদের ভাল করে বুঝতে হবে। তারপর কথা বলতে হবে শ্লীল-অশ্লীলাদি নিয়ে। প্রাকৃত চেতনা কামাবচর ভূমির চেতনা। মন্দিরের গায়ে, দেবতার পিছনের চালচিত্রে কামলীলার ছবি। তারপর ঊর্ধ্বচেতনার সিঁড়িতে দাঁড়ালে দেখতে পাওয়া যাবে আকাশের ব্যাপ্তি। যার ভিতরে আমাদের ঢুকতে হবে। তলিয়ে যেতে হবে। তখন সবকিছু নিজের মধ্যে ফুটে উঠতে থাকবে পরিব্যাপ্ত চেতনায়।

নিজের মনের মধ্যে যা উদয় হবে সেই মতো করে গেলে কিছু হবে না। গুরুর কথামতো কাজ করতে হবে। মহাজনেরা বলে থাকেন, মনমুখী গোয়ারা, গুরুমুখী ভগবৎ প্যারা। সাতটা ভূমি বা স্তর পেরোতে হয় অধ্যাত্ম সাধনায়। বিষয়ের প্রতি যখন প্রবলতর অনাসক্তি আসে, গুরু ও তীর্থের প্রতি অনুরাগ জাগে, সাধনার প্রথম ভূমি জেগে যায়, গুরু তীরথ অনুরাগ, বিষয় বিষ কর্মান, ইসিকো জান প্রথম ভূমকা প্রমাণ। জগতের অনন্ত কার্যশৃঙ্খলা যখন বুঝতে পেরে গিয়ে জগৎ ও স্বচৈতন্যকে এক করে নিয়ে ধ্যানে বসে যাওয়ার স্বভাবজ সত্তা তৈরি হয়ে উঠবে, দ্বিতীয় ভূমির সন্ধানও মিলে যাবে, হমমে কৌনজগৎমে কৌন ইসকা ধ্যান। দুসরা ভূমকা প্রমাণ। তৃতীয় ভূমিতে সর্বগতব্রহ্মবোধ প্রখর হয়ে উঠতে থাকবে আর নিজের ও জগতের আধারভূত এক ব্রহ্মশক্তিকে অনুধাবন করবার মতো বোধ তৈরি হয়ে উঠবে, এক ব্রহ্ম জগৎমে জীবমে বসতা হ্যায় ঔর সব কি কারণ। ইয়ে হ্যায় তিসরা ভূমকা প্রমাণ। চতুর্থ ভূমিতে সবকিছু এক বলে মনে হতে থাকবে। শিবশক্তি, শ্যামশ্যামার একীভূত ভাবনা। সাধক সম্প্রদায়, জাতি, বর্ণকে এক করে দেখার অভ্যাস চতুর্থ ভূমির ফলাফল। এখানে সুখ-দুখ, ভাল-মন্দেও এক বোধ তৈরি হয়ে উঠবে, সর্বত্র সমদর্শন অউর অখণ্ডসন্তোষ। চৌথা ভূমকা প্রমাণ। পঞ্চম ভূমি ভক্তিভূমি, প্রেমভূমি, নারদ ভক্তি প্রেম, পঞ্চম ভূমকা প্রমাণ। এই ভূমিতে এসে দাঁড়াতে পারলে আর কোনও অধোদৃষ্টির ব্যাপার

নেই। ঊর্ধ্বদৃষ্টির ভিতর সকল ভূমির স্বরূপ সম্বন্ধে তখন আপনা থেকে অবগতি হতে থাকে। এমন লক্ষণযুক্ত মহাত্মার বশীকৃতমন, একাগ্রচিত্তের কাছাকাছি যদি কেউ থাকতে পারেন তবে দীর্ঘদিন সাধুসঙ্গের ফলে তাঁর মনও সর্বপ্রকার বিষয়সঙ্গবর্জিত হয়ে পড়ে বশীভূত ও একাগ্র হয়ে পড়বে। এও একপ্রকার গুরুর ছত্রছায়ায় থাকতে থাকতে শিষ্যদেহের বশীকরণ। এমন বশীকরণ কৃপাপরবশ হয়ে থাকে। গুরুর জ্ঞানশক্তির সঙ্গে ক্রিয়াশক্তির অভিন্ন যোগ-সংযোগের যে চৈতন্যভূমি সেখানে যদি শিষ্য তাঁর সাধনদেহের আংশিক অভিব্যক্তি ভরে দিয়ে গুরুর চৈতন্যের পূর্ণ স্বরূপশক্তিকে আস্বাদন করবার চিদ্রূপী সত্তা তৈরি করে নিতে পারার মতন ক্ষমতাবান হন তাহলে শিষ্য গুরুদেবের একাগ্রভূমি ও সমাধিচেতনার অন্তর্মুখকে নিজ দিকে আকর্ষণ করবার প্রক্রিয়াদিও জানেন। এর প্রয়োগে শিষ্যদেহে গুরুশক্তি রূপান্তরিত হয়ে যায়। দৃষ্টি, জ্ঞান ও ক্রিয়ার সম্মোহন বিদ্যাদি দিয়ে সূক্ষ্ম দেহাদির মারাত্মক প্রাণশক্তির চেতনাকে বশীকরণ করে শিষ্য গুরুর আধারকে কাজে লাগান। উভয়ের সূক্ষ্ম সম্বন্ধবোধে চিদানন্দময় লীলাভূমির বিকাশ হয়। স্থূলরূপের প্রকটভূমি তখন লৌকিক ইন্দ্রিয়ের বাইরে বের হয়ে আসে। একে মনোময় ভূমি বলে। মনোময় ভূমির লোকোত্তর দশায় বিজ্ঞানময় ভূমি জাগতে থাকে। সেখানে ঘটে আনন্দময় প্রকাশ। এমন প্রকাশে গুরু শিষ্য এক হয়ে ওঠেন। অনেক ক্ষেত্রে দুই মহাত্মার ভিতরেও এমন প্রকাশ ঘটে থাকে শক্তিক্রিয়ায়, জ্ঞানক্রিয়ায়, দেহক্রিয়ায়। সব ক্ষেত্রে গুরু শিষ্যের সম্পর্কাদি লাগে না। সম্বন্ধ লাগে উন্নত প্রজ্ঞার। এমন আধার পেলে যোগী মহাত্মা স্বীয় শিষ্য না হলেও সেখানেও চাক্ষুষী বিদ্যা, দৃষ্টি সম্মোহন ও দিব্যশক্তির অবতরণ ঘটান,

যখন আলোটি নিভিয়া যাবে,
আঁধার হইবে বিশ্ব।

এ ব্রহ্মাণ্ডে কে কার গুরু,
কে কার, বলো শিষ্য।